বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তারে কাথলিক মিশনারীদের অবদান মূল্যায়ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মাস্টার অব ফিলোসফি (এম.ফিল) ডিগ্রীর আংশিক চাহিদা পূরণার্থে দাখিলকৃত গবেষণা সন্দর্ভ

লিপিকা জেন কস্তা

মাস্টার অব ফিলোসফি (এম.ফিল)

নিবন্ধন নং ১৭৮

শিক্ষাবর্ষ ২০১১-২০১২

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উৎসর্গ

সকল মিশনারীদের প্রতি,

যাঁরা মানসম্মত শিক্ষা

বিস্তারে আনবে গতি।

ঘোষণাপত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, **“বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তারে কাথলিক মিশনারীদের অবদান মূল্যায়ন”** শীর্ষক আমার এম.ফিল সন্দর্ভটি তত্ত্বাবধায়ক ড. মো: আব্দুল মালেক-এর নির্দেশনায় পরিচালিত একটি বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার ফসল। এ শিরোনামে আমার কোন সন্দর্ভ কিংবা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রি বা প্রকাশনায় ইতোপূর্বে উপস্থাপিত হয়নি।

লিপিকা জেন কস্তা
এম.ফিল গবেষক
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তারিখ: ----জুন ২০১৬

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের এম.ফিল গবেষক (নিবন্ধন নং-১৭৮, শিক্ষাবর্ষ ২০১১-২০১২), লিপিকা জেন কস্তা কর্তৃক উপস্থাপিত **"বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তারে কাথলিক মিশনারীদের অবদান মূল্যায়ন"** শীর্ষক সন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে প্রণীত হয়েছে। সন্দর্ভটি তাঁর একক গবেষণাকর্ম। আমি সন্দর্ভটির প্রাথমিক এবং চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং এটি এম.ফিল ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যথাযথ কর্তৃপক্ষ সমীপে উপস্থাপনের সুপারিশ করছি।

ড. মোঃ আব্দুল মালেক
অধ্যাপক
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তারিখ: ---- জুন ২০১৬

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল কৃতজ্ঞতা মহান সৃষ্টিকর্তা পরম করুণাময় ঈশ্বরের প্রতি। তাঁর অপার কৃপায় আমি **“বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তারে কাথলিক মিশনারীদের অবদান মূল্যায়ন”** গবেষণা কর্মটি সুনির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করতে সমর্থ হয়েছি। গবেষণা কর্মটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

গবেষক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর পরিচালক মহোদয়ের প্রতি, যাঁর দাপ্তরিক সহযোগিতায় গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে সমর্থ হয়েছি।

গবেষক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক শ্রদ্ধেয় ড. মোঃ আব্দুল মালেক, অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এর প্রতি। গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে রয়েছে যাঁর সুষ্ঠু নির্দেশনা, সুচিন্তিত মতামত ও লেগে থাকা শ্রম। যা গবেষণার আঙ্গিক ও বাহ্যিক পুষ্টি সাধন করে গবেষণা কর্মটিকে তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করেছে।

গবেষক কৃজ্ঞতা প্রকাশ করছে, মিঃ রিচার্ড ডি-কস্তার প্রতি তাঁর পরিশ্রম ও আন্তরিক সহযোগিতা গবেষণা কর্মটিকে সমৃদ্ধি দান করেছে।

গবেষক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে বিভিন্ন তথ্য ও সূত্র প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিপ্রধান, মিশনারীগণ (ফাদার, সিস্টার ও ব্রাদার), সহকর্মী ও সহযোগীদের প্রতি। যাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা গবেষকের গবেষণাকর্মে পাথেয় হয়ে থাকবে। পরিশেষে গবেষক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে পরিবারের সদস্যবর্গ, এম. ফিল ২০১১-২০১২ শিক্ষাবর্ষে সকল শিক্ষার্থী বন্ধুদের প্রতি। যারা গবেষকের গবেষণাকর্মে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন।

বিনীত
লিপিকা জেন কস্তা
গবেষক

গবেষণার সার সংক্ষেপ

লিপিকা জেন কস্তা **"বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তারে কাথলিক মিশনারীদের অবদান মূল্যায়ন"** এম. ফিল কার্যক্রমের আংশিক পরিপূরক অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

গবেষণার শিরোনাম

"বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তারে কাথলিক মিশনারীদের অবদান মূল্যায়ন"।

গবেষণার গুরুত্ব

শিক্ষা একটি দেশের দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির জন্য গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। শিক্ষাই দেশ ও জাতির অগ্রগতির পথকে সুগম করে জাতীয় আশা, আকাঙ্ক্ষা ও ভবিষ্যৎ সমাজ জীবনকে সার্থকভাবে প্রতিফলিত ও বিকশিত করে তোলে। তাই জ্ঞানের প্রসার সাধন, মানুষের সার্বিক উন্নয়ন ও পরিবেশের সাথে শিক্ষার্থীদের অধিকতর ফলপ্রসূভাবে খাপ খাওয়ানোর ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা সম্পর্কে গবেষণার প্রয়োজন। উন্নত গবেষণা পদ্ধতিকে শিক্ষা ও শিক্ষা প্রক্রিয়ায় প্রয়োগ করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমস্যা উদঘাটন করা ও সুষ্ঠু ভাবে সমাধানের প্রচেষ্টা হয়ে থাকে।

সাধারণ অর্থে 'শিক্ষা' বলতে বোঝায় ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ সাধন। কাথলিক মিশনারীরা শুরু থেকেই শিক্ষার এ লক্ষ্য অর্জনে বিশেষ অবদান রেখে চলেছেন। একই ভাবে তাঁরা শিক্ষার মাধ্যমে বাংলাদেশে সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছেন। তাঁরা মনে করেন, শিক্ষার দ্বারা একটি জাতিকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে ও সত্যিকারের আলোর পথে চলতে সহায়তা করা যেতে পারে। তাই তাঁরা সারা দেশে তৈরি করেন অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যাতে সবাই শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়। বর্তমানে বাংলাদেশে কাথলিক মিশনারীদের পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে - ৫টি কলেজ, ৪৮টি হাইস্কুল, ১৪টি জুনিয়র হাইস্কুল, ৫১৩টি প্রাইমারী স্কুল এবং ১৩টি ভোকেশনাল স্কুল, ১২৫টি হোস্টেল এবং ১টি বিশ্ববিদ্যালয়। উল্লেখযোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে: নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাকা), নটর ডেম কলেজ (ঢাকা), হলিক্রস কলেজ (ঢাকা), সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুল এণ্ড কলেজ (ঢাকা), সেন্ট গ্রেগরী হাইস্কুল এণ্ড কলেজ (ঢাকা),

সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার হাইস্কুল (ঢাকা), সেন্ট নিকোলাস হাইস্কুল (নাগরী, গাজীপুর), সেন্ট প্লাসিড হাইস্কুল এণ্ড কলেজ (চট্টগ্রাম), বান্দুরা হলিক্রস হাইস্কুল এণ্ড কলেজ (নবাবগঞ্জ), হলিক্রস গার্লস হাইস্কুল (তেজগাঁও, ঢাকা), হলিক্রস গার্লস কলেজ (তেজগাঁও, ঢাকা) এবং সেন্ট আলফ্রেড হাইস্কুল (পাদ্রিশিবপুর, বরিশাল)।

এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মিশনারী সিস্টার, ব্রাদার ও ফাদারদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। তাঁদের নিষ্ঠা, দক্ষতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে এসব প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করছে। তাঁদের অবদানে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার মানসম্মতকরণ এগিয়ে যাচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে নানাবিধ সামাজিক সুফল সৃষ্টি হচ্ছে।

বলা চলে, শিক্ষা সমাজের অগ্রগতির অন্যতম প্রধান উপায়। তবে গতানুগতিক শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের অগ্রগতি সাধন সম্ভব নয়। কেবল আধুনিক চিন্তা ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি সমন্বিত শিক্ষাই সামাজিক উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করতে পারে। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও সমাজ অগ্রগতিতে দীর্ঘদিন ধরে মিশনারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে ও নানা সামাজিক কর্মকাণ্ডে মিশনারীদের অবদান মূল্যায়নের দাবী রাখে। এ পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণাকর্মটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণাকর্মের প্রধান উদ্দেশ্যাবলি নিম্নরূপ

ক. বাংলা ভূখণ্ডে কাথলিক মিশনারীদের শিক্ষা বিস্তারের প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান করা;

খ. বাংলায় কাথলিক মিশনারীদের শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণ করা;

গ. বাংলায় কাথলিক মিশনারীদের শিক্ষা বিস্তারের পরিসর অনুসন্ধান করা;

ঘ. বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় কাথলিক মিশনারীদের অবদান পর্যালোচনা করা; এবং

ঙ. বাংলাদেশে কাথলিক মিশনারীদের শিক্ষা বিস্তারের সামাজিক ফলাফল মূল্যায়ন করা।

গবেষণার অনুমিত সিদ্ধান্ত

১. কাথলিক মিশনারীদের পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সর্বস্তরের মানুষের শিক্ষার সহায়ক।

২. বাংলাদেশের মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা পালন করে আসছে।

৩. মানসম্মত শিক্ষা বিস্তারে মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

গবেষণার পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণার তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বহুল প্রচলিত 'ঐতিহাসিক বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি' অনুসরণ করা হয়েছে।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

বর্তমান সমস্যাটির পরিসর অত্যন্ত ব্যাপক। দেশে কাথলিক মিশনারীদের পরিচালিত বিভিন্ন ধরনের বা বিভিন্ন মাধ্যমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। আরো রয়েছে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাবিদ, শিক্ষা কর্মকর্তা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী। গবেষণাটি সঠিক, সুন্দর, সুষ্ঠু ও সুচারু রূপে সম্পন্ন করার জন্য পর্যাপ্ত সময় ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমান গবেষণাকর্মটি এম.ফিল কোর্সের আংশিক চাহিদা পূরণের জন্য পরিচালিত হওয়ায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে। তাই স্বল্প সময়, আর্থিক সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্যাজনিত কারণে গবেষণাটি সংক্ষিপ্ত ও সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
উৎসর্গ	VIII
ঘোষণাপত্র	VIII
প্রত্যয়নপত্র	VIII
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	VIII
গবেষণার সারসংক্ষেপ	VIII

প্রথম অধ্যায়

গবেষণার বিবরণ	**১-৬**
১.১ ভূমিকা	১
১.২ ব্যবহারিক প্রত্যয়সমূহ	২
১.৩ গুরুত্ব	৩
১.৪ উদ্দেশ্য	৪
১.৫ পদ্ধতি	৫
১.৬ পরিধি	৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

	পৃষ্ঠা নং
সংশ্লিষ্ট সাহিত্য ও গবেষণা পর্যালোচনা	**৭-১১১**
২.১ ভূমিকা	৭
২.২ শিক্ষা সহায়ক আন্তর্জাতিক ও জাতীয় দলিল ও কমিশনসমূহের পর্যালোচনা	৮
২.৩ জাতীয় শিক্ষা নীতি চূড়ান্ত খসড়া-২০১০	১৪
২.৪ সংশ্লিষ্ট পুস্তকাদি ও নিবন্ধ পর্যালোচনা উপস্থাপন	২০

তৃতীয় অধ্যায়

পৃথিবীতে খ্রিস্টধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ	**১১২-১৯৬**
৩.১ ভূমিকা	১১২
৩.২ জগত সৃষ্টি	১১২
৩.৩ মানব সৃষ্টি	১১২
৩.৪ পাপ	১১৩
৩.৫ সম্পর্ক পুনঃস্থাপন	১১৩
৩.৬ মনোনীত জাতি	১১৪
৩.৭ জল প্লাবন	১১৪
৩.৮ মোশীকে আহ্বান	১১৪
৩.৯ রাজা দাউদ	১১৪
৩.১০ উপায়সমূহ	১১৫

৩.১১ পরিত্রাণের উপায়	১১৫
৩.১২ যীশুর বাণী প্রচারের মূলভাব	১১৬
৩.১৩ দূত সংবাদ	১১৬
৩.১৪ যীশুর জন্ম	১১৭
৩.১৫ রাখালদের কাছে সংবাদ	১১৭
৩.১৬ যীশুকে মন্দিরে উৎসর্গ	১১৮
৩.১৭ পণ্ডিতদের আগমন	১১৮
৩.১৮ মিশরে পলায়ন	১১৯
৩.১৯ শিশু হত্যা	১১৯
৩.২০ মন্দিরে বালক যীশু	১১৯
৩.২১ যীশুর আত্মপ্রকাশ	১২০
৩.২২ বারোজন শিষ্য মনোনয়ন	১২২
৩.২৩ যীশুর যেরুশালেমে প্রবেশ	১২৩
৩.২৪ যুদাসের চুক্তি	১২৩
৩.২৫ শেষ ভোজ	১২৩
৩.২৬ গেৎসিমানী বাগানে যীশু	১২৪
৩.২৭ মহাযাজকের দরবার	১২৪
৩.২৮ পিলাতের দরবারে যীশু	১২৪

৩.২৯ সৈন্যদের হাতে যীশুর অপমান ১২৫

৩.৩০ যীশুর ক্রুশ বহন ১২৫

৩.৩১ যীশুর ক্রুশারোপণ ১২৫

৩.৩২ যীশুর সমাধি ১২৫

৩.৩৩ যীশুর পুনরুত্থান ১২৬

৩.৩৪ শিষ্যদের কাছে যীশুর দর্শনদান ১২৬

৩.৩৫ শিষ্যদের প্রেরণ ১২৭

৩.৩৬ যীশুর স্বর্গারোহণ ১২৭

৩.৩৭ ঈশ্বরের পরিকল্পনায় খ্রিস্টমণ্ডলী ১২৭

৩.৩৮ খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রসার ১৩৪

৩.৩৯ পবিত্র আত্মার অবতরণ ১৩৫

৩.৪০ খঞ্জ বা খোঁড়া ব্যক্তির আরোগ্যলাভ ১৩৭

৩.৪১ প্রথম ধর্মশহীদ ১৩৭

৩.৪২ পিতরের কর্মতৎপরতা ১৩৭

৩.৪৩ খ্রিস্টভক্তদের উপর ইহুদী নেতাদের উৎপীড়ন (৪২খ্রিঃ) ১৩৯

৩.৪৪ শৌলের মনপরিবর্তন ১৩৯

৩.৪৫ পিতরের প্রাধান্য ১৪০

৩.৪৬ পল (শৌল)এর প্রচারকার্য ১৪১

৩.৪৭ পলের প্রথম প্রচারযাত্রা (৪৫-৪৯ খ্রিঃ)	১৪১
৩.৪৮ দ্বিতীয় প্রচার যাত্রা (৫১-৫৪ খ্রিঃ)	১৪১
৩.৪৯ রোম অভিমুখে পলের যাত্রা	১৪২
৩.৫০ রোমে পিতর (পিটার)	১৪৩
৩.৫১ খ্রিস্টানদের উপর প্রথম নির্যাতন (৬৪-৬৮ খ্রিঃ)	১৪৪
৩.৫২ ধর্মশহীদ পিতর ও পল	১৪৪
৩.৫৩ নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি	১৪৫
৩.৫৪ জেরুশালেমের ধ্বংসলীলা	১৪৫
৩.৫৫ কাটাকম্ব সমাধিস্থান	১৪৬
৩.৫৬ মণ্ডলীর সংগঠন	১৪৬
৩.৫৭ দ্বিতীয় নির্যাতনকাল (৯৪-৯৬ খ্রিঃ)	১৪৭
৩.৫৮ তৃতীয় নির্যাতনকাল (৯৮-১১৭ খ্রিঃ)	১৪৭
৩.৫৯ ধর্মশহীদ সাধু ইগ্নেসিয়াস (১০৭ খ্রিঃ)	১৪৮
৩.৬০ ধর্মোপাসনাদি	১৪৮
৩.৬১ চতুর্থ নির্যাতনকাল (১৬১-১৮০ খ্রিঃ)	১৪৯
৩.৬২ পঞ্চম নির্যাতনকাল (২০২-২১০ খ্রিঃ)	১৫০
৩.৬৩ ষষ্ঠ নির্যাতনকাল (২৩৫-২৩৮ খ্রিঃ)	১৫২
৩.৬৪ সপ্তম নির্যাতনকাল (২৪৯-২৫১ খ্রিঃ)	১৫২

৩.৬৫ অষ্টম নির্যাতনকাল (২৪৭-২৫৯ খ্রিঃ) ১৫২

৩.৬৬ নবম নির্যাতনকাল (২৭৫ খ্রিঃ) ১৫৪

৩.৬৭ দশম নির্যাতনকাল (৩০৩ খ্রিঃ-৩০৫ খ্রিঃ) ১৫৫

৩.৬৮ বিভিন্ন ভ্রান্ত ধর্মমত ১৫৬

৩.৬৯ মণ্ডলীর সাংগঠনিক কার্যক্রম ১৫৭

৩.৭০ রাজধানী কনষ্টান্টিনোপল ১৫৮

৩.৭১ স্থাপত্য কীর্তি ১৫৮

৩.৭২ ধর্মভ্রষ্ট ১৫৮

৩.৭৩ মণ্ডলীর প্রাথমিক পর্যায়ের ধর্মগুরু ও আচার্যগণ ১৫৯

৩.৭৪ সাধু আমব্রোজ ১৬১

৩.৭৫ সাধু আগষ্টিন ১৬২

৩.৭৬ বর্বরদের রোম আক্রমণ ১৬৩

৩.৭৭ স্কটল্যাণ্ডে বর্বরদের মধ্যে ধর্মপ্রচার ১৬৪

৩.৭৮ মণ্ডলীর প্রগতিশীল সংগঠন ১৬৪

৩.৭৯ ভাণ্ডালদের আক্রমণ ১৬৫

৩.৮০ ধর্মভ্রষ্ট নেষ্টোরিয়াস ১৬৬

৩.৮১ আয়ারল্যাণ্ড ১৬৬

৩.৮২ এটিলা ও বর্বর হুনজাতি ১৬৭

৩.৮৩ ইটালীতে বর্বর রাজ্য প্রতিষ্ঠা	১৬৮
৩.৮৪ ফ্রাঙ্ক রাজ্য প্রতিষ্ঠা	১৬৮
৩.৮৫ সন্ন্যাসী সাধু বেনেডিক্ট	১৬৯
৩.৮৬ ইংল্যাণ্ডে খ্রিস্টধর্ম প্রচার	১৭০
৩.৮৭ জার্মানীতে প্রচার	১৭০
৩.৮৮ পবিত্র রোম সাম্রাজ্য	১৭১
৩.৮৯ বুলগেরিয়ায় খ্রিস্টবাণী	১৭২
৩.৯০ পোল্যাণ্ডে খ্রিস্টমণ্ডলী	১৭৩
৩.৯১ হাঙ্গেরী	১৭৩
৩.৯২ স্থাপত্যের উন্নয়ন	১৭৫
৩.৯৩ লিয়ং ধর্মসভা	১৭৬
৩.৯৪ ভৌগোলিক আবিষ্কার	১৭৮
৩.৯৫ কল্যাণকর্মসাধন	১৭৯
৩.৯৬ আমেরিকায় প্রেমধর্মের বীজবপন	১৮২
৩.৯৭ দক্ষিণ আমেরিকায় প্রচারকদের আগমন	১৮২
৩.৯৮ উত্তর আমেরিকায় খ্রিস্টবাণী প্রচার	১৮৩
৩.৯৯ আফ্রিকায় ধর্মসম্প্রসারণ	১৮৩
৩.১০০ চীনদেশে সু-সমাচার প্রচার	১৮৪

৩.১০১ জাপানে সু-সমাচার প্রচার ১৮৪

৩.১০২ ফিলিপাইনে খ্রিস্টবাণী প্রচার ১৮৪

৩.১০৩ উপসংহার ১৯০

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতবর্ষে খ্রিস্টমণ্ডলী প্রতিষ্ঠায় কাথলিক মিশনারীদের অবদান ১৯৭-২৪৮

৪.১ ভূমিকা ১৯৭

৪.২ ভারতে প্রথম খ্রিস্টবাণী প্রচার ১৯৭

৪.৩ সাধু বার্থালোমেয়ো ১৯৯

৪.৪ পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও খ্রিস্টীয় সম্প্রদায় গঠন ১৯৯

৪.৫ প্রাচ্যদেশীয় রীতিতে খ্রিস্টীয় উপাসনা ২০০

৪.৬ ভারতে পর্তুগীজদের আগমন ২০৪

৪.৭ সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার ২০৮

৪.৮ সম্রাট আকবরের ফরমান ২০৯

৪.৯ মিশনারীদের আগমন ২০৯

৪.১০ যেজুইটদের আগমন ২১০

৪.১১ সম্রাট আকবরের রাজসভায় যেজুইট যাজকগণ ২১১

৪.১২ সম্রাট আকবরের দরবারে প্রেমবাণী প্রচার ২১১

৪.১৩ আগস্টিনিয়ান ধর্মসংঘের যাজকদের আগমন ২১৪

৪.১৪ পূর্ববঙ্গে গমন ২১৫

৪.১৫ যেজুইটদের পুনরাগমন ২১৫

৪.১৬ পূর্ববঙ্গে যশোহর রাজ্য ২১৬

৪.১৭ বাকলা (বরিশাল/বাখরগঞ্জ) ২১৬

৪.১৮ শ্রীপুর ২১৭

৪.১৯ চট্টগ্রাম ও দিয়াঙ্গা ২১৭

৪.২০ ডমিনিকান সংঘের যাজকগণ ২১৮

৪.২১ ঢাকা জেলায় খ্রিস্টবাণী প্রচার ২২১

৪.২২ কাথলিক মণ্ডলীর পুরোহিতগণ ২২২

৪.২৩ বঙ্গদেশে ভিকারিয়েট বিভক্ত ২২৬

৪.২৪ বঙ্গদেশে ভিকারিয়েট উপ-অঞ্চলে বিভক্ত ২২৬

৪.২৫ পালকীয় সফর (বিশপ অলিফ) ২২৮

৪.২৬ পশ্চিম বঙ্গ ধর্মাঞ্চল ২২৮

৪.২৭ পশ্চিম বঙ্গ সফর (বিশপ অলিফ) ও মধ্যবঙ্গ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ২৩১

৪.২৮ মধ্যবঙ্গ মিশনকর্মী গঠন ২৩১

৪.২৯ মিলান ফাদারদের আগমন ২৩২

৪.৩০ নদীয়ায় গ্রামাঞ্চলে মিশন প্রতিষ্ঠা ২৩৩

৪.৩১ পশ্চিমবঙ্গে যেজুইটগণ ২৩৫

৪.৩২ উত্তরবঙ্গ ২৩৬

৪.৩৩ আসানসোল অঞ্চল ২৩৭

৪.৩৪ দার্জিলিংএর পার্বত্য অঞ্চল ২৩৮

৪.৩৫ ডন বস্কোর সালেসীয়দের আগমন ২৩৮

৪.৩৬ ভারতের স্বাধীনতা লাভ ও বঙ্গভঙ্গ ২৩৯

৪.৩৭ রাঘবপুর প্যারিশ ২৪১

৪.৩৮ বহরমপুর প্যারিশ ২৪১

৪.৩৯ উপসংহার ২৪২

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতবর্ষের বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে কাথলিক মিশনারীদের ভূমিকা ২৫০-২৬৭

৫.১ ভূমিকা ২৫০

৫.২ নতুন খ্রিস্টীয় সমাজ ভারতের সমাজব্যবস্থার অঙ্গীভূত ২৫০

৫.৩ আর্চবিশপ কেরু (১৮৪০-১৮৫৫ খ্রিঃ) ২৫২

৫.৪ পশ্চিমবঙ্গ ভিকারিয়েটে যেজুইটগণ ২৫৬

৫.৫ সিস্টার্‌স অব চ্যারিটির শিমুলিয়ায় আগমন ২৫৭

৫.৬ কৃষ্ণনগরে দ্বিতীয় বিশপ শান্তিনো তাভেজ্জা (পিমে) ১৯০৬-১৯২৮ ২৫৭

৫.৭ আসানসোল অঞ্চল ২৫৯

৫.৮ মিশনারীজ অফ চ্যারিটির প্রতিষ্ঠা ২৫৯

৫.৯ শহরে পানীয় জল সরবরাহ ২৬২

৫.১০ এক্সরে মেশিন ও থিয়েটার হল ২৬২

৫.১১ পুস্তক প্রকাশনা ২৬৩

৫.১২ জনকল্যাণমূলক কাজ ২৬৩

৫.১৩ উপসংহার ২৬৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগ গ্রহণ ২৬৮-২৯৪

৬.১ ভূমিকা ২৬৮

৬.২ আগস্টিনিয়ান ধর্মসংঘের যাজকদের আগমন ২৬৯

৬.৩ বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে অবদান ২৭০

৬.৪ শিক্ষায় সাফল্য ২৭২

৬.৫ আর্চবিশপ কেরু (১৮৪০-১৮৫৫ খ্রিঃ) ২৭৬

৬.৬ পূর্ববঙ্গ ধর্মাঞ্চল (১৯৪৫ খ্রিঃ) ২৭৭

৬.৭ বিশপ টমাস অলিফ (১৮৫৫-১৮৫৯ খ্রিঃ) ২৭৮

৬.৮ মধ্যবঙ্গ মিশনের অগ্রগতি ২৭৮

৬.৯ পশ্চিমবঙ্গ ভিকারিয়েটে যেজুইটগণ ২৮০

৬.১০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২৮২

৬.১১ কৃষ্ণনগরের ২য় বিশপ শান্তিনো তাভেজ্জা ২৮৩

৬.১২ দার্জিলিংএর পার্বত্য অঞ্চল ২৮৬

৬.১৩ ডন বস্কোর সালেসীয়দের আগমন ২৮৭

৬.১৪ লুইস এল.আর. মরো, এসডি.বি (১৯৩৬-৬৯) ২৮৮

৬.১৫ শিক্ষা ২৮৯

৬.১৬ সিস্টারস অফ মেরী ইম্মাকুলেট ২৯০

৬.১৭ খুলনা প্যারিশ ২৯০

৬.১৮উপসংহার ২৯১

সপ্তম অধ্যায়

বর্তমান বাংলাদেশে শিক্ষাবিস্তারে কাথলিক মিশনারী ২৯৫-৩৪৪

৭.১ ভূমিকা ২৯৫

৭.২ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পর্তুগীজদের অনুপ্রবেশ ২৯৬

৭.৩ মোগল যুগে খ্রিস্টধর্ম (১৫৭৬-১৭৬৫) ২৯৭

৭.৪ খ্রিস্টীয় সাহিত্যের সূচনা ২৯৮

৭.৫ ঢাকা শহরে মিশনারী কাজের সূত্রপাত ২৯৯

৭.৬ ঐতিহাসিক তেজগাঁও উপাসনাগৃহ ৩০১

৭.৭ হলিক্রস ফাদার ও সিস্টারদের আগমন ৩০২

৭.৮ ভিকারিয়েট (ধর্মাঞ্চল) শিক্ষাব্যবস্থা ৩০৩

৭.৯ বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী ৩০৪

৭.১০ বিশপীয় অঙ্গসমূহ/সংগঠনসমূহ ৩০৪

৭.১১ উৎসর্গীকৃত জীবন ৩০৯

৭.১২ নিবেদিত প্রাণ	৩১০
৭.১৩ ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের সেবাকাজ	৩১১
৭.১৪ বর্তমানে দেশ ও জাতির সেবায় বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলী	৩১২
৭.১৫ বাংলাদশে হলিক্রস অতীত ও বর্তমান	৩১৭
৭.১৬ ধর্মপ্রদেশসমূহ	৩২৮
৭.১৭ শিক্ষা সেবায় ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ	৩৩৭
৭.১৮ বৈশিষ্ট্যসমূহ/গুণাবলী	৩৩৮
৭.১৯ উপসংহার	৩৩৯

অষ্টম অধ্যায়

উপাত্ত বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন	**৩৪৫-৩৫১**
৮.১ ভূমিকা	৩৪৫
৮.২ শিক্ষা বিস্তারে মিশনারীদের অবদান সংক্রান্তের বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন	৩৪৫
৮.৩ পরামর্শদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	৩৫১

নবম অধ্যায়

গবেষণার ফলাফল ও উপসংহার	**৩৫২-৩৬২**
৯.১ ভূমিকা	৩৫২
৯.২ গবেষণালব্ধ ফলাফল	৩৫২
৯.৩ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাঠামোগত অবস্থা	৩৫৩
৯.৪ বর্তমান পদক্ষেপসমূহ	৩৫৪

৯.৫ সুপারিশসমূহ বা মতামত ৩৫৯

৯.৬ পরবর্তী গবেষণার জন্য সুপারিশ ৩৬১

৯.৭ উপসংহার ৩৬১

পরিশিষ্ট সূচি

বিষয় বস্তু	পৃষ্ঠা নং
পরিশিষ্ট - ক। গবেষণা তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচিত স্থানসমূহ	৩৬৩
পরিশিষ্ট - খ। মানচিত্রসমূহ	৩৬৪-৩৬৮
পরিশিষ্ট - গ। স্থিরচিত্রসমূহ	৩৬৯-৩৭৩

সহায়ক তথ্যপঞ্জি/গ্রন্থপঞ্জি

সহায়ক তথ্যপঞ্জি/গ্রন্থপঞ্জি ৩৭৪-৩৭৮

প্রথম অধ্যায়

গবেষণার বিবরণ

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.১ ভূমিকা		১
১.২ ব্যবহারিক প্রত্যয়সমূহ		২
১.৩ গুরুত্ব		৩
১.৪ উদ্দেশ্য		৪
১.৫ পদ্ধতি		৫
১.৬ পরিধি		৫

গবেষণার বিবরণ

১.১ ভূমিকা

শিক্ষা একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের চাবিকাঠি হলো শিক্ষা। ইহা ব্যক্তি জীবনের সকল অন্ধকারকে পেছনে ফেলে পশুত্বকে অবদমিত ক'রে মানবীয় সকল গুণাবলীর উন্মেষ ঘটায়। তাছাড়া, দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হ'লে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মন, মনন, মানসিকতা, মূল্যবোধ, ব্যক্তিত্ব, জীবনবোধ, দেশাত্মবোধকে গভীর, পরিপক্ব, বিকশিত ও শাণিত করা। প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে হৃদয়বান, উদারমনা ও সামষ্টিক কল্যাণকামী করে তোলে।

বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্মের ইতিহাস বহু পুরনো। কেউ কেউ মনে করেন ভারতীয় উপমহাদেশে খ্রিস্ট ধর্মের ইতিহাস দুই হাজার বছরেরও বেশি। অর্থাৎ পৃথিবীতে খ্রিস্টধর্মের গোড়া পত্তনের সময় থেকেই। ভারতীয় জনগণের বহু পুরনো ও দৃঢ়বিশ্বাসপূর্ণ ঐতিহ্য অনুসারে প্রভু যীশু খ্রিস্টের ১২ জন প্রেরিতশিষ্যের একজন সাধু থোমাস বা টমাস যীশুর মৃত্যুর কয়েক বৎসর পর ৫২ খ্রিস্টাব্দে ভারতে এসেছিলেন খ্রিস্টের বাণী প্রচার করতে। ভারতে প্রধানত চেন্নাই এর মাইলাপুর অঞ্চলের খ্রিস্টভক্তরা টমাসীয় খ্রিস্টান নামে পরিচিত ছিলেন। টমাসীয় খ্রিস্টানদের উপস্থিতি ভারতে থাকলেও তাঁরা অন্যদের কাছে যীশুর বাণী প্রচারের বিষয়ে গুরুত্ব দেননি। এ জন্য ভারতবর্ষে খ্রিস্টধর্মের প্রসার দীর্ঘ দিন সীমিত ছিল।

১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে ভাস্কো-দা-গামার ভারত আবিষ্কারের পর থেকে যীশুর বাণী প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। তাঁরা প্রকৃত পক্ষে মানুষের সেবা করার উপরেই বেশি জোর দিয়েছেন। কারণ তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে ক্ষুধার্তকে আহার, তৃষ্ণার্তকে পানীয়, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র, বন্দী মানুষকে মুক্তি, অসুস্থদের সেবা ইত্যাদির মাধ্যমে খ্রিস্টকেই সেবা করা হয়।

ভাস্কো-দা-গামার ভারত আবিষ্কারের পর থেকেই শুরু হয় তৎকালীন ‘বাংলায়’ ফরাসি, ওলন্দাজ, ইংরেজ প্রভৃতি বণিকদের আগমন। তাঁরা প্রধানত ব্যবসার জন্য এদেশে আসতেন। তবে বিশেষভাবে পর্তুগিজ বণিকেরা তাঁদের নিজেদের আধ্যাত্মিক যত্ন নেওয়ার জন্যই চ্যাপলেইন হিসাবে সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন যাজকদের। এভাবে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু ক’রে তাঁদের সাথে যেসব মিশনারী যাজক এদেশে এসেছিলেন তাঁরা হলেন ফ্রান্সিসকান, ডমিনিকান, আগস্টিনিয়ান, যেজুইট প্রকৃতি সন্ন্যাস-সংঘভুক্ত মিশনারীগণ।

পর্তুগিজরা সম্রাট আকবরের কাছ থেকে হুগলিতে বসতি স্থাপনের অনুমতি পাওয়ার পর ১৫৯৮-৯৯ খ্রিঃ একটি স্কুল ও হাসপাতাল স্থাপন করেন। এসময়ে কয়েকজন ফাদার কর্মরত ছিলেন।

১৫৯৯ খ্রিঃ আগস্টিনিয়ান মিশনারীগণ হুগলিতে একটি গির্জা নির্মাণ করেন। এখান থেকেই পশ্চিমবঙ্গে ও পূর্ববঙ্গের ঢাকাসহ অন্যান্য অঞ্চলে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের কাজ পরিচালনা করা হয়। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের শুরুতেই পর্তুগিজরা চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করেন। এরপর তাঁরা ঈশ্বরীপুরে, সাতক্ষীরায় বিভিন্ন গির্জা নির্মাণ করেন। ১৬০৮ খ্রিঃ বাংলার সুবেদার ইসলাম খান ঢাকাকে রাজধানীতে রূপান্তরিত করেন। এরপর পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসি ও ইংরেজ বণিকগণ এর প্রতি আকৃষ্ট হন। তখন থেকে ঢাকা অঞ্চলে খ্রিস্টধর্মের বিস্তার ঘটতে থাকে।

১৭১২ খ্রিঃ পূর্ববঙ্গে খ্রিস্টান তথা কাথলিক খ্রিস্টানদের জনসংখ্যা ছিল ১৪,১২০ জন। বাংলায় কাথলিক ধর্ম বিস্তারের ফলশ্রুতিতে কাথলিক মিশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মিশন ‘বাংলা’ ভূখন্ডে ধর্ম প্রচারের সাথে সাথে শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ১৯৭১ সালে ‘বাংলাদেশ’ প্রতিষ্ঠার পরে এসব মিশনের শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। কাথলিক মিশন বাংলাদেশ প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। এ মিশনের শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম অনুসন্ধান করা এবং মূল্যায়ন করা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

১.২ ব্যবহারিক প্রত্যয়সমূহ

যে বিশ্বাসীরা ধর্মগুরুদের ও বিশেষরূপে পোপের অধীনে থেকে যীশু খ্রিস্টের ধর্ম ও আজ্ঞা স্বীকার করেন তাঁদেরকে কাথলিক মণ্ডলী বা খ্রিস্টমণ্ডলী বলে। “পোপ” মানে পিতা। তিনি সাধু পিতরের

উত্তরাধিকারী খ্রিস্টমণ্ডলীর দৃশ্য মস্তক। পোপ রোমের বিশপ, খ্রিস্টের প্রতিনিধি ও মণ্ডলীর দৃশ্য অধিপতি। কাথলিক শব্দের অর্থ 'সার্বজনীন'।

মিশন :'মিশন' হলো খ্রিস্টভক্তদের মিলন স্থান। এখানে সবাই সমবেত হয়। এখানে গির্জাঘর থাকে। ধর্ম ও সামাজিক রেজিস্ট্রেশনের জন্য যা যা দরকার, সব এখানে থাকে। এদের তত্ত্বাবধানের জন্য ফাদারগণ থাকেন। মিশন শব্দের অর্থ প্রেরিত। মানুষের মধ্যে কিভাবে ঐশ্যরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, শৃঙ্খলা আনা ও রক্ষা করা যায় এই উদ্দেশ্যে প্রভুর বাণী প্রচার করার জন্যই মিশন গড়ে উঠে।

মিশনারী: 'মিশনারী' বাংলা প্রতিশব্দ প্রেরণকর্মী। এঁরা প্রভুর কাছ থেকে আহবান পেয়ে থাকেন। এঁদের মূল লক্ষ্য প্রভুর বাণী প্রচার করা। এঁরা পরোক্ষভাবে এবং প্রত্যক্ষভাবে মানুষের মধ্যে প্রভুর বাণী প্রচার করেন।

শিক্ষা বিস্তার: 'শিক্ষা বিস্তার' বলতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার বুঝানো হয়েছে।

১.৩ গুরুত্ব

শিক্ষা একটি দেশের দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির জন্য গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। শিক্ষাই দেশ ও জাতির অগ্রগতির পথকে সুগম করে জাতীয় আশা, আকাঙ্ক্ষা ও ভবিষ্যৎ সমাজ জীবনকে সার্থকভাবে প্রতিফলিত ও বিকশিত করে তোলে। তাই জ্ঞানের প্রসার সাধন, মানুষের সার্বিক উন্নয়ন ও পরিবেশের সাথে শিক্ষার্থীদের অধিকতর ফলপ্রসূভাবে খাপ খাওয়ানোর ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা সম্পর্কে গবেষণার প্রয়োজন। উন্নত গবেষণা পদ্ধতিকে শিক্ষা ও শিক্ষা প্রক্রিয়ায় প্রয়োগ করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমস্যা উদ্ঘাটন করার ও সুষ্ঠুভাবে সমাধানের চেষ্টা করা হয়ে থাকে।

সাধারণ অর্থে শিক্ষা বলতে বোঝায় ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ সাধন। কাথলিক মিশনারীরা শুরু থেকেই শিক্ষার এ লক্ষ্য সাধনে বিশেষ অবদান রেখে চলেছেন। একই ভাবে তাঁরা শিক্ষার মাধ্যমে বাংলাদেশে সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছেন। তাঁরা মনে করেন, শিক্ষার দ্বারা একটি জাতিকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে ও সত্যিকারের আলোর পথে চলতে সহায়তা করা যেতে পারে। তাই তাঁরা সারা দেশে তৈরি করেন অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যাতে সবাই শিক্ষা লাভের সুযোগ

পায়। বর্তমানে বাংলাদেশে কাথলিক মিশনারীদের পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে - ৫টি কলেজ, ৪৮টি হাইস্কুল, ১৪টি জুনিয়র হাইস্কুল, ৫১৩টি প্রাইমারী স্কুল এবং ১৩টি ভোকেশনাল স্কুল, ১২৫টি হোস্টেল এবং ১টি বিশ্ববিদ্যালয়। উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছেঃ নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ, নটর ডেম কলেজ (ঢাকা), হলিক্রস কলেজ (ঢাকা), সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুল এণ্ড কলেজ (ঢাকা), সেন্ট গ্রেগরী হাইস্কুল এণ্ড কলেজ (ঢাকা), সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার হাইস্কুল (লক্ষীবাজার, ঢাকা), সেন্ট নিকোলাস হাইস্কুল (নাগরী, গাজীপুর), সেন্ট প্লাসিড হাইস্কুল এণ্ড কলেজ (চট্টগ্রাম), বান্দুরা হলিক্রস হাইস্কুল এণ্ড কলেজ (নবাবগঞ্জ, ঢাকা), হলিক্রস হাই স্কুল এণ্ড কলেজ (বান্দুরা, ঢাকা) এবং সেন্ট আলফ্রেড হাইস্কুল (পাদ্রিশিবপুর, বরিশাল)।

এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মিশনারী সিস্টার, ব্রাদার ও ফাদারদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। তাঁদের শিক্ষা নিষ্ঠা, দক্ষতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে এসব প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করছে। তাঁদের অবদানে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার মানসম্মতকরণ এগিয়ে যাচ্ছে। এর দ্বারা বাংলাদেশে নানাবিধ সামাজিক সুফল সৃষ্টি হচ্ছে।

বলা চলে, শিক্ষা সমাজের অগ্রগতির অন্যতম প্রধান উপায়। তবে গতানুগতিক শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের অগ্রগতি সাধন সম্ভব নয়। কেবল আধুনিক চিন্তা ও বিজ্ঞান প্রযুক্তি সমন্বিত শিক্ষাই সামাজিক উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করতে পারে। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও সমাজ অগ্রগতিতে দীর্ঘদিন ধরে মিশনারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। বাংলাদেশের শিক্ষা ও নানা সামাজিক ক্ষেত্রে মিশনারীদের অবদান মূল্যায়নের দাবী রাখে। এ পরিপ্রেক্ষিতে এই গবেষণাকর্মটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

১.৪ উদ্দেশ্য

এ গবেষণাকর্মের প্রধান উদ্দেশ্যাবলি নিম্নরূপ

ক. বাংলা ভূখণ্ডে কাথলিক মিশনারীদের শিক্ষা বিস্তারের প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান করা;

খ. বাংলায় কাথলিক মিশনারীদের শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণ করা;

গ. বাংলায় কাথলিক মিশনারীদের শিক্ষা বিস্তারের পরিসর অনুসন্ধান করা;

ঘ. বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় কাথলিক মিশনারীদের অবদান পর্যালোচনা করা; এবং

ঙ. বাংলাদেশে কাথলিক মিশনারীদের শিক্ষা বিস্তারের সামাজিক ফলাফল মূল্যায়ন করা।

১.৫ পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণার তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বিজ্ঞানসম্মত ও বহুল প্রচলিত ঐতিহাসিক বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

- ❖ বাংলাদেশের কাথলিক মিশনারীদের শিক্ষা বিস্তার সম্পর্কে বিভিন্ন নথিপত্র পর্যালোচনা করা।
- ❖ কাথলিক মিশনারীদের রচিত বইপুস্তক, প্রবন্ধ, প্রতিবেদন ইত্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা।
- ❖ নেতৃস্থানীয় মিশনারীদের সাথে যোগাযোগ করা।
- ❖ মিশনারীদের পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্যাদি পর্যালোচনা করা।
- ❖ শিক্ষা বিস্তারের সাথে যুক্ত কাথলিক মিশনারীদের কর্ম ও জীবন সম্পর্কে রচিত বিভিন্ন বই, প্রবন্ধ ও অন্যান্য দলিল পর্যালোচনা করা।
- ❖ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক ম্যাগাজিন, বই ও অন্যান্য বিষয় পর্যালোচনা করা।

গবেষক নিজে বিভিন্ন মিশনরীদের কাছে গিয়ে, মিশনারীদের কাছ থেকে শিক্ষা বিস্তারে জড়িত এমন ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে, মিশনারীদের পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের কাছ থেকে বইপুস্তক, প্রবন্ধ, প্রতিবেদন, ম্যাগাজিন, পত্রিকা, নথিপত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করেছেন।

১.৬ পরিধি

এ গবেষণাকর্মের পরিধি বেশ ব্যাপক। কারণ একটা বৃহত্তর পরিসরে বাংলায় বা বঙ্গদেশে খ্রিস্টধর্ম ও মিশনারীদের আগমন ঘটে। অনেকেই এর সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকলেও তাঁদের সকলকে একটি মাত্র গবেষণাকর্মের আওতায় আনা সম্ভব নয়। যাদের অবদান তাৎপর্যপূর্ণ তাঁদেরকে বর্তমান গবেষণাকর্মের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

- সরকার, লুইস প্রভাত, “বঙ্গ দেশে খ্রীষ্টধর্ম ও খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়”, জয় গুরু ইম্প্রেশন, কলকাতা-৭০০০০৬, প্রথম সংস্করণ, ২০০২।
- কস্তা, ফাদার বেঞ্জামিন, সিএসি এবং কুইয়া, সিস্টার ফিলোমিনা সিএসসি, “খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা” ৯ম-১০ম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড, ঢাকা।
- গমেজ, ফাদার জয়ন্ত এস (সম্পাদক) “সাপ্তাহিক প্রতিবেশী”- ২০১১ খ্রীঃ
- D' Costa Jerome, "Christianity in Bangladesh."
- Fr. Armanasco, "Kripasastra" the Foreign Missions of Milan.
- April 15, 1953
- http://www.cbcbsee.org/CBCB
- http://en.wikipedia.org/wiki/christianity-in-Bangladesh
- http://sites.google.com/sitr/bdguiber/home/6-english/mission/the history-of- christian -contributions-in-Bengal.
- পেরেরা, ফাঃ আদম এস, সিএসসি; দীপ্তি, সিঃ মেরী, এসএমআরএ; এল. গমেজ, সিঃ শিখা, সিএসসি, ‘খ্রিস্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা’, ৫ম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা। পৃঃ ৮৯-৯২।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সংশ্লিষ্ট সাহিত্য ও গবেষণা পর্যালোচনা

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
২.১	ভূমিকা	৭
২.২	শিক্ষা সহায়ক আন্তর্জাতিক ও জাতীয় দলিল ও কমিশনসমূহের পর্যালোচনা	৮
২.৩	জাতীয় শিক্ষা নীতি চূড়ান্ত খসড়া-২০১০	১৪
২.৪	সংশ্লিষ্ট পুস্তকাদি ও নিবন্ধ পর্যালোচনা উপস্থাপন	২০

সংশ্লিষ্ট সাহিত্য ও গবেষণা পর্যালোচনা

২.১ ভূমিকা

সংশ্লিষ্ট সাহিত্য ও গবেষণা পর্যালোচনা গবেষণা পরিচালনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গবেষণা হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে নতুন তথ্য ও সূত্রের আবিষ্কার। সংশ্লিষ্ট তথ্য, সূত্র, গবেষণা পর্যালোচনা এক্ষেত্রে পথনির্দেশকের কাজ করে। এর মাধ্যমে গবেষক অজানা বিষয়ের স্থান, কাল, পাত্র খুঁজে বের করে সংশ্লিষ্ট নতুন সত্যে উপনীত হতে পারেন। এ বিষয়ে হালিম,(২০০৪) বলেছেন,"Review of related literature is very important part of a research work because research is a systematic way of investigation and related literature is a guideline to this way. Related literature enables the researcher to know the amount of work done in the concerned area as well as investigate unknown and unexplored issues. It is necessary that the researchers should be aware of the knowledge generated and the ongoing process of knowledge generation for a better clarity of the problem and an insight into its methodological issues. For any researcher, review forms the basis for the problem under investigation and helps him/her to arrive at the proper perspective of the study".

একজন গবেষক তার গবেষণাকর্মকে সমৃদ্ধ করার জন্য গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বই, সাময়িকী, স্মরণিকা, ম্যাগাজিন, গবেষণাকর্ম এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে সহায়তা গ্রহণ করেন। প্রয়োজনে গবেষক ইন্টারনেটের মাধ্যমে ওয়েবসাইড থেকেও তথ্য সংগ্রহ করেন। সুন্দরভাবে আলোচনা, পর্যালোচনা ও বুঝার জন্য "বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তারে কাথলিক মিশনারীদের অবদান মূল্যায়ন" শীর্ষক গবেষণাটির জন্য প্রধান কিছু বিষয়ের পর্যালোচনা উল্লেখ করা হলো।

২.২ শিক্ষা সহায়ক আন্তর্জাতিক ও জাতীয় দলিল ও কমিশনসমূহের পর্যালোচনা

আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া (Globalization Process) গতিময় হওয়ার ক্রমধারায় শিক্ষারও বিশ্বপরিপ্রেক্ষিত রূপ সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও ধারার সাথে সংগতি রেখে পুনর্গঠিত হচ্ছে। দেশে দেশে শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উপাদান সংযুক্ত হচ্ছে। জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার ভূমিকা জোরদারের উপর গুরুত্ব আরোপ করে চলছে। সাথে সাথে নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। এসব সংস্থার দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে শিক্ষার বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতের প্রধান প্রধান দিক বর্ণনা করা হলো।

 # জাতিসংঘ/আন্তর্জাতিক সনদ ও কমিশনের শিক্ষা মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা (Declaration of Human Rights)- ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের ২১৭ ক(১১১) বিধিতে বিশ্বের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষায় এক সার্বজনীন ঘোষণা প্রদান করা হয়। এ ঘোষণায় মানব জীবনের বিভিন্ন দিক অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শিক্ষাও এর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ ঘোষণাপত্রে ২৬ নং অনুচ্ছেদে মানুষের শিক্ষার অধিকার বর্ণনা করা হয়েছে। এ অনুচ্ছেদের এক উপ-অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "প্রত্যেকেরই শিক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে। প্রাথমিক/প্রারম্ভিক ও মৌলিক স্তরসমূহে শিক্ষা অবৈতনিক হতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে। কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষা লাভের সুযোগ সাধারণভাবে সহজলভ্য হবে এবং মেধা অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষায় অংশ গ্রহণে সকলের সমান সুযোগ থাকবে"।

(Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and Professional education shall be made generally available and high line eduation shall be equally accessible to all on the basis of merit.)

 # সবার জন্য শিক্ষার বিশ্বঘোষণা ১৯৯০ (World Declaration on Education for All-1990) ১৯৯০ সালের ৫ থেকে ৯ মার্চ থাইল্যাণ্ডের জমতিয়েন (Jomtein)-এ 'সবার জন্য শিক্ষা' বিষয়ক বিশ্ব ঘোষণা প্রদান করা হয়। এটি জমতিয়েন ঘোষণা নামেও পরিচিত। এ ঘোষণার সারমর্মের কিছু অংশ নিচে তুলে ধরা হলো:

১) মৌলিক শিক্ষার চাহিদা পূরণ (Meeting Basic Learning Needs) মৌলিক শিক্ষার চাহিদা পূরণের জন্য পরিকল্পিত সুযোগ থেকে প্রত্যেক শিশু, যুবক, বয়স্ক ব্যক্তি উপকৃত হতে হবে। (Every person - Child, youth and adult shall be able to benefit from education opportunities designed to meet their basic learning needs.)

২) সার্বজনীন সুযোগ সৃষ্টি ও সমতা বিস্তৃতি (Universalizing Access and Promoting Equity) : সকল শিশু, যুবক ও বয়স্ক ব্যক্তিকে মৌলিক শিক্ষা দিতে হবে। (Basic education should be provided to all children, youth and adults.)

৩) শিক্ষা অর্জনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান (Focusing on Learning Acquisition): শিক্ষার সম্প্রসারিত সুযোগ কোন ব্যক্তি বা সমাজের অর্থবহ উন্নয়নের কাজে লাগে কি'না তা চূড়ান্তভাবে নির্ভর করে প্রাপ্ত সুযোগ থেকে ঐ ব্যক্তি বা সমাজ প্রকৃত পক্ষে কোনো শিক্ষা অর্জন করে কি'না তার উপর, অর্থাৎ শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা এবং মূল্যবোধ যদি আত্মস্থ ও আত্মীকরণ করা যায়, তবেই তা উন্নয়নের কাজে লাগে। (Whether or not expanded educational opportunities will translate into meaningful development for an individual or for society depends ultimately on whether people actually learn as a result of those opportunities, i.e., whether they incorporate useful knowledge, reasoning ability, skills and values.)

৪) মৌলিক শিক্ষার পদ্ধতি ও পরিধি বিস্তৃতকরণ (Broadening the means and scope of Basic Education)

৫) শিশু, যুবক, বয়স্ক ব্যক্তি সকলের মৌলিক শিক্ষা চাহিদার বৈচিত্র্য, জটিলতা এবং পরিবর্তনশীলতার কারণে মৌলিক শিক্ষার সংজ্ঞায় প্রতিনিয়ত নতুন নতুন মাত্রা যুক্ত হয়ে তার পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে। (The diversity, complexity and changing nature of basic learning needs of children, youth and adults necessitates broadening and constantly redefining the scope of basic education.)

 # দিল্লি ঘোষণা ১৯৯৩ (The Delhi Declaration 1993)১৯৯৩ সালে দিল্লিতে উচ্চ জনসংখ্যার নয়টি উন্নয়নশীল দেশের (বাংলাদেশ, ব্রাজিল, চীন, মিশর, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো, নাইজেরিয়া ও পাকিস্তান) প্রতিনিধিরা একটি সম্মেলনে মিলিত হয়ে প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন ও সকল নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূরণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে দিল্লি ঘোষণা (১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৩) প্রদান করে। এ ঘোষণার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ তুলে ধরা হলোঃ

১। আমরা বিশ্বের ৯টি উচ্চ জনসংখ্যার উন্নয়নশীল দেশের নেতৃবৃন্দ, এতদ্বারা আমাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছি যে, আমরা প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করে এবং শিশু, যুব ও প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যে শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করে আমাদের সকল নাগরিকের মৌলিক শিক্ষা চাহিদা মেটানোর জন্য ১৯৯০ সালে "সবার জন্যে শিক্ষা' বিষয়ক বিশ্বসম্মেলন এবং বিশ্ব শিশু সম্মেলনে নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ যথাসাধ্য উৎসাহ-উদ্দীপনা ও সংকল্প নিয়ে অনুসরণ করব। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি মানুষ আমাদের এই দেশসমূহে বাস করছে এবং বিশ্বব্যাপী সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে আমাদের প্রচেষ্টার সাফল্য যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়ে পূর্ণ সচেতনতার সাথে আমরা এই অঙ্গীকার করছি। (We, the leaders of nine high population developing nations of the world, hereby

reaffirm our commitment to pursue with utmost zeal and determination the goals set in 1990 by the world conference on education for all and the world summit on children to meet the basic learning needs of all our people by making primary education universal and expanding learning opportunities for children, youth and adults. We do so in full awareness that our countries contain more than half of the world's population and that the success of our efforts is crucial to the achievement of the global goal of education for all.)

একুশ শতকের শিক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক কমিশন (১৯৯৩ -১৯৯৬) পরিচালন নীতিমালা (Guiding Principles) কমিশন একুশ শতকের শিক্ষার জন্য ছয়টি পরিচালন নীতি নির্ধারণ করে। এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য হলো :

১। শিক্ষা একটি মৌলিক মানবাধিকার এবং সর্বজনীন মানবিক মূল্যবোধ। এজন্য ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের লক্ষ্যে শিক্ষানীতি গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

২। শিক্ষার প্রসার সাধন গোটা সমাজের দায়দায়িত্ব। সমাজের সকল ব্যক্তি ও সকল অংশীদার প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষার প্রসার সাধনে নিয়োজিত হতে হবে।

বিশ্ব শিক্ষা ফোরাম - ২০০০ (World Education Forum - 2000)

সেনেগালের রাজধানী ডাকারে ২০০০ খ্রিঃ বিশ্ব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা 'সবার জন্য শিক্ষা' (Education for All) নীতি বাস্তবায়নে একটি ঘোষণাপত্র প্রণয়ন করেন। এটি The Dakar Framework for Action (DFA) ঘোষণা নামে পরিচিত। DFA ছয়টি লক্ষ্য (Goals) নির্ধারণ করে। এ লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য ১২টি কৌশল নির্ধারণ করে। এর মধ্যে ২ নং লক্ষ্যে বলা হয়েছে :

সকল শিশুকিশোর ও বয়স্কদের শিক্ষা চাহিদা নিশ্চিত করতে বুনিয়াদি, জীবনঘনিষ্ঠ ও সামাজিক শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচি এমনভাবে প্রণয়ন করা যেন সেখানে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়।

 # সহস্রাব্দ ঘোষণা ২০০০ (The Millennium Declaration -2000) : এখানে উন্নয়ন লক্ষ্য ৮টি। এসব লক্ষ্যের মধ্যে ২ ও ৩ নম্বর লক্ষ্য শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত।

ক) ২নং লক্ষ্যের লক্ষ্যমাত্রা (target) হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে, ২০১৫ খ্রিঃ মধ্যে বিশ্বের সর্বত্র বালক-বালিকা সকলের প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্ত করার নিশ্চয়তা বিধান। (Ensure that, by 2015 Children everywhere, boys and girls alike, will be able to complete a full course of Primary Schooling);

খ) ৩নং লক্ষ্যের লক্ষ্যমাত্রা (target) হিসাবে ধরা হয়েছে, ২০০৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এবং ২০১৫ খ্রিঃ মধ্যে শিক্ষার সকল স্তরে লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণ। (Eliminate gender disparity in primary and secondary education preferably by 2005 and in all levels of education no later than 2015.)

 # উডের শিক্ষা দলিল (১৮৫৪ খ্রিঃ): উচ্চতর শিক্ষা দলিল সরকারীভাবে মিশনারী ও শিক্ষিত ভারতীয়দের শিক্ষামূলক কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। এই ঐতিহাসিক দলিল স্যার চার্লস উডের নামানুসারে উড এডুকেশন ডেসপ্যাচ নামে পরিচিত। এই দলিলটি শতাব্দী পূর্বে রচিত হলেও তা আজও আধুনিকতার অভিব্যক্তি হিসাবে অভিনবত্ব দাবী করতে পারে।

সুপারিশসমূহ: ডেসপ্যাসের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে শিক্ষাসংক্রান্ত নতুন পরিকল্পনাটি (New Scheme) প্রথমেই উল্লেখযোগ্য।

১) শিক্ষা বিভাগ ও জনশিক্ষা অধিকর্তা : এর অধীনে যথেষ্ট সংখ্যক দক্ষ স্কুল ও কলেজ পরিদর্শকগণ, প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাদান সম্পর্কে যথাযথ পরামর্শ দান করবেন এবং শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়ন সম্পর্কে সরকারের কাছে সঠিক প্রতিবেদন পেশ করবেন।

২) উল্লেখ করা হলো যে, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় অনুকরণে কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বেতে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন। এটি পরিচালিত হবে সিনেট কর্তৃক/চ্যান্সেলর এবং সরকার মনোনীত ফেলোদের নিয়ে এ সিনেট গঠিত হবে।

৩) শিক্ষার স্তর : শিক্ষাস্তরের সর্বোচ্চ বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষা। এ শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত কলেজগুলোর মাধ্যমে প্রসারিত হবে। উচ্চ শিক্ষার স্তরের নিচের দিকে থাকবে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। এখানে ইংরেজি যা আধুনিক ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা : সর্বসাধারণের প্রয়োজনীয় শিক্ষার জন্য সরকারী অর্থ ও উদ্যম ব্যয় করা যুক্তিযুক্ত। তাই প্রথম প্রয়োজন মাধ্যমিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোর সংখ্যা বৃদ্ধি করা। এখানে ইংরেজি ও মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করলে জনসংখ্যা শিক্ষা বিস্তার সহজ হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা : প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাতৃভাষা জনশিক্ষাকে দ্রুতগতিতে বিস্তার করতে সমর্থ হবে।

ডেসপ্যাসের সুপারিশসমূহ : স্তর বিন্যাসে শিক্ষাব্যবস্থা শুধু সরকারের পক্ষে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তাই ডেসপ্যাস বেসরকারী প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করতে সরকারকে সুপারিশ করেন। সরকারী অনুদান প্রদানের দ্বারা উৎসাহ ত্বরান্বিত করা হবে। তাই শর্ত সাপেক্ষে অনুদান দেওয়ার সুপারিশ করা হলো। শর্তগুলো হলোঃ

১। বেসরকারি পরিচালনার দায়িত্ব

২। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাদান

৩। সরকারি পরিদর্শন ব্যবস্থা

৪। সরকারী অনুদান সম্পর্কিত যেকোন আইনে সম্মত হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন ও অনুদান দিয়ে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করা।

শিক্ষা কেন্দ্র থেকে সরকারী দায়িত্ব ক্রমান্বয়ে নামিয়ে আনার জন্য এরূপ সুপারিশ করা হলো। এ ছাড়াও আরো কয়েকটি সুপারিশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১। শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণএর কথা বলা হয়। চাকুরিরত শিক্ষকেরা তাদের প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে উপবৃত্তি নিয়ে যাতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা।

২। আইন, চিকিৎসা, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংএর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সুপারিশ করা হয়।

প্রভাব : ডেসপ্যাচ ভবিষ্যতের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রেখেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

১। ধর্মনিরপেক্ষ প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

২। পরীক্ষা ব্যবস্থার উপর যে গুরুত্ব দেয়া হয় তা আমরা আজও ভোগ করছি।

২.৩ জাতীয় শিক্ষা নীতি চূড়ান্ত খসড়া-২০১০ (National Education Policy-2010):

একটা উন্নত আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য এবং একটি সুস্থ পরিচ্ছন্ন মানবিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য বর্তমান শিক্ষা কাঠামো পরিবর্তন করা হচ্ছে। নতুন শিক্ষানীতিতে শিক্ষাস্তর, শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক শিক্ষণ পদ্ধতি, শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সংস্কার করা হয়েছে। স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ১৯৭৪ সালে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন, ১৯৮৮ সালে অধ্যাপক মফিজউদ্দিন আহমেদ শিক্ষা কমিশন, প্রফেসর মোঃ শামসুল হক এর নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ২০০০ এবং সর্বশেষ প্রফেসর মোঃ মনিরুজ্জামান শিক্ষা কমিশন ২০০৩ গঠন করা হয়। বর্তমান সরকার পূর্বের শিক্ষানীতি ২০০০ পর্যালোচনা করে বর্তমান শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেন। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে ৩টি স্তরে ভাগ করা হয়েছে।

শিক্ষার স্তরসমূহ

১। প্রাক্-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা

বর্তমানে ৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্য এক বছর মেয়াদী প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার কথা বলা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা ধরা হয়েছে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। জাতীয় জীবনে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অত্যধিক। দেশের সব মানুষের শিক্ষার প্রয়োজন এবং জনসংখ্যাকে দক্ষ করে তোলার বৃত্তিমূলক প্রাথমিক শিক্ষার এই স্তর পরবর্তী সকল স্তরের ভিত্তি সৃষ্টি করে ব'লে যথাযথ সম্পূর্ণ উপযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। প্রাথমিক শিক্ষা হবে সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক ও সকলের জন্য একই মানের।

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

❖ মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং দেশজ আবহ ও উপাদানভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করা। বিদ্যালয়ে আনন্দময় অনুকূল পরিবেশ তৈরি ক'রে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ব্যবস্থা করা।

❖ কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুসরণ ক'রে সব ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান বাধ্যতামূলক করা।

❖ শিশুর মনে ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলাবোধ, শিষ্টাচারবোধ, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবাধিকার, সহজীবনযাপনের মানসিকতা, কৌতূহল, প্রীতি, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি নৈতিক ও আত্মিক গুণাবলী অর্জনে সহায়তা করা এবং তাকে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিমনস্ক করে কুসংস্কারমুক্ত মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে উৎসাহিত করা।

❖ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপিত করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে দেশাত্মবোধের বিকাশ ও দেশগঠনমূলক কাজে তাকে উদ্বুদ্ধ করা।

❖ শিক্ষার্থীর নিজ স্তরে যথাযথ মানসম্পন্ন প্রান্তিক দক্ষতা নিশ্চিত ক'রে তাকে উচ্চতর ধাপের শিক্ষাগ্রহণে উৎসাহী এবং উপযোগী করে তোলা। এই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা। এছাড়া ভৌত অবকাঠামো, সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা, শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক আকর্ষণীয় ক'রে তোলা এবং মেয়েদের মর্যাদা সমুন্নত রাখা।

❖ শিক্ষার্থীকে জীবনযাপনের জন্য অবশ্যকীয় জ্ঞান, বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা, জীবনদক্ষতা, দৃষ্টি ভঙ্গি, মূল্যবোধ, সামাজিক সচেতনতা অর্জনের মাধ্যমে মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণে সমর্থ করা এবং পরবর্তী স্তরের শিক্ষালাভের উপযোগী করে গড়ে তোলার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

❖ শিক্ষার্থীদের মধ্যে কায়িক শ্রমের প্রতি আগ্রহ ও মর্যাদাবোধ এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণিতে প্রাক্‌বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

❖ প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য স্ব-স্ব মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

❖ শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ এলাকাসমূহে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ নজর দেওয়া।

❖ সবধরনের প্রতিবন্ধীসহ সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত ছেলেমেয়েদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ক'রে সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২। মাধ্যমিক শিক্ষা

মাধ্যমিক শিক্ষা ধরা হয়েছে নবম–দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত। এই স্তরের শিক্ষার্থীরা শিক্ষা শেষে সামর্থ্য অনুযায়ী উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ধারায় যাবে, নয়তো অর্জিত বৃত্তিমূলক শিক্ষার ভিত্তিতে বা আরো বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে জীবিকার্জনের পথে যাবে। মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

❖ শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা।

❖ কর্মজগতে অংশগ্রহণের জন্য, বিশেষ করে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, একটি পর্যায়ের প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে শিক্ষার্থীকে তৈরি করা।

❖ মানসম্পন্ন শিক্ষাদান ক'রে প্রাথমিক স্তরে প্রাপ্ত মৌলিক জ্ঞান সম্প্রসারিত ও সুসংহত করা। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষার ভিত শক্ত হবে।

- ❖ বিভিন্ন রকমের মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন আর্থসামাজিক, নৃ-তাত্ত্বিক ও অন্যান্য পিছিয়ে-পড়া গোষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানো। পিছিয়ে-পড়া অঞ্চল গুলোর জন্যও যতদিন প্রয়োজন বিশেষ পদক্ষেপের মাধ্যমে শিক্ষার অগ্রগতি সমর্থন করা।
- ❖ নির্ধারিত বিষয়ে সকল ধারায় অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

৩। উচ্চ শিক্ষা: সম্মান, স্নাতক, মাষ্টার্স, এমফিল বা পিএইচডি-কে উচ্চশিক্ষাস্তর ধরা হয়েছে। উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে জ্ঞান সঞ্চার ও নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবন এবং সেই সঙ্গে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা। বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রগুলোর জন্য স্ব-শাসন ব্যবস্থা অপরিহার্য। উচ্চ শিক্ষার সামগ্রিক ব্যবস্থায় পুনর্বিন্যাস আবশ্যক। মানসম্মত শিক্ষা এবং ক্ষেত্র বিশেষে (যথা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ব্যবসায়), বাস্তব প্রশিক্ষণ দিতে পারে সেই আলোকে বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথ নিয়মানুসারে চালিত হতে হবে। উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ:

- ❖ কার্যকরভাবে বিশ্বমানের শিক্ষাদান, শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা জাগানো এবং মানবিক গুণাবলী অর্জনে সহায়তা দান।
- ❖ অবাধ বুদ্ধিচর্চা, মননশীলতা ও চিন্তার স্বাধীনতা বিকাশে সহায়তা দান করা।
- ❖ পাঠদান পদ্ধতিতে সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে [দেশের বাস্তবায়নযোগ্য উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা] রাষ্ট্রীয় সমস্যা সনাক্ত করা ও সমাধান বের করা।
- ❖ নিরলস জ্ঞানচর্চা ও নিত্যনতুন বহুমুখী মৌলিক ও প্রয়োগিক গবেষণার ভেতর দিয়ে জ্ঞানের দিগন্তের ক্রমসম্প্রসারণ।
- ❖ আধুনিক ও দ্রুত অগ্রসরমান বিশ্বের সঙ্গে কার্যকর পরিচিতি ঘটানো।
- ❖ জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের উপযোগী বিজ্ঞানমনস্ক, অসাম্প্রদায়িক, উদারনৈতিক, মানবমুখী প্রগতিশীল ও দূরদর্শী নাগরিক সৃষ্টি।
- ❖ জ্ঞানচর্চা, গবেষণা, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী হতে জ্ঞানের নতুন নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি।
- ❖ মেধার বিকাশ এবং সৃজনশীল নতুন নতুন পথ ও পদ্ধতির উদ্ভাবন।
- ❖ জ্ঞান সৃজনশীলতা এবং মানবিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ নাগরিক সৃষ্টি।

শিক্ষা-শিখন পদ্ধতি

পঞ্চম শ্রেণি শেষে সকলের জন্য স্থানীয় সমাজ কমিটি ও স্থানীয় সরকারের যৌথ ব্যবস্থাপনায় সমাপনী পরীক্ষা এবং অষ্টম শ্রেণি শেষে বিভাগভিত্তিক প্রাথমিক পরীক্ষা হবে। এই পরীক্ষাটি প্রাথমিক সার্টিফিকেট নামে পরিচিত হবে।

পঞ্চম শ্রেণির শেষে ফলাফলের ভিত্তিতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বৃত্তি প্রদান করা হবে। অষ্টম শ্রেণি শেষে পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল অনুসারে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিভাগভিত্তিক বৃত্তি প্রদান করা হবে।

দশম শ্রেণিতে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং ফলাফলের ভিত্তিতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বৃত্তি প্রদান করা হবে।

দ্বাদশ শ্রেণি শেষে একটি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং এর নাম হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা।

পরীক্ষা হবে সৃজনশীল পদ্ধতিতে এবং পরীক্ষার মূল্যায়ন হবে গ্রেডিং পদ্ধতিতে।

বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষাকে অন্যান্য মাধ্যমিক শিক্ষার ধারার সঙ্গে সমন্বয় করে বিষয়গুলো নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ধারায় শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাত হবে ১:১২ এবং সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষক ছাত্রের অনুপাত হবে ১:৩০।

পাঠ্যপুস্তক: পূর্বে সাধারণ, বাংলা মাধ্যম, ইংরেজি মাধ্যম ও মাদ্রাসায় নিজস্ব বিষয়ে পড়েছে। বর্তমান শিক্ষানীতিতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মৌলিক কিছু বিষয় সবাইকে একইভাবে পড়তে হবে।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে বিষয়গুলো শুরু হবে বাংলা, ইংরেজি আর গণিত দিয়ে।

তৃতীয় শ্রেণি থেকে শুরু হবে বাংলাদেশ স্টাডিজ, পরিবেশ এবং ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা দিয়ে।

ধর্ম শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মূল চারটি ধর্মের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

মাধ্যমিক স্তরে সকল ধারায় বাংলা, ইংরেজি, গণিত, তথ্যপ্রযুক্তি ও বাংলাদেশ স্টাডিজ শিক্ষাকে আবশ্যিক বিষয় রাখা হয়েছে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

= বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ এবং চাকুরিতে প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের কথা বলা হয়েছে।

= শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তনের সাথে সাথে পাঠদানের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির প্রয়োগ এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

= এছাড়াও আরো বিভিন্ন বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছে :

= অসাম্প্রদায়িকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং শিক্ষার্থীদের দক্ষতা অর্জনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

= প্রয়োগমুখী মানসিক শ্রমের সাথে উৎপাদনমুখী কায়িক শ্রমের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে।

অঙ্গীকার: সময় ও অবস্থা বিবেচনা করে বর্তমান সরকার ২০১৮ সালের মধ্যে নতুন শিক্ষানীতি কার্যকর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

প্রত্যাশা: নতুন শিক্ষানীতি তখনই বাস্তবায়ন সম্ভব হবে যখন বিদ্যালয়ের কাঠামোগত সকল সুযোগ সুবিধা, দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ, বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্নিং বডির তদারকি, শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুসম্পর্ক, শিক্ষকদের মানসম্মত বেতন প্রদান এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের পর ফলো-আপ করা সম্ভব হয়। শিক্ষাকে যুগোপযোগী, আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন এবং উন্নত করা। এতে দেশ ও সমাজ হয়ে উঠবে আরো যুগোপযোগী ও সমৃদ্ধশালী। এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

২.৪ গবেষণা সংশ্লিষ্ট পুস্তকাদি ও নিবন্ধ পর্যালোচনা উপস্থাপন

 # কলুস্‌সি, ফাঃ লুচানো, এসডিবি (ভিকার জেনারেল), "খ্রীষ্ট মণ্ডলীর ইতিহাস" (পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৭৫)।

দুই হাজার বছরেরও অধিক পূর্বে পৃথিবীতে মানব জাতির মুক্তিদাতা যীশুখ্রিস্টের আবির্ভাব থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত খ্রিস্টমণ্ডলীর ক্রমবিকাশের যে ধারাবাহিক বিবরণ রচিত হয়েছে তা "খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাস" নামে পরিচিত।

খ্রিস্টমণ্ডলীর আদি পর্ব (১ম–৮ম শতাব্দী)

পবিত্র আত্মার অবতরণএর মধ্য দিয়ে শিষ্যগণ অনুপ্রেরণা ও আবেগে প্রকাশ্যে জনতার সম্মুখীন হয়ে খ্রিস্টের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে বেরিয়ে পড়েন। শিষ্যগণ প্রতিটি জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষায় উপদেশ দিতে সক্ষম হলেন। এভাবে প্রতিটি ভাষাভাষীর শ্রোতা তাদের উপদেশ মনোযোগ দিয়ে শুনে সবই বুঝতে পারলো।

শিষ্যদের মধ্য থেকে পিতর শ্রোতাদের বুঝালেন ও প্রভুর নামে দীক্ষিত হতে নির্দেশ দিলেন। তাঁর প্রচারের ফলে অনেক অনুগামী খ্রিস্টমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। পিতর প্রকাশ্যে সব লোকের সামনে খ্রিস্টের বাণী প্রচার করতেন। কেউ তাকে এ কাজে বাঁধা দেয়নি। পক্ষান্তরে লোকেরা তাকে খুব ভক্তি করতো, শ্রদ্ধা করতো ও ভালোবাসতো। যারা পিতরের উপদেশ শুনেছিলেন তারাও নিজেদের দেশে ফিরে গিয়ে দেশবাসীর কাছে খ্রিস্টের বাণী প্রচার করছিলেন। যীশুর আদেশ অনুযায়ী শিষ্যেরা তাই করেছিলেন। যীশু তাঁর শিষ্যদের এই আদেশ দিয়েছিলেন, "সর্বত্র যাও এবং মানব জাতিকে আমার শিক্ষামন্ত্রে দীক্ষিত কর। আমার আদেশ পালন করতে বল, তবেই তারা পরিত্রাণ পাবে।"[১] শিষ্যেরা সাধ্যমতো তাদের ত্যাগ, সেবা ও ভালোবাসা দিয়ে ভক্তদের উদ্দেশ্যে বাণী প্রচার করে গেছেন। তাদের সেবা ছিল নিঃস্বার্থ। তাদের সেবায় ব্যক্তিস্বার্থ ছিলনা। তারা প্রচারের মাধ্যমে মানুষকে নানা শিক্ষা দিয়ে গেছেন। সেই শিক্ষার জন্য তাদেরকে কোন পারিশ্রমিক দিতে হতো না। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষার জন্য মানুষকে বেতন দিতে হয়। পক্ষান্তরে, শিষ্যদের মনোভাব ছিল উদার।

রোপিত বৃক্ষ যেমন ক্রমান্বয়ে পত্রপুষ্পে বিকশিত ও শোভিত হয় তেমনি প্রচারিত খ্রিস্টধর্মের ফলশ্রুতিতে খ্রিস্টভক্তদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। খ্রিস্টভক্তদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন, পারস্পরিক প্রেম, সহানুভূতি ও হৃদ্যতা গড়ে উঠল। এছাড়াও তাদের মধ্যে আত্মত্যাগ ও অপরের দুঃখে দুঃখী হওয়ার মনোভাব দেখা দিল। পিতর হলেন সেই নব প্রতিষ্ঠিত খ্রিস্টমণ্ডলীর ধর্মগুরু এবং পল হলেন বাণী প্রচারের নির্ভীক অগ্রদূত। যীশুর শিক্ষা ছিল ত্যাগ, সেবা ও ভালোবাসার শিক্ষা।

সেই প্রাথমিক যুগ থেকেই মণ্ডলীতে এমন প্রথা গড়ে উঠেছিল যে, যারা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাদেরকে নির্দিষ্ট সময় ধরে খ্রিস্টধর্ম বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে প্রস্তুত করে তোলা হতো।[২] খ্রিস্টধর্মানুসারীদের উপর অত্যাচার-নির্যাতনের সেই যুগে বহু লোক খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে দীক্ষিত হতে চেয়েছিল। এদের মধ্যে অনেকেই ছিল দীন-দরিদ্র। তারা কোন স্বার্থের জন্য নয় বরং খ্রিস্টের মুক্তির বাণী শুনেই খ্রিস্টধর্মাবলম্বী হতে চেয়েছিল। সে যুগে মণ্ডলীভুক্ত হওয়ার জন্য কোন জাতি বা বর্ণজনিত কোন বাধানিষেধ ছিল না এবং এখনও নেই। কারণ পারস্পরিক প্রেম-ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব ছিল খ্রিস্টের মূল শিক্ষা।[৩] তাই প্রাচীন মণ্ডলীর সম্পদশালী সদস্যগণ দীনদুঃখীদের অভাব মোচনে সহায়তা করতেন। খ্রিস্টমণ্ডলীতে ধনী-দরিদ্রের কোন ভেদাভেদ নেই, কারণ ধনবান সম্প্রদায় খ্রিস্টপ্রেমে উদ্দীপিত হয়ে গরীব ও অনাথদেরকে নিজের সুখ-সাচ্ছন্দ্যের অংশীদার করে নেয়।

অগণিত লোক যখন খ্রিস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ধর্মান্তরিত হতে শুরু করেছিল তখন ক্ষমতাধর ও প্রভাবশালীদের অনেকেই তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে দিয়েছিল। তারা প্রতিহিংসা, লোভ ও ঘৃণার বশবর্তী হয়ে নতুন বিশ্বাসীদেরকে "খ্রিস্টান" বলে অভিযুক্ত করতো। তাদের অভিযোগ ও দাবি অনুসারে ক্ষমতাসীনরা খ্রিস্টভক্তদের শাস্তি দিতেন। তথাপি খ্রিস্টভক্তরা সর্বস্ব ত্যাগ করে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিতেন। কেননা যীশু তাঁর অনুগামীদের উদ্দেশে বলেছিলেন, "আমার জন্য লোকে তোমাদের ঘৃণা করবে, কেননা তার আগে তারা আমাকে ঘৃণা করেছে। যে শেষ পযন্ত স্থির থাকবে সে পরিত্রাণ পাবে।"

এরূপ দৈববাণী সকল যুগের জন্যই প্রযোজ্য। সুতরাং খ্রিস্টমণ্ডলী যে যুগে যুগে নির্যাতিত ও অত্যাচারিত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

খ্রিস্টবিশ্বাসীদের মধ্যে অনেক বিদগ্ধ, বাগ্মী ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাদের অন্যতম ছিলেন গ্রীকভাষী সাধু জাষ্টিন। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত দার্শনিক। তিনি প্লেটোর শিষ্য ছিলেন। তিনি জ্ঞানচর্চায় খুবই উৎসাহী ছিলেন। পর্যটনকালে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, বহু খ্রিস্টভক্ত মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনেও সর্বান্তঃকরণে উৎপীড়কদের জন্য ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেছে এবং অত্যাচার নির্যাতন সত্ত্বেও নির্ভয়ে ও হাসিমুখে জীবন উৎসর্গ করেছে। পরবর্তী কালে সমুদ্র উপকূলের এক বেলাভূমিতে একজন অকালবৃদ্ধ তাদের বুঝিয়ে দিলেন যে, শত্রুদের ভালোবাসাই হলো খ্রিস্টভক্তদের একটি আদর্শগত বৈশিষ্ট্য।[৪]

- সাধু আইরেনিয়াস ধর্মশিক্ষার জন্য পুঁথি লিখেন ও ধর্মভ্রষ্টদের মতামত নিয়ে তাঁর ভাষণে ও লিখনে প্রমাণ করেন।

- এশিয়া মাইনরের স্মির্ণা (Smyrna) নগরের ধর্মাধ্যক্ষ সাধু পলিকার্প জ্ঞানগর্ভ অনেক পত্র লিখেন।

- খ্যাতনামা লেখক, যুক্তিবাদী, আইনজীবি তের্তুলিয়ান খ্রীষ্টধর্ম রক্ষার্থে উৎসর্গীকৃত ধর্মশহীদদের জীবন ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর চিন্তাসমৃদ্ধ বহু সংখ্যক প্রতিবাদ সম্বলিত প্রবন্ধ সম্রাট, শাসক ও আইনবিদদের কাছে পেশ করা হয়। তার মতো অখণ্ড ও অকাট্য যুক্তি খণ্ডন করার ক্ষমতা কারো ছিলনা। তাঁর ঐতিহাসিক এবং যুক্তিসিদ্ধ রচনাগুলি মণ্ডলী সমর্থন করে থাকে। তাঁর ভাষণগুলির মধ্যে যুক্তিনির্ভর একটি ভাষণ হলো: "আমরা নিরপরাধ খ্রিস্ট-অনুগামী হলেও তোমরা আমাদের দণ্ডিত করছো, নির্যাতন করছো এবং আমাদের চূর্ণ-বিচূর্ণ করছো। এরূপ নিষ্ঠুর হত্যালীলা চালালেও জানবে আমাদের একএকটি রক্তবিন্দু হলো নতুন খ্রীষ্টভক্ত উৎপন্নের বীজস্বরূপ।"

খ্রিস্টপূর্ব ৬৫ সন থেকে বাইজান্টিয়াম, তুরস্ক দেশের (বর্তমান ইস্তাম্বুল) ছিল গ্রীকসভ্যতা, কলাবিদ্যা ও সাহিত্যের বিশিষ্ট কেন্দ্র।

আনুমানিক ৩৫৭ খ্রিঃ সাধু যেরোম জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সন্ন্যাসজীবন অবলম্বন করে সিরিয়ার মরু অঞ্চলে বসবাস করার সময় প্রাচীন হিব্রুভাষায় শিক্ষা লাভ করেন পবিত্র বাইবেলের শব্দগত অর্থ সম্যকরূপে উপলব্ধি করার জন্য। পরিশেষে তিনি হিব্রু, আরামাইক ও গ্রীক ভাষায় রচিত বাইবেলটিকে আধুনিক ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেন।[৫] যাকে বলা হয় ভালগেট (Vulgate)। তিনি প্রথম খ্রিস্টীয় সাহিত্যের ইতিবৃত্ত রচনা করেন। তিনি মণ্ডলীর কার্যাবলী, লেখকদের বিভিন্ন ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি অনুবাদ, সন্ন্যাসীদের জীবন ইতিহাস, ধর্মীয় উপদেশ ও শিক্ষামূলক পত্র ভাষান্তরিত করেছেন।

তৎকালীন রোম সাম্রাজ্যের কনষ্টান্টিনোপলের বিশপ উলফিলাস (Ulfilas) বর্বর উপজাতিদের শিক্ষিত করার জন্য তাদের ভাষার ভিত্তিতে উপযোগী বর্ণমালা ও প্রাথমিক স্তরে শিক্ষণীয় ব্যাকরণ ও পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন।[৬] পরবর্তীতে তাদের ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন।

তখনকার দিনে অলংকারশাস্ত্র ছিল শিক্ষার মূল ভিত্তি। সাধু আগষ্টিন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কার্থেজএর মহাবিদ্যালয়ে অলংকারশাস্ত্র নিয়ে অধ্যয়ন করেন। তিনি নানাবিধ দর্শনবাদ তত্ত্বে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন, লেখনী ধারণ করে যুক্তিযুক্ত জ্ঞানগর্ভ পুস্তকাদি রচনা করেন ও যুক্তিতর্কের দ্বারা বিশ্লেষণ করেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো ‘স্বীকারোক্তি’ ও ‘ঈশ্বরনগরী’। তিনি ঐশকৃপা তত্ত্বের ব্যাখ্যা করে জ্ঞানগর্ভ পুস্তক রচনা করেন। এজন্য তাকে ঐশকৃপার আচার্য বলা হয়।[৭]

ধর্মাচার্য ও বিশপ সাধু বাসিল কর্তৃক নির্মিত সিজারিয়ার হাসপাতালটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, পীড়িত, ক্ষতজীর্ণ রোগীদের সেবা দেওয়া হতো। এছাড়াও আর্তদের কল্যাণে হাসপাতাল, বৃদ্ধাশ্রম, অনাথাশ্রম নির্মিত হয়। মানুষের দুঃখ-কষ্ট নিবারণের জন্য খ্রিস্টমণ্ডলী দরিদ্রদের অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছিল। সমাজের প্রান্তিক ও অস্পৃশ্য মানুষদের সেবার জন্য পুরোহিতগণ স্বার্থত্যাগ ও পরিশ্রম করতেন। এ ধরনের মানসিকতা দর্শনে মানুষ বুঝতে পারলো যীশুর দয়া ও প্রেমের শিক্ষা কতই না মহৎ।

খ্রিস্টমণ্ডলী কিশোর-কিশোরীদের শিক্ষার ব্যবস্থাও করে।[৮] পঞ্চম শতাব্দীতে নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মিত হয়। এছাড়া প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যকদের রচনা পাঠ করার সুযোগ হয়। এই শতাব্দীতেই কলাবিদ্যা, সুকুমার শিল্প ও স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষ সাধিত হয়।

বেনেডিক্টিন সন্ন্যাসীরা সাধু বেনেডিক্টএর মূল শিক্ষা অনুসারে কাজকর্ম করতেন। ইউরোপের অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগে মন্তেক্যাসিনো মঠটি ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন যুগের মানুষের কাছে আলোকস্তম্ভস্বরূপ। বিদ্যাচর্চা ও কর্মচর্চা ছিল মঠটির হৃদপিণ্ড।[৯] সন্ন্যাসীরা অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে প্রথিতযশা গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যিকগণের রচনাবলী ও বাইবেলীয় কোডেক্স (Codex) অর্থাৎ পুঁথি নকল করতেন। তাঁদের পরিশ্রমের জন্যই সুপ্রাচীন কালের গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য এখনো আমরা পাঠের সুযোগ লাভ করছি।

পোপ গ্রেগরি কর্মব্যস্ত জীবন অতিবাহিত করে গেছেন। তিনি শিক্ষা সংস্কৃতি প্রবর্তন করে সমাজ উন্নয়নে তৎপর ছিলেন ও মানুষের মধ্যে নবচিন্তার স্রোত প্রবাহিত করেন। তিনি বর্বরদের সভ্যতাবিরোধী আচার-আচরণ সংস্কার করে তাদেরকে প্রকৃত মানুষ করার চেষ্টা করেন।[১০] তিনিই সর্বপ্রথম পোপের উপাধি অবলম্বন করেন (Servus Servorum Dei) অর্থাৎ পোপ হলেন "ঈশ্বরের সেবকদের সেবক"।

জার্মান প্রচারক সাধু বনিফাস মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করে মঠ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন। তিনি জ্ঞানগর্ভ পত্র, কবিতা, উপদেশ ও জার্মান ভাষার উপযোগী ব্যাকরণ রচনা করেন। তিনি অসভ্য ও বর্বরদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উৎসাহিত করেছিলেন।[১১]

সহোদর দুই ভাই, সাধু সিরিল (St. Cyril) ও সাধু মেথোডিয়াস (St. Methodius), শ্লাভদের কাছে ধর্মপ্রচার করে শ্লাভীয় ভাষায় (Slavonic) বর্ণমালা আবিষ্কার করেন। এই বর্ণমালা থেকেই রুশ বর্ণমালা সৃষ্টি হয়েছে।[১২] তারা ব্যাকরণের প্রচলন ও শ্লাভীয় ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন।

হাঙ্গেরীর রাজা সাধু স্টিভেন (St. Stephen) এর প্রয়াসে বহু ধর্মমঠ, বিদ্যালয়, বৃহদায়তন হাসপাতাল, অনাথাশ্রম ও বৃদ্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

জত্তো (Giotto, ১৩৩৭ খ্রিঃ) নামক ইটালীর একজন শিল্পী, স্থপতি, চিত্রকর তার অপূর্ব শৈল্পিক সৌন্দর্য দ্বারা উপাসনাগৃহগুলির শ্রীবৃদ্ধি করেন। এসময় ইউরোপে সর্বত্র স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্র শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। যুগান্তরের পটভূমিতে এগুলি উত্তরোত্তর সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করে চলেছে।

ধর্মতত্ত্ববিদ মহান পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিক আলবার্টএর শিষ্য টমাস ৬০টি গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্য থেকে সুম্মা (Summa) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১৩] এই গ্রন্থে তিনি সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে খ্রিস্টীয় দর্শনশাস্ত্র ও ধর্মতত্ত্বসমূহ ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর রচিত সঙ্গীত ধর্মোপসনায় গীত হয়।

বৈজ্ঞানিক পোপ একবিংশ যোহন (John XXI) ৫ বৎসর যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন ও ন্যায়শাস্ত্র (Logic) বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ ৩৩০ বৎসর ধরে শ্রেষ্ঠ পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।[১৪]

পোপ বনিফাস রোম নগরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ভাটিকান গ্রন্থাগারটি সম্প্রসারণ করেন।

পোপ পঞ্চম নিকোলাস রোম নগরীকে পৃথিবীর শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্র ঘোষণা করে বিভিন্ন দেশের পণ্ডিত ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের মূল্যবান প্রাচীন পুঁথি পড়ার নিমন্ত্রণ জানান। তাঁরই প্রচেষ্টায় "ভ্যাটিকান লাইব্রেরী" পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীন গ্রন্থাদি সংরক্ষণে ও আয়তনে খ্যাতি অর্জন করে।[১৫] সাহিত্য ছাড়াও এখানে চিত্র ও ভাস্কর্য শিল্পের উন্নতি হয়। ১৪৬৪ খ্রিঃ দ্বিতীয় পল রক্ষিত পুঁথিগুলি ছাপানোর ব্যবস্থা করেন। এর ফলে সর্বস্তরের জনসাধারণ দুর্লভ পুস্তকাদি পড়ার সুযোগ লাভ করে। মধ্যযুগের সামাজিক গোঁড়ামি ও ভ্রান্ত ধ্যানধারণা থেকে মুক্তির প্রয়াসকে বলে নবজাগরণ। ইউরোপে সর্বস্তরে শিল্পে, সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে এই নবজাগরণ পরিলক্ষিত হয়।

আধুনিক যুগ

এ সময়ে যেসব ধর্মসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় তাদের প্রত্যেকটিরই উদ্দেশ্য ছিল ধর্মপ্রচার, শিক্ষাদান ও সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

ফিলিপ ২০ বৎসর বয়সে স্বদেশ ত্যাগ করে রোম নগরীতে গেলেন। তিনি জনসাধারণকে সহজ, সরল ভাষায় ও আনন্দদায়ক কৌতুকের মাধ্যমে শিক্ষা দিতেন।[১৬] তিনি খেলাধুলা ও গানবাজনা করতেন। তিনি এমনভাবে মেলামেশা করতেন যাতে তাঁর আদর্শ দেখে ও উপদেশ শুনে মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠিত হয়।[১৭]

পোপ গ্রেগরি ধর্মশিক্ষাদানের জন্য শিক্ষাকেন্দ্র (Seminary) স্থাপন করেন। অদ্যাবধি রোমের গ্রেগোরিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি বহন করছে। তিনি পঞ্জিকার সংস্করণ করেন। তার এই নবরূপায়িত বৎসর গণনাকে "গ্রেগরিয়ান ক্যালেণ্ডার"[১৮] বলে। আজ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাৎসরিক দিন গণনা করা হয়।

ফাদার মাত্তেও রিচ্চি (Matteo Ricci) ইটালীর একজন যেজুইট বৈজ্ঞানিক, জ্যোতিষী ও সাহিত্যিক। ১৫৭৮ খ্রিঃ চীনদেশে পদার্পণ করে তিনি চীন ভাষায় 'ঈশ্বরের সত্যতত্ত্ব' নামে, পুস্তক রচনা করেন। পরবর্তীতে মিশনারীদের পক্ষে ধর্মতত্ত্বগুলি সহজভাবে শেখানোর জন্য সহায়ক হয়েছিল।

ফাদার দিয়েগো ছিলেন মহাপণ্ডিত। তিনি বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার জন্য একটি মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে ভারতীয় শিক্ষার মানোন্নয়ন করার জন্য আত্মোৎসর্গ করেছেন।[১৯] ভারতীয়রা কৃতজ্ঞচিত্তে তাকে স্মরণ করে।

সাধু ফান্সিস জেভিয়ার একটি ঘন্টা হাতে নিয়ে নগরের সব জায়গায় পরিভ্রমণ ক'রে কিশোরদের একটি স্থানে একত্রিত করে গানের মাধ্যমে শিক্ষা দিতেন।[২০] কিশোররা বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসাধারণকে গান শুনিয়ে অনুপ্রাণিত করতেন। তিনি নগ্নপায়ে প্রচার কার্য চালাতেন। তিনি তামিল ভাষায় প্রার্থনাপুস্তক অনুবাদ করেন। পরবর্তীতে তিনি জাপানে গিয়ে "ক্যাটেখিজম" বা ধর্মশিক্ষার বই জাপানী ভাষায় অনুবাদ করেন।

সম্রাট আকবর ছিলেন ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে শুনতে ভালোবাসতেন। তিনি ধর্মপ্রচারকদের রাজ দরবারে আহ্বান করে ইবাদৎ খানায় বসে ধর্মালোচনা করতেন। তিনি

তার পুত্র মুরাদকে পর্তুগীজ ভাষা ও খ্রিস্টধর্ম শিক্ষার জন্য ফাদার মন্তসেরারের হাতে সমর্পণ করেন।

১৫৯১ খ্রিঃ লাহোরে সম্রাট স্থানীয় একটি শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব মিশনারীদের উপর ন্যস্ত করেন। এ প্রতিষ্ঠানে সম্রাটের পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, আমলা ও অভিজাত পরিবারের সন্তানরা পড়াশুনা করতো। এছাড়াও একটি উচ্চমানের মহাবিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব তিনি মিশনারীদের হাতে ন্যস্ত করেন। তিনি মিশনারীদের কাছ থেকে খ্রিস্টধর্ম বিষয়ে শিক্ষা শ্রবণ করতেন। এ সময় আগ্রায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

ফাদার দেনোবিলি প্রার্থনা, ধর্মশিক্ষা, ধর্মতত্ত্বের উপর কয়েকটি গ্রন্থ তেলেগু, তামিল ও সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন।

১৫৯৮ খ্রিঃ ৪ জন যেজুইট ফাদার বাংলাদেশে এসে একটি স্কুল ও হাসপাতাল নির্মাণ করেন।[২১] এটি ছিল পূর্ব বাংলার প্রথম হাসপাতাল। পরে তারা চট্টগ্রামে ২টি স্কুল নির্মাণ করেন।

১৬৪০ খ্রিঃ যেজুইট পুরোহিতগণ হুগলিতে সান্তো পাউলো (St. Paul) নামক মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

ফাদার আমব্রোজ ১৭৫০ খ্রিঃ নাগরীতে (Nagory) একটি গির্জা ও স্কুল নির্মাণ করেন।[২২]

পোপ ষোড়শ গ্রেগরি রাজ্যের অনুপোযোগী আদালত ও বিচার-বিধি এবং অপ্রচলিত শাসন প্রথার সংস্কার করেন। ভ্যাটিকান ভবনে তিনি ঐতিহ্যবাহী স্মারক যথা - প্রাচীন কালের মিশরীয় বিবিধ বস্তু-সামগ্রী নিয়ে একটি যাদুঘর (museum) প্রতিষ্ঠা করেন। তার প্রচেষ্টায় ইটালিতে দশমিক মুদ্রা ব্যবস্থার প্রচলন হয়।[২৩]

১৮৪১ খ্রিঃ ডনবস্কো পরিত্যক্ত, অনাথ ও চপলমতি কিশোরদের আশ্রয়দানের জন্য টুরিন নগরীতে "অরাটরি" স্থাপন করেন। পরবর্তীতে আশ্রিত কিশোরদের শিক্ষিত করার পরিকল্পনা করেন।[২৪] পরে তাদের দেহমনের উপযোগী একটি বহুমুখী শিক্ষাদর্শনের মাধ্যমে সুনাগরিক করার বাস্তবমুখী

পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন দক্ষ শিল্পী, কর্মী, বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও লেখক। তিনি মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনের উপযোগী বহু সংখ্যক পুস্তক-পুস্তিকা ও গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন।

পরবর্তীতে বিভিন্ন সংঘের কর্মোদ্যোগী অদম্য সদস্যগণ পৃথিবীর সর্বত্র পঠনপাঠনের উপযোগী সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, করিগরী বিদ্যালয়, বোর্ডিং স্কুল ও শিক্ষাদানের জন্য উপযোগী প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন।

ফাদার যোসেফ কত্তোলেঙ্গো ইটালিতে "ঈশ্বরের দয়ার ক্ষুদ্র গৃহ" নামে সুবৃহৎ হাসপাতাল নির্মাণ করেন। এখানে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত দশ সহস্রাধিক রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করা হয়।[২৫]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে, ইটালির উত্তরাঞ্চলে বার্থলোমেয়া বিদ্যার্জনে সার্থকতা অর্জন করার পর ছাত্রীদের ধর্মীয় ও নৈতিক বিষয়ে প্রবুদ্ধ করতেন। এছাড়াও তিনি রোগক্লিষ্ট মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করে দুর্বল ও অসুস্থ রোগীদের সেবা করে আনন্দ উপভোগ করতেন।

১৯৮১ খ্রিঃ পোপ ২য় জনপল মেহমেট আলি অগসা কর্তৃক গুলিবিদ্ধ হয়েও তিনি তার আততায়ীকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। যীশুর ক্ষমার বাণী তাঁর ছিল মজ্জাগত।[২৬]

বর্তমান পৃথিবীতে কাথলিক ধর্মগুরু পোপের ভূমিকা যে সার্বিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এবং সমগ্র বিশ্বে তিনি যে তার কর্মধারার মাধ্যমে কতখানি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ববাসী তা উপলব্ধি করেছে। তাঁর অন্তিম উক্তি ছিল: "ভালোবাসাই হৃদয়ে পরিবর্তন আনে, শান্তি দেয়। আমেন।"[২৭]

সমাজ, রাষ্ট্র ও সাংস্কৃতিক উত্থানপতন চিত্রিত করা ইতিহাসের কাজ। ধর্ম যেখানে শিথিল ও উৎপীড়িত সেখানে সভ্যতা বা সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে না।

খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাসে দেখতে পাই, এ ধর্মের জন্য বহু সংখ্যক ধর্মশহীদ অলৌকিক আত্মত্যাগ, পোপগণের জ্ঞান, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়, ধর্মবীরদের নিঃস্বার্থ দয়া, তাদের পবিত্র জীবনের কথা, ধর্মপ্রাণ মহাপুরুষদের সহিষ্ণুতা, পরদুঃখকাতরতা ও আত্মোৎসর্গের কথা। এসব কথা পাঠ করলে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে।

এ পুস্তকটিতে দেখতে পাই মিশনারীদের সেবা কত নিঃস্বার্থ। তাদের সেবায় কোন স্বার্থ নেই। যীশুর শিক্ষার মূল কথা হচ্ছে ভ্রাতৃত্ব, প্রেম ও ভালোবাসা। এসব কথা স্মরণ করে মিশনারীরা সেবা করে গেছেন।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

১। খ্রিস্টের প্রেমবাণী প্রচার ও বিস্তার।

২। খ্রিস্টমণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করা ।

৩। সদুপদেশ, সদাচারণ ও সুমন্ত্রে দীক্ষিত করা।

৪। শিক্ষা প্রদান ও বিস্তার করা।

৫। গরীব-দুঃখী, অনাথ, দুর্বল ও অসুস্থদের ভালোবাসার মাধ্যমে সেবা দান করা।

৬। ধর্মশিক্ষার মাধ্যমে নৈতিক বিষয়ে প্রবুদ্ধ করা।

৭। পরস্পরের সাথে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা।

শিক্ষার কৌশলসমূহ/কর্মপদ্ধতি

১। দেশ-দেশান্তরে পরিভ্রমণ করে।

২। পায়ে হেঁটে (নগ্নপায়ে)।

৩। গ্রামেগঞ্জে, নগরে-বন্দরে, হাটে-বাজারে, অলিতে গলিতে ঘুরে ঘুরে।

৪। ঘন্টা বাজিয়ে গানের মাধ্যমে।

৫। সহজ ও সরল ভাষায়।

৬। আনন্দদায়ক কৌতুকের মাধ্যমে।

৭। খেলাধুলা ও গানবাজনার মাধ্যমে।

৮। ধর্মীয় বইপুস্তকাদি বিলি করে।

৯। কিশোরদের একত্রিত করে।

১০। যেখানে প্রচার করতে যেতেন সেই স্থানের ভাষা অনুযায়ী বইপুস্তকাদি রচনা ও বাইবেল অনুবাদ করে।

১১। বহুমুখী শিক্ষাদর্শনের মাধ্যমে।

১২। সুনাগরিক করার বাস্তবমুখী পরিকল্পনার মাধ্যমে

১৩। শিক্ষার কোন বয়স ছিল না। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে শিক্ষা প্রদান করতেন।

১৪। শিক্ষার ভাষা ছিল বন্ধুসুলভ।

১৫। যেখানেই প্রচারের জন্য গেছেন সেখানেই উপাসনাগৃহ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন।

১৬। অকালবৃদ্ধ ও অসহায়দের জন্য আশ্রম ও থাকার গৃহ নির্মাণ করেছেন।

১৭। অনাথ ও পরিত্যক্ত শিশুকিশোরদের জন্য অরাটরী নির্মাণ করেছেন।

১৮। আর্তপীড়িত রোগক্রান্তদের সেবা ও চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছেন।

ব্যক্তিত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ/গুণাবলী

১। আগ্রহী ও আত্মত্যাগী।

২। ধর্মানুরাগ ও ক্ষমাশীলতা।

৩। সক্রিয় নিষ্ঠা।

৪। ন্যায়পরায়ণ ও পরিশ্রমী।

৫। সাহসী ও সচ্চরিত্রবান।

৬। গুণবান ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

৭। জীবন যাপন সাধারণ ও আদর্শ খ্রিস্টীয়জীবন।

৮। বুদ্ধিদীপ্তি সম্পন্ন।

৯। সুদক্ষ ও দায়িত্বশীল।

১০। সাহিত্যিক ও উচ্চশিক্ষিত।

১১। শান্ত ও বিনীত।

১২। প্রাণবন্ত ও স্বাধীনচেতা।

১৩। পারস্পরিক প্রেমে দৃঢ়বিশ্বাসী ।

১৪। উদারতা ও সহনশীলতা।

১৫। দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও ঐশতত্ত্ববিদ।

১৬। দক্ষশিল্পী ও কর্মী।

১৭। চিন্তাবিদ, লেখক ও অনুবাদক।

১৮। জ্ঞানদানে অত্যুৎসাহী ও কর্মোদ্যোগী।

১৯। অটুট ধর্মবিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক জীবন।

২০। দিব্য ক্ষমতাসম্পন্ন।

২১। প্রচার ক্ষেত্রে উত্তম কৃষকের মতো।

বাধাসমূহ/অন্তরায়

১। খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধে যারা ছিল তারা ষড়যন্ত্র করে অভিযুক্ত করতো।

২। হৃদয়হীন সম্রাটদের হাতে অনেকে তাদের জীবন উৎসর্গ করেছে।

৩। বর্বরদের নিষ্ঠুর অভিযান।

৪। বিভিন্ন বিপর্যয় দেখা দিয়েছে (যেমন যুদ্ধ, ধ্বংস)

৫। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কাজ করেছে।

৬। অনেক নির্যাতন অত্যাচার ও উৎপীড়নের মুখে পতিত হয়েছে।

৭। বিভিন্ন ভ্রান্ত মতামতের সম্মুখীন হয়েছেন।

৮। চিঠিপত্র ছাড়া যোগাযোগের কোন মাধ্যম ছিলনা।

৯। যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত ছিল না।

১০। বেশিরভাগ লোক ছিল অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন।

১১। আর্থিক দিক দিয়ে অনেকেই ছিল অসচ্ছল।

১২। সামাজিক দিক দিয়ে ছিল দুর্বল, অসহায় ও দীনদরিদ্র।

স্বার্থকতা

খ্রিস্টমণ্ডলীকে পুষ্পশোভিত উদ্যানের সঙ্গে তুলনা করা যায়। কারণ মণ্ডলী নামক বৃক্ষটি অসংখ্য সদ্‌গুণের সিঞ্চনে প্রাণবন্ত, পল্লবিত ও পুষ্পিত হয়ে উঠেছে। মণ্ডলীর ভূতপূর্ব সাধু-সজ্জন ব্যক্তিদের আদর্শ জীবন, শিক্ষা বর্তমান ও ভবিষ্যতের মানুষের উত্তম বীজস্বরূপ। মিশনারীগণ নানা অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করে, বিভিন্ন পরিবেশে নানা বিপর্যয় কাটিয়ে তাদের লক্ষ্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। তারা তাদের মুখের কথায় নয় বরং কাজ দিয়ে তাদেও সার্থকতা প্রমাণ করেছেন।

#সরকার, লুইস প্রভাত, "বঙ্গদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিষ্টিয় সম্প্রদায়" (১৫৭৬-১৯৬০১) প্রথম খণ্ডঃ ইউরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে পর্তুগীজরাই সর্বপ্রথম বঙ্গদেশে আগমন করে। তারাই সর্বপ্রথম এই প্রদেশে খ্রিস্টবাণী প্রচার করে। বস্তুত তাদের আগ্রহ, উদ্যম ও প্রয়াসের ফলে বঙ্গদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টীয় সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হয়। বঙ্গদেশে কাথলিক ও প্রটেস্টান্ট মিশনারীগণ খ্রিস্টধর্ম প্রচার করে বিভিন্ন অঞ্চলে খ্রিস্টমণ্ডলী স্থাপন করেছেন। কাথলিক ও প্রটেস্টান্ট মিশনারীদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য থাকলেও তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল এক। ভিন্ন মত ও ভিন্ন পথের পথিক এই সব মিশনারীগণ তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে গিয়েছেন। তারা তাদের ত্যাগ, সেবা, পরিশ্রম ও ভালোবাসা দিয়ে খ্রিস্টপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রচারের মাধ্যমে নানাভাবে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

যীশুখ্রিস্টের দ্বাদশ শিষ্যের অন্যতম সাধু টমাস যীশুর মৃত্যুর কয়েক বৎসর পর খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতে আগমন করেন। তিনি তার স্বকর্ণে শোনা ও স্বচক্ষে দেখা যীশুর বাণী ও আলৌকিক কার্যাবলী পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশবাসীর কাছে প্রচার করেন। তিনি যীশুর ক্ষমা ও প্রেমের বাণী এবং ক্রুশের উপর যীশুর আত্মবলিদানের মর্মন্তুদ কাহিনী শুনাতেন। ৫২ খ্রিঃ মালাবার অঞ্চলে (বর্তমান কেরালা) তিনি ৭টি গির্জা নির্মাণ করেন। সাধু টমাস খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দির মধ্যভাগে ভারতে খ্রিস্টমণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করেন।[২৮] এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, খ্রিস্টধর্ম পাক-ভারতে প্রায় দুই হাজার বছরের প্রাচীন ও ঐতিহ্য মণ্ডিত ধর্ম। তখন প্রাচ্যদেশীয় রীতিতে খ্রিস্টীয় উপাসনা হতো।

১৪৯৮ খ্রিঃ ২৭ মে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা মালাবারের কালিকট বন্দরে অবতরণ করার পর থেকেই ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে পর্তুগীজরা ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করতে শুরু করেন। তাদের পরেই পর্তুগীজ মিশনারীগণ ভারতে নতুনরূপে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। পর্তুগীজরা ছিল রোমান কাথলিক। তাদের ভাষা ল্যাটিন হওয়াতে ল্যাটিন পদ্ধতিতে উপাসনা অনুষ্ঠান প্রবর্তন করা হয়। পর্তুগীজ যাজকদের আগ্রহ, উদ্যম ও প্রয়াসের জন্য বঙ্গদেশে খ্রিস্টধর্ম ও বঙ্গীয় সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে ইংরেজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও দিনেমারগণ এদেশে আগমন করেন। পর্তুগীজরা মূলত বণিক সম্প্রদায়। তাই তারা চট্ট্রগ্রাম ও সপ্তগ্রামে উপনিবেশ স্থাপন করে। এসব বণিকদের সাহায্য ও সহযোগীতায় বঙ্গদেশে খ্রিস্টীয় মিশনারীদের

আগমন সহজ হয়ে ওঠে। কেদার রায়, রামচন্দ্র ও প্রতাপাদিত্য – এই তিনজন রাজাই ছিলেন খ্রিস্টধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাদের আনুকূল্য, বদান্যতা ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্যই পূর্ববঙ্গে খ্রিস্টধর্মের প্রচার ও প্রসার সম্ভব হয়। বঙ্গদেশে বসবাসের জন্য প্রথম পুরোহিত ভিকার জেনারেল ফাদার পেরেইরা আগমন করেন। তাঁর সাথে আরো দু'জন পুরোহিত কর্মরত ছিলেন। পুরোহিতের সংখ্যা কম থাকায় আগস্টিন, যেজুইট ও ডমিনিকান পুরোহিতদের যৌথ প্রয়াসে খ্রিস্টবাণী প্রচারিত হয় ও মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।[২৯]

হুগলিতে শিক্ষা ও সেবা প্রতিষ্ঠান: যেজুইট সংঘ প্রতিষ্ঠার অল্পকালের মধ্যে শিক্ষাবিদ হিসাবে ফাদারদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তাঁরা যেখানেই পদার্পণ করেছেন সেখানেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করে শিক্ষাবিস্তার কার্যে আত্মনিয়োগ করেছেন।[৩০] হুগলিতে ফাদার ফারনানদেজ একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কয়েক মাসের মধ্যে সেখানে তিনি উচ্চতর একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান করেন। ১৫৯৮ খ্রিঃ আগষ্ট মাসে উচ্চতর শিক্ষার জন্য সেন্ট পলস্ কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গদেশে মিশনারীদের পরিচালিত এ দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।[৩১] এছাড়া দুঃখী, দরিদ্র ও মুমূর্ষুদের জন্য তিনি একটি হাসপাতাল স্থাপন করেন। বঙ্গদেশে যখন বাণীপ্রচার ও মণ্ডলী প্রতিষ্ঠার কাজ দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছিল তখনই খ্রিস্টমণ্ডলীর উপর ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসে। যা সন্দীপের যুদ্ধ নামে পরিচিত।

১৬১৭ খ্রিঃ যেজুইট মিশনারীগণ ব্যান্ডেলে তাদের আবাসিক গৃহ ও কলেজ ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করেন। প্রতিকূল পরিবেশেও মিশনারীদের ও দেশীয় রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে বঙ্গদেশে খ্রিস্টান জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং মিশনারীদের আন্তরিক প্রয়াস ও নিরলস পরিশ্রমের ফলে, তাদের কাজের ধারা অব্যাহত থাকে।

সম্রাট আকবর ছিলেন উদার মনের মানুষ। খ্রিস্টান মিশনারীদের ব্যাপারে তাঁর মনোভাব ছিল ইতিবাচক। তাঁর আমলে যে সব মিশনারী খ্রিস্টধর্ম প্রচারে রত ছিলেন তাদের উদ্যম ও উৎসাহ, কায়িক শ্রম ও ক্লেশভোগ, ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ ছিল প্রশংসনীয়। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাথেও তাঁদের সদ্ভাব ছিল। ফাদার আন্তোনিওর লিখিত বিবরণ থেকে জানা যায় যে, মিশনারীদের প্রচার পদ্ধতি

ছিল প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ধর্মশিক্ষাদান, জপমালা বিষয়ক গান (ভুষণার রাজপুত্র দোম আন্তনিওর রচিত), বাড়ি বাড়ি গিয়ে ও হাটেবাজারে যীশুর কথা শুনিয়ে ও বাণীর ব্যাখ্যা ক'রে, প্রচার পুস্তিকা বিলি ক'রে।[৩২]

শিক্ষা ও বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে অবদান : মিশনারীদের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তাঁরা যেখানেই প্রচার কাজের জন্য যেতেন, সেখানেই শিক্ষা বিস্তারের পবিত্র কাজটিকে অগ্রাধিকার দিতেন।[৩৩] বাংলা গদ্য সাহিত্যের উন্নয়নকল্পে পর্তুগীজ মিশনারীদের অগ্রণী ভূমিকা প্রশংসার দাবী রাখে।[৩৪] মূলত প্রচারের সুবিধার জন্য সহজবোধ্য চলিত বাংলায় ধর্মপুস্তক রচনা করে তাঁরা নিজেদের অজ্ঞাতসারে বাংলা গদ্য সাহিত্যের নবদিগন্ত উন্মোচন করেন।

১৫৯৯ খ্রিঃ ঢাকা জেলার শ্রীপুরে ফাদার ফ্রান্সিস ফারনানদেজ একটি ক্যাটেকিজম (প্রশ্নোত্তরে ধর্মশিক্ষা) পুস্তক রচনা করেন। যশোহর রাজ্যের চাঁদকানে ফাদার ডমিঙ্গো ডি'ক্রুজ আরও একটি ক্যাটেকিজম বই রচনা করে তা চলিত বাংলায় অনুবাদ করেন।

১৬৮২ খ্রিঃ ফাদার মার্কোস আন্তনিও সনতুচ্চি, ফাদার ইগ্নেসিউস গমেজ এবং ফাদার মানুয়েল সয়রবা – এই তিনজন একত্রে বাংলার শব্দ তালিকা, ব্যাকরণ, খ্রিস্টীয় প্রার্থনামালা, খ্রিস্টধর্মের মূল শিক্ষা বাংলায় রচনা করেন।[৩৫]

১৭১২-১৪ খ্রিঃ ফাদার আন্তনিও ক্লদিউস বার্বিয়ে বাংলায় একটি ক্যাটেকিজম রচনা করেন। ফাদার মানুয়েল দ্যা আসুম্পসাঁও রচনা করেন "কৃপা শাস্ত্রের অর্থভেদ" নামে খ্রিস্টধর্মতত্ত্ব পুস্তক। রোমান হরফে মুদ্রিত হলেও বাংলা ভাষার এটিই অন্যতম মুদ্রিত পুস্তক।[৩৬] এটি ১৭৪৩ খ্রিঃ পর্তুগালের লিসবন থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এছাড়াও "বাংলা ব্যাকরণ ও বাংলা পর্তুগীজ ও পর্তুগীজ বাংলা" (Vocabulariem Idioma Bengalla e Portuguez) শব্দ কোষটির অবদান রয়েছে। লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত এই শব্দকোষটির পাণ্ডুলিপি গবেষক ও ভাষাতত্ত্ববিদগণ বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এটা ফাদার মানুয়েলের রচনা নয়। এটি রচনা করেছেন পর্তুগীজ ভাষায় সুপণ্ডিত, সংবাদ গ্রন্থের রচয়িতা ভুষণার রাজপুত্র

দোম আন্তনিও। তিনি ছিলেন খ্রিস্টধর্মশাস্ত্রবিদ, একজন সার্থক প্রচারক।[৩৭] তিনি ছিলেন সে যুগের আলোচিত ব্যক্তিত্ব।

রাজনৈতিক কারণে বঙ্গদেশের খ্রিস্টীয় মিশনগুলি যখন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থাকে তখন প্রটেস্টান্ট খ্রিস্টমণ্ডলী নতুন আশা ও উদ্যম নিয়ে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কাথলিক মণ্ডলী ও প্রটেস্টান্ট মণ্ডলী মতের দিক দিয়ে আলাদা হলেও কর্মক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল অভিন্ন।

ঊনবিংশ শতাব্দিতে এদেশে শিক্ষার মান উন্নত ছিল না। তবে বঙ্গদেশে শিক্ষা ব্যবস্থা গতানুগতিকভাবেই চলতো। মিশনারীগণ ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার পর শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়।[৩৮] এ সময়ে প্রচারকাজের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হতো। এগুলো হলো :

- যেসব স্থানে তাঁরা বাস করতেন তার নিকবর্তী গ্রাম, হাট, বাজার, নদীতীরে বা খেয়াঘাটে যেখানে লোকসমাগম হতো সেখানেই তাঁরা প্রচার করতেন।
- বছরে দু'এক বার তাঁরা দূর-দূরান্তের গ্রামাঞ্চলে গিয়ে প্রচার করতেন।
- হিন্দুদের পূজা-পার্বণ, ধর্মীয় উৎসব এবং ধর্মমেলাতে, বৃহৎ সমাবেশে তাঁরা প্রচার কার্য চালাতেন।
- জনগণের মাঝে তাঁরা মথি লিখিত সু-সমাচারটি বাংলায় অনূদিত পুস্তিকা আকারে বিতরণ করতেন।
- দু'একজন ধর্মান্তরিত বাঙ্গালী খ্রিস্টানকে নিয়ে উল্লেখিত স্থানে উপস্থিত হয়ে তাঁরা বাংলায় গান গাইতেন।

১৮১৭ খ্রিঃ কলকাতায় হিন্দু কলেজ (বর্তমানে প্রেসিডেন্সী কলেজ) প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল নিরপেক্ষ।[৩৯] ১৮২৬ খ্রিঃ হেনরী লুই ভিভিয়ান ডি'রোজারিও উচ্চতর শ্রেণির শিক্ষক হিসাবে প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। তিনি ছিলেন তেজস্বী, স্বাধীন চিন্তাবিদ, সুপণ্ডিত ও

অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন ইন্দো-পর্তুগীজ এক তরুণ। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়ে ওঠেন। সর্বোপরি রাজা রামমোহন রায়ের সহযোগীতায় ১৮৩০ খ্রিঃ রেভারেণ্ড আলেকজাণ্ডার ডাফ কলকাতায় "জেনারেল এসেম্বলী ইনস্টিটিউশন" নামক একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রটেস্টান্ট মিশনারীগণ নদীয়া জেলাতেই শিক্ষাক্ষেত্রে বেশি উন্নতি লাভ করেন।[৪০] নিম্নে তার একটি চিত্র দেয়া হলো :

স্থান	বিদ্যালয়সমূহ	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্র/ছাত্রী
কৃষ্ণনগর	প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫টি	১৯৮ জন ছাত্র
১৮৪২ খ্রিঃ	ইংরেজি বিদ্যালয়	১টি	১৭২ জন ছাত্র
১৮৪২ খ্রিঃ	বালিকা বিদ্যালয়	১টি	১১২ জন ছাত্র
চাপড়া	প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫টি	৪৮ জন ছাত্র ছাত্রী
	বালিকা বিদ্যালয়	১টি	২১০ জন ছাত্র ছাত্রী
বল্লভপুর	প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪টি	৬৯ জন ছাত্র ছাত্রী
	বালিকা বিদ্যালয়	১টি	৪০ জন ছাত্র ছাত্রী
রতনপুর	প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭টি	৬৯ ছাত্র ছাত্রী
	বালিকা বিদ্যালয়	১টি	২০০ জন ছাত্র
শোলো	প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫টি	৭৬ জন ছাত্রী
	বালিকা বিদ্যালয়	১টি	৩৭০ ছাত্র
কার্পাসডাঙ্গা	প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫টি	৬৮ ছাত্রী
	বালিকা বিদ্যালয়	১টি	

সূত্রঃ সরকার, লুইস প্রভাত, "বঙ্গদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিষ্টিয় সম্প্রদায়"

মিশনারীগণ তাদের ঘোষিত লক্ষ্য অনুযায়ী নদীয়ায় খ্রিস্টান সমাজকে সব দিক দিয়ে উন্নত করার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, তা হলো :

অর্থ সাহায্য দিয়ে সমাজকে স্বনির্ভর করতে প্রচেষ্টা চালানো, বিনামূল্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, উচ্চশিক্ষার বিস্তারের জন্য সেন্ট জনস্ স্কুল ও সেন্ট পল্স স্কুলকে হাইস্কুলে উন্নত করা, স্কুল ও কলেজে সুযোগ্য শিক্ষক নিয়োগের জন্য স্থাপিত হয় টিচারস্ ট্রেনিং স্কুল, মেয়েদের জন্য নার্সেস ট্রেনিং স্কুল, ২টি অধুনালুপ্ত সেবা প্রতিষ্ঠান "আশা বাড়ি" (House of Hope) এবং দয়াবাড়ি (House of Mercy) প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪১]

মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলিকে ৩ ভাগে ভাগ করা হয় তা হলো:

১। ইউরোপীয়ান ছেলেমেয়েদের জন্য বোর্ডিং স্কুল।

২। ভারতীয় খ্রিস্টান ছেলেমেয়েদের জন্য বোর্ডিং স্কুল।

৩। রোমান কাথলিক ছেলেমেয়েদের জন্য বোর্ডিং স্কুল।

১৮৩৩ খ্রিঃ কলকাতার বাইরে ৫৮টি মিশন স্কুল, চুচুড়াঁয় ৬টি, শ্রীরামপুরে ১টি বোর্ডিং স্কুল, কালনা ও কাটেরাতে ১টি করে কেন্দ্রিয় স্কুল, কলকাতা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে ৪৫টি মিশন স্কুল ছিল। এছাড়াও বালিকাদের জন্য কলকাতার বাইরে সন্নিহিত অঞ্চলে ৯টি বালিকা বিদ্যালয় ছিল।

ইউরোপীয় ছেলেমেয়েদের শিক্ষার মান ছিল খুবই উন্নত। এখানে অন্যান্য বিষয়ের সাথে ল্যাটিন ও গ্রীকভাষা শিক্ষা দেওয়া হতো। অন্যান্য স্কুলগুলিতে পাঠ্যবিষয় ছিল ইংরেজি, পার্সী, বাংলা, খ্রিস্টধর্মের মূলনীতি, খ্রিস্টিয় ধর্মতত্ত্বের প্রাথমিক জ্ঞান, অংক, ইতিহাস, ভূগোল, এবং প্রাথমিক জ্যোতির্বিদ্যা।

১৮১৮ খ্রিঃ শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যাপ্টিস্ট মিশনারীগণ শ্রীরামপুরে একটি কলেজ স্থাপন করেন। এখানে পালি ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা ও চর্চার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ছাত্রদেরকে মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়।[৪২] তাদেরকে অংক, দর্শনশাস্ত্র, রসায়ন ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাসও পড়তে হতো। ভারতীয় ছাত্রদেরকে সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজি, বিভিন্ন ধর্মমত,

চরিত্রগঠন, জ্যোতির্বিদ্যা, সাধারণ ইতিহাস ও ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাগ্রহণ করতে হতো। ১৮২০ খ্রিঃ হাওড়ার শিবপুরে বিশপস্ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি মিশনারীদের স্থাপিত দ্বিতীয় কলেজ।[৪৩] এখানকার পাঠ্যক্রমে খ্রিস্টধর্মতত্ত্ব এবং খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাস প্রাধান্য পায়। এখানেও হিব্রু, গ্রীক, ল্যাটিন ভাষা, প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস, দর্শনশাস্ত্র, অংক পাঠ্যবিষয় ছিল। ১৮৩০ খ্রিঃ রেভাঃ আলেকজাণ্ডার ডাফ কলকাতার জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন যার ১৮৪০ খ্রিঃ এ নামকরণ করা হয় স্কটিশ চার্চ কলেজ। কলেজটিকে ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়। এই কলেজের পাঠ্যক্রমে ছিল ইংরেজি সাহিত্য ও ব্যাকরণ, বীজগণিত ও পাটিগণিত, ভূগোল, রাজনীতি, পদার্থবিদ্যা, প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস, ইংরেজি ও বাংলা রচনা ও অনুবাদ, বাইবেল ও খ্রিস্টধর্মের সংক্ষিপ্ত সার। এই তিনটি কলেজের মধ্যে শ্রীরামপুর কলেজ ও স্কটিশ চার্চ কলেজ ভারতের ভবিষ্যৎ শিক্ষানীতির নির্ধারক হয়ে ওঠে।[৪৪]

বাংলা ভাষার অবদান : বাংলা গদ্যের সুগঠনে ব্যাপ্টিস্ট মিশনারী রেভাঃ উইলিয়াম কেরী ও জসুয়া মার্শম্যানের অবদান উল্লেখযোগ্য। দু'জনেই প্রথমে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন সংস্কৃত ভাষায়। এর ফলে বাংলা ভাষায় দক্ষতা অর্জন করা তাদের পক্ষে সহজ হয়। ১৮০১ খ্রিঃ কেরী ও তার সহযোগীদের চেষ্টায় শ্রীরামপুর থেকে নিউ টেস্টামেন্টের বাংলা অনুবাদ বাংলা হরফেই মুদ্রিত হয়। এ উপলক্ষে এখানে ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮০০ খ্রিঃ ৪ঠা মে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কেরি ১৮০১ খ্রিঃ সংস্কৃত ও বাংলার শিক্ষক নিযুক্ত হন এই প্রতিষ্ঠানে। তিনি এ বিভাগের পাঠ্য তালিকা প্রস্তুত করতে গিয়ে বাংলা গদ্য পুস্তকের অভাব অনুভব করেন। তিনি একদল শিক্ষক রচয়িতাকে খুঁজে বের করেন। নতুন গদ্যের ভাষা যেন শুধু বোধগম্য না হয়, বাংলা ভাষার গঠনরীতিসম্মত হয় সেদিকে ছিল সজাগ ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি। ১৮০১ খ্রিঃ বাংলা ফ্রেজ ও ইডিয়মের বৈচিত্র্যপূর্ণ "কথোপকথন" প্রকাশিত হয়। একই বছরে কেরী ও তাঁর সহকর্মী মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারএর সহযোগীতায় বাংলা ব্যাকরণ রচনা প্রকাশ করেন।[৪৫]

১৮০০-১৮০৯ খ্রিঃ মধ্যে তিনি সমগ্র বাইবেলের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত করেন। ১৮০২ খ্রিঃ কেরির সম্পাদনায় কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারতের প্রথম মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৮১২ খ্রিঃ ১৫০টি গল্পের সমষ্টি "ইতিহাস মালা" প্রকাশিত হয়। ১৮১৫-১৮২৫ খ্রিঃ বাংলা

থেকে ইংরেজি অভিধান সংকলিত হয়। ১৮১৫ খ্রিঃ বাংলা থেকে ইংরেজি অভিধানের প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এভাবে অনুবাদ, সংকলন ও সম্পাদনার মাধ্যমে কেরী বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সেবা করে গেছেন। বাংলা ভাষার শিক্ষার ক্ষেত্র প্রসারিত করতে গিয়ে তিনি গঠনমূলক কাজও করেছেন। বিদেশী[৪৬] হয়েও বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির জন্য নিবেদিতপ্রাণ নিষ্ঠা প্রদর্শনের জন্য বাঙালী জাতি চিরকাল তার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে।

১৮৩৪ খ্রিঃ কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৫ খ্রিঃ সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতার অনুমোদন হয় ও জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন হয়।[৪৭] তখন ভারতে ৩ ধরনের বিদ্যালয়ের উদ্ভব হয়। তা হলো ঃ (১) মাতৃভাষার মাধ্যমে বিদ্যালয়, (২) প্রটেস্টান্ট মিশনারী কর্তৃক পরিচালিত ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় এবং (৩) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত সরকারী বিদ্যালয়। তখন গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিকএর আমলে সরকার স্থির করেন যে, ধর্মীয় ব্যাপারে নিরপেক্ষ থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে। সুতরাং ফাদার সেন্ট লেজের কাথলিক ছেলেদের ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলটিকে সুগঠিত করতে প্রয়াসী হন।

১৮৩৬ খ্রিঃ প্রটেস্টান্ট মণ্ডলীর বিশপগণ কলকাতায় La-martiniere নামক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরেজির মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাদানের সঙ্গে খ্রিস্টধর্ম শিক্ষাদান করা ছিল তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য।[৪৮]

১৮৪১ খ্রিঃ ফাদার গোয়ারার (Goirar) চট্টগ্রামে ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বিশপ লুইতাবেদ দ্বিতীয় ভিকার অ্যাপোস্টলিকএর প্রচেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষকতায় বঙ্গদেশের প্রথম কাথলিক পত্রিকা "বেঙ্গল কাথলিক এক্সপজিটর" প্রকাশিত হয়।[৪৯]

বিশপ কেরু তার সন্নিহিত অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের জন্য ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এছাড়াও ডিসপেনসারী ও অনাথদের জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৪৩ খ্রিঃ ফাদার গোয়ারার বরিশালে স্কুল নির্মাণ করেন। ১৮৪৬ খ্রিঃ লরেটো সিস্টারগণ চট্টগ্রামে "বেথলেহেম কনভেন্ট" ও ঢাকায় "নাজারেথ কনভেন্ট" স্থাপন করেন। প্রবল আর্থিক অনটন থাকা সত্ত্বেও সিস্টারগণ শিশুদের শিক্ষাদান কাজে রত ছিলেন।

পূর্ব থেকেই মধ্যবঙ্গের জেলাগুলিতে প্রটেস্টান্ট মিশনারীগণ ধর্মপ্রচারে রত ছিলেন। তারা বিভিন্ন স্থানে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা দিতে থাকেন। এ ছাড়া তারা হাসপাতাল স্থাপন করে জনসাধারণের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

ফাদার বকাচ্চি (Boccaci) বহুরমপুরে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। যার ছাত্র সংখ্যা ছিল ১২০ জন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, শিক্ষা ছাড়া কাথলিকদের উন্নত করা সম্ভব নয়।[৫০]

ফাদার লুইজি লিমানা কৃষ্ণনগরে একটি আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৫৬ খ্রিঃ কাথলিক সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি অনাথাশ্রম নির্মাণ করেন। প্রথমে তিনি ৫জন ছাত্র নিয়ে শিক্ষা দিতে শুরু করেন। তিনি নিজেই ধর্মশিক্ষা দিতেন। ক্রমে ক্রমে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে স্কুলের সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। পরবর্তীতে লরেটো সিস্টারদের হাতে তিনি স্কুলটি পরিচালনার দায়িত্ব ছেড়ে দেন। ফাদার লিমানা কৃষ্ণনগরের বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান ও পরিচালনার দায়িত্ব দেন সিস্টারস্ অফ চ্যারিটির সিস্টারদের হাতে। সিস্টারগণ শিক্ষাদান ছাড়াও ধর্মশিক্ষা ও চিকিৎসা দিতেন।

১৯৬৬ খ্রিঃ মহামারী ও দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষকে সাহায্য করার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন। যারা মহামারী থেকে রক্ষা পেয়েছিল তাদের মেয়েদের জন্য তিনি স্কুল খোলেন। সেখানে তিনি আদর্শ সহধর্মিণী ও জননী হওয়ার জন্য গৃহস্থালী কাজের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতেন।

১৮৬৬ খ্রিঃ ফাদার মারিয়েত্তি ছেলেদের জন্য যশোহরে একটি স্কুল শুরু করেন। ফাদারদের উৎসাহে মনমোহন ঘোষ "যশোহরের কাথলিক মণ্ডলীর ইতিহাস" নামক বাংলা ভাষায় ২৭ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা রচনা করেন। এটিই বঙ্গদেশে কাথলিক মণ্ডলীর ইতিহাসের প্রথম মৌলিক রচনা।[৫১] মিলানের সংগ্রহশালায় এর কপি সংরক্ষিত আছে।

১৮৬৩ খ্রিঃ ফাদার আরো একটি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে তাকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নত করে জনপ্রিয় করে তোলেন।

১৮৬০ খ্রিঃ চ্যারিটি সম্প্রদায়ের সিস্টারগণ মেয়েদের জন্য আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রথমে ৩০জন ছাত্রী নিয়ে তারা কাজ শুরু করেন। এ ছাড়াও তারা বয়স্কা মহিলাদেরকে ধর্ম ও নীতি শিক্ষাদানের উপযুক্ত করার জন্য বাংলা ভাষা শিক্ষা দিতেন।

ফাদার মারিয়েত্তি পার্বত্য অঞ্চলে দার্জিলিংএর কাছে একটি স্বাস্থ্য নিবাস ও বৃদ্ধাশ্রম নির্মাণ করেন।

১৮৬৬-৬৭ খ্রিঃ বালেশ্বরে দুর্ভিক্ষের সময় ফাদার সাপাট অনাথ শিশুদের জন্য অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। পরিচালনার দায়িত্ব নেন ক্রুশভক্ত কন্যা সংঘের সিষ্টারগণ।

১৮৭৪ খ্রিঃ ফাদার গকিলেত ২৪ পরগনায় মাত্র ১ জন ছাত্র নিয়ে বিদ্যালয় আরম্ভ করেন। কিছু দিনের মধ্যে ছাত্রসংখ্যা বেড়ে হলো ১৪৪ জন ।

১৮৭৭ খ্রিঃ সেপ্টেম্বর মাসে ফাদার হেনরী ১২ জন ছাত্র নিয়ে রাঘবপুর একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় শুরু করেন। এটি রাঘবপুরের প্রথম বিদ্যালয় । ফাদার ছিলেন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম পুরোহিত। এদিকে রাঁচীতে অনেকগুলো ছোট বড় প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয় গড়ে উঠল।

১৮৮৫ খ্রিঃ ফাদার কনস্টান্ট লিভিন্স ছোট নাগপুরে আদিবাসী ছেলেমেয়েদের মাঝে শিক্ষার আলো বিস্তার করতে প্রয়াসী হন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, এরা শিক্ষিত না হলে নিজেদের অধিকার রক্ষা করতে পারবে না।[৫২] তিনি এলাকায় ১০০টি স্কুল স্থাপন করেন। কয়েক বছরের মধ্যে ২০০ জন আদিবাসী শিক্ষক ও ক্যাটেকিষ্ট তৈরি হয়ে গেল। এদের হাতেই প্রাথমিক শিক্ষাদানের কাজ ন্যস্ত করা হলো। আদিবাসীরা লক্ষ্য করলো যে, মানবিকতা, ন্যায়বিচার ও মানবীয় শ্রম খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থের লিখিত নির্দেশই হয়ে থাকে না, বরং সেটা তাদের নিজেদের জীবনের বাস্তবতা হয়ে এক নতুন জগতের সন্ধান দেয়।[৫৩] ১৮৯৮ খ্রিঃ তৈরি হলো সেন্ট পলস মিডল ভারনাকুলার স্কুল।

ফাদার নর্কাট ছিলেন একজন লেখক ও কবি। তার লেখার মধ্যে ‘দলিতদের মুক্তি’ ও ‘ওঠো, জাগো’ উল্লেখযোগ্য।

উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান[৫৪]

সেন্ট জেভিয়ার্স : ১৮৩৪ খ্রিঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর কয়েক বছর পর সেন্ট জনস স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে তা বন্ধ হয়ে যায়। পরে ১৮৬০ খ্রিঃ তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে এখানে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

লরেটো হাউজ :১৮৪২ খ্রিঃ কলকাতায় মেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠা স্থাপন করে। ১৮৪৭ খ্রিঃ ইন্টালীতে স্থানান্তর করা হয়। পরবর্তীতে শিয়ালদহ, বৌবাজার ও হাওড়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়।

ফাদার ব্রাইন সুলেমান যখন কলকাতার আর্চবিশপ হলেন তখন তিনি ছোট নাগপুর মিশনে প্রাইমারী স্কুল, মধ্য ইংরেজি স্কুল ও হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করে আদিবাসীদের উন্নতির সোপান তৈরি করেন। তিনি কলকাতার Light of the East (প্রাচ্যের জ্যোতি) নামক ভারত তত্ত্বের পত্রিকা প্রকাশ করেন। ফাদার তাভেজ্জা ভবরপাড়া মিশনে একজন ব্রাহ্মণ পল্লী কবিকে দিয়ে যীশুর জীবন কাহিনী ছন্দের আকারে রচনা করিয়ে নেন।

তারপর পালাকীর্তনিয়া ও তার দলকে নামমাত্র পারিশ্রমিক দিয়ে গ্রামে গ্রামে খ্রিস্টের জীবনী প্রচার করতে যান। পরবর্তীতে তিনি ভাষার উপর পারদর্শী হয়ে বাইবেলের মঙ্গলসমাচার (Gospel) এর বাংলা অনুবাদ করেন ও মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন। পরে তারা যীশুর জীবনের ঘটনাবলী ও সাধুসাধ্বীদের জীবনী অবলম্বনে যাত্রা ও পালা গান রচনা করে বিভিন্ন স্থানে মঞ্চস্থ করে প্রচার কাজে লিপ্ত থাকেন।

১৯২২ খ্রিঃ পদ্মা নদীর উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলিতে ৩১টি স্কুল নির্মিত হয়। মেয়েদের সাধারণ শিক্ষা ও ধর্মশিক্ষার জন্য সিস্টারস অব চ্যারিটির সিষ্টারগণ ধানজুরিতে একটি কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ফাদার পদেরজায় দেবীপুরে একটি স্কুল স্থাপন করেন। পরবর্তীতে স্কুলটিকে মধ্যবাংলা থেকে মধ্যইংরেজি স্কুলে পরিণত করা হয়। ফাদার কস্তার মনে করতেন উপযুক্ত শিক্ষা না পেলে কোন

জাতিই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। আর এ শিক্ষা শৈশবকাল থেকেই আরম্ভ হওয়া উচিত।[৫৫] তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়টিকে জুনিয়র হাইস্কুল থেকে পৃথক করেন।

১৯৫৪ খ্রিঃ ৬ষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত জুনিয়র হাইস্কুলের সরকারী অনুমোদন পায়। তখন ছাত্র সংখ্যা ছিল ৫২০ জন। তার মধ্যে ৩২০ জন ছিল ছাত্র ও ২০০ জন ছিল ছাত্রী।

১৮৯৩ খ্রিঃ মোড়াপাই মিশনের শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে সেন্ট প্যাট্রিক প্রাইমারী স্কুলটি স্থাপিত হয়। পরে তা নিম্নমাধ্যমিক স্কুলে পরিণত হয়।

১৯০৮ খ্রিঃ লরেটো সিস্টারদের ও সাধ্বী আন্না সমাজের সিস্টারদের পরিচালনায় মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। আর মহিলাদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে শিল্পবিদ্যালয় তৈরি হয়। ১৯৬১ খ্রিঃ কার্মেল সম্প্রদায়ের সিস্টারগণ খড়গপুরে একটি কনভেন্টস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং একটি ইংরেজি মাধ্যম প্রাইমারী স্কুল শুরু করেন। এখানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১৮০ জন। কেজি থ্রি-তে ছিল ৩০ জন। ফাদার আর্নেস্ট দরিদ্র ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের জন্য "নির্মল হৃদয় আশ্রম" প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাদেরকে সাধারণ শিক্ষা ও ধর্মশিক্ষা দানের ব্যবস্থা করেন। ১৯৫৭ খ্রিঃ আসানসোলে গড়ে ওঠে নতুন সেন্ট যোসেফস স্কুল ও বোর্ডিং এবং মেয়েদের জন্য সাধ্বী মারীয়া গরেত্তি স্কুল। পরবর্তীতে তা হাইস্কুলে উন্নীত হয়। ফাদার মাইকেল ওরেরি নেপালীদের মধ্যে কাজ শুরু করেন। তিনি কার্শিয়াংএ সেন্ট আলফনসাস বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এছাড়াও তিনি এখানে কারিগরি বিভাগ খোলেন। এখানে ছেলেদের কাঠের কাজ ও চর্ম শিল্পের ট্রেনিং দেওয়া হয়। গয়াগঙ্গায় ফাদার আণ্ডারসন প্রাথমিক স্কুলকে মধ্যস্কুল ও পরে হাইস্কুলে পরিণত করা হয়। এখানে ছাত্র সংখ্যা ছিল ২০০ জন।

মিশনারীজ অফ চ্যারিটি

বিদ্যালয়ে পড়ার সময় থেকেই মাদার তেরেজা কলকাতায় যেজুইট ফাদারদের কাজ কর্মের খবরাখবর রাখতেন। সবকিছু জানার পর তাঁর মধ্যে সন্ন্যাসিনী হওয়ার ইচ্ছা জাগে। তিনি লরেটো সিস্টার সংঘে যোগ দেন লরেটো কনভেন্টে। তিনি ১৯৩১ খ্রিঃ প্রথম ব্রত গ্রহণ করে তেরেজা নাম ধারণ করেন ও এন্টালীর সেন্ট মেরীস হাইস্কুলে শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন। ১৯৪৭ খ্রিঃ

বাৎসরিক নির্জনধ্যানের জন্য দার্জিলিং যাবার পথে তিনি যীশুর বিশেষ আহ্বান শুনতে পেলেন। দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতম মানুষের পাশে কাজ করার জন্য তিনি পাটনায় গিয়ে রোগীদের সেবা ও চিকিৎসার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ১৯৪৮ খ্রিঃ কলকাতায় মতিঝিল বস্তিতে তার দয়া ও প্রেমের কাজ শুরু করেন।[৫৬] তখন থেকেই মিশনারীজ অফ চ্যারিটির সুবৃহৎ বৃক্ষের বীজ অঙ্কুরিত হয়। এরপর বিস্তার হতে থাকে এর অনেক শাখা-প্রশাখা। ১৯৫৪ খ্রিঃ কালীঘাটে রাস্তায় পড়ে-থাকা মুমূর্ষু রোগীদের জন্য খোলা হয় "নির্মল হৃদয় আশ্রম"। ১৯৫৫ খ্রিঃ পরিত্যক্ত ও অনাথ শিশুদের জন্য তৈরি হলো "শিশুভবন"। দেশ বিদেশে খোলা হলো নতুন নতুন বুনিয়াদ। হাজার হাজার দারিদ্র মানুষ ও অনাথ শিশু মিশনারীজ অব্ চ্যারিটি সিস্টারদের আশ্রয় নিতে লাগলো। আজও অবধি তারা নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছেন।

ডনবস্কোর সালেসীয়ানদের আগমন

ফাদার জন বস্কো ডন বস্কো নামেই গোটা বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেন। তার জীবনের লক্ষ্য ছিল দুঃখকষ্ট, অভাব-অনটনের মধ্যে নিমজ্জিত কিশোর বয়সী যুবকদেরকে বিপথগামী হওয়ার বিপদ থেকে রক্ষা করা। তিনি সমাজের নিঃস্ব, দরিদ্র ও অবহেলিত কিশোরদের স্বনির্ভর করে তাদেরকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য প্রভিজ্ঞা করেছিলেন। তিনি প্রথমে স্থানীয়ভাবে গির্জার কাছেই গড়ে তোলেন সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কারিগরি কর্মশালা। তিনি নিজেই তাদেরকে কর্মশালার কাজ শিখাতেন। রাতে ধর্ম ও নীতি শিক্ষা দিতেন। এভাবে ধর্ম ও কর্মের সমন্বয় হয়ে ওঠে তাঁর শিক্ষার মর্মবাণী। তিনি ছিলেন দক্ষ কর্মী, শিল্পী ও বিশিষ্ট চিন্তাবিদ। তিনি মানুষের নৈতিক চরিত্রের উন্নতির জন্য বহু পুস্তক রচনা করেছেন। সালেসীয় ফাদার ও ব্রাদারগণ তাঁর আদর্শ ও শিক্ষানীতিকে বিস্তার ও ফলপ্রসূ করার জন্য পৃথিবীর সব দেশেই গড়ে তুলেছেন সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কারিগরি বিদ্যালয়, বোর্ডিং স্কুল, অনাথাশ্রম ও চরিত্রগঠনের উপযোগী অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। ১৯৩৪ খ্রিঃ ডন বস্কো স্কুলের সূচনা হয়।

মনসিনিয়র ইম্মানুয়েল বার্স কৃষ্ণনগরে অরাটরী ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে ছেলেদের নীতিশিক্ষা ও খেলাধুলা শেখানো হয়।[৫৭] ডন বস্কো স্কুলে ১টি কারিগরি বিভাগ চালু করে সেখানে তিনি ছয়টি

নতুন মেশিন বসিয়ে ছাত্রদেরকে কাঠের ও লোহার কাজ শেখাতে শুরু করেন। বিদ্যুৎ না থাকার কারণে তিনি ১২ অশ্বশক্তি সম্পন্ন মোটর ও ডায়নামোর ব্যবস্থা করেন। কৃষ্ণনগরের ৪র্থ বিশপ লুইস এ. আর মরো শিক্ষাকে তার পালকীয় পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার দান করেন। তিনি মনে করতেন, শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি বা সম্প্রদায় কোন উন্নতি হতে পারে না।[৫৮] তাই তিনি শিক্ষার বুনিয়াদ গঠনের কাজ শুরু করেন। তিনি বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে ধর্মীয় উপাসনা অনুষ্ঠানের পর ১০/১২ জন ছেলেকে তাদের মায়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে গাড়িতে তুলে স্কুলে নিয়ে আসতেন। তার মায়েরা বুকফাটা কান্নার মধ্যে বলতে থাকতো 'ছেলেধরা আমাদের সব ছেলেদের নিয়ে গেল'। মায়েরা তাদের ছেলেদের স্কুলে পাঠাতে চাইতো না বলে বিশপ এভাবেই তাঁর কাজ শুরু করেন। তখন সময়টা ছিল ১৯৪৪ খ্রিঃ। তিনি মাদার আনানশিয়াতার হাতে তুলে দিতেন শিশুদের। মাদার তাদেরকে রংএর খেলনা বিস্কুট দিয়ে ও লজেন্স দিয়ে ভুলিয়ে রাখতেন। এভাবে ফাদারের সংসার দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে থাকলো। বিশপ মহোদয় এই শিশু নিকেতনের নাম তুলে দিয়ে নতুন নাম দিলেন "জুনিয়র ডন বস্কো স্কুল"। গ্রাম হতে গ্রামান্তর থেকে আসা এসব কচিকাঁচাদের কলতানে মুখরিত হয়ে উঠতো এখানকার পরিবেশ। পড়াশুনার পাশাপাশি এদের ড্রিল ও খেলাধুলা শেখানো হতো। তাদের খাবার-দাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও প্রয়োজনীয় সব জিনিস দেওয়া হতো। মেধাবীদের হাইস্কুলে ও কলেজে ভর্তি করানো হতো ও বাকিদের ভর্তি করানো হতো টেকনিক্যালে স্কুলে। ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় বিশপ মরোর অনুরোধে কৃষ্ণনগরে প্রচুর ত্রাণসামগ্রী সরবরাহ করা হয়। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের কাথলিক উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করেন। ধর্মপল্লীর উন্নতির জন্য তিনি আমেরিকা থেকে ২টি জীপগাড়ী, একটি Willys Jeep stationwagon, একটি ট্রাক্টর, ৬টি অটোমেটিক লেদ মেশিন, একটি hammond organ,৭টি টেপ রেকর্ডার, ৩টি ফিল্ম প্রজেক্টর, ৩টি জেনারেটর, ৫০ বাক্স টিনজাত খাদ্য, দশ বাক্স শিশুদের বই, ২৪টি চুল কাটার যন্ত্র, ৩০ বাক্স ঔষধ ও ডাক্তারি যন্ত্রপাতি এবং আরও কত কি সংগ্রহ ও বিতরণ করেন।

তিনি ইংরেজিতে বহু ধর্মশিক্ষার বই রচনা করেন। বাংলা ভাষায় বইয়ের প্রকাশনা ও প্রেস সংক্রান্ত বিষয়ে কর্মশিক্ষা দিয়ে ছাপাখানার কাজে জীবিকা নির্বাহ করতে সাহায্য করতেন। এছাড়া তিনি শিশু-উদ্যান, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি কেন্দ্র, পাঠাগার নির্মাণ করেন। সিস্টারস্ অফ চ্যারিটির সিস্টারগণ

হলি ফ্যামিলি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও হলি ফ্যামিলি প্রাইমারী স্কুল পরিচালিত করেন। ১৯৬০ খ্রিঃ এটি সরকারী সহায়তার আওতায় আসে। এটি নদীয়ায় শ্রেষ্ঠ বালিকা বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। শিক্ষার পাশাপাশি মেয়েদের জন্য শিল্প বিদ্যালয় পরিচালনা করেন।[৫৯] ১৯৫৯ খ্রিঃ নগেন্দ্রপুরে সিস্টারস্ অফ মেরী ইম্মাকুলেট মন্তেসরি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে এটিকে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পরিণত করে তার নাম দেওয়া হয় "বিশপ মরো সেন্টার"। এখানে মেরী ইম্মাকুলেট হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয় যা বর্তমানে বেশ প্রশংসিত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান। ১৯৪০ খ্রিঃ ফাদার বিয়াঙ্কি ৪০ জন ছাত্র নিয়ে "সেন্ট যোসেফস" নামে মধ্য ইরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৪ খ্রিঃ স্কুলটি হাইস্কুল হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে। এখান থেকে পাস-করা ছাত্রদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেট দেওয়া হতো। মেরী ইম্মাকুলেট সিষ্টারগণ বহরমপুরে একটি ইংরেজি মাধ্যম হাইস্কুল, বাংলা মাধ্যম প্রাথমিক স্কুল তৈরি করেন।

"বঙ্গদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়" বইটিকে সম্পূর্ণ ইতিহাস বলা যায় না। এটিকে ইতিহাসের রূপরেখা বলে মনে করা হয়। কারণ সীমিত পরিসরে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। এক সময় সমগ্র বাংলাকে বঙ্গদেশ বলে অভিহিত করা হতো। বঙ্গদেশে মিশনারীগণ কিভাবে খ্রিস্টমণ্ডলী গঠন ও শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়েছেন তা উপলব্ধি করতে পেরেছি। এখানে দেখতে পাই তাদের কঠোর পরিশ্রম, আত্মত্যাগ, অধ্যবসায়, দয়া, নিবেদিতপ্রাণ, ধর্মপ্রাণ মহাপুরুষদের সহিষ্ণুতা, পরার্থপরতা ও আত্মোৎসর্গের কথা। যীশু খ্রিস্টের আদর্শ ও শিক্ষানুসারে মিশনারীগণ নিঃস্বার্থভাবে সেবা করে গেছেন। যা আজও অবধি চলছে।

<u>শিক্ষার পদ্ধতি/কৌশলসমূহ</u>

- লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করা।
- জনসমাবেশে গিয়ে প্রচার করা ।
- হাটবাজারে গিয়ে প্রচার করা ।
- ধর্মবিষয়ক প্রচার পুস্তিকা বিলি করে।

- গান গেয়ে।
- তারা যেখানে বাস করতেন সেই সব স্থানের নিকটবর্তী গ্রামে পরিদর্শনে গিয়ে।
- নদীর তীরে বা ঘাটে গিয়ে।
- বছরে একবার বা দু'বার দূরদূরান্তের গ্রামগুলোতে গিয়ে।
- পূজা-পার্বণ, ধর্মীয় উৎসব ও ধর্মীয় মেলায় সমাগত বৃহৎ জনসমাবেশে গিয়ে।
- সু-সমাচারের অংশবিশেষ বাংলায় অনূদিত পুস্তিকা আকারে বিতরণ ক'রে।
- শহরের এক প্রান্তে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে।
- পালাগান ও কীর্তনের মাধ্যমে।
- নাটিকা বা জীবন্তিকা উপস্থাপন ক'রে।
- কৌতুকাভিনয়ের মাধ্যমে।
- খেলাধুলার মাধ্যমে।
- বিভিন্ন জায়গায় পরিভ্রমণ ক'রে।
- কাঁধে কাপড়ের ব্যাগ ঝুলিয়ে পায়ে হেঁটে যাওয়া-আসার সময়।
- নীতিশিক্ষার মাধ্যমে।
- কারিগরি বহুমুখী শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে।
- তাঁরা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে শিক্ষা দিতেন।
- কিশোরদের জন্য অরাটরী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।
- অনাথ ও পরিত্যক্ত ছেলেদের জন্য বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে।

- রোগাক্রান্ত ও আর্তপীড়িতদের জন্য বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে।
- প্রচারের জন্য তাঁরা যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই উপাসনাগৃহ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন।
- তাদের শিক্ষার ভাষা ছিল সহজ-সরল।
- ১৯৫২ খ্রিঃ থেকে তাঁরা চলচ্চিত্র ও টেপরেকর্ডারের মাধ্যমে শিক্ষা দিতেন।

অন্তরায় ও বাধাসমূহ

- যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত ছিল না।
- উপযুক্ত বাসগৃহের অভাব ছিল।
- পরিবেশ ছিল অস্বাস্থ্যকর।
- প্রতিটি পদক্ষেপে পেতে হতো ঘৃণা, ঈর্ষা ও মিথ্যা অভিযোগ।
- নানা প্রকার দুর্গতি ও বিপত্তি দেখা দিতো।
- প্রতিকূল পরিস্থিতি বিরাজ করতো।
- ভ্রান্ত মতামতের কারণে বাধাগ্রস্ত হতেন।
- অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা ছিল।
- সামাজিক দিক দিয়ে ছিল দুর্বল ও অসহায়।
- বেশির ভাগ লোকজন ছিল অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন।
- নিঃস্ব-হতদরিদ্র।
- মিশনারীগণ বেশির ভাগ ছিল বিদেশী। তারা স্থানীয় ভাষায় ঠিকমতো কথাবার্তা বলতে না পারার কারণে তাদের স্নায়ুকে পীড়ন করতো।

- জায়গা-জমি ছিল সীমিত।
- বিভিন্ন রোগের প্রার্দুভাব (কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ডায়ারিয়া ইত্যাদি)
- সহযোগিতার অভাব।
- দূষিত পরিবেশ।
- বাসস্থানের অভাব ছিল; তাদেরকে খড়কুটা দিয়ে তৈরী কুঁড়ে ঘরে থাকতে হতো।
- কর্মএলাকাগুলো ছিল দুর্গম।
- বেশিরভাগ মানুষ ছিল নিরক্ষর, অত্যন্ত দরিদ্র ও সহায়সম্বলহীন।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ (যেমন খরা, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, দুর্ভিক্ষ) ইত্যাদি প্রায়ই লেগে থাকতো।
- **উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য**
- খ্রিস্টের বাণী প্রচার।
- খ্রিস্টমণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করা।
- শিক্ষা প্রদান ও বিস্তার করা।
- নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে প্রবুদ্ধ করা।
- গরীব-দুঃখী, অনাথ, দুর্বল ও অসুস্থদেরকে ভালোবাসার মাধ্যমে সেবা করা।
- ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন।
- একে অপরের সাথে সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া।
- সুকুমার বৃত্তির প্রসার।

ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ

- দেশাত্মবোধ ও স্বাধীনতা।
- ন্যায়পরায়ণতা ও পরিশ্রম।
- উদারতা ও সক্রিয়তা।
- দক্ষ শিল্পী ও কর্মঠ।
- অটুট ধর্মবিশ্বাস।
- আধ্যাত্মিক জীবন।
- সাহসী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।
- জীবনযাপন সাদাসিধে ও আদর্শ খ্রিস্টীয় জীবন।
- পারস্পরিক প্রেমের নীতিতে দৃঢ় বিশ্বাস।
- সহনশীলতা ও সহমর্মিতা।
- দায়িত্বশীল ও সুদক্ষ।
- সাহিত্যিক ও উচ্চশিক্ষিত।
- আদর্শ শিক্ষক ও প্রচারক।
- ধর্মানুরাগী ও দয়াশীল।
- সচ্চরিত্র ও আত্মত্যাগী।
- বিচক্ষণতা।
- চিন্তাবিদ, লেখক, অনুবাদক।

➢ জ্ঞানার্জনে উৎসাহী।

➢ কর্মোদ্যোগী ও আগ্রহী।

সার্থকতা : বিশ্বের প্রতিটি জাতির প্রতিটি মানুষের জীবন তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। সেই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও জাতিসত্তা বিশ্বের অমূল্য সম্পদ। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় মিশনারীগণ যে ধর্মীয় ভাবপ্রবাহের সৃষ্টি করেছেন সেই প্রবাহের স্রোতধারায় বিশ্বের প্রতিটি মানুষের আচার-আচরণ, জাতীয় ও ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রবাহিত হয়ে খ্রিস্টমণ্ডলীর অঙ্গনে প্রবেশ করেছে। এ প্রসঙ্গে খ্রিস্টমণ্ডলীকে একটি বটবৃক্ষের সাথে তুলনা করা যায়। তবে কিছু কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। অবশ্য তা বাহ্যিক আকৃতিগত নয় বরং অন্তর্নিহিত মৌল বিশ্বাসেই রয়েছে সেই সাদৃশ্য। মিশনারীগণ নানা ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করে, বৈরী ও প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা ক'রে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নানা বাধাবিপত্তি অতিক্রম ক'রে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হয়েছেন। এভাবে ক্রমে ক্রমে তারা বেগবতী নদীর আকার ধারণ করে প্রবল বন্যার মতো মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে নিত্য নতুন গতিতে প্রবাহিত হয়ে চলেছেন। তাদের নিজস্ব গতি প্রমাণ করেছে তাঁদের কাজের সার্থকতা।

 # হালদার, গৌরদাস, "শিক্ষা প্রসঙ্গে ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস"

ভারতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার পটভূমি (১৫০০-১৮১৩ খ্রিঃ) (Background of the Western Education of India)ঃ ভারতীয় শিক্ষার যে সর্বাধুনিক রূপ ও সমস্যার সঙ্গে আমরা পরিচিত তার সূত্রপাত ঘটেছিল ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে।

আদিপর্বে মিশনারী শিক্ষা প্রয়াস (১৫০০-১৭৫৭ খ্রিঃ) (Educational Activities of the Early Christian Missionary Period):সুলতানী আমলের অবক্ষয়ের যুগে পর্তুগীজ নাবিকগণ বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভারতে প্রবেশ করে। ইউরোপীয় প্রথা অনুসারে নাবিকদের জাহাজে মিশনারীগণ থাকতেন। বণিকদের ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিকতার মান বজায় রাখাই ছিল তাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। মিশনারীগণ এদেশে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টায় মনোযোগ দিতেন। তাদের প্রয়াস পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির পক্ষে ছিল অসামান্য অবদান। ইউরোপীয় খ্রিস্টান সম্প্রদায় প্রটেস্টান্ট ও রোমান কাথলিক – এই দুই সম্প্রদায়ের মিশনারীগণ একই উদ্দেশ্য নিয়ে

বিভক্ত হয়ে দেশে ও বিদেশে ধর্মীয় প্রভাব বিস্তার করে। ধর্মপ্রচার ও বিস্তার – এই দুটির মধ্যে ছিল অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। ধর্মের প্রতি অনুরাগকে স্থায়ী করার জন্য যেমন শিক্ষার প্রয়োজন, তেমনি শিক্ষার মাধ্যমে প্রচার করা ছিল সহজসাধ্য।

ধর্মপ্রচার ও শিক্ষা বিস্তার : শাসকদের ছত্রছায়ায় মিশনারীরা উপনিবেশের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। মিশনারীদের মধ্যে সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার ও রবার্ট ডি'নোবিলির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা ধর্মপ্রচার ও শিক্ষাবিস্তারে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আদিপর্বে মিশনারীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। যথা :

(১) প্রাথমিক ল্যাটিন স্কুল, (২) ভারতীয় অনাথ বালক-বালিকাদের জন্য প্রাথমিক স্কুল। এখানে কৃষি ও শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, (৩) উচ্চশিক্ষার জন্য যেজুইট কলেজ এবং (৪) ধর্মপ্রচারে শিক্ষার জন্য সেমিনারী – এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার বিষয় ছিল ল্যাটিন, ন্যায়শাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, পর্তুগীজ ব্যাকরণ, মিউজিক ইত্যাদি।

পর্তুগীজ মিশনারীদের অবদান

- কয়েকটি কলেজ শিক্ষাক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সুনাম অর্জন করেছিল।
- ভারতীয় বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে শিক্ষা ও ধর্মপ্রচার করে।
- গোয়াতে প্রথম ছাপাখানা (১৫৬৫ খ্রিঃ) প্রতিষ্ঠা করে।
- ইউরোপীয় বণিক ও মিশনারীদের ভারতীয় জনগণের সাথে ভাবের আদান-প্রদান ও বিনিময়ের মাধ্যমে।

প্রচার ও শিক্ষার পদ্ধতি

- মিশনারীগণ গ্রামে গ্রামে বাইবেল হাতে নিয়ে ঘুরতেন।
- ঘন্টা বাজিয়ে সকলকে একত্রিত করতেন।
- প্রয়োজনে তত্ত্বাবধায়ক (Overseer) নিয়োগ করতেন।
- গ্রামে গ্রামে তাঁরা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

পরবর্তীতে এদেশে বাণিজ্যের জন্য আসেন ওলন্দাজ, ফরাসী, দিনেমার মিশনারীগণ। পর্তুগীজদের মতো ফরাসীরাও তাদের কর্মকেন্দ্রগুলিতে সর্বস্তরের শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। তারা ফরাসী ভাষা ছাড়াও আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষা ও দেশীয় শিক্ষক নিয়োগের উপর গুরুত্ব দিতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পর্তুগীজ ও ফরাসী মিশনারীরা ছিলেন রোমান কাথলিক মতাবলম্বী।

আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে দিনেমার মিশনারীদের শিক্ষা প্রচেষ্টার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

জেগেনবল্গ (Ziegenbalg) দিনেমার মিশনারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। তিনি ১৭১৩ খ্রিঃ তামিল ভাষায় একটি ছাপাখানা, ১৭১৬ খ্রিঃ ত্রাঙ্কুবারে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১৭১৭ খ্রিঃ মাদ্রাজে দুটি পৃথক অবৈতনিক স্কুল স্থাপন করেন। এছাড়া একটি তামিল ব্যাকরণ ও তামিল ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন। কিয়াম্যান্ডার (kiemander) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় ফোর্ট সেন্ট ডেভিড স্কুল। এটি এ যুগের একটি বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তার কর্মদক্ষতায় খুশি হয়ে রবার্ট ক্লাইভ তাকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ করেন। তিনি তার বাকি জীবন বাংলাদেশের শিক্ষা প্রচেষ্টায় অতিবাহিত করেন।

মিশনারী শিক্ষার স্বরূপ: বিশালতা ও বিচিত্রতার বিচারে মিশনারী প্রচেষ্টায় পরিমাণগত গুরুত্ব না থাকলেও প্রকৃতি ও গুণগত গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। মিশনারীদের সমবেত প্রচেষ্টায় সে যুগে নানা ধরনের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। অবৈতনিক বিদ্যালয়, অনাথাশ্রম, শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়, ভার্নাকুলার স্কুল, মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয় ও ধর্মীয় মহাবিদ্যালয় এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টান্ত। তখন জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাই মিশনারী স্কুলে শিক্ষা লাভ করতে পারতো।

মিশনারীরা শিক্ষা বিস্তার ও ধর্মপ্রচারের মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার উপর গুরুত্ব আরোপ করতেন। নব প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানায় মাতৃভাষার উপর পুস্তক প্রকাশ করা হতো। প্রচারকে সহজসাধ্য করার জন্য বাইবেলকে আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রাথমিক স্তরে লিখন ও পঠন এবং গণিতের সঙ্গে বাইবেল ছিল অবশ্য পাঠ্যবিষয়।

ভারতীয়দের ইংরেজি শিক্ষার আগ্রহ লক্ষ্য করে মিশনারীরা অনেকগুলি ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে মিশনারীদের অবদান অনস্বীকার্য।

মিশনারীরা দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে (Indigenous System of Education) আধুনিক ভাবধারায় সংস্কার করার চেষ্টা করেছিলেন। যেমন :

- বিদ্যালয়ে আধুনিক সাজসরঞ্জাম ব্যবহার
- মুদ্রিত পুস্তক পাঠের ব্যবস্থা
- একাধিক শিক্ষক দ্বারা বিদ্যালয়ের পাঠদান পরিচালনা।
- ছাত্রদের শ্রেণিবিভাগ
- পঠনপাঠনের সময়নির্ঘন্ট
- রবিবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন নির্দিষ্ট করা।

লিখন, পঠন ও গণিতের সঙ্গে ইতিহাস, ভূগোল, সাধারণ বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিধি, বৃত্তিমূলক বিষয় পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ক'রে মিশনারীগণ শিক্ষার মানকে উন্নত করেন। এসব নতুন নতুন কর্মসূচীর দ্বারা তাঁরা শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রবর্তন ও নবজাগরণ (Foundation of Western Education and Renaissance)

ভবিষ্যৎ শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্তর ছিল ১৮১৩ খ্রিঃ সনদ আইনে। ১৮১৩-১৮৩৩ খ্রিঃ পর্যন্ত বেসরকারী ও মিশনারী প্রয়াস ছিল সতেজ। বেসরকারী উদ্যোগের মধ্যে ১৮১৩ খ্রিঃ সনদে শিক্ষাধারার ফলশ্রুতি ছিল ভারতব্যাপী মিশনারীদের শিক্ষা প্রচেষ্টা (Missionary Enterprises)। ভারতে ইতিপূর্বে আগত মিশনারীরা কর্মক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করেছিলেন এবং নতুন নতুন মিশনারী দল ভারতে প্রবেশ করেন। তাদের কর্মক্ষেত্রগুলি ছিল বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ।

বাংলা : শ্রীরামপুর মিশনারী ১৮১৫ খ্রিঃ মধ্যেই সরকারী নিষেধাজ্ঞা ও নানা গোলমাল থাকা সত্ত্বেও কলকাতা ও তার উপকণ্ঠে শ্রীরামপুর ত্রয়ী ২০টিরও বেশি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তারা বিভিন্ন ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। বাংলা ভাষায় সমাচার দর্পণ প্রকাশ করেন ১৮১৮ খ্রিঃ। ঐ বছরই তারা শ্রীরামপুর মিশনারী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

লণ্ডন মিশনারী: ১৮১৪-১৮১৮ খ্রিঃ মধ্যে এই মিশনারীগণ চুঁচূড়া ও তার আশেপাশে ৩৬টি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর ছাত্র সংখ্যা ছিল প্রায় ৩,০০০ এর মতো। শিক্ষকদের জন্য সরকারী বার্ষিক ১৮০০ টাকা মঞ্জুরী প্রাপ্তির ব্যবস্থা ছিল।

চার্চ মিশনারী সোসাইটি কলকাতাতে একটি Corresponding Committeeএর মাধ্যমে কর্মের সূচনা করে। এই সোসাইটির অর্থানুকূল্যে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট বর্ধমানে দুটি গ্রামীণ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তারা বর্ধমান ও তার চারপাশে ১০টি ভার্ণাকুলার স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এসব বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় ১০,০০০এর মতো। ১৮২০ খ্রিঃ "বিশপ কলেজ" প্রতিষ্ঠা করেন। এটি মিশনারীদের দ্বিতীয় কলেজ। আলেকজাণ্ডার ডাফ তখনকার প্রচলিত মিশনারী শিক্ষা প্রচেষ্টায় সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তাই তিনি পূর্ণাঙ্গ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা বাইবেলের সারমর্ম উপলব্ধি ও খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষাদান করাকেই শ্রেষ্ঠ উপায় হিসাবে নির্ধারণ করলেন। তাঁর চিন্তাধারা বাস্তবায়িত করার প্রয়াস পেলেন General Assembly's Institutionস্থাপনের মাধ্যমে। এটি এখন কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ। এখানে ইংরেজি ছিল শিক্ষার মাধ্যম এবং বাইবেলপাঠ ছিল আবশ্যিক। ডাফ এর শিক্ষানীতি সারা ভারতে মিশনারী আদর্শ হিসাবে গৃহীত হলো।

বোম্বাই : বাংলার মতো বোম্বাইএ চলছিল মিশনারী উদ্যোগ। এখানে কাজ শুরু করেন আমেরিকান মারাবী মিশন। তারা ১৮১৫ খ্রিঃ ছেলেদের জন্য ১টি ও ১৮২৪ খ্রিঃ মেয়েদের জন্য ১টি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। চার্চ মিশনারী সোসাইটি ১৮২০ খ্রিঃ শ্রেণিপাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও স্কুল স্থাপন করেন। ১৮২২ খ্রিঃ স্কটিশ চার্চ মিশন গ্রামে গ্রামে শিক্ষাকেন্দ্র প্রসারিত করে। ঐ বছরই ছেলেদের ও মেয়েদের জন্য ২টি স্কুল স্থাপন করেন। ছেলেদের স্কুলটি উইনস্‌ন কলেজ নামে পরিচিত। আইরিশ মিশনারীরা কয়েকটি ভার্নাকুলার স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

মাদ্রাজ :১৮১৭ খ্রিঃ Mr. Hough ৯টি স্কুল স্থাপন করে। এর ছাত্র সংখ্যা ছিল ২৮৩ জন। ১৮১৯ খ্রিঃ মাদ্রাজ টাউনে দুটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। যা আজ একটি রেপেট কলেজ (Raypet College) নামে খ্যাতি লাভ করেছে। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় চার্চ মিশনারী সোসাইটির দ্বারা পরিচালিত স্কুলের সংখ্যা ছিল ১০৭টি এবং তাদের ছাত্র সংখ্যা প্রায় ২২,৮৮২ জন।

উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যসমূহ

- ধর্ম প্রচার করা।
- খ্রিস্টমণ্ডলী গঠন করা।
- শিক্ষা বিস্তার করা ।
- কর্মক্ষেত্রকে প্রসারিত করা।
- মাতৃভাষায় পুস্তক প্রকাশ।
- নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা করা।
- স্কুলগুলির উন্নয়ন।
- পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশনা।
- দক্ষ স্কলার নির্বাচন করা।

বাধা বা অন্তরায়সমূহ

- সরকারী নিষেধাজ্ঞা
- স্থানীয় সমস্যা
- আর্থিক সমস্যা
- পৃষ্ঠপোষকতার অভাব
- সহযোগীতার অভাব
- শাসকগোষ্ঠীর অবহেলা
- অনাগ্রহ বা আগ্রহের অভাব

- পাঠ্যপুস্তকের অভাব

১৮৩৩এর সনদ নবীকরণ ও মিশনারী উদ্যোগ

এ সময়ে সারা পৃথিবীর মিশনারীদের জন্য ভারতের দ্বার উন্মুক্ত হলো। শিক্ষা উদ্যোগের ক্ষেত্রে সরকারী ও মিশনারী প্রয়াস প্রায় সমান হওয়ার ফলে ১৮৩৩ থেকে ১৮৫৪ খ্রিঃ মধ্যে ভারতে অনেকগুলি মিশনারী কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮৩৭ খ্রিঃ মাদ্রাজ খ্রিস্টান কলেজ, ১৮৪১ খ্রিঃ মসুলিপট্টমের নোবল কলেজ, ১৮৪৪ খ্রিঃ নাগপুরের বিশপ কলেজ, ১৮৪৬ খ্রিঃ নাগাপট্টমের সেন্ট যোসেফ কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল মিশনারী প্রচেষ্টার উল্লেখযোগ্য অবদান। কলেজ প্রতিষ্ঠা ছাড়াও মিশনারীরা দেশের সর্বত্র ইংরেজি শিক্ষার স্কুল স্থাপন করেন। তাই শিক্ষা প্রচেষ্টার এ যুগটি ছিল মিশনারী কর্মপ্রচেষ্টার স্বর্ণময় যুগ।

শিক্ষা উদ্যোগের বৈশিষ্ট্যসমুহ

- মিশনারী শিক্ষা উদ্যোগে দেশজ শিক্ষাধারা উপেক্ষিত হয়নি। ফলে মিশনারীদের দ্বারাই আঞ্চলিক ভাষার উন্নতি হয়েছিল।
- মিশনারী প্রচেষ্টা পূর্ণোদ্যমে ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদানে নিয়োজিত ছিল যা ধর্মপ্রচারে সহায়ক ছিল।
- ধর্মনিরপেক্ষতা ও উচ্চ শিক্ষায় সরকারী হস্তক্ষেপ ছিল মিশনারী নীতির পরিপন্থী।
- কর্মচারী ও মিশনারীদের মধ্যে সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা করা।
- শিক্ষা ছিল অবৈতনিক।
- সাধারণ মানুষের শিক্ষাও নৈতিক মান রক্ষা করতো। ফলে মিশনারীদের প্রচেষ্টা অনেক পরিমাণে সার্থক হয়েছে।

নারী শিক্ষা (১৮১৩-১৮৫৩, Female Education)

তৎকালীন সামাজিক, পারিবারিক ও অর্থনৈতিক কারণে মেয়েদের শিক্ষা ছিল অবহেলিত। আধুনিক যুগে নারী শিক্ষার শুরু ও সম্প্রসারণে মিশনারীরাই ছিলেন অগ্রদূত।

১৮১৮ খ্রিঃ দেশীয় মেয়েদের জন্য প্রথম স্কুল স্থাপিত হয় । ১৮১৮ খ্রিঃ কেরী আরও একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তখন কলকাতার বিভিন্ন স্থানে ১০টি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮২১ খ্রিঃ চার্চ মিশনারী সোসাইটির সাহায্যে মিস কুক কলকাতা ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রবল উদ্দীপনা নিয়ে কাজ শুরু করেন এবং প্রথম বছরে ৮টি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী দু'বছরে ১৪টি স্কুল স্থাপন করে কর্মদক্ষতার পরিচয় দেন। স্কুলের শিক্ষা ছিল অবৈতনিক। সাধারণ লেখাপড়া, গণিত, ভূগোল ও সূচীশিল্প ছিল পাঠ্যতালিকাভুক্ত। অধিকন্তু পরিধেয়, খাদ্য, বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ ও কৃতী ছাত্রীকে পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হতো। ১৮১৪ খ্রিঃ লেডি আমহার্স্ট এর পৃষ্ঠপোষকতায় 'Ladies Society for Native Female Education' নামে একটি সংস্থা নারী শিক্ষার উন্নয়নকল্পে গঠিত হয়েছিল। ১৮১৬খ্রিঃ স্থাপিত হলো সেন্ট্রাল গার্লস্ স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর। রাজা বৈদ্যনাথ রায় ৩০,০০০ টাকা দান করেন। স্কুলগুলিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

উত্তর ভারতে প্রতিষ্ঠিত মিশনারী স্কুলগুলি প্রধানত তিন শ্রেণীর : (১) দিবা স্কুল, (২) বোর্ডিং স্কুল এবং (৩) পারিবারিক স্কুল।

১৮২১ খ্রিঃ প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় মাদ্রাজে। ১৮৫০ খ্রিঃ মধ্যে অন্ততঃ ৭টি মহিলা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল মাদ্রাজে। বোম্বেতে ১৮১৪ খ্রিঃ প্রথম মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে আরও ১০টি স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮১৯-১৮৩০ খ্রিঃ মধ্যে স্কটিশ চার্চ সোসাইটির তত্ত্বাবধানে ৬টি মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। থান যেসিন এবং নাসিফে ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক পৃথক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু মেয়েদের জন্য পুনাতে ৫টি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে বাংলাদেশে উত্তর পাড়া, যশোহর সুখসাগর, বা পুনা আহমেদাবাদে অনেক মহিলা বিদ্যালয় গড়ে উঠে। ১৮৪৯ খ্রিঃ মিঃ বেথুএর উদ্যোগে কলকাতাতে বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং

স্কুলের সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলশ্রুতিতে দেশব্যাপী নারী শিক্ষা বিস্তারের প্রেরণা বৃদ্ধি পায়।

উদ্দেশ্যাবলী

- বাঙ্গালী নারীদের শিক্ষিত করা।
- মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা।
- যে কোন বয়সের নারীদের শিক্ষা দেয়া।

অন্তরায় বা বাধাসমূহ

- আর্থিক অসচ্ছলতা
- পারিবারিক কারণ
- সামাজিক কারণ
- অজ্ঞতা বা নিরক্ষরতা
- কুসংস্কার ও সেকেলে মনোভাব

মাতৃভাষার উন্নয়ন :(Growth of vernacular) আধ্যাত্মিক উন্নয়ন ও স্ব-স্ব ধর্ম প্রচার করাই ছিল মিশনারীদের উদ্দেশ্য। কিন্তু শিক্ষার বিস্তার ছাড়া ধর্মপ্রচার মোটেই সম্ভব না। তাই তারা আঞ্চলিক ভাষা শিক্ষা, বাইবেল অনুবাদ ও প্রচারের মাধ্যমে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্র রচনা করেন। ধর্মপ্রচারের সূত্র ধরেই বাংলা ভাষার উন্নয়ন পর্ব শুরু হয়। তাই দেশীয় ভাষার উন্নয়নে মিশনারীদের অবদান অনস্বীকার্য। ধর্ম ও শিক্ষা বিস্তার মিশনারীদের পারস্পরিক সহযোগিতা ছিল প্রেরণার উৎস। বিভিন্ন বাধা-নিষেধ থাকা সত্ত্বেও শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ পূর্ণোদ্যমে তাঁদের প্রচারকার্য পরিচালনা করেছেন। তার মধ্যে থেকে তিনজন অগ্রণী কর্মী হলেন : উইলিয়াম কেরী সুদক্ষ প্রচারক, মিঃ মার্শম্যান মুদ্রণ কার্যে পারদর্শী এবং মি. ওয়ার্ড শিক্ষকতায় দক্ষ। শিক্ষার ইতিহাসে এই তিনজন শ্রীরামপুরত্রয়ী নামে খ্যাত। এই তিন জনই ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে প্রথমে বাংলা ভাষা শিক্ষা করেন। ১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় নতুন মুদ্রণ যন্ত্র। শিল্পী পঞ্চানন কর্মকার বাংলা অক্ষর তৈরির জন্য সাহায্য করেছিলেন চার্লস উইলকিন্সকে। ১৮০১ খ্রিঃ বাংলা ভাষায় বাইবেল অনূদিত

ও প্রকাশিত হলো এদের চেষ্টায়। বাইবেলটি প্রায় ৩১টি ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ ও প্রচার করা হয়। ১৮১৮ খ্রিঃ শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া ১৮১৪-১৮১৮ খ্রিঃ মধ্যে কলকাতা ও তার আশেপাশে ৩৬টি স্কুল ও বর্ধমানে ১০টি ভার্নাকুনার স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলা ভাষা শিক্ষণ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে। ১৮০০ খ্রিঃ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কেরী ঐ কলেজে সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের প্রথম অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। তিনি বাংলা ভাষায় উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাব লক্ষ্য করেছিলেন। ১৮০১ খ্রিঃ প্রকাশিত হয় বাংলা ব্যাকরণ ও সুবৃহৎ অভিধান। ঐ বছরই প্রকাশিত হয় ৩১টি অধ্যায়যুক্ত ‘কথোপকথন’। এতে বাংলা ভাষায় বাংলার সাধারণ সমাজচিত্র বর্ণিত হয়েছে। আরেকটি উল্লেখযোগ্য পুস্তক ‘ইতিহাসমালায়’ রয়েছে পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, বেতাল পঞ্চবিংশতি থেকে অনুবাদ করা গল্প ও ইতিহাস থেকে গৃহীত গল্প। এছাড়া কাশীরামদাসের মহাভারত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, বিষ্ণুশর্মার হিতোপদেশ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে কেরীর অবদান রয়েছে। তিনি শুধু সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না। পাঠ্যপুস্তক পঠনপাঠনের মধ্যে চিন্তার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। ১৮১৮ খ্রিঃ মার্শম্যানের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয় ‘দিকদর্শন’। এরপর প্রকাশিত হয় ‘সমাচার দর্পণ’। তবে এই যুগে বাংলা ভাষার উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে রামমোহন রায় ও তার উত্তরসুরি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান অসামান্য।

উদ্দেশ্য

- বাণী প্রচার
- মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা
- শিক্ষার বিস্তার
- প্রেরণা দান
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি

অবদান

- ভাষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ
- মুদ্রণ যন্ত্র প্রতিষ্ঠা
- শিক্ষা ক্ষেত্রে দক্ষ শিক্ষক তৈরি
- সুদক্ষ প্রচারক তৈরি
- সাহিত্যের উন্নয়ন
- অনুবাদ ও পুস্তক প্রকাশনা

The Catholic Directory of Bangladesh-2013

বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী (Catholic Bishops Conference of Bangladesh - CBCB) - বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করার পর (মার্চ ১৯৭১ খ্রিঃ) বাংলাদেশ কাথলিক সন্মিলনী প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের কাথলিক মণ্ডলীর স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সেবাদানের বিষয়সংশ্লিষ্ট সাধারণ নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করাই এর কাজ। বিশপীয় অঙ্গসংগঠনসমূহের বিভিন্ন কমিশন রয়েছে। এ কমিশনগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশ মণ্ডলীর পালকীয়, সেবামূলক, পরিচালনা ও অন্যান্য বিষয়গুলোর কার্যসমূহ পরিচালিত হয় ও দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। তার মধ্যে অন্যতম একটি কমিশন হলো বাংলাদেশ কাথলিক শিক্ষাবোর্ড। এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো : (১) যুব শ্রেণির শিক্ষার জন্য জাতীয় সকল বিষয়াদিতে অর্থপূর্ণভাবে অংশগহণ, (২) মণ্ডলীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষানীতিমালা পুনর্গঠন, পুনঃপরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রস্তুতিতে সহায়তা দান করা এবং (৩) জীবনাহ্বান হিসেবে শিক্ষকদের ধারাবাহিক গঠনে সহায়তা করা।

ধর্মপ্রদেশসমূহ : বাংলাদেশে মোট ৮টি ধর্মপ্রদেশ রয়েছে। বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশের কাজ বিভিন্ন রকম। তবে বিভিন্ন কাজের সুবিধার জন্য বাংলাদেশ মণ্ডলীর কর্মকাণ্ড সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি ধর্মপ্রদেশেই মিশনারীগণ, বিভিন্ন সংঘের সন্ন্যাসব্রতীগণ, ধর্মপ্রদেশীয়

যাজকগণ তাদের শক্তিসামর্থ্য, বুদ্ধি, শ্রম, সেবা, ধৈর্য্য, ভালোবাসা, সহিষ্ণুতা দিয়ে নিরলস ও নিঃস্বার্থভাবে তাদের সেবা দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

মণ্ডলীর প্রেরণকর্মের মধ্যে শিক্ষা বিশেষ অগ্রাধিকার পায়। শিক্ষা প্রসারে মণ্ডলীর ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপক প্রসারিত। শিক্ষা ভাবনায় প্রাক্-প্রাথমিক, প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, কারিগরি বিদ্যালয় – এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এর আওতাভুক্ত। এছাড়া নারীশিক্ষার ক্ষেত্রেও খ্রিস্টমণ্ডলী দূরদর্শী ভূমিকা পালন করছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের শিক্ষার সুযোগ দানের জন্য মণ্ডলী সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রেখেছে।

বাংলাদেশে কাথলিক মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ

ধর্মপ্রদেশ	নিবন্ধকৃত ও অনিবন্ধকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় (মণ্ডলী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত)	নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়	উচ্চ বিদ্যালয়	কলেজ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ	বিশ্ববিদ্যালয়	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	বোর্ডিং/ হোস্টেল/ এতিমখানা
ঢাকা	১৬	১৭	০২	১৮	৩+১=৪	১	০৩	১৬
চট্টগ্রাম	১২	০১		১০				২১
দিনাজপুর	২২	০৪	০৩	০৩	১		০২	২০
খুলনা	১৮	০১	০৩	০৫			০৪	১৭
ময়মনসিংহ	১৪৪	০৬	০৪	০৮			০৪	২৬
রাজশাহী	১৫	০৩		০৩				১৯
সিলেট		০১	০৪	০১				০৬
বরিশাল	প্রক্রিয়াধীন							
মোট	**২২৭**	**৩৩**	**১৪**	**৪৮**	**৫**	**১**	**১৩**	**১২৫**

তথ্যসূত্র : সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

এ সকল প্রতিষ্ঠানে মোট ৯৪,০২০ জন শিক্ষার্থী আছে এবং এখানকার শিক্ষক সংখ্যা হলো ১৯৫০ জন। এখানে উল্লেখ্য যে, সারা বাংলাদেশে কাথলিক চার্চের ৩৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ১৯৭৩ খ্রিঃ জাতীয়করণ করা হয়। এগুলো এখন সরকারী প্রাথমিক স্কুল। সেগুলো পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ ফাণ্ড না থাকায় সরকারকে দিয়ে দেয়া হয়। তবে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে কারিতাস শিক্ষাপ্রকল্প বাংলাদেশে শিক্ষাবিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে খ্রিস্টমণ্ডলীর ৩৪টি ধর্মসংঘ কাজ করে যাচ্ছে। তাদের বেশির ভাগেরই প্রধান কাজ শিক্ষাবিস্তার। এ ধর্মসংঘগুলোর মধ্যে প্রধান প্রধানগুলো হলো পবিত্র ক্রুশ সংঘের ফাদার, সিস্টার ও ব্রাদারগণ, আরএনডিএম, এসএমআরএ, লুইজিনা, শান্তি রাণী, মারীয়া বাম্বিনা, পিমে, সালেশিয়ান, মেরীনল সিস্টারগণ, যেজুইটস, ফ্রান্সিসকান ও অবলেট ফাদারগণ। তবে পবিত্র ক্রুশ সংঘের ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারগণ সুদীর্ঘসময় ধরে সকল স্তরের শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

শিক্ষা বিস্তারে অবদান: বাংলাদেশে শিক্ষাবিস্তারে খ্রিস্টমণ্ডলীর অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেশের সার্বিক জনসংখ্যার তুলনায় খ্রিস্টানদের সংখ্যা অতি নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের অবদান, বিশেষ করে নারী-শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নে তাদের অবদান প্রশংসনীয়। নারী শিক্ষার জন্য মণ্ডলী অনেক প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীতে নারী শিক্ষার হার প্রায় শতভাগ। এছাড়া পেশাগত ও উচ্চশিক্ষার দিক দিয়েও মেয়েরা অনেক এগিয়ে আছে। নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য বিভিন্ন ধর্মসংঘের সন্ন্যাসব্রতী ব্রাদার, সিষ্টার ও ফাদারদের পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এখানে তাদের পরিচালিত প্রাথমিকোত্তর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একটি তালিকা দেওয়া হলো :

১। সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারস গার্লস হাইস্কুল (লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা)।

২। সেন্ট গ্রেগরী হাইস্কুল (লক্ষ্মীবাজার,ঢাকা)।

৩। সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার গ্রীনহেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল (মোহাম্মদপুর, ঢাকা)।

৪। সেন্ট যোসেফ হাইস্কুল এণ্ড কলেজ (মোহাম্মদপুর, ঢাকা)

৫। হলিক্রস গার্লস হাইস্কুল (তেজগাঁও, ঢাকা)।

৬। হলিক্রস কলেজ (তেজগাঁও, ঢাকা)।

৭। বটমলী হোম গার্লস হাই স্কুল, তেজগাঁও, ঢাকা।

৮। সেন্ট যোসেফস হাইস্কুল ও কলেজ (ধরেণ্ডা, ঢাকা)

৯। সেন্ট মেরীস গার্লস হাইস্কুল এণ্ড কলেজ (তুমিলিয়া, গাজীপুর)।

১০। পাঞ্জোরা গার্লস হাইস্কুল (নাগরী,গাজীপুর)।

১১। মঠবাড়ি গার্লস হাইস্কুল (গাজীপুর)।

১২। সেন্ট থেকলাস গার্লস হাইস্কুল (গোল্লা, ঢাকা)।

১৩। নারায়ণতলা হাইস্কুল (সুনামগঞ্জ)

১৪। তুইতাল গার্লস হাইস্কুল (দাউদপুর, ঢাকা)

১৫। রাঙ্গামাটিয়া হাইস্কুল (গাজীপুর)

১৬। তুমিলিয়া বয়েজ হাইস্কুল (কালীগঞ্জ, গাজীপুর)।

১৭। সেন্ট ইউফ্রেজিস গার্লস হাইস্কুল এণ্ড কলেজ (হাসনাবাদ, ঢাকা)।

১৮। সেন্ট থেকলা গার্লস হাইস্কুল (গোবিন্দপুর, ঢাকা)।

১৯। আওয়ার লেডী অব ফাতেমা গার্লস্ হাইস্কুল (কুমিল্লা)।

২০। সেন্ট স্কলাস্টিকা গার্লস হাইস্কুল (চট্টগ্রাম)।

২১। ব্রাদার আন্দ্রেজ হাইস্কুল (সোনাপুর, নোয়াখালী)।

২২। সেন্ট আলফ্রেডস হাইস্কুল (পাদ্রিশিবপুর)।

২৩। সেন্ট ফিলিপস্ হাইস্কুল ও কলেজ (দিনাজপুর)

২৪। ফাতেমা হাইস্কুল (খুলনা)

২৫। সেন্ট পলস্ হাইস্কুল (শেলাবুনিয়া, খুলনা)।

২৬। বিড়ইডাকুনী হাইস্কুল (ময়মনসিংহ)

২৭। সেন্ট তেরেজা হাইস্কুল (ভালুকাপাড়া)।

২৮। রাণীখং হাই স্কুল (নেত্রকোনা)।

২৯। সেক্রেট হার্ট হাইস্কুল (বালুচড়া, নেত্রকোনা)

৩০। কর্পূস খ্রীষ্টি হাইস্কুল (জলছত্র, টাঙ্গাইল)

৩১। সেন্ট পলস্ হাইস্কুল (পীরগাছা, টাঙ্গাইল)

৩২। সেন্ট ফ্রেডরিকস হাইস্কুল (বরুয়াকোনা, নেত্রকোনা)।

৩৩। মরিয়মনগর হাইস্কুল (মরিয়মনগর, শেরপুর)।

৩৪। সেন্ট লুইস হাইস্কুল (বোর্ণি, নাটোর)।

৩৫। সেন্ট যোসেফস্ মাল্টিরেটারেল হাইস্কুল (বনপাড়া, নাটোর)।

৩৬। সেন্ট রীটাস হাইস্কুল (মথুরাপুর, পাবনা)।

৩৭। উদয়ন হাইস্কুল (বরিশাল)

৩৮। নারীকেলবাড়ি হাইস্কুল (গোপালগঞ্জ)

৩৯। সেন্ট জেভিয়ারস হাইস্কুল (বলিপাড়া, বান্দরবান)।

৪০। সেন্ট প্যাট্রিক হাইস্কুল (খাগড়াছড়ি)।

৪১। ডন বস্কো হাইস্কুল (বান্দরবান)।

৪২। সেন্ট ফ্রান্সিস হাইস্কুল (ধানজুরি, দিনাজপুর)।

৪৩। সেন্ট ভিয়ান্নী হাইস্কুল, মরিয়মপুর (দিনাজপুর)।

৪৪। সেন্ট যোসেফ হাইস্কুল (খুলনা)

৪৫। সেন্ট লুইস হাইস্কুল (শিমুলিয়া, যশোর)।

৪৬। সেক্রেড হার্ট হাইস্কুল (যশোর)

উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে শিক্ষালাভ করে অনেকেই আজ দেশের ভিতরে ও বাইরে দক্ষতার সাথে সেবা ও নেতৃত্ব দান করে যাচ্ছে।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা: আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াও কাথলিক মণ্ডলী অনগ্রসর বা ঝরে-পড়া শিক্ষার্থীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য বেশ কিছু কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

১। নারিন্দা সেন্ট যোসেফস্ স্কুল অব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেড

২। জাগরণী ট্রেনিং সেন্টার এণ্ড শপ

৩। নটর ডেম ট্রেড স্কুল

৪। মটস্ (মিরপুর)

৫। কারিতাস ট্রেড স্কুল

এছাড়াও পিতৃমাতৃহীন অনাথ ও এতিম শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য মণ্ডলীর পক্ষ থেকে অরফানেজের ব্যবস্থা রয়েছে। ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুবিধার জন্য বোর্ডিং বা হোস্টেলের ব্যবস্থা রয়েছে।

কারিতাস বাংলাদেশ : শিক্ষার ক্ষেত্রে মণ্ডলীর পক্ষে কারিতাস বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। শিক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন করে, শিক্ষকদের উপযুক্ত ও মানসম্মত প্রশিক্ষণদানের জন্য নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ, আর্থিক অনুদান প্রদান, সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর জন্য সুযোগ সৃষ্টি, যুবকার্যক্রমে সহায়তা, শিক্ষকমূল্যায়ন-পদ্ধতি শিক্ষা দান করে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গতা দিয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে কারিতাসএর অবদান অনস্বীকার্য।

বাংলাদেশ কাথলিক শিক্ষাবোর্ড

(Bangladesh Catholic Educatiuon Board – BCEB)

বাংলাদেশ মণ্ডলীতে শিক্ষাবিস্তারের কাজ বেগবান করার জন্য বাংলাদেশ মণ্ডলী প্রথম থেকে সংগঠিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই কাজের চূড়ান্তরূপ হলো রেজিষ্টিকৃত বর্তমান বাংলাদেশ কাথলিক শিক্ষাবোর্ড। ২০০৯ খ্রিঃ ১০-১১ নভেম্বর মাসে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর নিয়মিত মিটিংএ গঠিত হয় এই বোর্ড। এই কাথলিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে রয়েছে সকল ধর্মপ্রদেশের শিক্ষা কমিশন, আর বিশপগণ হলেন এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। কাথলিক মণ্ডলীর শিক্ষার দর্শন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এদেশে শিক্ষাসেবায় তৎপরতার জন্য বাংলাদেশ কাথলিক শিক্ষাবোর্ড সহায়তা করছে। বাংলাদেশ কাথলিক শিক্ষা বোর্ডের অধীন কমিটিগুলো হলো :

১। নিয়মনীতি প্রণয়ন কমিটি

২। খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা পাঠ্যপুস্তক কমিটি

৩। বিভিন্ন আদিবাসী ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন কমিটি

৪। সরকারের সাথে শিক্ষাকার্যক্রম সমন্বয় কমিটি

৫। অর্থ ও বাজেট কমিটি

৬। উচ্চশিক্ষা বিষয়ক কমিটি

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : বাংলাদেশ কাথলিক শিক্ষাবোর্ড বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। সেগুলি হলো :

* মণ্ডলীর সমগ্র শিক্ষা সেবার মান উন্নয়ন

* বোর্ডের অধীনে কাথলিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ নীতিমালা প্রণয়ন করে।

* শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সরকারী, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ের কাজের সমন্বয় সাধন এবং তাদের মধ্যে সমঝোতাপূর্ণ সাহায্য প্রদান ও সমর্থন দান করা।

* সবার জন্য শিক্ষা – এই উদ্যোগের সাথে একাত্ম হয়ে দেশে সাধারণ ও বিশেষ স্কুল প্রতিষ্ঠা করে গুণগত ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা।

* সরকার, সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে মুখপাত্র হিসাবে প্রতিনিধিত্বমূলক ভূমিকা পালন করা।

* শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সামগ্রিক ও মূল্যবোধ শিক্ষায় জোরদার ভূমিকা পালন

* শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবদান সুস্পষ্টভাবে সমন্বিত করতে এবং অনুরূপ প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বীকৃতি ও সমর্থন দানে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

* অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন ও সহযোগিতা করে।

* জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সহায়তা করে তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৌঁছে দেয়া।

* গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলোকে সাহায্য করার জন্য সরকারি, ব্যক্তিগত বা অন্য কোন খ্রিস্টান দাতা সংস্থার অনুকূলে তহবিল যোগাড় করা।

সার্থকতা বা সফলতা: স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন এসেছে। সেই পরিবর্তনগুলো ছিল নতুন প্রণীত সরকারি শিক্ষানীতি অনুসারে প্রশাসনিক কাঠামোগত পরিবর্তন যেমন : পরিচালনা পরিষদ, প্রতিষ্ঠান প্রধান ও শিক্ষক নিয়োগ, বিদ্যালয় নিবন্ধিতকরণ, পাঠ্যক্রম,

পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও সরবরাহ। সরকারের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করে এসব প্রতিষ্ঠানকে যুগের চাহিদামাফিক গড়ে তোলা হয়েছে। উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার গুণগত মান বজায় রাখতে বা সুনিশ্চিত করতে তারা সক্ষম হয়েছে।

 # আহমেদ, ইমতিয়াজ, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পর্তুগিজ বাণিজ্য (১৪৯৮-১৬৪১) পৃষ্ঠাসংখ্যা ১-৩০৮

প্রাচ্যের দেশগুলোতে খ্রিস্টধর্মের প্রচারের আকাঙ্ক্ষা ইউরোপীয়দের এশীয় অঞ্চলে আগমনের অন্যতম কারণ ছিল। খ্রিস্টধর্মের আবির্ভাব ঘটে প্যালেস্টাইনে। প্রথম চারশত বছরে ইহা গ্রেকো-রোমান সাম্রাজ্যে বিস্তার লাভ করে এবং দক্ষিণ ইউরোপের সভ্যতাকে প্রভাবিত করে।[৬০] পরবর্তী আটশত বছরে খ্রিস্টান মিশনারীগণ মধ্য ও উত্তর ইউরোপে সভ্যতার আলোকবর্তিকা ছড়ায়। পরবর্তীতে যীশু খ্রিস্টের বাণী গ্রীনল্যান্ড ও আইসল্যান্ডে প্রচারিত হয়। মধ্যযুগের শেষ পর্বে তারা সমগ্র ইউরোপে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করে। ইউরোপের পাশাপাশি এশিয়ার দেশগুলোতে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের ব্যাপারেও উদ্যোগী হয়। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইউরোপীয় জাতি আগমন করে এবং ঔপনিবেশিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। তবে খ্রিস্টধর্ম প্রচারকে তারা অন্যতম কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করেছিল।

১৪৯৮ খ্রিঃ পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা কর্তৃক ভারতীয় জলপথ আবিষ্কারের ন্যায় মধ্যযুগীয় ইতিহাসের কোন ঘটনা বিশ্ব সভ্যতাকে এমন প্রভাবিত করেনি। পর্তুগীজ বণিকগণ ভারতে আগমনের মাত্র দু'দশকের কম সময়ের মধ্যে সমগ্র দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যে তারা একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। পর্তুগীজ নাবিক পর্তুগালের যুবরাজ হেনরী দি নেভিগেটর সমুদ্র অভিযানের ৫টি কারণের মধ্যে দুইটি ছিল : (১) খ্রিস্টান রাজ্যের সন্ধান লাভ ও (২) খ্রিস্টমতবাদ প্রচার করা।[৬১]

খ্রিস্টধর্ম প্রচার : ভারতবর্ষ ও পূর্বভারতীয় অঞ্চলে পর্তুগীজরা বাণিজ্যের উদ্দ্যেশ্যে আগমন করেন। তাদের সঙ্গে মিশনারীগণ থাকতেন। বাণিজ্যের সাথে সাথে তারা ধর্মপ্রচারের কাজে লিপ্ত হন।

উদ্দেশ্য : তাদের প্রচারের উদ্দেশ্যগুলো ছিল-

- খ্রিস্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার ও প্রসার ঘটানো।
- খ্রিস্টমণ্ডলী গঠন করা।
- ধর্মীয় রীতিনীতি শিক্ষা দান করা।
- নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা।
- স্থানীয় লোকদের উৎসাহিত করা।
- শিক্ষার বিস্তার ঘটানো।
- খ্রিস্টের প্রেমের বাণী প্রচার করা।

শিক্ষা বিস্তার

শিক্ষাবিস্তারে মিশনারীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে কোচিন, ক্যানানোর এবং কুইলনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়।[৬২] পর্তুগাল সরকারের পক্ষ থেকে দরিদ্র ছাত্রদের অর্থ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি প্রদান করা হতো। ফরাসী পর্যটক তাভারনিয়ের উল্লেখ করেছেন, পর্তুগিজ ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে এক বছরের মধ্যে যা শিখতো কানাড়ী ছেলেমেয়েরা ছয়মাসেরও কম সময়ের মধ্যে যে কোনো বিষয়ে তার চেয়েও বেশি শিখে ফেলতো।[৬৩] পর্তুগীজদের প্রতিষ্ঠিত স্কুল, কলেজসমূহ হিন্দুদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

শিক্ষা প্রসারের সাথে সাথে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষার উন্নয়ন সাধনে মিশনারীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ প্রসঙ্গে তামিল ও বাংলা ভাষায় আধুনিক ব্যাকরণ রচিত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লিখিত তামিল ভাষায় যে গ্রন্থটি ছিল, সেটা ছিল পদ্যে লেখা। তাছাড়া এর বর্ণ, অর্থ প্রভৃতিতে পার্থক্য ছিল। ফাদার হেনরিকস ১৫৪৯ খ্রিঃ তামিল ভাষায় আধুনিক ব্যাকরণ রচনার কাজ শুরু করেন ও ১৫৫২খ্রিঃ সমাপ্ত করেন।[৬৪]

১৫৬৫ খ্রিঃ ব্যাকরণের সংস্করণ বের হয়। হেনরিকস তার ব্যাকরণ গ্রন্থটিতে সন্ধি, শব্দরূপ ও ব্যাকরণের অন্যান্য নিয়ম কানুন সম্পর্কে আলোচনা করেন।[৬৫] তিনি আধুনিক তামিল ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রথম রচয়িতার মর্যাদা লাভ করেন। তামিল গদ্যের বিকাশেও মিশনারীদের ভূমিকা

লক্ষ্যণীয়। প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে জানা যায়, সক্ষম যুগ[৬৬] থেকে তামিল ভাষার লেখার কাজ শুরু হয়, কিন্তু তা ছিল ছন্দোবদ্ধ পদ্যে। গদ্য সাহিত্য তখন কবিতায় লেখা হতো। সেখানে সহজ বোধ্যতা এবং প্রাঞ্জলতা নামক ভাষার প্রয়োজনীয় দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সেখানে অনুপস্থিত ছিল।[৬৭] তামিল ভাষার জ্ঞানচর্চা সংস্কৃতির ব্রাহ্মণদের ন্যায় উচ্চ বর্ণের লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।[৬৮] মিশনারীগণ খ্রিস্টধর্মের বিধানসমূহ ও উপদেশাবলি তামিল ভাষাভাষী লোকদের কাছে সরল ও বোধগম্য ভাষায় উপস্থাপনের জন্য তামিল গদ্য সাহিত্য বিকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। মিশনারীদের প্রচেষ্টায় ১৫৭৯খ্রিঃ গদ্যরীতিতে রচিত হয় "ক্রিসিতিয়ানি ভেনাকম" নামক গ্রন্থ। এটি ছিল মূলত একটি অনুবাদ গ্রন্থ। তবে খ্রিস্টমতবাদের উপর লিখিত মূল গ্রন্থটি রচনা করেন মার্কোস জর্জ। ১৫৬৬খ্রিঃ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।[৬৯] ১২টি অধ্যায়ে বিভক্ত এ গ্রন্থটি লেখা শেষ করা হয়েছে পবিত্র এই বাক্য দিয়ে, There is no salvation except through the name (Jesus)। ফাদার ইগানসিয়ো ব্রুনো প্রথম Vocabularum Tamulicum Jafanapatam নামে পর্তুগিজ-তামিল অভিধান রচনা ও প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে আন্তোনিয়ো প্রোয়েনসা আরও একটি অভিধান রচনা করেন যা প্রকাশিত হয় ১৬৭৯খ্রিঃ। এতে ১৬,৫৪৬ টি তামিল শব্দের ল্যাটিন এবং পর্তুগিজ উভয় ভাষাতে অর্থ দেওয়া আছে।[৭০]

বাংলা ভাষায় সমৃদ্ধি সাধনেও মিশনারীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীন সুলতানি আমলে এবং মোগল আমলে কবি সাহিত্যিকদের আবির্ভাবে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। তখন দেশের বেশিরভাগ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে গদ্যরীতির ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মিশনারীগণ গদ্যে একাধিক গ্রন্থ রচনা করে মধ্যযুগীয় বাঙালি কবি সাহিত্যিকদের মানসিক দীনতাকে ভেঙ্গে বাংলা ভাষায় গদ্যরীতি প্রবর্তনের পথিকৃৎ হয়ে দাঁড়ায়। তবে বাঙালি খ্রিস্টানদোম আন্তোনিয়োগে রোজারিয়ো এবং ফাদার মনোয়েলদা আসসুম্পমাও এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। আন্তোনিয়োগে রোজারিয়োর গ্রন্থটির নাম 'ব্রাহ্ম রোমান কাথলিক সংবাদ' গ্রন্থটির মূল পাণ্ডুলিপিটি এভোরার সাধারণ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে, তার নাম পৃষ্ঠায় 'Dialogo' উল্লিখিত আছে বলে ড. রহিম উল্লেখ করেছেন।[৭১] তিনি এ গ্রন্থের উপর গবেষণা প্রবন্ধ প্রণয়ন কালে 'Dialog' এর অনুবাদ করেন "সংলাপ" বা 'কথোপকথন'।[৭২] গ্রন্থটি একজন

ব্রাহ্মণরোমান কাথলিক ধর্মযাজকের মধ্যে কথোপকথনের ভঙ্গিতে রচিত। ১৯৩৭ খ্রি: ড. সুরেন্দ্রনাথ সেন গ্রন্থটির অংশ বিশেষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ করেন "ব্রাহ্মণ রোমান কাথলিক সংবাদ" নামে। এর সন্ধান প্রথম ফাদার হোস্টেন ১৯১৪খ্রিঃ সমাজে পরিবেশন করেন। ১৭৪৩ খ্রিঃ ফাদার ম্যানুয়েল কর্তৃক প্রথম সম্পাদিত ও পর্তুগিজ ভাষায় অনূদিত হয়ে ফ্রান্সিসকোদা সিলভা কর্তৃক লিসবন থেকে মুদ্রিত হয়।[৭৩] তবে অনুমান করা হয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল।

১৭৩৫খ্রিঃ ফাদার ম্যানুয়েল রচিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ', ১৭৪৩ খ্রিঃ লিসবন থেকে মুদ্রিত হয়। লিসবন, শ্রীরামপুর, গোয়ার নিকটস্থ মারগাঁও থেকে গ্রন্থটির একাধিক সংস্করণ বের হয়।

বাংলা অভিধান ও শব্দকোষ রচনাতেও মিশনারীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। ফ্রান্সিসকো ডি'সিলভা কর্তৃক লিসবন থেকে Vocabularioem Idioma Benglla, Eportuguise নামক অভিধান প্রকাশিত হয়। এর উদাহরণগুলো বাংলা হলেও রোমান হরফে মুদ্রিত এবং মূল গ্রন্থটি পর্তুগীজ ভাষায় রচিত। তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে দেখা যায় এর লেখক দোম আন্তোনিয়ো। তার তিন সহকর্মী সানতোচ্চি, গমেজ ও সরায়ভা প্রমুখ ব্যক্তিগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অভিধানটি সম্পাদন করেছিলেন।[৭৪] এ গ্রন্থটির দুটি কপি ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পুস্তকাগারে সংরক্ষিত আছে। ৬০২পৃঃ পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থটি ৫ ভাগে বিভক্ত :

১ম ভাগ : নামপত্র, ভূমিকা।

২য় ভাগ : বাংলা ব্যাকরণ।

৩য় ভাগ : বাংলা-পর্তুগিজ শব্দকোষ।

৪র্থ : পর্তুগিজ-বাংলা শব্দকোষ।

৫ম : তিথির নাম সংখ্যাবাচক নাম, হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থের নাম, ঈশ্বরের গুণাবলি ও সমোচ্চার্য বাংলা শব্দাবলি।[৭৫]

ব্যাকরণ গ্রন্থটির দৃষ্টান্তসমূহ বাংলা হলেও অক্ষরগুলো রোমান হরফে মুদ্রিত। ব্যাকরণ জনিত কারণ ছাড়াও নানা কারণে গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ।

মিশনারীগণ প্রথম এশীয় অঞ্চলে আধুনিক মুদ্রণ ব্যবস্থা বা ছাপানোর কাজ শুরু করেন, যা শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে। ভারতে বসতি স্থাপনের কিছুকাল পরেই মিশনারীগণ ইউরোপ থেকে মুদ্রণযন্ত্র আমদানি করে। ১৫৫৬খ্রিঃ পর্তুগীজরা ভারতে ছাপাখানা স্থাপন করে।[৭৬] ছাত্রদের ব্যবহার্য দর্শনের উপর একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ Conclusoes ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে গোয়ায় মুদ্রিত প্রথম বই। ১৫৬৬ খ্রিঃ গ্রন্থটির সন্ধান পাওয়া যায়।[৭৭]

ভারতীয় ভাষায় বই মুদ্রণের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হচ্ছে ১৫৭৭খ্রিঃ মূল পর্তুগীজ থেকে সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারের Doctrine Christao গ্রন্থের “খ্রিস্টীয় ভন্নকনম” নামে তামিল অনুবাদ প্রকাশ হয়।[৭৮] প্রথমদিকে এখানকার ছাপাখানা গুলোতে পর্তুগীজ ভাষায় লিখিত ধর্মপুস্তক ছাপা হতো। কিন্তু ক্রমান্বয়ে ধর্মপ্রচারে দেশী ভাষায় ব্যবহারের সুযোগসুবিধার কথা উপলব্ধি করে ফাদারগণ দেশীয় ভাষায় কয়েকটি বই অনুবাদ করেন। বলা বাহুল্য, পুস্তক প্রণয়ন ধারার গতিপথের এ শুভ পরিবর্তনের ফলে ভারতীয় মুদ্রণশিল্পের দ্রুত উন্নতি সাধিত হয়।

শিক্ষার কৌশল

- বিভিন্ন বই পুস্তক বিলি করে।
- প্রার্থনা সংগীত রচনা করে।
- বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে।
- পুরস্কৃত করে।
- উপকূলীয় শহরগুলিতে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করে।
- শিশুদের ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষা দান করে।
- দেশীয় ভাষায় বইপুস্তক রচনা করে।

প্রতিবন্ধকতা বা অন্তরায়

- দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সনাতন ও প্রচলিত রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষমতাদ্বন্দ্বে মিশনারীগণ ছিলেন নবাগত প্রতিযোগী।
- আঞ্চলিক বিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।
- প্রতিকূল পরিবেশ বিরাজ করছিল।
- পৃষ্ঠপোষকতার অভাব ছিল।
- স্থানীয় লোকজন ছিল দরিদ্র।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র প্রাচ্যবাণিজ্য থেকে পর্তুগীজদের বিদায়ঘন্টা বাজলেও কাথলিক ধর্ম প্রচারের কাজ থেমে থাকেনি। তারা পিতৃ-মাতৃহীন শিশুদের দীক্ষিত করে তাদের লেখাপড়াসহ যাবতীয় ব্যয়ভারসহ সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতো। বিভিন্ন কাজের পর পুরস্কৃত করে উৎসাহিত করতো।

 # মান্নান আ.খা.আব্দুল, এ.কে.এম মোজাম্মেল হক, গোলাম রসুল মিয়া, মুহম্মদ ইবলু আনাম, "শিক্ষার ইতিহাস," (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১-১৯৪)

বর্তমানের শিক্ষাব্যবস্থা অতীতের শিক্ষা প্রচেষ্টারই ফলশ্রুতি। শিক্ষার প্রসারে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা মানুষের জীবনযাপন প্রণালীকে সুবিন্যস্ত ও উন্নত করেছে। বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের সাথে পূর্ববর্তী সময়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুসৃত শিক্ষা কার্যক্রমের প্রচ্ছন্ন সংযোগ রয়েছে। তাই বর্তমানকে সঠিকভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করার জন্য অতীতকে জানা একান্ত প্রয়োজন।

শিক্ষায় মিশনারীদের ভূমিকা

১৪৯৮ খ্রিঃ পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করেন। পরবর্তী দু'শতাব্দীর মধ্যে বিভিন্ন বাণিজ্য সংস্থা এদেশে আগমন করে। এসব নাবিকদের সাথে থাকতেন

পাদ্রী মিশনারীরা যারা ধর্মের প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রচেষ্টায় ব্রতী হতেন। ধর্মপ্রচার ও শিক্ষাবিস্তার – এই দুটির মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল।

উদ্দেশ্য[৭৯]

- ধর্মপ্রচার করা।
- শিক্ষার বিস্তার ঘটানো।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা।

শিক্ষা বিস্তার

ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষার ভিত্তি রচিত হয়েছিল ১৮৫৪খ্রিঃ উডের শিক্ষা দলিলের মাধ্যমে। উডের শিক্ষা দলিল সরকারীভাবে মিশনারী ও শিক্ষিত ভারতীয়দের শিক্ষামূলক কার্যকলাপের সমন্বয় সাধন করে। বিশালতা ও বিচিত্রতার বিচারে মিশনারী শিক্ষা প্রচেষ্টার পরিমাণগত গুরুত্ব যথেষ্ট না থাকলেও এর প্রকৃতি ও গুণগত গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

মিশনারীদের অবদান বহুমুখী। শিক্ষার সংগঠন থেকে শুরু করে বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদির উপর মিশনারীদের চিরস্থায়ী প্রভাব রয়েছে। তাঁরা শিক্ষাক্ষেত্রে ও পাঠ্যসূচীতে আধুনিক ভাব ধারার বিকাশ ঘটান।[৮০] তাঁরাই এদেশে সর্ব প্রথম ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

পর্তুগীজ মিশনারীদের শিক্ষা প্রচেষ্টা

ইউরোপীয়ানদের মধ্যে পর্তুগীজরা সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে এসে বিভিন্ন স্থানে কুঠি স্থাপন করে। পর্তুগীজদের ভারতবর্ষের আধুনিক শিক্ষার জনক হিসাবে গণ্য করা হয়।[৮১] তারা চার ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল। (ক) পর্তুগীজ শিশুদের জন্য চার্চ ও মিশনারীদের আস্তানা সংলগ্ন স্থানে পর্তুগীজ ও ল্যাটিন ভাষায় প্রাথমিক বিদ্যালয়, (খ) ভারতীয় অনাথ শিশুদের জন্য কৃষি ও শিল্প কারখানার কাজের উপযোগী পেশামূলক প্রাথমিক বিদ্যালয়, (গ) উচ্চ শিক্ষার জন্য যেজুইট কলেজ, (ঘ) ধর্মীয় প্রচার প্রশিক্ষণের জন্য সেমিনারী। প্রথম পর্যায়ে ভারতে আসেন তাদের মধ্যে

সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স (১৫৪২ খ্রিঃ) ও রবার্ট ডি'নবিলীর (১৬০৫খ্রিঃ) নাম উল্লেখযোগ্য। ফ্রান্সিস রাস্তায় চলার সময় ছোট ঘন্টা বাজাতেন। ঘন্টার শব্দে মানুষ জড়ো হতো।[৮২] তখন তিনি সবাইকে বাইবেল পাঠ করে শোনাতেন। তিনি গ্রামে অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। বোম্বেতে সেন্ট আন্নে কলেজ স্থাপন করেছিলেন যা এদেশে উচ্চ শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়েছিল। আধুনিক শিক্ষার একটি প্রধান উপাদান হলো ছাপার মেশিন।[৮৩] ১৫৭৭ খ্রিঃ প্রথম ভারতে ছাপার মেশিন স্থাপন করেন। ফলে এদেশে আধুনিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটে। এর পরবর্তীতে আসে ওলন্দাজ, ফরাসী ও দিনেমার মিশনারীগণ। পর্তুগীজদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ফরাসীরা তাদের কুঠি সংলগ্ন এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে ভারতীয় শিক্ষকদের দ্বারা পাঠদান করাতেন। পণ্ডীচেরিতে তারা একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পর্তুগীজ ও ফরাসী কাথলিক মিশনারীরা ভারতে শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং শিশুদের দর্শন শিক্ষা দিতেন। শিশুদের বিনামূল্যে বই, খাবার ও কাপড় দেওয়া হতো। শ্রীরামপুরে প্রটেস্টান্ট মিশনারীগণ খ্রিস্টধর্ম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তারা শ্রীরামপুর ও আশেপাশের এলাকায় ১৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪টি মিশনারী স্কুল স্থাপন করেন। সেখানে স্থানীয় ভাষায় পাঠ দান করা হতো।[৮৪] খ্রিস্টধর্ম পাঠদানের প্রধান বিষয় ছিল। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি স্কুল ও একটি ধর্মীয় সেমিনারী স্থাপন করা হয়েছিল। এখানে ইংরেজি ভাষায় পাঠদান করা হতো।

শিক্ষাবিস্তার ও ধর্মপ্রচারে বিখ্যাত মিশনারী ড. ক্রে, মি. ওয়ার্ড ও মি. মার্শম্যানের নাম উল্লেখযোগ্য। ইতিহাসে এই তিনজন 'শ্রীরামপুর ট্রীয়ো'[৮৫] নামে পরিচিত।

ইউরোপীয় কোম্পানীর ন্যায় বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিও ভারতবর্ষে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করে। ১৬৯৮ খ্রিঃ কোম্পানীর চার্টার নবায়নের সময় এ্যাক্টে মিশনারী ধারা যুক্ত করা হয়। এ সনদে মিশনারীদের শিক্ষকতা কর্মের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এর ভিতরেই নিহিত ছিল যৌথভাবে কোম্পানী ও মিশনারীদের ধর্মপ্রচার ও শিক্ষা প্রচেষ্টার বীজ।

ভারতীয় শিক্ষায় মিশনারীদের অবদান

- মিশনারীদের মূল লক্ষ্য ছিল খ্রিস্টধর্ম প্রচার করা এবং প্রচারের মাধ্যম হিসাবে তারা শিক্ষাকে বেছে নেন।

- লোকেরা যেন বাইবেল পড়তে পারে সেজন্য মিশনারীরা বিভিন্ন স্কুল প্রতিষ্ঠা করে ও বাইবেলকে পাঠ্য বিষয় হিসাবে আবশ্যকীয় করা হয়েছিল।
- তারা দরিদ্র, অবহেলিত ও অনাথ শিশুদের জন্য বিভিন্ন স্কুল ও আশ্রম স্থাপন করেছিল।
- তারা অবৈতনিক বিদ্যালয়, আশ্রম, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষাঙ্গণ, স্কুল, ভার্ণাকুলার স্কুল, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ধর্মীয় মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিল।
- আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে মিশনারীদের অবদান অনস্বীকার্য।
- শিক্ষা বিস্তার ও ধর্মপ্রচারের মাধ্যম হিসাবে তারা মাতৃভাষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে।
- তারা প্রথম ছাপাখানা আবিষ্কার করে আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটায়।
- নব প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানায় মাতৃভাষায় পুস্তক প্রকাশিত হতো।
- প্রচারকে সহজবোধ্য করার জন্য আঞ্চলিক ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করে তা প্রকাশ করা হতো।
- মিশনারীগণ ইংরেজি শিক্ষার বীজ বপন করেন। ফলে মানুষ ক্রমান্বয়ে ইংরেজি শিক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়ে।
- বাংলা ভাষার উন্নয়নেও মিশনারীদের অবদান উল্লেখযোগ্য।

এ উপমহাদেশের বিশালতা ও বিচিত্রতার বিচারে মিশনারী শিক্ষা প্রচেষ্টার পরিমাণগত যথেষ্ট গুরুত্ব না থাকলেও এর প্রকৃতি ও গুণগত গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। ভারতে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করাই মিশনারীদের শিক্ষা প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য হলেও শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের অবদান অপরিসীম। তাঁরা বিদেশী হয়েও ভারতীয় শিক্ষাকে আধুনিকীকরণের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাও বহুল পরিমাণে মিশনারীদের নিকট ঋণী বললে অত্যুক্তি হবে না।

 # পণ্ডিত, দিলীপ, বাংলাদেশে খ্রিস্টীয় মণ্ডলীর ইতিহাস (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১-২৭৪)

রোমান কাথলিক মণ্ডলী বাংলাদেশের প্রাচীনতম খ্রিস্টমণ্ডলী। পর্তুগীজ নাবিক, বণিক ও যাজকরা ষোড়শ শতকে ইহার গোড়াপত্তন করেন। ১৫১৭ খ্রিঃ পর্তুগীজরা বাণিজ্য উপলক্ষে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দরে উপস্থিত হন। বাংলাদেশ তখন গৌড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৫৩৭ খ্রিঃ বিহারের

শেরশাহ্ কর্তৃক গৌড়ের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়ে পড়লে গৌড়ের সুলতান মাহমুদ শাহ্ সাহায্যের আশায় পর্তুগীজদের চট্টগ্রাম ও সাতগাঁওতে বাণিজ্য ঘাঁটি স্থাপনের অনুমতি দেন। ষোড়শ শতকে পর্তুগাল বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৌ-শক্তিতে পরিণত হয়। সমুদ্রে তাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার মতো কোনো শক্তি ভারতীয় উপমহাদেশে ছিল না। বারো ভূঁইয়াদের অভ্যুদয়ের ফলে বাংলাদেশ তখন কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়। ফলে পর্তুগীজরা বাংলাদেশের বাকলা (বরিশাল), চান্দিকন (যশোহর-খুলনা), শ্রীপুর (ঢাকা), ভুলুয়া (নোয়াখালী), কাতরাবো (ঢাকা-ময়মনসিংহ) এবং খুলনার টপগাঁওতে বাণিজ্য ঘাঁটি স্থাপন করে। ষোড়শ শতকের শেষভাগে চট্টগ্রাম, কর্ণফুলি নদীর মোহনায় অবস্থিত দিয়াঙ্গা, বাকলা, চান্দিকন ও শ্রীপুরে খ্রিস্টীয় সমাজের অস্তিত্বের প্রমাণ ইতিহাসে রয়েছে।

মোগল যুগে খ্রিস্টধর্ম (১৫৭৬-১৭৬৫ খ্রিঃ) : মোগল আমলে বাংলাদেশে কাথলিক মণ্ডলীর প্রকৃত প্রতিষ্ঠা হয়। এর দুটি কারণ হলো : (১) যেজুইট মিশনারীগণ এদেশে ধর্মপ্রচারের কাজ শুরু করেন। তারাই প্রথমে উপাসনাগৃহ, অনাথাশ্রম, স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে খ্রিস্টের সুসমাচার প্রচার করতে শুরু করেন। তারাই প্রথম বাংলা ভাষায় খ্রিস্টীয় সাহিত্যের সূত্রপাত করেছিলেন। যেজুইটদের পরে অন্যান্য সম্প্রদায়ের কাথলিক মিশনারীগণ এদেশে খ্রিস্টের রাজ্য বিস্তারের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন।[৮৬] (২) মোগল সম্রাট আকবর ও তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীর ধর্মীয় ব্যাপারে খুব উদার ছিলেন। তাঁদের সাথে যেজুইট মিশনারীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সম্রাট আকবর ও সম্রাট জাহাঙ্গীর মিশনারীদের বিনা বাধায় খ্রিস্টধর্ম প্রচারের অনুমতি দিয়েছিলেন। ১৬৬৬ খ্রিঃ পর্তুগীজদের সহায়তায় ঢাকার মোগল শাসনকর্তা শায়েস্তা খান আরাকানীদের কাছ থেকে চট্টগ্রাম দখল করেন।

যেজুইট মিশনারীগণ চট্টগ্রামে দুটি উপাসনাগৃহ ও একটি অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। চট্টগ্রাম থেকে যেজুইট মিশনারীগণ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে খ্রিস্টীয় মণ্ডলী স্থাপনের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু করেন। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যেজুইট মিশনারীগণ বাংলাদেশে ৪টি উপসনাগৃহ নির্মাণ করেন। তার মধ্যে চান্দিকনের উপসনাগৃহটিকে প্রথম খ্রিস্টীয় উপাসনাগৃহ বলে মনে করা হয়।

খ্রিস্টীয় সাহিত্যের সূচনা : খ্রিস্টীয় সাহিত্য ছাড়া খ্রিস্টমণ্ডলীর আত্মিক জীবন উন্নত হতে পারে না। তাছাড়া খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য সাহিত্যের প্রয়োজন রয়েছে। ফাদার ফার্ণান্দেজ খ্রিস্টধর্মের মূলনীতির উপর একটি গ্রন্থ ও একটি প্রশ্নোত্তরমালা পর্তুগীজ ভাষায় রচনা করেন। তার সহকর্মী ডমিনিক দ্যা সুজা অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাংলা ভাষা আয়ত্ত ক'রে বই দুটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। তাই তাকে বাংলা ভাষায় খ্রিস্টীয় সাহিত্যের জনক বলা হয়।[৮৭]

ঢাকা শহরে মিশনারী কাজের সূচনা : ১৬০৮ খ্রিঃ সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে, ঢাকা মোগল বাংলার রাজধানীতে পরিণত হয়। ১৬১৬ খ্রিঃ ঢাকায় কাথলিক মণ্ডলী স্থাপিত হয়। সম্ভবত আগষ্টিনিয়ান সম্প্রদায়ের মিশনারীগণ তার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তবে তারা তাদের কাজে বেশি অগ্রসর হতে পারেননি। তার আভাস পাওয়া যায় ফাদার ম্যানরিদের লেখা ভ্রমণ কাহিনীতে। বাংলাদেশে খ্রিস্টীয় মণ্ডলীর ইতিহাসে সপ্তদশ শতক ফসল সংগ্রহের যুগ। এই শতকে চট্টগ্রাম ও ঢাকা জেলায় খ্রিস্টমণ্ডলীর জনসংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান কাথলিক মণ্ডলীর ভিত্তি রচিত হয়েছিল এই শতকে।

রেভারেণ্ড মথুরানাথ বসু, ফাদার মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ডোম আন্টোনীও রোজারিও – এই তিন জনই এদেশের মানুষ। এঁরা ছিলেন উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত। তাঁরা এদেশের অজ্ঞ, অনুন্নত ও অবহেলিত মানুষের কাছে খ্রিস্টবাণী প্রচারের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। এ কথা বলা যায় যে, তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলেই এদেশের অনূর্বর জমিতে খ্রিস্টীয় মণ্ডলীর শিকড় গ্রথিত হয়েছে।[৮৮]

ডোম আন্টোনীও ছিলেন ঢাকার উত্তরে অবস্থিত ভূষণার এক জমিদারের সন্তান। তিনি ভাওয়াল পরগণার নাগরীতে মিশন প্রতিষ্ঠা করে খ্রিস্টের বাণী প্রচার করতে শুরু করেন। ১৬৬৩ খ্রিঃ নাগরীতে মণ্ডলী স্থাপিত হয়। তিনি খ্রিস্টধর্মের মূলনীতিগুলো সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য করার জন্য প্রশ্নোত্তরমালা রচনা করেছেন।গ্রন্থটি ড. সুরেন্দ্রনাথ "ব্রাহ্মণ রোমান কাথলিক সংবাদ" নামে সম্পাদনা করেন। ১৯৩৭ খ্রিঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তা প্রকাশ করে। এটি বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। ১৬৬৬ খ্রিঃ ঢাকার কাথলিক মণ্ডলীর ইতিহাসে শুরু হয় নতুন

অধ্যায়। এ যুগে ডোম আন্টোনীওর মিশন সফলতা লাভ করেছিল। ১৬৪০ খ্রিঃ ফাদার ম্যানরিক যখন ঢাকায় আসেন তখন তেজগাঁওএ একটি মনাষ্টরি ও উপাসনাগৃহ দেখেছিলেন। তবে এ নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। পরবর্তীতে কাথলিক মিশনারীগণ এর সংস্কার করেন। অষ্টাদশ শতকে কাথলিক মিশনারীগণ ঢাকা অঞ্চলকে প্রধান কর্মক্ষেত্রে পরিণত করে। ১৭৪৭ খ্রিঃ তারা হাসনাবাদে নতুন মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করে। এই শতকেই বাংলা ভাষায় খ্রিস্টীয় সাহিত্য ক্রমবিকাশের প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করে উৎকর্ষতার দিকে অগ্রসর হয়।[৮৯] ১৭৪৩ খ্রিঃ পর্তুগালের লিসবন শহরে তিনটি বাংলা বই রোমান অক্ষরে মুদ্রিত হয়। বাংলা ভাষায় প্রথম ছাপা বই হিসাবে এগুলো বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্থায়ী হয়ে আছে। বই তিনটির নাম হলোঃ

(1) Catechismo do Doutrina Christa

(2) Crepar Xaxtrer orthbhed

(3) Vocabulrio em Idioma Dengllae Portuguez.

কাথলিক মণ্ডলী: বিশ্বাস বিস্তার সংস্থা ১৮৩৬ খ্রিঃ ঢাকা জেলার তুমিলিয়া, ১৮৪৫ খ্রিঃ গোল্লাতে দুটি নতুন মণ্ডলী স্থাপন করে। পবিত্র ক্রুশ সম্প্রদায় ১৮৫৩ খ্রিঃ চট্টগ্রাম, ১৮৫৬ খ্রিঃ যশোহর, ১৮৫৮ খ্রিঃ খুলনা জেলার শিমুলিয়া, ১৮৬২ খ্রিঃ শোলপুর, ১৮৬৭ খ্রিঃ লক্ষীবাজারে নতুন নতুন মণ্ডলী স্থাপন করে। ১৮৮২ খ্রিঃ বেনেডিকটিন সম্প্রদায়ের মিশনারীগণ মাউসাইদ, ১৮৯৪ খ্রিঃ তুইতাল, ১৯১৩ খ্রিঃ ধরেণ্ডা, ১৯৯২ খ্রিঃ ময়মনসিংহের রাণীখংএ নতুন নতুন মণ্ডলী স্থাপন করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে ঢাকা জেলার কাথলিকদের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল ছিল। কিন্তু সেই সময়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে জনসাধারণ খুবই অনগ্রসর ছিল। পল্লী অঞ্চলে যে কয়টি স্কুল ছিল তাদের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। সেই সময়ে রাঙ্গামাটিয়া স্কুলে প্রথম শ্রেণির ছাত্রদের কলার পাতায় নিজেদের তৈরি কালি কলমে লিখতে হতো।[৯০] দ্বিতীয় শ্রেণিতে শেখানো হতো ধারাপাত, শুভংকরী ও অংক।[৯১] নানা কুসংস্কার কাথলিক সমাজকে দুর্বল করে রেখেছিল। এছাড়াও খ্রিস্টীয় চেতনা ছিল নিম্ন স্তরে। তখন মিশনারীগণ নানাভাবে বালক-বালিকা, যুবক-যুবতীদের শিক্ষা ও খ্রিস্টীয় জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। ফলে শিক্ষার প্রতি সবারই আগ্রহ জেগে

উঠেছিল। যুদ্ধ শেষ হবার পর তারা কাথলিক মণ্ডলীতে দেশীয় নেতৃত্ব গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন। ফলে ১৯২১ খ্রিঃ নেতা গঠনের একটি পরিকল্পনা গৃহীত হলো। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে ঢাকা, ময়মনসিংহ ও দিনাজপুর জেলার বেশ কয়েকজন প্রতিশ্রুতিশীল কাথলিক যুবককে বান্দুরা বোর্ডিংএ এনে প্রাথমিক ধর্মতত্ত্ব বিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্র তৈরি করা হলো। কিছুকাল পরে ফাদার ডেলোনী এসে "লিটিল ফ্লাওয়ার সেমিনারী' স্থাপন করেন। তাদের পাঠ্যবিষয় ছিল ল্যাটিন ভাষা ও সাহিত্য। পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল ভার্জিল, সিসেরো ও সিজার। রোম থেকে যখন কোনো ভিজিটর আসতো তখন ছাত্রদের ল্যাটিন ভাষায় নাটক মঞ্চস্থ করতে হতো। যারা ইংরেজিতে দুর্বল ছিল তাদেরকে প্রাইভেটভাবে ইংরেজি শেখানো হতো। ফাদার ডেলোনী "ইছামতীর বাণী" নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করতেন। পরবর্তীতে এই নাম বদলে "টিন হর্ণ" রাখা হয়। এই পত্রিকা টাইপ রাইটারে ছাপা হতো। প্রায় ৩০/৪০ জন ছেলে এই পত্রিকাগুলোর উপর ডাক টিকেট লাগাতো। তারপর ঠেলাগাড়িতে করে হাসনাবাদ পোষ্ট অফিসে নেওয়া হতো ছাড়ার জন্য। ফাদার ডেলোনী একজন ভাল লেখক ও বক্তা ছিলেন। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম ও দিনাজপুর ডায়োসিস প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাকিস্তানী যুগে খ্রিস্টমণ্ডলী : ভারতবর্ষ থেকে বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশ প্রথমে পূর্ববাংলা ও পরে পূর্ব পাকিস্তান নামে পাকিস্তান রাষ্টের একটি প্রদেশে পরিণত হবার ফলে এদেশের খ্রিস্টীয় মণ্ডলী এক চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। তাই পাকিস্তান সৃষ্টির সাথে সাথে খ্রিস্টমণ্ডলীকে নতুনভাবে সংঘবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। ফলে এ কাজটি কাথলিক মিশনারীগণ সবার আগে করতে সক্ষম হয়।

কাথলিক মণ্ডলীর স্বর্ণযুগ: পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রথম দশকে বর্তমান বাংলাদেশের রোমান কাথলিকগণ শিক্ষা, ব্যবসায়, চাকুরি ও রাজনীতিতে অগ্রগতি সাধন করেছিল। ১৯৫০ খ্রিঃ বাংলাদেশে একজন আর্চবিশপ নিযুক্ত করা হলো। মার্কিন যুক্তরাষ্টের নাগরিক রেভারেণ্ড লরেন্স গ্রেনার, সিএসসি এই নবসৃষ্ট পদটি অলংকৃত করেন। ত্রিশের দশকে তিনি বাংলাদেশে আসেন। প্রথম থেকেই তিনি শিক্ষা ও ধর্মবিস্তারে মনোযোগী ছিলেন। তিনি কাথলিকদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে এক মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেন। বর্তমানে এদেশে কাথলিক মিশন সমূহের

পরিচালিত যে প্রায় ৪০টি হাইস্কুল চালু রয়েছে, সে সবের অধিকাংশই প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হয়েছিল আর্চবিশপ গ্রেনারের পৃষ্ঠপোষকতায়।[৯২] বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে ঢাকা শহরে নটর ডেম কলেজ ও হলিক্রশ কলেজএর গোড়াপত্তনের মূলেও ছিলেন আর্চবিশপ গ্রেনারের উদ্যোগ ও প্রেরণা।[৯৩] পাকিস্তানী আমলে কাথলিক মিশন স্কুল ও কলেজগুলি খুব জনপ্রিয় ছিল।

১৯৫২ খ্রিঃ অক্টোবর মাসে ঢাকার মগবাজারে ফিলাডেলফিয়া প্রদেশের কাথলিক মেডিক্যাল মিশনারী সিস্টারদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে 'হলি ফ্যামিলী হাসপাতাল'। সিষ্টারগণ নিজেরাই তা পরিচালনা করতেন। স্বাধীনতার পর অর্থাৎ ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে এটা বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির পরিচালনাধীনে হস্তান্তর করা হয়। ১৯৪৬ খ্রিঃ ব্রাদার ফ্লাভিয়ান চট্টগ্রামের দিয়াংয়ে "মিরিয়াম আশ্রম" নামে একটি অনাথাশ্রম স্থাপন করেন। বর্তমানে এটি এদেশের একটি শ্রেষ্ঠ খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে এখানে একটি অনাথাশ্রম, একটি হাইস্কুল, মৎস্যশিকার প্রকল্প, একটি নারীকল্যাণ প্রকল্প, একটি হাসপাতাল, একটি নার্সিং স্কুল ও একটি গৃহনির্মাণ প্রকল্প রয়েছে।

আর্চবিশপ লরেন্স গ্রেনারের কার্যকালকে কাথলিক মণ্ডলীর ইতিহাসে 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়।[৯৪] তার সময় ১৯৫২ খ্রিঃ সিলেটের শ্রীমঙ্গল ও বান্দরবানে দুটি প্যারিশ বা ধর্মপল্লী স্থাপিত হয়। ফাদার চালর্স ইয়াং বাংলাদেশের বিভিন্ন কাথলিক ধর্মপল্লীতে সমবায় ঋণদান সমিতি গঠন করে ছিলেন। তাই তাকে খ্রিস্টান ঋণদান সমিতি আন্দোলনের অগ্রদূত বলা হয়। তিনি দরিদ্র জনগণকে মহাজনদের নিকট ঋণগ্রস্ত হওয়ার দায় থেকে রক্ষা করার জন্য তাদেরকে সমবায় সমিতির মধ্য দিয়ে সঞ্চয় করার শিক্ষা দিতে শুরু করেন। বর্তমানে সেই সমিতি বিরাট আকার ধারণ করেছে এবং দেশের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। আর্চবিশপ গ্রেনারের সময়েই ঢাকা জেলার কাথলিক নেতৃবর্গের মধ্যে একটি খ্রিস্টান এসোসিয়েশন নামে একটি অরাজনৈতিক সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে।

স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ে ও তার পরে কাথলিক মণ্ডলীর অন্যতম সন্ন্যাস-সংঘ – পবিত্র ক্রুশ সংঘের মিশনারীগণ – এদেশে আর্তমানবতার সেবায় যেরূপ নিঃস্বার্থভাবে নিজেদের বিলিয়ে দিতে শুরু করেন তা সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ফাদার টিম, ফাদার গেডার্ট, ফাদার হোমরিক, ফাদার জিমারম্যান, ফাদার তুরঞ্জো, ফাদার ইভান্স ও ফাদার লাব্বে।

বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ

- মিশনারীদের সেবা নিঃস্বার্থ
- প্রেরণার উৎস
- উত্তম শিক্ষাদান
- দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ
- উৎসাহদাতা
- উদার মনোভাবাপন্ন
- দানশীল ও কর্মঠ
- উত্তম প্রচারক

উদ্দেশ্য

- খ্রিস্টধর্ম প্রচার করা ও তার প্রসার ঘটানো
- স্থানীয় খ্রিস্টমণ্ডলী গঠন
- শিক্ষার বিস্তার ঘটানো
- নৈতিক গঠন ও শিক্ষা প্রদান
- সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।
- দেশীয় নেতৃত্ব গড়ে তোলা।

পদ্ধতি

- বাড়ি বাড়ি গিয়ে
- ধর্মীয় নাটক মঞ্চস্থ করার মাধ্যমে
- পালাগান বা যাত্রাগানের মাধ্যমে
- বইপুস্তক বিলি করে
- আঞ্চলিক ভাষায় বইপুস্তক প্রকাশ করে
- খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষা
- প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার প্রদান করে
- জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে শিক্ষা দিয়ে
- মাতৃভাষায় শিক্ষাপ্রদান করে

অন্তরায় বা বাধাসমূহ

- নিরক্ষতা ও অজ্ঞতা
- কুসংস্কার
- প্রাচীনপন্থী মনোভাব
- চরম দরিদ্রতা
- প্রাকৃতিক বিপর্যয়
- খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ ও চেতনার অভাব
- রাজনৈতিক অস্থিরতা

সার্থকতা: সেই সুলতানী আমল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে মিশনারীগণ নিজেদের স্বার্থচিন্তা না ক'রে দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য, সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তারা তাদের ভালোবাসা ও সেবাকাজের মধ্য দিয়ে নিজেদের সবকিছু উজাড় করে দিয়ে মানুষের সেবা করে চলেছেন। তারা মঙ্গলবাণীর সুমন্ত্রণাকে অবলম্বন করে

এগিয়ে চলেছেন। যার ফলে আমরা শিক্ষা বিস্তারে তাদের অনন্য ও অসাধারণ ভূমিকা দেখতে পাই।

 # প্রদীপ (Fr. Lucio), অনুবাদক, "নতুন মানুষের আবির্ভাব" (পৃষ্ঠা নং ১-৩৮৫)

বাইবেল হলো ঈশ্বরের শুভ পরিকল্পনার বিশ্বাসভিত্তিক ইতিহাসের বর্ণনা। বাইবেলের দুটি অংশ আছে: প্রথম অংশে ঈশ্বরের মনোনীত একটা জাতি কীভাবে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে প্রতিশ্রুত দেশের দিকে যাত্রা করেছে তার ঘটনাবহুল কাহিনী ও ধর্মীয় নেতৃবর্গ যেমন প্রবক্তা ও মুনীঋষিদের উপদেশ ও দিকনির্দেশনা। দ্বিতীয় অংশে ঈশ্বরের মুক্তি পরিকল্পনার চূড়ান্ত বাস্তবায়ন : যীশুর মধ্য দিয়ে সেই পূর্ণ মানুষের আবির্ভাব ও তার পরিণতি। ইতিহাসের গতিধারায় ঈশ্বর তাঁর কাজ ও বাণীর মধ্য দিয়ে নিজেকে তাদের নিকট প্রকাশ করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে: মানুষ যেন তাঁকে জানতে, মানতে ও ভালোবাসতে পারে। সৃষ্টির আদি থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে তিনি মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। মানুষ হয়ে জন্ম নিয়ে ঐশপ্রেমের মূর্ত প্রকাশ ঘটিয়ে ও সেই প্রেম বিতরণের মধ্য দিয়ে যীশুর আত্মপ্রকাশের পূর্ণতা পেয়েছে। সৃষ্টি ও মুক্তির ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশের ধাপগুলো হলো - জগৎ-সৃষ্টি ও মানবসৃষ্টি, আদি পিতা-মাতা, কুলপতি নোয়া, আব্রাহাম, মোশী ও প্রবক্তাগণ, বিচারকগণ রাজাবলি, ইত্যাদি। অবশেষে কালের পূর্ণতায় যীশুখ্রিস্টের জন্ম, ক্রুশীয় মৃত্যু, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ ও মণ্ডলী গঠন। পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মের মূল ভাবটিই হলো ভালোবাসা। ঈশ্বর মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করার জন্য নিজের পুত্রকে এজগতে পাঠিয়ে ভালোবাসার প্রমাণ দিয়েছেন। যীশুখ্রিস্ট আমাদের কাছে ঈশ্বরের স্বরূপ অর্থাৎ পবিত্র ত্রিত্বকে প্রকাশ করেছেন। পিতা ও পুত্র যেমন এক এবং পরস্পরকে ভালোবাসেন, তেমনিভাবে তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে পরস্পরের প্রতি ভালবাসায় এক হয়ে থাকার শিক্ষা দিয়েছেন। ক্ষমাশীল পিতা, হারানো ছেলে ও কঠিন হৃদয় ভাইয়ের উপমা কাহিনীর (লুক ১৫:১১-৩২) মধ্য দিয়ে যীশু ঐশ্বরিক ভালোবাসার সুন্দর চিত্র তুলে ধরেন। যীশু ক্রুশের উপর যন্ত্রণাভোগের সময় তাঁর শত্রুদের ক্ষমা করে দিয়ে ঈশ্বরের ভালোবাসার চূড়ান্ত প্রমাণ দিলেন। ঈশ্বর হলেন চিরজীবন্ত। তিনি ছিলেন, আছেন ও থাকবেন। তিনি মানুষকে অন্যান্য প্রাণীর মতো করে সৃষ্টি করেননি। মানুষকে তিনি তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং আমরা

আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের কিছু গুণ পেয়েছি। তা হলো ভালোবাসা, সৃজনশীলতা, শক্তি, মুক্তি, পবিত্রতা, বিবেক, ক্ষমা ইত্যাদি।

পবিত্র পরিবার : যীশু, মারীয়া ও যোসেফের পরিবার হলো পবিত্র পরিবার। আমরা এই পরিবার থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করি। মারীয়া ও যোসেফের মধ্যে ছিল পারস্পরিক শ্রদ্ধা, মর্যাদাবোধ ও ভালোবাসা। তাদের মধ্যে ছিল গভীর আধ্যাত্মিকতা ও মনের মিল। তাঁদের মধ্যে ছিল একতা ও দায়িত্ববোধ। এছাড়াও আমরা দেখতে পাই, আমাদের সামনে সবচেয়ে সুন্দর আদর্শ হলেন বালক যীশু। তার শৈশবের ঘটনাগুলো আমাদের জীবনের জন্য সুন্দর আদর্শ প্রকাশ করে। তা হলো, পিতার গৃহে থাকার আগ্রহ, ধর্মীয় জ্ঞান লাভের আগ্রহ, পিতামাতার প্রতি বাধ্যতার মনোভাব, কাজে অংশগ্রহণ, পরিবারে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সম্পর্ক। মানবজাতির মুক্তিদাতা যীশু খ্রিস্ট ঐশরাজ্যেও সুখবর প্রচারের জন্য তিন বছর প্রকাশ্যে কাজ করেছেন। এই আশ্চর্য কাজগুলো আমাদের বিশ্বাসের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আমরা পবিত্র বাইবেলে অনেক আশ্চর্য ঘটনা দেখতে পাই। যীশু খ্রিস্টের অলৌকিক কাজগুলো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কারণে ভিন্ন রকমের হয়েছে। যীশু খ্রিস্ট বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে মানুষের মঙ্গল সাধন করেছেন। যীশুর আশ্চর্যকাজের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো : (১) যীশু খ্রিস্ট হলেন ঈশ্বর এবং (২) পিতা ঈশ্বর তাঁকে একটি বিশেষ কাজ করার জন্য প্রেরণ করেছেন। যীশু খ্রিস্ট প্রকাশ্য প্রচার জীবনে তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী ও আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে মানুষের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শিক্ষা প্রদান করেছেন। তাঁর শিক্ষার মধ্যে রয়েছে সত্য ও সুন্দরের পথে জীবন যাপন এবং ন্যায্যতা, শান্তি ও ভালোবাসার পথ অনুসরণ করার মতো সকল বিষয়ের দিক নির্দেশনা। যীশু তাঁর বাণী প্রচারের কাজে বারোজন সহযোগীকে সঙ্গী হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। তাদেরকে তিনি নাম দিয়েছেন প্রেরিতশিষ্য বা প্রেরিতদূত। সাধু পিতর ছিলেন প্রেরিতদের মধ্যে প্রধান। যীশু পিতরের উপর এক বিশাল দায়িত্ব দিয়েছেন। 'আমার মেষদের দেখাশুনা কর' (যোহন ২১:১৫-১৭)। এই দায়িত্ব পিতরের উপর অর্পিত হয়েছিল। পিতর হয়ে উঠেছেন শিষ্যদলের প্রধান ও খ্রিস্টমণ্ডলীর নেতা। পিতর অনেক ঘটনার সাক্ষী। পরবর্তীতে পিতর গুরুর পথ অনুসরণ করে বিশ্বাস রক্ষার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। যীশুখ্রিস্ট চেয়েছেন, তাঁর সেবার জীবন ও বাণীর মধ্য দিয়ে ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে। ঐশরাজ্য হলো ভালোবাসা,

আনন্দ, ন্যায্যতা, শান্তি, ক্ষমা, সহভাগিতা ও সহযোগীতার রাজ্য। ঐশরাজ্যে প্রবেশ করার জন্য যীশু খ্রিস্টের আমন্ত্রণ আসে উপমা বা রূপকের মধ্য দিয়ে, যা তাঁর শিক্ষার একটি সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য।

যীশুর নানাবিধ শিক্ষা

- ক্রোধের বিষয়ে শিক্ষা (মথি ৫:২১-২৬)
- ব্যভিচারের বিষয়ে শিক্ষা (মথি ৫:২৭-৩২)
- শত্রুকে ভালোবাসার শিক্ষা (মথি ৫:৪৩-৪৮)
- প্রার্থনা ও উপবাস সম্বন্ধে শিক্ষা (মথি ৬:৫-১৮)
- শ্রেষ্ঠ দুটি আজ্ঞা (মার্ক ১২:২৮-৩৭)
- ন্যায়বিচার সম্বন্ধে শিক্ষা (লুক ১৮:২-৮)
- ক্ষমার বিষয়ে শিক্ষা (মথি ১৮:২১-৩৫)

উপমার মাধ্যমে শিক্ষা[৯৫]

- বীজবাপকের দৃষ্টান্ত (মার্ক ৪:১-২৫)
- আঙ্গুর চাষীদের গল্প (মার্ক ১২:১-১২)
- শ্যামাঘাসের দৃষ্টান্ত (নথি ১৩:১৪-৩০)
- হারানো মেষের কাহিনী (লুক ১৫:১-৭)

খ্রিস্টমণ্ডলীর বৈশিষ্ট্যসমূহ

- খ্রিস্টমণ্ডলী একটি মিলনসমাজ
- খ্রিস্টমণ্ডলী সেবক
- খ্রিস্টমণ্ডলী বাণী প্রচারক
- খ্রিস্টমণ্ডলী মানবদেহের মতো।
- দয়ালু শমরীয়ের গল্প (লুক ১০:৩০-৩৭)

খ্রিস্টমণ্ডলীর উদ্দেশ্য

- খ্রিস্টধর্ম প্রচার
- খ্রিস্টমণ্ডলী স্থাপন
- নৈতিক শিক্ষা প্রদান
- পরস্পরকে ভালোবাসা ও সেবা করা

শিক্ষা বা প্রচারের কৌশলগুলো

- বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে
- সহজ, সরল ভাষায় উপদেশ দেয়া
- উপমা বা গল্পের মাধ্যমে শিক্ষাদান
- সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষা
- পায়ে হেঁটে চলা

প্রতিবন্ধকতা বা অন্তরায়

- প্রতিকূল পরিস্থিতি
- অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা
- দুর্গম এলাকা
- ষড়যন্ত্রকারীদের রোষানলে পতিত হওয়া
- যাতায়াতের সমস্যা

সার্থকতা: যিশুখ্রিস্ট তাঁর পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে সেবা কাজ করেছেন। তিনি পরিবারে মা-বাবার সাথে থেকে তাদের সহযোগীতা করেছেন। তাদের বাধ্য ও অনুগত থেকেছেন। এরপর যীশু বিভিন্ন আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে সমাজের জনগণের সেবা করে গেছেন। তিনি মণ্ডলীতে বা সমাজঘরে আধ্যাত্মিক শিক্ষা দানের মাধ্যমে সেবা করেছেন। তিনি গোটা মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য তার জীবন দান করেছেন। যীশুর আদর্শ অনুসরণ করতেই আমরা আহূত হয়েছি। তাঁকে

অনুসরণ করার অর্থ হলো তিনি যেভাবে জীবন যাপন করেছেন সেই একই আদর্শ নিজ জীবন বাস্তবায়িত করা। মানুষ যখন তার পরিবার, সমাজ, মণ্ডলী বা রাষ্ট্রের সেবার জন্য জীবন ব্যয় করে তখনই তাদের জীবন হয়ে ওঠে সুন্দর, কল্যাণময় ও সার্থক।

 # ডি'কস্তা, যেরোম, "বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী'(পৃষ্ঠা সংখ্যা ১-৫১৫)

১৪৯২ খ্রিঃ খ্রিষ্টোফার কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের ছয় বছর পর পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করেন। ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে মিলন ঘটে। এর পরেই পর্তুগীজগণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল দখল করতে থাকেন। ১৫০০ খ্রিঃ থেকেই বিভিন্ন যাজকসংঘ পর্তুগাল থেকেই ব্যবসায়ীদের সাথে ভারতে এসে সমুদ্রউপকূলীয় জেলাগুলোতে গির্জা নিমাণ করতে শুরু করেন।[৯৬] ১৫৫৭ খ্রিঃ থেকে ভারতে ব্যাপক ভাবে এবং বিস্ময়কর সাফল্যের সঙ্গে পর্তুগীজদের ধর্মপ্রচার কাজ চলতে থাকে।[৯৭] ১৬০৬ খ্রিঃ মাইলাপুরস্থ সান থোম ধর্মপ্রদেশ স্থাপিত হয়। বঙ্গে পর্তুগীজ ব্যবসায়ী ও ঔপনিবেশিকদের আগমনের ফলেই পরবর্তীকালে ডাচ, ইংরেজ, ফরাসী ও অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির ব্যবসা উদ্যোগের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। তবে পর্তুগীজদেরই কেবল ধর্মপ্রচারের প্রবল আগ্রহ ছিল।[৯৮] ভিনসেন্ট এ. স্মিথ রচিত "দি অক্সফোর্ড হিস্টরী অব ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তকে দেখা যায় যে, ১৫৭২ খ্রিঃ মোঘল সম্রাট আকবর কাম্বে বন্দরে (বর্তমান গুজরাট প্রদেশের) সর্বপ্রথম ইউরোপীয় অর্থাৎ পর্তুগীজ খ্রিস্টানদের সংস্পর্শে আসেন। ১৫৭৬-১৫৭৭খ্রিঃ তিনি বঙ্গে ভিকার জেনারেল ও ধর্মপ্রদেশীয় ফাদার জুলিয়ানো পেরেরার কাছ থেকে খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। সম্রাটের ১০ বছর বয়স্ক দ্বিতীয় পুত্র শাহজাদা মুরাদকে পর্তুগীজ ভাষা ও খ্রিস্টান নীতি শিক্ষাদানের ভার দেওয়া হয় ফাদার মনসেরাতের উপর। সম্রাটের অনুরোধে ১৫৯০-৯২ খ্রিঃ এবং ১৫৯৫ খ্রিঃ যেজুইটদের আরও দুটি দল সম্রাটের কাছে যান এবং খ্রিস্টধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান দান করেন। ফাদার ফার্নান্দেজ ও ফাদার দমিঙ্গো দু'জন হুগলিতে একটি স্কুল ও হাসপাতাল নির্মাণ করেন।[৯৯] ১৫৯৯খ্রিঃ আরাকানরাজ খুব উৎসাহের সাথে ধর্মপ্রচারকদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন ও তাঁর রাজ্যব্যাপী খ্রিস্টধর্ম প্রচারের অনুমতি দেন। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত তহবিল থেকে অর্থ দিয়ে চট্টগ্রামে গির্জা নির্মাণের ব্যবস্থা করে দেন। চণ্ডিকায় যীশুর পবিত্র নামের গির্জাটি ১৬০০ খ্রিঃ উৎসর্গীকৃত হয়। বঙ্গে যেজুইট ফাদারদের এটিই প্রথম গির্জা। ফাদার

ফ্রান্সিসকো ফার্নান্দেজ ও ফাদার আঁদ্রে বভেস আরাকান রাজ্যের অর্থানুকূল্যে চট্টগ্রামে সাধু জন বাপ্তিস্তের গির্জা নির্মাণ করেন। ১৬১২ খ্রিঃ আগস্টিনিয়াম ফাদার ঢাকায় নারিন্দায় "স্বর্গোন্নীতা রাণীর" গির্জা নির্মাণ করেন। কিছু কালের মধ্যেই তারা শ্রীপুর, লরিকূল, কাত্রাবুতে আরো গির্জা নির্মাণ করেন। ১৬২১ খ্রিঃ তারা আরাকানে 'সাফল্যের রাণী' নামে গির্জা নির্মাণ করেন।[১০০] আন্তইনদা রোজারিও ঢাকা জেলার বিভিন্ন অঞ্চল ও আসামে বাণী প্রচার করেন।[১০১] তিনি গান, তর্কবিতর্ক ও কথোপকথনের মাধ্যমে ধর্মপ্রচার করতেন। তার রচিত "সাধু আন্তনীর পালা"সহ অন্যান্য পালাগান ভাওয়াল অঞ্চলের কাথলিকদের মধ্যে এখনও পরিদৃষ্ট হয়। পরবর্তীকালে বাংলা ভাষায় ধর্মশিক্ষা দানের জন্য "ব্রাহ্মণ রোমান কাথলিক সংবাদ" নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। বাংলা গদ্য রীতির প্রচলনে এ গ্রন্থটি মূল্যবান অবদান রেখেছে। ফাদার সানতুচ্চি ঢাকায় পৌঁছলে দূর-দূরান্তের গ্রামগুলো থেকে খ্রিস্টানরা নৌকাযোগে দুই তিন দিনের পথ পাড়ি দিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে। এরা ছিল খুবই দরিদ্র। এরা নিজ গ্রামে বাস করতে পছন্দ করতো বলে এদেরকে একত্রিত করা খুব কষ্টকর হতো। তাই ফাদারগণ বিচ্ছিন্ন গ্রামগুলিতে গিয়ে বাণী প্রচার করতেন। ১৭৫০ খ্রিঃ ফাদার আন্দ্রোজিও দা সান্তো আগস্তিনো তার এক বিবরণীতে উল্লেখ করেন যে, লোকেরা দরিদ্র হলেও সুন্দর মনোভাব নিয়ে ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করছিল। ফাদার তৎকালীন ধর্মপ্রচার পদ্ধতি সম্পর্কে অমূল্য তথ্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তিনি বলেন "আমাদের বহু ক্যাটেখিষ্ট আছেন। তারা আমাদের কাছ থেকে কোন বেতন পান না, কারণ বেতন দেওয়ার সামর্থ্য আমাদের নেই। তাদের শিষ্যরা অর্থাৎ খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা গ্রহণকারীগণ ক্যাটেখিষ্টদের ভরণপোষণ করে থাকে। তারা তাকে 'মাস্টার' বলে সম্বোধন করে ও খুব শ্রদ্ধাও করে। জপমালা বিষয়ক গান করে ধর্মশিক্ষা দেওয়া হতো।[১০২] ১৭৯৯ খ্রিঃ ব্যাপ্টিস্ট মিশনারীগণ বঙ্গে আগমন করে। স্কুল ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান চালুর ব্যাপারে তারা প্রথম উদ্যোগ নেন। ১৮৩৭ খ্রিঃ যেজুইট ফাদার গোয়ারা চট্টগ্রামে একটি গির্জা, স্কুল ও যাজক ভবন নির্মাণ করেন। ফরাসী বিশপ লুই তার্বেদএর কার্যকালে বঙ্গের প্রথম কাথলিক পত্রিকা 'বেঙ্গল কাথলিক এক্সপজিটর' প্রকাশিত হয়।[১০৩] ১৮৪১ খ্রিঃ ১৩ই মার্চ, ফাদার কেলী এক্সপজিটরকে 'দি কাথলিক হেরাল্ড' নামে প্রকাশ করেন। ১৮১১ খ্রিঃ মধ্য বঙ্গের ইংরেজ বসতি গুলোতে ইংরেজি ভাষাভাষী স্কুল স্থাপিত হয় । এসব উন্নত ধরনের স্কুলের সঙ্গে ডিসপেনসারি হাসপাতাল সংযুক্ত ছিল। বিশপ কেরু স্কুল ডিসপেন্সারি ও অনাথ আশ্রম

পরিচালনার জন্য আয়ারল্যাণ্ড থেকে লরেটো সংঘের সিস্টারদের আনার ব্যবস্থা করেন। লরেটো সংঘের সিস্টারদের প্রধান কাজ ছিল স্কুলে শিক্ষাদান। ১৮৪৩ খ্রীঃ ফাদার গোয়ারা বরিশালে ১টি স্কুল, গির্জা ও যাজক ভবন নির্মাণ করেন। কলিকাতার বনিকগণ এসব কাজের জন্য অর্থ যুগিয়েছেন।

পর্তুগীজদের অবদান : বাণী প্রচারকদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলেই ভারত বর্ষের দুর্ভেদ্যতম অঞ্চল সমূহে খ্রিস্টধর্ম প্রবর্তিত হয়। তারা প্রচারের সুবিধার জন্য প্রথম মুদ্রণ যন্ত্র আমদানী ও পুস্তকাদি ছাপার ব্যবস্থা করেন।[১০৪] যেজুইট ফাদারগণ ১৫৫৬ খ্রিঃ গোয়ায় প্রথম মুদ্রণ যন্ত্র আমদানী করেন। ১৫৫৭ খ্রিঃ তামিল ভাষায় অথচ রোমান হরফে প্রথম পুস্তকটি মুদ্রিত হয়। এটি ছিল সাধু ফ্রান্সিস, জেভিয়ার বিরচিত 'Doctrina Christao'এর তামিল অনুবাদ।[১০৫] "খ্রীস্টীয় ভন্নক নর্ম" ১৫৯৯ খ্রিঃ ফাদার ফান্সিসকো ফার্নান্দেজ কথোপকথনের ভঙ্গীতে একটি "ক্যাটেখিজম" পুস্তিকা লিখেছিলেন। পরবর্তীতে ফাদার দোমিঙ্গো দা সুজা আরও একটি "ক্যাটেখিজম" রচনা করেন। পরবর্তীতে পুস্তকদ্বয় বাংলায় অনুবাদ করা হয়। ১৬৮২ খ্রিঃ ফাদার মার্কোস আন্তোনিও সানতুচ্চি, ফাদার ইগ্নাসিউস গমেজ ও ফাদার মানুয়েল সয়রবা একত্রে মিলে বাংলায় একটি শব্দতালিকা, ব্যাকরণ, খ্রিস্টীয় প্রার্থনা মালা ও খ্রিস্টধর্মের শিক্ষার অনুবাদ রচনা করেন। ১৭১২-১৭১৪ খ্রিঃ ফাদার আন্তোনিও ক্লদিউস বার্বিয়ে মাইলাপুরের বিশপ ফ্রান্সিসকো লেইন এস.জে.'র সঙ্গে বঙ্গে সফরকালে বাংলাভাষা আয়ত্তপূর্বক একটি "ক্যাটেখিজম" রচনা করেন। ১৯৪৩ খ্রিঃ ফাদার ম্যানুয়েল দা আসুম্পসাঁও রচিত 'কৃপাশাস্ত্রের অর্থভেদ' পর্তুগালের লিসবন থেকে প্রকাশিত হয়। কথোপকথনের ভঙ্গিতে এ পুস্তকটি খ্রিস্টধর্মের মাহাত্ম্য তুলে ধরেছে।[১০৬] ফাদার আসুম্পসাঁওয়ের বিশেষ অবদান হচ্ছে "Vocabulrio em Idima Benglla e Portugues" নামক পুস্তকটির রচনা। বাংলা গদ্য সাহিত্যের উন্নয়নে পর্তুগীজ বাণী প্রচারকদের অগ্রণী ভূমিকা অনস্বীকার্য।[১০৭] সাধু টমাস সর্ব প্রথমে ভারতে এসে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেন। তিনি ৫২ খ্রিঃ জাহাজযোগে ক্রাঙ্গানোরে পৌঁছেন। ভারতে সাধু টমাসের আগমনের অকাট্য প্রমাণ না থাকলেও খ্রিস্টীয় ৩য় শতক থেকে শুরু করে ভারতে খ্রিস্টানদের অস্তিত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে। খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাসে মহান বাণী প্রচারকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ফাদার ফ্রান্সিস জেভিয়ার।

১৫৪২ খ্রিঃ ৬ই মে তিনি গোয়ায় পৌঁছান। সেখানে ক্রমে ক্রমে বহু গির্জা ও মঠাশ্রম গড়ে উঠেছিল। সেখানকার অধিবাসীদের নৈতিক চরিত্র ছিল শোচনীয়। এদের অন্তরে পরিবর্তন আনার জন্য তিনি তৎপর হয়ে উঠেন। তিনি অসুস্থ ও বন্দীদের পরিচর্যা করেন, ধর্মপ্রচার করেন, ছেলেমেয়েদের প্রার্থনা, শ্রদ্ধামন্ত্র ও ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা শিক্ষা দেন।[১০৮] তিনি নিজ হাতে ঘন্টা বাজিয়ে নগরের সবার কাছে গিয়ে কিশোর-কিশোরীদের সমবেত করে ধর্মশিক্ষা দিতেন।[১০৯] এরা নিজ গৃহে ফিরে গিয়ে পিতামাতাদের এই ধর্মশিক্ষার কথা পুনর্ব্যক্ত করে খ্রিস্টের প্রতি অনুরক্ত হতে অনুপ্রাণিত করতো। গোয়ার বিশপ ফাদার জেভিয়ারের এ ধর্মশিক্ষাদান পদ্ধতি অনুকরণ করার জন্য অন্যান্য যাজকদের নির্দেশ দেন। ফাদান জেভিয়ার ধর্মশিক্ষাদানসহ পবিত্র সংস্কারসমূহ প্রদান করেন এবং পৌত্তলিক প্রথাসমূহ উচ্ছেদ করেন। তিনি তামিল ভাষায় প্রশ্নোত্তরে ধর্মশিক্ষা, প্রেরিতগণের শ্রদ্ধামন্ত্র, ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা ও কিছু প্রার্থনা অনুবাদ করেন।[১১০] তিনি কিশোর কিশোরীদের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করতেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন এরাই সব কিছু শিখে উত্তম খ্রিস্টান হবে। ছেলেমেয়েরা গৃহে ফিরে তাদের পিতামাতাদেরওধর্মশিক্ষা দিতো। কোচিনে তিনি একটি কলেজ স্থাপন করেন। কাথলিক মণ্ডলীর ন্যায় ভারতীয় উপমহাদেশে প্রটেস্টান্ট মণ্ডলীও বাণীপ্রচার ও শিক্ষা বিস্তারের কাজে লিপ্ত ছিলেন।

ভিকারিয়েটে শিক্ষা ব্যবস্থা : বিশপ বালসিপের প্রশিক্ষণে ও পেশায় শিক্ষক ছিলেন বলে ভিকারিয়েটে কাথলিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন। তাঁর পূর্বসূরি বিশপ দ্যুফাল ভিকারিয়েটের অধিকাংশ জেলাতেই স্কুল স্থাপন করেছিলেন। এসব স্কুল যোগ্য মাস্টারদের দ্বারা পরিচালিত হতো। এছাড়াও এসব স্কুলে মৌলিক শিক্ষণীয় বিষয়াদি ও ধর্মশিক্ষা দেওয়া হতো।[১১১] ১৮৮২ খ্রিঃ ডম গ্রেগরী দ্য গ্রুত ওএসবি ঢাকায় বোর্ডিংসহ একটি স্কুল স্থাপন করেন। এর নাম ছিল সেন্ট গ্রেগরীজ স্কুল। এখানে ৯ জন অনাথ বালক ও প্রায় ৩৫ জন বালক-বালিকা দিনের বেলায় পড়াশুনা করতো। ৯ জন অনাথ বালকের মধ্যে ২ জন চট্টগ্রামের, ১ জন বরিশালের ও ৬ জন ঢাকার।[১১২] ১৮৮৩ খ্রিঃ এক রিপোর্টে বলা হয় সেন্ট গ্রেগরীজ স্কুলে শিক্ষকের সংখ্যা ২ জন থেকে ৪ জনে উন্নীত করা হয়েছে।[১১৩] বর্তমান সেন্ট গ্রেগরীজ স্কুলের গোড়াপত্তন এভাবেই হয়েছিল। ১৮৮৩ খ্রিঃ চট্টগ্রামে ফাদার ডম গ্রেগরী সেন্ট স্কলাস্টিকাস কনভেন্ট স্থাপনে সহায়তা

করেন। ১৮৮৭ খ্রিঃ সেন্ট জনস ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯০ খ্রিঃ ফাদার পীটারস বাণী প্রচারের জন্য আকিয়াব থেকে "The Indo Burman Catholic News" নামক ইরেজি ভাষায় কাথলিক সংবাদপত্র প্রকাশ শুরু করেন। এটি সারা পূর্ববঙ্গের মধ্যে প্রথম কাথলিক সংবাদপত্র।[১১৪] ১৮৯০ খ্রিঃ লক্ষীবাজারে মেয়েদের বোর্ডিংসহ নতুন কনভেন্ট স্কুল চালু করেন।[১১৫] ১৯০০ খ্রিঃ ৬ই জুন ঢাকা ধর্মপ্রদেশকে ১০টি কেন্দ্রীয় বাণী প্রচার কেন্দ্রে ভাগ করা হয়। এসব কেন্দ্র থেকে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে বাণী প্রচার করা হতো। এসব কেন্দ্রে একটি করে পাকা গির্জা, স্কুল ও যাজকভবন ছিল। এদের অধীনস্থ উপকেন্দ্র সমূহে ছিল বাঁশ নির্মিত গির্জা-কাম-স্কুল। এরই মধ্যে অনেক ধর্মসংঘের সিস্টারগণ নিজেদের কাজ বেশ সম্প্রসারিত করেন। তারা মেয়েদের জন্য ক্লাস, বিবাহের প্রস্তুতিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এমনকি বোর্ডিং ও অনাথ আশ্রম চালু করেন। ক্রমান্বয়ে সিস্টারদের শিক্ষা ও সেবামূলক কাজ তৎকালীন ঢাকা ধর্মপ্রদেশে বিস্তার লাভ করে।[১১৬] শিক্ষকতা ছাড়াও তারা বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে ধর্মপ্রচার, ঔষধ বিতরণ করতেন, কুষ্ঠগৃহ ও বৃদ্ধাশ্রম পরিচালনাও করতে থাকেন। বিশপ হার্তের সময়ে প্রতিটি স্থানে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, বান্দুরা ও আকিয়াব) সরকারী স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হাইস্কুল, প্রতিটি বাণী প্রচার কেন্দ্রে সরকার স্বীকৃত প্রাইমারী স্কুল ও ক্যাটেখিস্ট পরিচালিত স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। পবিত্র ক্রুশ সংঘের ব্রাদারগণ প্রধানতঃ বিদ্যালয় পরিচালনা, শিক্ষকতা ও ধর্মশিক্ষাদানের কাজ করতেন। নানা বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও ক্রমান্বয়ে তাদের কাজের ক্ষেত্র ও পরিধি বিস্তার লাভ করে। অভিজ্ঞ বাণী প্রচারক বিশপ ল্যাগ্রাঁ ধর্মপ্রদেশে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেন। বিশপ মহোদয় ৯টি কেন্দ্র পূর্ণ উদ্যোমে চালু রাখেন। প্রতিটি কেন্দ্রে একটি করে স্কুল ছিল। (ঢাকা, রাণীখং, তুমিলিয়া, বান্দুরা, গোল্লা, গৌরনদী, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও আকিয়াব)।[১১৭] ১৮৯৪-১৯০৯ খ্রিঃ 'হলিক্রস ভের্নাস্কুলার বুকলেট সিরিজ' নামে বাংলা ভাষায় ধর্মীয় পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই ৩৫টি পুস্তক-পুস্তিকা বের হয়। এগুলো ছিল ধর্ম শিক্ষা, প্রার্থনা, ধর্মীয় গান, সাধুসাধ্বীর জীবনী ও উপদেশ বিষয়ক। তখন বাংলায় 'খ্রিস্টের অনুকরণ' পুস্তকটিও প্রকাশিত হয়। বিশপ ল্যাগ্রাঁ ১৯২০ খ্রিঃ "ধর্মজ্যোতি" নামে একটি ধর্মপ্রদেশীয় মাসিক সাময়িকী প্রকাশ করেন। এটিই ছিল বাংলা ভাষার প্রথম সাময়িকী।[১১৮]

এ সাময়িকীর উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় বিষয়াদি তুলে ধরা, যুক্তিতর্ক দ্বারা ধর্মমত ব্যক্ত করা ও বিরোধী মত খণ্ডন করা।

১৯২৭ খ্রিঃ হলিক্রস সিস্টারগণ প্রথমে তুমিলিয়ায় হলিক্রস কনভেন্টে কাজ শুরু করেন। তাদের প্রচার ও সেবামূলক কাজ বিভিন্ন এলাকায় বিস্তার লাভ করে। এছাড়া সিস্টারদের পরিচালিত হলিক্রস গালর্স হাইস্কুল (১৯৫১ খ্রিঃ) এবং হলিক্রস কলেজ (১৯৫০ খ্রিঃ) ঢাকা নগরীতে মেয়েদের দুটি অন্যতম বিদ্যালয় হিসাবে বিশিষ্টতা অর্জন করে।[১১৯] একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নারী শিক্ষার ব্যবস্থা করায় সমাজ বিশেষ উপকৃত হয়েছে। ১৯২৭ খ্রিঃ ঢাকা ধর্মপ্রদেশের বিভক্তির পর নবগঠিত ঢাকা ধর্মপ্রদেশে ৮টি বাণী প্রচার কেন্দ্রের অধীনে ২১টি গির্জা ও ৩ টি হাইস্কুল ছিল। ১৯৩৩ খ্রিঃ ৫ই মার্চ সিস্টার রোজ বার্ণাড, সিএসসি ৮ জন তরুণীকে নিয়ে ধর্মপ্রদেশীয় সিস্টার সংঘের প্রার্থীকাল শুরু করেন। প্রতিষ্ঠিত হয় "প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার সঙ্গিনী" সঙ্ঘ, এসএমআরএ। এই সংঘের সদস্যাগণ ক্রমান্বয়ে তাদের শিক্ষকতা, চিকিৎসা, ধর্মশিক্ষাদান, সেলাই কেন্দ্র পরিচালনা, হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ, সক্রিয় খ্রিস্টীয় সমাজগঠন, প্রাকৃতিক পরিবার পরিকল্পনা, ইত্যাদি কর্মসূচী বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে বিস্তার করতে থাকেন।[১২০] ১৯৪১ খ্রিঃ ফাদার ডুয়েন প্যাট্রিক, সিএসসি রাণীখং ধর্মপল্লী থেকে ৮ পৃষ্ঠার মাসিক পত্রিকা 'রাণীখং মিশন চিঠি' বের করেন। ২য় সংখ্যাটির নামকরণ হয় 'কাথলিক মিশন' পত্রিকা। ১৯৪৭ খ্রিঃ এর নাম হয় 'প্রতিবেশী'। পত্রিকাটি চিত্তাকর্ষক ও উপদেশমূলক। সততা ন্যায়পরায়ণতা, সত্যনিষ্ঠা, স্বাদেশিকতা, ঈশ্বর ও প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসা ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দেওয়াই এর একমাত্র উদ্দেশ্য।[১২১] যুগে যুগে 'প্রতিবেশী' তার নাম, আকার, লেখার ধরন, সম্পাদক পাল্টিয়েছে। প্রথম এটি ধর্মপল্লীর মুখপত্র থেকে ক্রমান্বয়ে ঢাকা ধর্মপ্রদেশের মুখপত্রে পরিণত হয়। ১৯৭৪ খ্রিঃ এটি জাতীয় কাথলিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। কাথলিক সমাজে লেখক-লেখিকা গঠনে "প্রতিবেশী"-র ভূমিকা অনস্বীকার্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের পূর্বাঞ্চলে বিশেষ করে বঙ্গে দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাব দেখা দেয়। তখন লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করে। এ সময় মিশনের তরফ থেকে অনেককে গম, আটা-ময়দা ও চাল দান করে রক্ষা করা হয়েছে। এ সময় মিশনারীগণ আবেদন করে খাদ্য সামগ্রী জোগাড় করে আনতেন লোকদের বাঁচানোর জন্য। ১৯৪৩ খ্রিঃ দুর্ভিক্ষে বহু ছেলেমেয়ে অনাথ হয়ে পড়ে। তখন ১৯৪৫

খ্রিঃ তেজগাঁও গির্জার সন্নিকটে ৬০ জন অনাথ ছেলেমেয়ে নিয়ে হলিক্রস সিস্টারগণ অনাথ আশ্রম গড়ে তোলেন। মিঃ বটমলী নামক একজন বৃটিশ কর্মকর্তা এ অনাথাশ্রম স্থাপনে সহায়তা করেছেন বলে তার নাম যুক্ত হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে বটমলী হোম অর্ফানেজটি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে ছেলেমেয়েদের বিদ্যাশিক্ষা, গান-বাজনা, নৃত্য, সেলাই, ড্রইং, পেইন্টিং, বাগান করা, হাঁসমুরগী পালন, খেলাধুলা, থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেন।[১২২] ১৯৫০ খ্রিঃ কুমিল্লায় "আওয়ার লেডী অব ফাতিমা সিনিয়র ক্যাম্ব্রিজ স্কুল" স্থাপিত হয়। ১৯৫২ খ্রিঃ জলছত্রে কুষ্ঠাশ্রম স্থাপিত হয়। পবিত্র ক্রুশ সংঘের বাণী প্রচারকগণ প্রথম থেকেই শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করেছিলেন। ১৯৪৭ খ্রিঃ পাকভারত স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত কোন খ্রিস্টান কলেজ ছিল না। ১৯৪৯ খ্রিঃ ৩রা নভেম্বর কলা ও বাণিজ্য শাখার মাত্র ১৯ জন ছাত্র নিয়ে নতুন কলেজ চালু হয়। তখন সেন্ট গ্রেগরীজ হাই স্কুলের সুনাম ছিল বলে নতুন কলেজটিও 'সেন্ট গ্রেগরীজ কলেজ' (বর্তমানে নটরডেম কলেজে) নাম গ্রহণ করে। শিক্ষা দীক্ষা অধ্যয়ন বহির্ভূত বিভিন্ন কার্যক্রম ও ক্রীড়াদিতে এ কলেজের ছাত্ররা বিভিন্ন সময়ে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। ব্রাদার ডনাল্ড বেকার, সিএসসি দরিদ্র কিশোর ও যুবকদের পেশাগত প্রশিক্ষণ দানের জন্য কারিতাস বাংলাদেশের আর্থিক সহায়তায় ৫টি স্থানে ট্রেড স্কুল চালু করেন। এসব স্কুলে কাঠের কাজ, দর্জির কাজ, ইলেকট্রিক ও লাইট মেকানিক্সএর কাজ শিখানো হয়।[১২৩] একটি কেন্দ্রীয় টিমের দ্বারা স্কুলগুলো পরিচালিত হয়। ১৯৫৪ খ্রিঃ দ্বিতীয়ার্ধে ফাদার ইয়াং ঢাকায় বয়স্ক শিক্ষা ও সমবায় সম্পর্কে সচেতন করার উদ্দেশ্যে সোস্যাল এ্যাকশান কনফারেন্স চালু করেন। ১৯৫৫ খ্রিঃ ৩রা জুলাই 'দি খ্রিস্টীয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড' গঠিত হয়। সমবায় আন্দোলনকে গতিশীল করা এবং আর্থ-সামাজিক ও মানবাধিকার সমুন্নত রাখার জন্য "সমবার্তা" নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। এভাবে ফাদার বিভিন্ন স্থানে ঋণদান সমিতি গড়ে তুলেছেন। 'কারিতাস' সমিতির কর্মীদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দানেরও ব্যবস্থা করে থাকে। অন্যান্য সমিতিকে ঢাকাস্থ ঋণদান সমিতি প্রশিক্ষণসহ নানা ভাবে সহায়তা দান করেছে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ঋণদান সমিতিকে প্রশিক্ষণ সংগঠন ও প্রচারে সহায়তা করেন। কেন্দ্রিয়ভাবে একটি ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ গঠন করে থাকে। এ লীগ হচ্ছে বিভিন্ন ঋণদান সমিতির ফেডারেশন।

১৯৫৭ খ্রিঃ "মহাধর্মপ্রদেশীয় কাথলিক শিক্ষা বোর্ড" গঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন স্কুলের মধ্যে সমন্বয় সাধন, শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্যার সাময়িক এবং অভিন্ন নীতি নির্ধারণ।[১২৪] কাথলিক শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য এবোর্ড বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল। বর্তমানেও এর কাজ অব্যাহত রয়েছে। ফাদার ইসিদোর এফ দা কস্তা বিনে পয়সায় বাইওকেমিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা করতেন। তিনি সবার কাছে প্রিয় যাজক ছিলেন। ফাদার মাইকেল কস্তা বাণী প্রচারে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তার দানশীলতা ছিল সর্বজনবিদিত। তিনি তিনটি পুস্তক রচনা করেন। 'স্মৃতিকথা' পুস্তকটিতে দুঃসাহসিক প্রচার জীবনের বিস্তৃত বিবরণ আছে।[১২৫] ১৯৬০ খ্রিঃ থেকে এক দশক পর্যন্ত প্রতি বছর কাথলিক শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য ঢাকায় শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতো। এখানে শিক্ষা বিশেজ্ঞগণ বক্তৃতা করতেন। এখানে শিক্ষকদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা, আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতি বিষয়ক বক্তৃতা ও শিক্ষা বিষয়ক চার্ট, মানচিত্র ও পাঠ পরিকল্পনার প্রদর্শনী হতো।[১২৬] এ সম্মেলন বেশ উপকার সাধন করেছিল। ফাদার যাকোব দেশাই এদেশে আধুনিক বাংলা কাথলিক সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ। আর্চবিশপ গ্রেনার বারংবার কাথলিক স্কুলের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি স্কুলগুলোতে উন্নততর শিক্ষাদান ও কাথলিক ছেলেমেয়েদের পড়ানোর জন্য পিতামাতা ও শিক্ষকশিক্ষিকাদের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করতেন। ১৯৭২ খ্রিঃ ২১শে জানুয়ারী মাদার তেরেজা সম্প্রদায়ের সিস্টারগণ মুক্তিযুদ্ধের সময় বর্বর পাকিস্তানী সেনাদের দ্বারা ধর্ষিতা নারী, তরুণী ও তাদের গর্ভজাত সন্তানদের সেবাযত্ন করার ও পুনর্বাসনের কাজ শুরু করেন। তারা 'শিশু ভবন' প্রতিষ্ঠা করেন। পরে তারা তেজগাঁও, মাউসাইদ, সিলেট ও লক্ষীপুরে কাজ শুরু করেন। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ খ্রিস্টীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৯২ খ্রিঃ লক্ষীবাজারে সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স গ্রীন হেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল স্থাপিত হয়। পরে এটি ঢাকার মোহাম্মদপুরে স্থানান্তরিত করা হয়। এটি মিশনের রাণী সিস্টারগণ পরিচালনা করছেন। ১৯৭২ খ্রিঃ কাথলিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ছিল ১৩০টি প্রাইমারী স্কুল, ১০টি জুনিয়র স্কুল, ১৬টি হাইস্কুল ও ২টি কলেজ। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে বাংলাদেশে কাথলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছিল ২টি কলেজ, ২২টি হাই স্কুল, ৩টি জুনিয়র হাইস্কুল, ১৫৮টি প্রাইমারী স্কুল। ১৯৮৫ খ্রিঃ শেষে বাংলাদেশে কাথলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছিল ২টি কলেজ, ২৪টি হাইস্কুল, ১টি জুনিয়র হাইস্কুল এবং ১৬২টি প্রাইমারী স্কুল।[১২৭]

উদ্দেশ্য

বাণী প্রচার করা

স্থানীয় মণ্ডলী গঠন করা

শিক্ষার বিস্তার ঘটানো

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করা

মূল্যবোধে গঠন দান করা

বাণী প্রচারক গড়ে তোলা

প্রচার পদ্ধতি

গ্রামের দূর দূরান্তে গিয়ে

পায়ে হেঁটে ব্যাগ কাঁধে নিয়ে

নৌকাযোগে ও গরুর গাড়িতে চড়ে

গানের মাধ্যমে

তর্কবিতর্কের মাধ্যমে

পরস্পর কথোপকথনের মাধ্যমে

বিভিন্ন পালা গান ও যাত্রার মাধ্যমে

নাটিকা উপস্থাপন করে

পবিত্র জপমালা বিষয়ক গান গেয়ে

পুস্তক রচনা ও বিতরণ করে

মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজ সরল ভাবে শিক্ষাদান

নিজ হাতে ঘণ্টা বাজিয়ে

প্রতিবন্ধকতা/অন্তরায়সমূহ

অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা

প্রতিকূল পরিস্থিতি

রাজনৈতিক বিপর্যয়

সমাজের নিম্ন শ্রেণির লোক

খুবই দরিদ্র

যাতায়াত ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন

বিদ্বেষপরায়ণতা

তিক্ত সম্পর্ক

সহযোগীতার অভাব

ধর্মীয় বিশৃংখলা

ধর্মীয় বিশ্বাসে দুর্বলতা

অসামাজিক কার্যকলাপ ও জীবন যাপন

আকস্মিক আক্রমণ ও লুণ্ঠন

অসহায় ও অশিক্ষিত

পৌত্তলিক প্রথাসমূহ

অনৈতিকতা

প্রাকৃতিক বিপর্যয় (বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প)

স্থানান্তরিত হওয়া

অভ্যন্তরীণ কোন্দল

মিশনারীদের সংখ্যা কমে যাওয়া

পালকীয় যত্নের অভাব

নৈতিক চরিত্র শোচনীয়

অস্বাস্থ্যকর বসতি

আর্থিক সমস্যা

প্রশাসনিক সমস্যা

বিভিন্ন রোগব্যাধি (কলেরা, জ্বর, কুষ্ঠ, আমাশয়)

বৈশিষ্ট্য সমূহ

উত্তম প্রচারক ও সেবক

আদর্শ শিক্ষক

পরিশ্রমী

মেধা ও বুদ্ধিমত্তা

ধৈর্য ও অধ্যবসায়

নিঃস্বার্থ

কাজে উদ্যাম ও উৎসাহ

সাহিত্যিক

লেখক ও নাট্যকার

প্রকাশক

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ

দানশীলতা

উদারতা ও দয়া

সহযোগীতা ও সহমর্মীতা

সার্থকতা

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের বিকাশ ও প্রৈরিতিক কর্মকাণ্ডে বিদেশী মিশনারীগণ বিশেষ অবদান রেখেছেন। গোড়া থেকেই খ্রিস্টমণ্ডলীর একাংশ নানা ভাবে সক্রিয় সহযোগীতা করে এসেছেন। এদের ভূমিকাকেও খাটো করে দেখার কোন উপায় নেই। তারা যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছেন ও শিক্ষা দিয়ে গেছেন তা আজও পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। মিশনারীগণ তাদের শ্রম, ধৈর্য সহকারে, নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। তাদের কাজ ও সেবা ছিল নিঃস্বার্থ। তাঁরা নিজেদের

কোন স্বার্থ দেখেনি। বরং সেবা ও ভালোবাসার জন্য প্রচুর ত্যাগ ও সাধনা করেছেন। তাদের আরব্ধ কর্মযজ্ঞে নিবেদিতপ্রাণ কর্মীগণ আজও দৃপ্ত পদক্ষেপে সামনের দিকে এগিয়ে চলছে।

 # নিবন্ধ : কস্তা, ফাদার বেঞ্জামিন, সিএসসি, "বাংলাদেশে হলিক্রস : অতীত ও বর্তমান": বিগত শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ফ্রান্স দেশের ল্যামা শহরে পবিত্র ক্রুশ সংঘের জন্ম। সংঘের শুরু থেকেই প্রতিষ্ঠাতার লক্ষ্য ছিল ফান্স দেশের বাইরে মণ্ডলীর প্রয়োজন অনুসারে প্রেরণকাজে যথাসাধ্য সাড়া দেওয়া। সংঘের মধ্যে তিনটি শাখা বা সম্প্রদায় আছে যথা ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টার। বিগত ১৬০ বছরে বাংলাদেশের বাইরে থেকে চার শতাধিক প্রেরণকর্মী এদেশে এসেছেন। সংখ্যার দিক থেকে সম্প্রদায়টি বর্তমান বাংলাদেশে বৃহত্তম সন্ন্যাস-সংঘ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বাংলাদেশে হলিক্রস পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সংঘের শুরু থেকেই হলিক্রস সন্ন্যাসব্রতীদের প্রধান প্রৈরিতিক কাজ ছিল শিক্ষাদান ও পালকীয় সেবা কাজ।

শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান : হলিক্রস পরিবারের সদস্যগণ শিক্ষার উপর শুরু থেকেই গুরুত্ব দিয়ে আসছিলেন। তাই তাঁরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছোটখাট গির্জাঘর নির্মাণের পাশাপাশি স্কুল ঘর নির্মাণ করেছেন। শুরুতে প্রাথমিক শিক্ষার উপরই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। যার ফলে বর্তমানে দেশে সার্বিক সাক্ষরতার তুলনায় কাথলিক খ্রিস্টানদের সাক্ষরতার হার অনেক বেশি। ধর্মীয় বিশ্বাসকে আত্মস্থ ও গভীর করে তোলার জন্য শিক্ষার মাধ্যমে মন, মেধা, চিন্তা-চেতনা ও হৃদয় মনের বিকাশ গঠন অপরিহার্য।

এদেশে শিক্ষা বিস্তারের গুরুত্ব অনুধাবন করে ১৮৯৪ খ্রিঃ ঢাকার নব নিযুক্ত বিশপ পিটার হার্থ পুরনো ঢাকার লক্ষ্মীবাজারে সেন্ট গ্রেগরী স্কুল নির্মাণের কাজ শুরু করেন। ১৯১২ খ্রিঃ নির্মিত হয় বান্দুরা হলিক্রস হাইস্কুল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশাসনিক কাজ ও শিক্ষকতায় অনেক হলিক্রস সদস্য নিয়োজিত। বর্তমানে দেশে কাথলিক চার্চ পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে হলিক্রস পরিবারের সদস্যগণ পরিচালনা করছেন একটি বিশ্ববিদ্যালয় (নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ), একটি ডিগ্রী কলেজ (নটর ডেম কলেজ, ঢাকা) এবং ৫টি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ যথা নটর ডেম কলেজ ময়মনসিংহ (বাড়েরা, ময়মনসিংহ), সেন্ট ফিলিপস্ স্কুল এণ্ড কলেজ (কসবা, দিনাজপুর), হলিক্রস

হাইস্কুল এণ্ড কলেজ (বান্দুরা, নবাবগঞ্জ), সেন্ট যোসেফ স্কুল এণ্ড কলেজ (মোহাম্মদপুর, ঢাকা) এবং হলিক্রস কলেজ (তেজগাঁও, ঢাকা)। এ ছাড়াও হলিক্রস ব্রাদার ও সিষ্টারগণ বেশ কিছু হাইস্কুল পরিচালনা করছেন যেগুলো প্রায় শতবর্ষ আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো সেন্ট গ্রেগরীজ হাই স্কুল (লক্ষ্মী বাজার), হলিক্রস হাই স্কুল (বান্দুরা), সেন্ট নিকোলাস হাই স্কুল (নাগরী), তুমিলিয়া বয়েজ হাইস্কুল (গাজীপুর), মরিয়ম আশ্রম হাইস্কুল (দিয়াং, চট্টগ্রাম), ব্রাদার আন্দ্রে হাইস্কুল (সোনাপুর, নোয়াখালী), বান্দরবান ডন বস্কো হাইস্কুল (বান্দরবান), সেন্ট প্লাসিড হাই স্কুল (চট্টগ্রাম), উদয়ন হাইস্কুল (বরিশাল), বিড়ইডাকুনি হাইস্কুল (ময়মনসিংহ), ইত্যাদি। এছাড়াও রয়েছে কয়েকটি কারিগরি বিদ্যালয়ঃ সেন্ট যোসেফ কারিগরি বিদ্যালয় (নারিন্দা), বটমলী হোম কারিগরি বিদ্যালয় (তেজগাঁও)।

অতি সাম্প্রতিক কালে প্রতিষ্ঠিত নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি নতুন যুগের সূচনা করেছে। বর্তমানে হলিক্রস পরিবারের সদস্যদের সাথে সহকর্মী হিসাবে যুক্ত হয়েছেন বেশকিছু সংখ্যাক খ্রিস্টভক্ত ও অন্যান্যরা। মানসম্মত শিক্ষাদান, কিশোর-কিশোরী ও যুবক যুবতীদের চরিত্র গঠন, নিয়ম-শৃংখলা শিক্ষা, পরীক্ষায় ভাল ফলাফল ইত্যাদির বিবেচনায় হলিক্রস পরিবারের সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শীর্ষস্থানীয় বলে বিবেচিত। অর্ধশতকেরও অধিক সময় ধরে উচ্চশিক্ষা, বিশেষত নারীশিক্ষার ক্ষেত্রেও এই ধর্মসংঘের অবদান অনস্বীকার্য। শিক্ষা ও পালকীয় সেবাকাজের পাশাপাশি হলিক্রস পরিবারের সভ্যরা জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। হলিক্রস পরিবারের কোন সদস্য এককভাবে খ্যাতনামা শিল্পী বা সাহিত্যিকরূপে আত্মপ্রকাশ করতে না পারলেও ধর্মীয় সাহিত্য রচনা ও অনুবাদ, খ্রিস্টধর্ম শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক রচনা ও সম্পাদনা, বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় গল্প-প্রবন্ধ লেখা, স্মরণিকায় প্রকাশিত রচনা ও প্রকাশনা, ইত্যাদিতে যথেষ্ট অবদান রাখছেন। এছাড়া তারা নির্ধারিত সেবাকাজের বাইরেও বিভিন্নভাবে মণ্ডলীর অগ্রগতি ও পরিপক্বতা লাভে সহায়তা করে থাকেন। যেমন, মৌলিক খ্রিস্টীয় সমাজ গঠন, মানবাধিকার, ন্যায্যতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে কর্মসূচি, মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনা, অনাথাশ্রম, রোগীদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা ও আধ্যাত্মিক পরিচর্যা, যুবগঠন ও প্রশিক্ষণদান, জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে

তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। জলছত্র এলাকায় ‘জাগরণী মহিলা সমিতি’র মাধ্যমে গরিব ও বিধবা মহিলাদের অর্থনৈতিক মুক্তি ও স্বাবলম্বিতা অর্জনে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছেন।

প্রৈরিতিক কাজ

- শিক্ষা বিস্তার।
- আধ্যাত্মিক ও মানসিক পরিচর্যা।
- স্থানীয় মণ্ডলীতে নেতৃত্বসেবা।
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান।
- বিভিন্ন গঠনগৃহে শিক্ষাদান ও পরিচালনা।
- স্থানীয় সন্ন্যাস-সংঘ প্রতিষ্ঠা।
- বিদেশে মিশনারী প্রেরণ।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

- খ্রিস্টীয় সাক্ষ্যদান।
- খ্রিস্টের বাণী প্রচার।
- স্থানীয় মণ্ডলী গঠন।
- শিক্ষার বিস্তার।
- সার্বিক গঠনদান।
- বাস্তব ও জীবনমুখী শিক্ষাদান।
- প্রকৃত আদর্শিক সুশিক্ষা ও নীতি মুল্যবোধের জ্ঞান প্রদান।

- দেশে প্রকৃত যোগ্য, দক্ষ ও সুযোগ্য নাগরিক গঠন করা।
- দারিদ্র্যের হাত থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষতা ও কর্মনৈপুণ্য অর্জনে সহায়তা করা।
- বিদ্যার্জনের সাথে চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশে সহায়তা করে পূর্ণাঙ্গ মানুষ ও দায়িত্বশীল নাগরিক গড়ে তোলা।
- বহুমুখী প্রতিভা ও চেতনাকে বিকশিত হতে সহায়তা করা।

বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী

- নিঃস্বার্থ।
- নিবেদিতপ্রাণ।
- প্রকাশক ও সাহিত্যিক।
- উত্তম শিক্ষক।
- নেতৃত্ব দানকারী।
- সক্রিয় ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।
- প্রেরণার উৎস।
- নীতি নির্ধারক।
- দায়িত্বশীল।

অন্তরায় বা বাধাসমূহ

- অর্থনৈতিক দৈন্য ও সীমাবদ্ধতা।
- পৃষ্ঠপোষকতার অভাব।

- বিদেশী মিশনারীদের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাওয়া।
- সামগ্রিক পরিকল্পনার অভাব।
- উচ্চশিক্ষার প্রতি মানুষের উদাসীনতা ও অনীহা।
- প্রতিকূল পরিবেশ

সার্থকতা: বাংলাদেশে পবিত্র ক্রুশ পরিবারের তিনটি শাখাই যথেষ্ট দায়িত্বশীল। তারা নিজেদের মধ্যে মিলন ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তুলে যৌথ গঠনকর্মসূচী পরিচালনায় গুরুত্বসহকারে পালন করছেন। বিভিন্ন বাধাবিঘ্ন ও প্রতিকূলতার মধ্যেও হলিক্রস পরিবার সাহসের সাথে এগিয়ে চলেছে। তারা মানুষকে সুশিক্ষা দানে পিছু হটে যাননি। ভাল গাছের যেমন ভাল ফল আছে তেমনি ভাল কাজের ভাল ফল আছে। হলিক্রস পরিবারের সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশের বহু মানুষ যথাসাধ্য মানসম্মত বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাচ্ছে। তারা জ্ঞানার্জন ক'রে দেশে ও বিদেশে গিয়ে মেধার বিকাশ ঘটাচ্ছে। এরা বাংলাদেশের সম্পদ। সন্ন্যাসব্রতীগণ তাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শিক্ষাকে সেবা ও ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাদের পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে দৃঢ়সংকল্প। তাদের আদর্শ ও প্রভাব চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। তাই বলা যায়, শিক্ষা বিস্তারে তারা সার্থকতা লাভ করেছেন।

তথ্য সূত্রঃ

[১]কলুস্‌সি, ফাঃ লুচানো, এস ডিবি (ভিকার জেনারেল), "খ্রীষ্ট মণ্ডলীর ইতিহাস" পৃষ্ঠা নং ২
[২] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৪
[৩] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৪
[৪] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩৩
[৫] ঐ পৃষ্ঠা নং ৬২
[৬] ঐ পৃষ্ঠা নং ৬৩
[৭] ঐ পৃষ্ঠা নং ৬৬
[৮] ঐ পৃষ্ঠা নং ৭০
[৯] ঐ পৃষ্ঠা নং ৮১
[১০] ঐ পৃষ্ঠা নং ৮১
[১১] ঐ পৃষ্ঠা নং ৮৯
[১২] ঐ পৃষ্ঠা নং ৯৯
[১৩] ঐ পৃষ্ঠা নং ১২৭
[১৪] ঐ পৃষ্ঠা নং ১২৮
[১৫] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৪৫
[১৬] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৫৯
[১৭] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৫৯
[১৮] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৪৫
[১৯] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৮২
[২০] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৮৩
[২১] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৯০
[২২] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৯৪
[২৩] ঐ পৃষ্ঠা নং ২১২
[২৪] ঐ পৃষ্ঠা নং ২১৯
[২৫] ঐ পৃষ্ঠা নং ২২১
[২৬] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৪২
[২৭] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৪২
[২৮] সরকার, লুইস প্রভাত, "বঙ্গদেশে খ্রীষ্টধর্ম ও খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়" পৃষ্ঠা নং ১
[২৯] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৪
[৩০] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৫
[৩১] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৫
[৩২] ঐ পৃষ্ঠা নং ৬২
[৩৩] ঐ পৃষ্ঠা নং ৬৩
[৩৪] ঐ পৃষ্ঠা নং ৬৩
[৩৫] ঐ পৃষ্ঠা নং ৬৩
[৩৬] ঐ পৃষ্ঠা নং ৬৪
[৩৭] ঐ পৃষ্ঠা নং ৬৫
[৩৮] ঐ পৃষ্ঠা নং ১২২
[৩৯] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৩৩
[৪০] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৪০
[৪১] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৪০
[৪২] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৫৩
[৪৩] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৫৩
[৪৪] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৫৩
[৪৫] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৫৪
[৪৬] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৫৪
[৪৭] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৬৭
[৪৮] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৭১
[৪৯] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৭৩
[৫০] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৯৭
[৫১] ঐ পৃষ্ঠা নং ২২০
[৫২] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৩০
[৫৩] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৩০
[৫৪] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৫৫
[৫৫] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৭৫
[৫৬] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৯৯

[৫৭] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩০৬
[৫৮] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩২১
[৫৯] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩৩১
[৬০] আহমেদ, ড. ইমতিয়াজ, “দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পর্তুগীজ বাণিজ্য”- পৃষ্ঠা নং ৯৩
[৬১] ঐ পৃষ্ঠা নং ৯৩
[৬২] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৩৯
[৬৩] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৩৯
[৬৪] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৪০
[৬৫] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৪০
[৬৬] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৪০
[৬৭] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৪০
[৬৮] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৪০
[৬৯] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৪০
[৭০] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৪০
[৭১] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৪১
[৭২] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৪১
[৭৩] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৪১
[৭৪] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৪৩
[৭৫] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৪৩
[৭৬] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৪৩
[৭৭] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৪৩
[৭৮] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৫৩
[৭৯] অধ্যাপক আ.খা.আব্দুল মান্নান, অধ্যাপক এ.কে.এম মোজাম্মেল হক, অধ্যাপক ড. গোলাম রসুল মিয়া। অধ্যাপক মুহম্মদ ইবলু আনাম, “শিক্ষার ইতিহাস,” পৃষ্ঠা নং ৮৩
[৮০] ঐ পৃষ্ঠা নং ৮৩
[৮১] ঐ পৃষ্ঠা নং ৮৩
[৮২] ঐ পৃষ্ঠা নং ৮৪
[৮৩] ঐ পৃষ্ঠা নং ৮৪
[৮৪] ঐ পৃষ্ঠা নং ৮৫
[৮৫] ঐ পৃষ্ঠা নং ৮৬
[৮৬] পণ্ডিত, দিলীপ, বাংলাদেশে খ্রিস্টীয় মণ্ডলীর ইতিহাস পৃষ্ঠা নং ২
[৮৭]ঐ পৃষ্ঠা নং ৪
[৮৮]ঐ পৃষ্ঠা নং ১০
[৮৯]ঐ পৃষ্ঠা নং ১২
[৯০]ঐ পৃষ্ঠা নং ১৫২
[৯১] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৫২
[৯২] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৮৬
[৯৩] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৮৬
[৯৪] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৮৭
[৯৫] প্রদীপ (ঋৎ. খঁপরড়), অনুবাদক, “নতুন মানুষের আবির্ভাব” পৃষ্ঠা নং ২২৪
[৯৬] ডি'কস্তা, যেরোম, “বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী’ পৃষ্ঠা নং ৪
[৯৭]ঐ পৃষ্ঠা নং ৪
[৯৮]ঐ পৃষ্ঠা নং ৪
[৯৯]ঐ পৃষ্ঠা নং ৬
[১০০]ঐ পৃষ্ঠা নং ১৬
[১০১]ঐ পৃষ্ঠা নং ১৬
[১০২]ঐ পৃষ্ঠা নং ২৪
[১০৩]ঐ পৃষ্ঠা নং ২৯
[১০৪]ঐ পৃষ্ঠা নং ৩৭
[১০৫]ঐ পৃষ্ঠা নং ৩৭
[১০৬]ঐ পৃষ্ঠা নং ৩৭
[১০৭]ঐ পৃষ্ঠা নং ৪৬
[১০৮]ঐ পৃষ্ঠা নং ৬১
[১০৯]ঐ পৃষ্ঠা নং ৬১
[১১০]ঐ পৃষ্ঠা নং ৬২
[১১১]ঐ পৃষ্ঠা নং ৯৯
[১১২]ঐ পৃষ্ঠা নং ৯৯
[১১৩]ঐ পৃষ্ঠা নং ৯৯
[১১৪]ঐ পৃষ্ঠা নং ৯৯

[115] ঐ পৃষ্ঠা নং ১১১
[116] ঐ পৃষ্ঠা নং ১২১
[117] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৩৩
[118] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৪৬
[119] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৫২
[120] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৬১
[121] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৮১
[122] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৯১
[123] ঐ পৃষ্ঠা নং ২২০
[124] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৩২
[125] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৩৬
[126] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৪৫
[127] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩৭০

গ্রন্থপঞ্জি

❖ কলুস্‌সি, ফাঃ লুচানো, এস ডি.বি (ভিকার জেনারেল), "খ্রীষ্ট মন্ডলীর ইতিহাস", ৪র্থ সংস্করণ, সাধু যোসেক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট অফ প্রিন্টিং, কৃষ্ণ নগর, নদীয়া । পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৭৫ ।

❖ সরকার, লুইস প্রভাত, "বঙ্গদেশে খ্রীষ্ট ধর্ম ও খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়", জয়গুরু ইম্প্রেশন, কলকাতা ৭০০০০৬, প্রথম সংস্করণ, ২০০২ ।

❖ হালদার, গৌরদাস, "শিক্ষা প্রসঙ্গে ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস," প্রকাশক:- শ্রী সূর্য কুমার ব্যানার্জী, ৪র্থ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২ খ্রীঃ

❖ The Catholic Directory of Bangladesh 2013, Published by Proatibeshi Prokashoni, 10th revised Edition.

❖ আহমেদ, ইমতিয়াজ, "দক্ষিণ ও দক্ষিণ - পূর্ব এশিয়ার পর্তুগীজ বাণিজ্য" বাংলা একাডেমী, ঢাকা প্রকাশনা, জুন ২০০৮ খ্রীঃ । (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০৮)

❖ পন্ডিত, দিলীপ, "বাংলাদেশে খ্রিস্টিয় মন্ডলীর ইতিহাস", খ্রিষ্টিয়ান লিটারেচার সেন্টার, চাঁদপুর, কুমিল্লা। (পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৭৪)

❖ প্রদীপ (Fr.Lucio), অনুবাদক, "নতুন মানুষের অবির্ভাব", জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যশোর, ৫ম প্রকাশ, ২০১০ খ্রিঃ। (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৮৫)

❖ মান্নান আ.খা.আব্দুল, এ.কে.এম মোজাম্মেল হক, গোলাম রসুল মিয়া। আনাম, মুহম্মদ ইবলু, "শিক্ষার ইতিহাস," ঢাকা আহছানিয়া মিশন, ২য় মুদ্রণ জুন, ১৯৯৬ খ্রী:(পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯৪)

❖ ডি'কস্তা, যেরোম, "বাংলাদেশ কাথলিক মন্ডলী', (প্রথম খন্ড), প্রতিবেশী প্রকাশনী, আগষ্ট, ১৯৮৮খ্রিঃ (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫১৫)

❖ কস্তা, ফাদার বেঞ্জামিন, সি.এসসি," বাংলাদেশে হলিক্রসঃ অতীত ও বর্তমান"।

❖ কস্তা, ফাঃ বেঞ্জামিন, সি.এস.সি, “বাংলাদেশে বর্তমান হলিক্রস”।

❖ মালেক আব্দুল, বেগম, মরিয়ম, ইসলাম ফকরুল, রিয়াদ শেখ শাহবাজ, “শিক্ষবিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষা”, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা-১২০৭, চতুর্থ সংস্করণ মার্চ ২০১৪, চৈত্র ১৪২০। (পৃঃ ৬২১, ৬২২, ৬২৯, ৬৩০, ৬৩২, ৬৩৩, ৬৩৭, ৬৩৮, ৬৪৯, ৬৫২, ৬৫৩)।

তৃতীয় অধ্যায়

পৃথিবীতে খ্রিস্টধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ

নং	পৃষ্ঠা নং
৩.১ ভূমিকা	১১২
৩.২ জগত সৃষ্টি	১১২
৩.৩ মানব সৃষ্টি	১১২
৩.৪ পাপ	১১৩
৩.৫ সম্পর্ক পুনঃস্থাপন	১১৩
৩.৬ মনোনীত জাতি	১১৪
৩.৭ জল প্লাবন	১১৪
৩.৮ মোশীকে আহ্বান	১১৪
৩.৯ রাজা দাউদ	১১৪
৩.১০ উপায়সমূহ	১১৫
৩.১১ পরিত্রাণের উপায়	১১৫
৩.১২ যীশুর বাণী প্রচারের মূলভাব	১১৬
৩.১৩ দূত সংবাদ	১১৬
৩.১৪ যীশুর জন্ম	১১৭
৩.১৫ রাখালদের কাছে সংবাদ	১১৭

৩.১৬ যীশুকে মন্দিরে উৎসর্গ	১১৮
৩.১৭ পণ্ডিতদের আগমন	১১৮
৩.১৮ মিশরে পলায়ন	১১৯
৩.১৯ শিশু হত্যা	১১৯
৩.২০ মন্দিরে বালক যীশু	১১৯
৩.২১ যীশুর আত্মপ্রকাশ	১২০
৩.২২ বারোজন শিষ্যের মনোনয়ন	১২২
৩.২৩ যীশুর জেরুশালেমে প্রবেশ	১২৩
৩.২৪ যুদাসের চুক্তি	১২৩
৩.২৫ শেষ ভোজ	১২৩
৩.২৬ গেৎসিমানী বাগানে যীশু	১২৪
৩.২৭ মহাযাজকের দরবার	১২৪
৩.২৮ পিলাতের দরবারে যীশু	১২৪
৩.২৯ সৈন্যদের হাতে যীশুর অপমান	১২৫
৩.৩০ যীশুর ক্রুশবহন	১২৫
৩.৩১ যীশুর ক্রুশারোপণ	১২৫
৩.৩২ যীশুর সমাধি	১২৫
৩.৩৩ যীশুর পুনরুত্থান	১২৬

৩.৩৪ শিষ্যদের কাছে যীশুর দর্শনদান ১২৬

৩.৩৫ শিষ্যদের প্রেরণ ১২৭

৩.৩৬ যীশুর স্বর্গারোহণ ১২৭

৩.৩৭ ঈশ্বরের পরিকল্পনায় খ্রিস্টমণ্ডলী ১২৭

৩.৩৮ খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রসার ১৩৪

৩.৩৯ পবিত্র আত্মার অবতরণ ১৩৫

৩.৪০ খঞ্জ বা খোঁড়া ব্যক্তির আরোগ্য লাভ ১৩৭

৩.৪১ প্রথম ধর্মশহীদ ১৩৭

৩.৪২ পিতরের কর্মতৎপরতা ১৩৭

৩.৪৩ খ্রিস্টভক্তদের উপর ইহুদী নেতাদের উৎপীড়ন (৪২খ্রিঃ) ১৩৯

৩.৪৪ শৌলের মনপরিবর্তন ১৩৯

৩.৪৫ পিতরের প্রাধান্য ১৪০

৩.৪৬ পল (শৌল)এর প্রচারকার্য ১৪১

৩.৪৭ পলের প্রথম প্রচারযাত্রা (৪৫-৪৯ খ্রিঃ) ১৪১

৩.৪৮ দ্বিতীয় প্রচার যাত্রা (৫১-৫৪ খ্রিঃ) ১৪১

৩.৪৯ রোম অভিমুখে পলের যাত্রা ১৪২

৩.৫০ রোমে পিতর (পিটার) ১৪৩

৩.৫১ খ্রিস্টানদের উপর প্রথম নির্যাতন (৬৪-৬৮ খ্রিঃ) ১৪৪

৩.৫২ ধর্মশহীদ পিতর ও পল ১৪৪

৩.৫৩ নির্যাতনের মাত্রাবৃদ্ধি ১৪৫

৩.৫৪ জেরুশালেমের ধ্বংসলীলা ১৪৫

৩.৫৫ কাটাকম্ব সমাধিস্থান ১৪৬

৩.৫৬ মণ্ডলীর সংগঠন ১৪৬

৩.৫৭ দ্বিতীয় নির্যাতনকাল (৯৪-৯৬ খ্রিঃ) ১৪৭

৩.৫৮ তৃতীয় নির্যাতনকাল (৯৮-১১৭ খ্রিঃ) ১৪৭

৩.৫৯ ধর্মশহীদ সাধু ইগ্নাসিয়াস (১০৭ খ্রিঃ) ১৪৮

৩.৬০ ধর্মোপসনাদি ১৪৮

৩.৬১ চতুর্থ নির্যাতনকাল (১৬১-১৮০ খ্রিঃ) ১৪৯

৩.৬২ পঞ্চম নির্যাতনকাল (২০২-২১০ খ্রিঃ) ১৫০

৩.৬৩ যষ্ঠ নির্যাতনকাল (২৩৫-২৩৮ খ্রিঃ) ১৫২

৩.৬৪ সপ্তম নির্যাতনকাল (২৪৯-২৫১ খ্রিঃ) ১৫২

৩.৬৫ অষ্টম নির্যাতনকাল (২৪৭-২৫৯ খ্রিঃ) ১৫২

৩.৬৬ নবম নির্যাতনকাল (২৭৫ খ্রিঃ) ১৫৪

৩.৬৭ দশম নির্যাতনকাল (৩০৩–৩০৫ খ্রিঃ) ১৫৫

৩.৬৮ বিভিন্ন ভ্রান্ত ধর্মমত ১৫৬

৩.৬৯ মণ্ডলীর সাংগঠনিক কার্যক্রম ১৫৭

৩.৭০ রাজধানী কনষ্টান্টিনোপল ১৫৮

৩.৭১ স্থাপত্যকীর্তি ১৫৮

৩.৭২ ধর্মভ্রষ্টাচার ১৫৮

৩.৭৩ মণ্ডলীর প্রাথমিক পর্যায়ের ধর্মগুরু ও আচার্যগণ ১৫৯

৩.৭৪ সাধু আমব্রোজ ১৬১

৩.৭৫ সাধু আগষ্টিন ১৬২

৩.৭৬ বর্বরদের রোম আক্রমণ ১৬৩

৩.৭৭ স্কটল্যাণ্ডে বর্বরদের মধ্যে ধর্মপ্রচার ১৬৪

৩.৭৮ মণ্ডলীর প্রগতিশীল সংগঠন ১৬৪

৩.৭৯ ভাণ্ডালদের আক্রমণ ১৬৫

৩.৮০ ধর্মভ্রষ্ট নেষ্টোরিয়াস ১৬৬

৩.৮১ আয়ারল্যাণ্ড ১৬৬

৩.৮২ এটিলা ও বর্বর হুনজাতি ১৬৭

৩.৮৩ ইটালীতে বর্বর রাজ্য প্রতিষ্ঠা ১৬৮

৩.৮৪ ফ্রাঙ্ক রাজ্য প্রতিষ্ঠা ১৬৮

৩.৮৫ সন্ন্যাসী সাধু বেনেডিক্ট ১৬৯

৩.৮৬ ইংল্যাণ্ডে খ্রিস্টধর্ম প্রচার ১৭০

৩.৮৭ জার্মানীতে প্রচার ১৭০

৩.৮৮ পবিত্র রোম সাম্রাজ্য ১৭১

৩.৮৯ বুলগেরিয়ায় খ্রিস্টবাণী ১৭২

৩.৯০ পোল্যাণ্ডে খ্রিস্টমণ্ডলী ১৭৩

৩.৯১ হাঙ্গেরীতে খ্রিস্টমণ্ডলী ১৭৩

৩.৯২ স্থাপত্যের উন্নয়ন ১৭৫

৩.৯৩ লিয়ং ধর্মসভা ১৭৬

৩.৯৪ ভৌগোলিক আবিষ্কার ১৭৮

৩.৯৫ কল্যাণকর্ম সাধন ১৭৯

৩.৯৬ আমেরিকায় প্রেমধর্মের বীজবপন ১৮২

৩.৯৭ দক্ষিণ আমেরিকায় প্রচারকদের আগমন ১৮২

৩.৯৮ উত্তর আমেরিকায় খ্রিস্টবাণী প্রচার ১৮৩

৩.৯৯ আফ্রিকায় ধর্মসম্প্রসারণ ১৮৩

৩.১০০ চীনদেশে সু-সমাচার প্রচার ১৮৪

৩.১০১ জাপানে সু-সমাচার প্রচার ১৮৪

৩.১০২ ফিলিপাইনে খ্রিস্টবাণী প্রচার ১৮৪

৩.১০৩ উপসংহার ১৯০

পৃথিবীতে খ্রিস্টধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ

৩.১ ভূমিকা

আমাদের চারপাশে কতশত মানুষ রয়েছে। তাদের সবাইকে হয়তো আমরা চিনি না। কিন্তু তাদেরকে আমরা ভাইবোন বা বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। কারণ আমরা সবাই একই বিশ্বের বাসিন্দা। আমরা সবাই নিজ নিজ বংশ পরিচয় জানতে চাই। তেমনিভাবে সবার ধর্মীয় বিশ্বাসেরও একটি ইতিহাস আছে। খ্রিস্টভক্ত হিসাবে আমাদের পূর্বপুরুষদের ইতিহাস জানাটা গুরুত্বপূর্ণ। কেননা তার ফলে আমাদের নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস আরো দৃঢ় হতে পারে।

৩.২ জগত সৃষ্টি

আদিকালে ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। পৃথিবী ছিল শূন্য ও অন্ধকার। ঈশ্বর আলো ও অন্ধকার সৃষ্টি করলেন। আলোর নাম দিলেন দিন ও রাতের নাম দিলেন অন্ধকার। এরপর তিনি সূর্য, চাঁদ ও তারা আকাশের বুকে বসালেন, যেন পৃথিবী আলোকিত হয়। এরপর ঈশ্বর স্থলভাগ ও সাগর সৃষ্টি করলেন। তারপর ঈশ্বর মাটি, গাছ, ঘাস, পাখি, মাছ, পশু সব সৃষ্টি করলেন। ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করে বললেন, “তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে স্থল, জল ও আকাশ পরিপূর্ণ কর” ।[১]

(আদি পুস্তক (১:১-২৫)

৩.৩ মানব সৃষ্টি

ঈশ্বর মানুষকে নিজের সাদৃশ্যে সৃষ্টি করলেন। তিনি মাটি দিয়ে মানুষের দেহ তৈরি করলেন ও তাদের মধ্যে প্রাণ জাগিয়ে দিলেন। তাতে মানুষ জীবিত হয়ে উঠল। ঈশ্বর তার নাম রাখলেন ‘আদম’। এরপর ঈশ্বর বুঝলেন মানুষের পক্ষে একা থাকা ভাল নয়। তখন ঈশ্বর তার বুক থেকে একটা পাঁজর নিয়ে নারীকে সৃষ্টি করলেন। তার নাম দিলেন ‘হবা’ অর্থাৎ নারী। ঈশ্বর তাদের

আশীর্বাদ করে বললেন, তোমরা বংশবৃদ্ধি কর, সারা জগতে ছড়িয়ে পড় ও সকল বস্তুর উপর কর্তৃত্ব কর।[২] আদম ও হবার জন্য ঈশ্বর এদেন অঞ্চলে একটি বাগান তৈরি করলেন ও সেখানে তাদের থাকতে দিলেন যেন তারা কাজ করে বাগানটা রক্ষা করে। আকাশ, পৃথিবী ও সকল বস্তু ঈশ্বর ছয় দিনের মধ্যে সৃষ্টি করলেন। সপ্তম দিনে তাঁর কাজ শেষ করে বিশ্রাম করলেন। তিনি এই দিনটাকে আশীর্বাদ দিয়ে পবিত্র করলেন।

(আদি - ১:২৬-২৭, ২:৭,১৮-২৪, ১:২৮-২:৪)

৩.৪ পাপ

ঈশ্বর আদম হবাকে হুকুম দিলেন, এই বাগানে যত গাছ আছে তোমরা তাদের ফল খাবে, কিন্তু মাঝখানে যে গাছটি রয়েছে সেটি হলো ভাল-মন্দ জ্ঞানের গাছ, তোমরা তার ফল খাবে না। কিন্তু তারা শয়তানের প্রলোভনে পড়ে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেলো। তখন তারা বুঝতে পারলো যে, তারা ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছে এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছে। তাদের মনের নির্মলতা ও পবিত্রতা নষ্ট হয়ে গেল। এতদিন ঈশ্বরের সাথে তাদের অত্যন্ত সহজ, স্বাভাবিক ও সুন্দর সম্পর্ক ছিল। কিন্তু অবাধ্যতার ফলে মানুষের পতন হলো। আদম তাঁর পাপের জন্য হবাকে দোষারোপ করলো, আর হবা দোষারোপ করলো সাপকে। তাদের পাপের শাস্তি হলো। ঈশ্বর সাপকে ও নরনারীকে শাস্তি দিলেন। মানুষ স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে পৃথিবীতে এলো। স্বর্গসুখ ও স্বর্গের দরজা মানুষের জন্য বন্ধ হয়ে গেল।[৩]

৩.৫ সম্পর্ক পুনঃস্থাপন

ঈশ্বর মানুষকে এত ভালোবাসলেও মানুষ বারংবার তাঁর প্রতি অবিশ্বস্ত হয়েছে। পৃথিবীতে এসে মানুষ পাপের জীবন যাপন করতে লাগল। ঈশ্বর পাপের কারণে নষ্ট হয়ে-যাওয়া সম্পর্ক পুনরায় স্থাপন করার জন্য বারংবার উদ্যোগ নিলেন। তিনি মানব ইতিহাসে প্রবেশ করলেন। পুনরায় সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে ঈশ্বর উদ্যোগ নিলেন। মানুষ অবাধ্য হয়ে পাপ করলেও এবং ঈশ্বর তা জেনেও মানুষকে চিরতরে ত্যাগ করেননি।[৪] তাকে তিনি পাপ থেকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

৩.৬ মনোনীত জাতি

ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে মানুষ করে পাঠাবার জন্য একটি জাতিকে মনোনীত করলেন। ঈশ্বরের মনোনীত জাতি হলো ইস্রায়েল জাতি।[৫] ইস্রায়েল জাতির মধ্য থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তি, রাজা, প্রবক্তাদের তিনি বেছে নিলেন তাঁর প্রতিশ্রুতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য। আব্রাহামকে তিনি করলেন মনোনীত জাতির পিতা, বিশ্বাসীদের পিতা। তিনি তাঁর সঙ্গে একটি সন্ধি স্থাপন করলেন। তিনি বললেন, "আমি এখন আমার ও তোমার মধ্যে একটি সন্ধি স্থাপন করছি; তোমার বংশধরদের সংখ্যা আমি সুবিপুল করে তুলব।"[৬]

৩.৭ জলপ্লাবন

পৃথিবী যখন পাপে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তখন ঈশ্বর জলপ্লাবন দিয়ে পৃথিবী ধ্বংস করেছিলেন। কিন্তু তিনি নোয়ার মধ্য দিয়ে মানবজাতির সঙ্গে একটি সন্ধি স্থাপন করেছিলেন। তিনি আকাশে একটি রংধনু স্থাপন করেছিলেন এই সন্ধির প্রতীক হিসাবে। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, মানুষকে তিনি আর এভাবে ধ্বংস করবেন না।[৭]

৩.৮ মোশীকে আহবান

মোশীকে ঈশ্বর আহবান করেছিলেন মিশর দেশের দাসত্ব থেকে ইস্রায়েল জাতিকে মুক্ত করার জন্য। মোশীর নেতৃত্বে ইস্রায়েল জাতি প্রতিশ্রুত দেশের দিকে যাত্রা আরম্ভ করেছিল। মিশর দেশ থেকে কনান দেশে যাত্রাকালে ইস্রায়েল জাতি বিভিন্নভাবে ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করেছে। ইস্রায়েল জাতিকে ঈশ্বর বারবার বলেছেন, তোমরা আমার আপন জাতি আর আমি তোমাদের আপন ঈশ্বর।[৮]

৩.৯ রাজা দাউদ

তারপর তিনি রাজা ও প্রবক্তাদের বেছে নিলেন। তিনি রাজা দাউদকে বেছে নিয়েছিলেন। পরে এই বংশে তার পুত্র জন্ম নিয়েছিল। প্রবক্তা ইসাইয়া মুক্তিদাতার আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের চূড়ান্ত পর্যায় হলো ঈশ্বরপুত্র যীশুখ্রিস্টের মানবরূপে পৃথিবীতে

জন্মগ্রহণ। রাজা দাউদের বংশধর হয়ে একজন নারীর গর্ভে যীশু মানুষরূপে জন্ম নিলেন।[৯] মানুষকে পাপ থেকে মুক্ত করতে তিনি ক্রুশীয় মৃত্যুকে বরণ করে নিলেন। তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হলেন। মৃত্যুকে জয় করে তিনি শয়তানের কবল থেকে মানুষকে পাপ থেকে রক্ষা করলেন। বন্ধ হয়ে যাওয়া স্বর্গের দরজা আবার খুলে দিলেন। তিনি 'মশীহ'। তিনি হলেন প্রতিশ্রুত মুক্তিদাতা। তাঁর মধ্য দিয়েই পূর্ণ হলো ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি ও পরিকল্পনা। ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যকার নষ্ট-হয়ে-যাওয়া সম্পর্ক আবার স্থাপিত হলো। যীশু হলেন নতুন আদম। এই সু-সম্পর্ক রক্ষার্থে যীশু স্থাপন করলেন মণ্ডলী ও পুণ্যসংস্কারসমূহ। দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে আমরা আদি পাপের ক্ষমা লাভ করি ও মণ্ডলীতে প্রবেশ করে ঈশ্বরের সন্তান হয়ে উঠি।

পাপস্বীকার সংস্কার গ্রহণ করে আমরা পাপের ক্ষমা লাভ করি ও ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাবার যোগ্য হয়ে উঠি। ইতিহাসের প্রভু এইভাবে অসীম ক্ষমা ও ভালবাসায় মানুষকে রক্ষা করলেন। মানুষের অবিশ্বস্ততা সত্ত্বেও তিনি নিজ উদ্যোগে মানুষের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করলেন।

৩.১০ উপায়সমূহ

ঈশ্বরের সাথে মানুষের এবং মানুষের সাথে মানুষের সুসম্পর্ক বজায় রাখার উপায়গুলো হলো :

(১) যোগাযোগ, (২) মানবসেবা, (৩)উপাসনা, (৪)আস্থা ও বিশ্বাস, (৫) সততা, (৬) গ্রহণ, (৭) শ্রদ্ধা, (৮) সমঝোতা, (৯) সাহায্য ও সহযোগিতা, (১০) সাম্য বা সমান মর্যদা।[১০]

ঈশ্বরকে লাভ করে আমরা পরিতৃপ্ত হতে চাই। যুগ যুগ ধরে মানুষ নানাভাবে, নানা স্থানে ঈশ্বরকে খুঁজছে। মানুষের ধ্যান, প্রার্থনা, ধর্মগ্রন্থ পাঠ, ধর্মানুশীলন, পুণ্যকাজ, মানবসেবা, জ্ঞান-অর্জন, তীর্থযাত্রা কিংবা সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ এসব কিছুর মধ্য দিয়েই মানুষ তাঁর আপন স্রষ্টাকে খুঁজে বেড়ায়।

৩.১১ পরিত্রাণের উপায়

ঈশ্বরকে জানতে, তাঁর আজ্ঞাগুলো মেনে চলতে এবং এই পৃথিবীতে ও পরকালে, পরম সুখে বাস করার জন্য ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানুষ পাপ করে সেই সুখ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

কিন্তু ঈশ্বর নিজেই উদ্যোগ নিয়ে মানুষকে ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। তিনি মানুষকে পরিত্রাণ দিতে চান। পাপের কবল থেকে রক্ষা পাবার জন্য মানুষের প্রয়োজন ঈশ্বরের পরিত্রাণ। ঈশ্বরের কৃপা পেয়ে মানুষ পরিত্রাণের পথে এগিয়ে চলতে পারে। এই কৃপা ঈশ্বর মানুষকে দান করেন তাঁর একমাত্র পুত্র যীশুখ্রিস্টের মধ্য দিয়ে। তাছাড়াও তিনি মানুষের জন্য দিয়েছেন বিধি-বিধান। এই বিধানের দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানুষ লাভ করবে ঐশ-অনুগ্রহ ও পরিত্রাণ। নানা উপায়ে পরিত্রাণ লাভ করা যায়, যেমন (১) প্রভু যীশুকে মুক্তিদাতারূপে গ্রহণ করা, (২) নৈতিক বিধান পালন করা, (৩) ঐশ-অনুগ্রহ ও ধর্মময়তা, (৪)খ্রিস্টমণ্ডলীর সদস্য হওয়া, (৫) সেবা কাজ করা।[১১]

৩.১২ যীশুর বাণী প্রচারের মূলভাব

প্রভু যীশুখ্রিস্ট পিতার ইচ্ছা অনুসারে এই জগতে এসেছেন মানবজাতির পরিত্রাণ সাধন করতে। প্রকাশ্য প্রচারজীবনে তিনি তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী ও আশ্চর্যকাজগুলোর মধ্য দিয়ে মানুষের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শিক্ষা প্রদান করেছেন। তাঁর শিক্ষার মধ্যে রয়েছে সত্য ও সুন্দরের পথে জীবনযাপন এবং ন্যায্যতা, শান্তি ও ভালোবাসার পথ অনুসরণ করার মতো সকল বিষয়ের দিক নির্দেশনা। বাণী প্রচারের মাধ্যমে যীশুখ্রিস্ট মানুষকে ধীরে ধীরে পরিত্রাণের জন্য প্রস্তুত করে তুলেছেন। তাই যীশুর বাণী প্রচারের মূলভাবগুলো হলো : (১)ঈশ্বরের রাজ্য, (২)ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা, (৩) সুখপন্থাসমূহ বা অষ্টকল্যাণ বাণী, (৪) শেষবিচার, (৫) মৃতদের পুনরুত্থান, (৬) জেরুশালেম মন্দির, (৭) ইহুদীদের বিধান, (৮)শান্তি, (৯)দীন-দরিদ্র, (১০) পবিত্র আত্মার বাণী ও প্রেরণকর্ম, (১১) বিবাহের অবিচ্ছেদ্যতা।[১২]

৩.১৩ দূত সংবাদ

গালিলেয়ার নাজারেথ নগরের একজন কুমারীর নিকট ঈশ্বর স্বর্গদূত গাব্রিয়েলকে পাঠালেন। জাতিতে তিনি ছিলেন ইহুদী। তাঁর বাবার নাম ছিল যোয়াকিম ও মায়ের নাম ছিল আন্না। জন্মের পূর্ব থেকেই মারীয়াকে তাঁর মা-বাবা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদন করেছিলেন। আর ঈশ্বর তাঁর পুত্রের জননী হবার জন্য মারীয়াকে নিষ্পাপ অবস্থায় পৃথিবীতে এনেছিলেন। দূত তাঁর নিকট

এসে বললেন, "আনন্দিত হও, হে অনুগ্রহীতা! প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন"। এই কথা শুনে মারীয়া খুব বিচলিত হলেন। তখন স্বর্গদূত বললেন, "ভয় পেয়ো না মারীয়া! তুমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করেছ। শোন, গর্ভধারণ করে তুমি একটি পুত্রের জন্ম দেবে। তার নাম রাখবে যীশু। তিনি মহান হয়ে উঠবেন, পরাৎপরের পুত্র বলে পরিচিত হবেন। প্রভু ঈশ্বর তাকে দান করবেন তার পিতৃপুরুষ দাউদের সিংহাসন। যাকোব বংশের ওপর তিনি চিরকাল রাজত্ব করবেন; অশেষ হবে তার রাজত্ব।"[১৩] কিন্তু মারীয়া দূতকে জিজ্ঞেস করলেন, "এ কেমন করে হবে?" দূত উত্তর দিলেন, "পবিত্র আত্মা তোমার উপর নেমে আসবেন, কারণ ঈশ্বরের পক্ষে অসাধ্য কিছুই নেই"। তখন মারীয়া বললেন, "এই যে, আমি প্রভুর দাসী; আপনি যা বলেছেন, আমার তাই হোক"। মারীয়া চিন্তিত হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে পুরোপুরি ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দিলেন। কারণ ঈশ্বরের প্রতি তাঁর ছিল গভীর বিশ্বাস ও আস্থা। সমাজের লোকেরা কী ভাববে বা বলবে এ ধরনের বিষয় তিনি চিন্তা করেননি। তাঁর পুরো জীবন দিয়ে তিনি শুধু ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করবেন, এটাই ছিল তাঁর সংকল্প।

৩.১৪ যীশুর জন্ম

সে সময় রোম সম্রাট আগুস্তুস সিজার এই রাজাজ্ঞা জারি করলেন যে, তাঁর রাজ্যের লোক গণনা করতে হবে। তাই রাজ্যের সকলেই নিজ নিজ শহরে নাম লেখাতে গেল। যোসেফ দাউদের বংশধর বলে দাউদের জন্মস্থান বেথলেহেমে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর স্ত্রী মারীয়াও গেলেন। বেথলেহেমে এসে মারীয়ার প্রসবের সময় উপস্থিত হলো। শিশুটির জন্ম হলে পর মারীয়া তাঁকে কাপড় দিয়ে জড়িয়ে একটি যাবপাত্রে রাখলেন। পান্থশালায় জায়গা ছিল না বলে তাঁরা এক গোয়াল ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন।[১৪]

৩.১৫ রাখালদের কাছে সংবাদ

সেই একই অঞ্চলে রাখালেরা মাঠে রাত জেগে তাদের মেষপাল পাহারা দিচ্ছিল। হঠাৎ একজন স্বর্গদূত তাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তার আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। রাখালেরা খুব ভয় পেল। কিন্তু স্বর্গদূত বললেন, "ভয় করো না। আমি মহা আনন্দের শুভ সংবাদ তোমাদের জন্য

এনেছি। আজ তোমাদের জন্য এক মুক্তিদাতা জন্মেছেন। তোমরা যাঁর জন্য অপেক্ষায় আছ, তিনি সেই খ্রীষ্ট। তোমরা কাপড়ে জড়ানো ও যাবপাত্রে শোয়ানো একটি শিশুকে দেখতে পাবে"। সেই স্বর্গদূতের পাশে আরও অসংখ্য স্বর্গদূত এসে ঈশ্বরের জয়গান করতে লাগলেন, "স্বর্গে ঈশ্বরের মহিমা হোক। পৃথিবীতে যারা তার প্রিয়, তাদের জীবনে শান্তি আসুক।"[১৫] দূতেরা চলে যাবার পর সেখানে যাওয়ার জন্য তারা যাত্রা শুরু করলো। সেখানে গিয়ে তারা মারীয়া, যোসেফ ও শিশুটিকে দেখতে পেলো। এরপর রাখালেরা ঈশ্বরের গৌরব-কীর্তন ও প্রশংসা করতে করতে নিজ নিজ মেষপালের কাছে ফিরে গেল।

৩.১৬ যীশুকে মন্দিরে উৎসর্গ

আটদিনের দিন শিশুটির ত্বকচ্ছেদের ব্যবস্থা হলো ও স্বর্গদূতের কথামতো তাঁর নাম 'যীশু' রাখা হলো। শিশুটির ৪০ দিন বয়স হলে তাঁর বাবা-মা ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করার জন্য তাকে জেরুসালেমে নিয়ে গেলেন।[১৬] সেদিন পবিত্র আত্মার প্রেরণায় সিমিয়োন নামে এক ধার্মিক লোক তাঁকে কোলে তুলে নিয়ে ঈশ্বরের স্তব করতে লাগলেন। তিনি শিশুটির বাবা-মাকে আশীর্বাদ করে বললেন, এই শিশুটি ইস্রায়েল বংশের বহু লোকের উত্থান ও পতনের কারণ হবে। তিনি যখন জাতির মাঝে দাঁড়াবেন তখন সকলের মনোভাব ধরা পড়বে। তার অনেক শত্রু হবে এবং তোমার বুকটা ছুরিতে বিদীর্ণ হবে।

৩.১৭ পণ্ডিতদের আগমন

কিছুদিন পরে পূর্বদিক থেকে কয়েকজন পণ্ডিত যেরুসালেমে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "ইহুদিদের নবজাত রাজা কোথায়? আমরা পুবাকাশে তাঁর জ্যোতিষ্ক দেখেছি ও তাঁর সামনে প্রণিপাত করতে এসেছি।" এই কথা শুনে হেরোদ রাজা উদ্বিগ্ন হলেন এবং তাঁর সভার প্রধান যাজক ও জাতির শাস্ত্রীদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় সেই ত্রাণকর্তা জন্মগ্রহণ করবেন? তারা তাকে বললেন, যুদেয়ার অন্তর্গত বেথলেহেমে। কারণ ভাববাদী মীখা তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীতে একথা লিখেছেন। হেরোদ পণ্ডিতদের বেথলেহেমে পাঠিয়ে দিলেন এবং বলে দিলেন, "আপনারা গিয়ে

ভালো করে সেই শিশুর খোঁজ নিন, খোঁজ পেলেই আমাকে সংবাদ দিন যেন আমিও গিয়ে তাঁকে প্রণিপাত করতে পারি।”

পণ্ডিতেরা আকাশের ঐ উজ্জ্বল তারকা দেখে দেখে পথ চলতে লাগলেন। যেখানে তারাটা গিয়ে থামলো সেখানেই ছিল শিশুটি। পণ্ডিতেরা ঘরে প্রবেশ করে তাঁকে প্রণাম করলেন ও তাদের রত্নপেটিকা খুলে যীশুকে সোনা, ধূপধুনো ও গন্ধনির্যাস উপহার দিলেন।[১৭] ঐ দিন রাতেই ঈশ্বর স্বপ্নে আদেশ দিলেন, তারা যেন হেরোদ রাজার কাছে ফিরে না যান। তাই অন্য পথ ধরে তারা নিজের দেশে চলে গেলেন।

৩.১৮ মিশরে পলায়ন

পণ্ডিতেরা নিজ দেশে চলে যাবার পর একজন স্বর্গদূত যোসেফকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, “ওঠ, শিশুটিকে ও তাঁর মাকে নিয়ে মিশরে পালিয়ে যাও, কেননা হেরোদ শিশুটিকে হত্যা করার জন্য খোঁজ করতে যাচ্ছে”। তখনই তাঁরা মিশরে চলে গেলেন।[১৮]

৩.১৯ শিশু হত্যা

রাজা হেরোদ যখন বুঝতে পারলেন যে, পণ্ডিতেরা তাঁকে ফাঁকি দিয়েছেন এবং তাঁর নিকট আর ফিরে আসবেন না, তখন তিনি রাগে গড়গড় করতে লাগলেন। তিনি তার সৈন্যদের আদেশ দিলেন এবং বেথলেহেম ও তার আশেপাশের সমস্ত অঞ্চলের দুই বছর বা তার কম বয়সী যত ছেলে-সন্তান আছে তাদের সকলকে হত্যা করালেন।[১৯] হেরোদ রাজার মৃত্যুর পর প্রভুর দূত মিশরে যোসেফকে স্বপ্নে আবার দেখা দিয়ে বললেন, “ওঠ, যাও।” যোসেফ উঠে শিশুটিকে ও তাঁর মাকে নিয়ে ইস্রায়েল দেশে ফিরে গেলেন। সেখানে তিনি গালিলেয়া প্রদেশের নাজারেথ শহরে বাস করতে লাগলেন।

৩.২০ মন্দিরে বালক যীশু

নিস্তার পর্ব পালনের জন্য প্রতি বছর যীশুর মা-বাবা জেরুশালেমে যেতেন। যীশুর বয়স যখন ১২ বছর তখন সেই পর্ব পালনের জন্য তারা জেরুসালেমে গেলেন। পর্ব শেষ হলে তারা

বাড়ির দিকে রওনা হলেন। কিন্তু যীশু সেখানেই রয়ে গেলেন। যখন সন্ধ্যা হয়ে এলো, তখন সবাই ব্যাকুল হয়ে যীশুকে খুঁজতে শুরু করলেন। তিন দিন পরে তারা মন্দিরে যীশুকে খুঁজে পেলেন। তিনি সেখানে শাস্ত্রগুরুদের মধ্যে বসে তাঁদের কথা শুনছিলেন ও তাঁদের প্রশ্ন করছিলেন। যত লোক তাঁর কথা শুনছিল, সকলেই তাঁর উত্তর শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময় তাঁর মা তাঁকে গিয়ে বললেন, বৎস, আমাদের প্রতি এ তোমার কেমন ব্যবহার? দেখ তো, তোমার পিতা ও আমি কত ব্যাকুল হয়েই না তোমাকে খুঁজছিলাম। তিনি তাদের বললেন, কেন আমাকে খুঁজছিলে? তোমরা কি জানতে না যে আমাকে আমার পিতার গৃহেই থাকতে হবে?[২০] যীশুর কথা শুনে তাঁর বাবা-মা অবাক হয়ে রইলেন। যীশুর কথা তাঁরা কিছুই বুঝতে পারলেন না। পরে যীশু তাঁদের সাথে নাজারেথে ফিরে গেলেন এবং তাঁদের বাধ্য হয়ে থাকলেন। এদিকে যীশু বয়সের সাথে সাথে জ্ঞানে বাড়তে লাগলেন। তিনি ঈশ্বর ও মানুষের কাছে আরও প্রিয় হতে লাগলেন।

৩.২১ যীশুর আত্মপ্রকাশ

ক) দীক্ষাগুরু যোহনের প্রচার

সম্রাট তিবেরিয় যখন ১৫ বছর ধরে রাজত্ব করেছিলেন, মহাপৌরোহিত্বের দায়িত্বভার যখন ছিল আন্না ও কাইফার উপরে, এমন সময় জাখারিয়ার পুত্র যোহন নির্জন প্রান্তরে ঈশ্বরের ডাক শুনতে পেলেন। তিনি জর্দান নদীর তীরে এসে পাপের ক্ষমালাভের জন্য দীক্ষাস্নানের কথা প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন। তিনি বলতেন, মন পরিবর্তন কর, ঈশ্বরের রাজত্ব আসন্ন। জেরুশালেম ও সমস্ত যুদেয়া থেকে লোকেরা তার কাছে এসে পাপ স্বীকার করে তার হাতে দীক্ষাস্নাত হতো। অনেক ফরিশীও তাঁর কাছে আসতো। জনতা তাঁর কথা শুনে ভাবতো, ইনি কি সেই খ্রিস্ট? কিন্তু যোহন বললেন, আমি জল দিয়ে তোমাদের দীক্ষাস্নাত করছি, কিন্তু আমার চেয়ে বড় একজন আসছেন, যার পাদুকা খুলে দেবার যোগ্যতাও আমার নেই। তিনি পবিত্র আত্মা ও আগুনে দীক্ষাস্নান করাবেন।[২১]

খ) যীশুর দীক্ষাস্নান

একদিন দীক্ষাস্নানের জন্য যীশু যোহনের সামনে এসে দাঁড়ালেন। যোহন বললেন, "আমারই তো আপনার হাতে দীক্ষাস্নাত হওয়া দরকার, আর আপনি কি'না আমার কাছে আসছেন?" কিন্তু যীশু বললেন, এখনকার মতো সম্মত হও, কেননা এভাবেই সমস্ত ধর্মময়তা সাধন করা আমাদের পক্ষে সমীচীন। তখন তিনি তাঁর কথায় সম্মত হলেন। যীশু দীক্ষাস্নান করে যখন জল থেকে উঠে প্রার্থনা করছিলেন, তখন হঠাৎ আকাশ খুলে গেল, পবিত্র আত্মা কবুতরের বেশে তার উপর নেমে এলেন এবং আকাশ থেকে এই বাণী শোনা গেল, "তুমি আমার প্রিয় পুত্র, তোমার উপর আমি প্রীত।"[২২] এর পরেই যীশু তার প্রচার কাজ আরম্ভ করলেন। তখন তার বয়স ছিল ৩০ বছর।

(মথি ৩:১৩-১৭; লূক ৩:২৩)

গ)যীশুর পরীক্ষা

যীশু পবিত্র আত্মার প্রেরণায় নির্জন প্রান্তরে গেলেন। সেখানে ৪০ দিন উপবাসের পর তার খিদে পেল। তখন শয়তান এসে তাঁকে ৩ বার পরীক্ষা করলো। যীশু বললেন, শয়তান দূর হও। শাস্ত্রে লেখা আছে, তুমি প্রভু ঈশ্বরকে ছাড়া আর কাউকে পূজা করবেনা। এরপর শয়তান তাঁকে ছেড়ে চলে গেল এবং স্বর্গদূতেরা এসে যীশুকে সেবা করতে লাগলেন।[২৩]

ঘ) যোহনের সাক্ষ্য দান

ঙ)প্রথম শিষ্যদের আহবান

চ) আশ্চর্য কার্য

১. কনান গ্রামে বিবাহ ভোজ
২. ঝড় থামানো
৩. পাঁচ হাজার লোককে আহার দান
৪. যীশু জলের উপর দিয়ে হেঁটে যান

৫. অন্ধকে দৃষ্টিদান

৬. কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করেন

৭. পক্ষাঘাতগ্রস্তকে নিরাময়

৮. শতপতির চাকরের আরোগ্যলাভ

৯. অপদূতগ্রস্ত ব্যক্তির সুস্থতা লাভ

১০. মৃত লোককে জীবন দান

১১. যাইরুসের মৃত কন্যাকে জীবন দান

এরপর যীশু নাজারেথ ত্যাগ করে কাফারনাউম শহরে বাস করতে লাগলেন। এই শহর ছিল গালিলেয়ার সমুদ্রের ধারে। সেখান থেকে তিনি ঈশ্বরের রাজ্যের সংবাদ চারিদিকে প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন। এরপর যীশু পিতরকে প্রথম আহ্বান করলেন। তাঁর সাথে ছিল যাকোব ও যোহন। এরপর যীশু মথিকে আহ্বান করলেন। এসব আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে যীশু খ্রিস্ট তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। এই শক্তি অপশক্তির বিরুদ্ধে। মন্দতার বিরুদ্ধে তার শক্তি ও ক্ষমতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে তিনি নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এই নতুন রাজ্যই হলো ঐশরাজ্য।[২৪]

৩.২২ বারোজন শিষ্য মনোনয়ন

একদিন যীশু এক পাহাড়ে গিয়ে উঠলেন। সেখানে সারারাত প্রার্থনা করে কাটালেন। ভোর হলে তিনি নিচে নেমে এসে শিষ্যদের ডাকলেন ও তাদের মধ্য থেকে বারোজনকে বেছে নিলেন। তাদের নাম রাখলেন প্রেরিতশিষ্য। তাদের তিনি শয়তান তাড়াবার ও রোগ সারাবার ক্ষমতা দিলেন। এই বারোজনের নাম হলো: পিতর ও তার ভাই আন্দ্রিয়, যাকোব ও তার ভাই যোহন, ফিলিপ, বার্থলোমেয়, টমাস, করগ্রাহক মথি, দুই ভাই যাকোব ও থদ্দেয়, কনানবাসী শিমোন ও যুদা ইষ্কারিয়ৎ, যে তাঁকে শেষে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল।[২৫] যীশুর অন্যান্য শিষ্য ও সারাদেশ থেকে আগত বহু লোক তাঁর পাশে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। এরা তাঁর উপদেশ শুনবার জন্য ও রোগ হতে মুক্তির জন্য এসেছিল। (লুক ৬:১২-১৯)

ঐশরাজ্যঃ ঐশরাজ্য জাগতিক কোনো রাজ্যের মতো নয়। এখানে আছে ন্যায্যতা, শান্তি, ভালোবাসা, ক্ষমা, সহানুভূতি, সহমর্মিতা ইত্যাদি।[২৬] যেখানে ঈশ্বরের কর্মগুলো সাধিত হয় ও যারা ঈশ্বরের ইচ্ছামতো চলে তাদের মধ্যে ঐশরাজ্য বিরাজমান। এটি বাইবেলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পুরাতন নিয়মে ঐশরাজ্যের আগমন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে এবং তা ঈশ্বরপুত্র যীশু খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করেছে। প্রভু যীশুর এ প্রকাশ তাঁর জীবন, কথা ও আশ্চর্য কাজ দ্বারা সাধিত হয়েছে। এই রাজ্য সমগ্র মানবজাতির কাছে ঘোষণা করা হয়েছে।

৩.২৩ যীশুর জেরুশালেমে প্রবেশ

নিস্তারপর্বের চারদিন আগে যীশু তার ১২ জন শিষ্যকে নিয়ে জেরুশালেম যাচ্ছিলেন। তাঁর আগমনের খবর পেয়ে জনগণ খেজুর পাতা হাতে নিয়ে অভ্যর্থনা করতে বেরিয়ে এলো। কেউ কেউ গাছের ডালপালা চারিদিকে ছড়িয়ে দিল। সকলেই চিৎকার করে বলতে লাগল, হোসান্না, যিনি প্রভুর নামে আসছেন, যিনি ইস্রায়েলের রাজা, তিনি ধন্য।[২৭] যীশুর নতুন ধরনের কথা শুনে, তাঁর জীবন ও আশ্চর্য কাজগুলো দেখে অগণিত মানুষ দিন দিন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগলো। তা দেখে ইহুদি ধর্মনেতা ও ফরিশীরা তাঁর উপর খুব ক্ষেপে উঠেছিল। তারা যীশুকে মেরে ফেলার জন্য নানারকম ষড়যন্ত্র করতে লাগল।

৩.২৪ যুদাসের চুক্তি

যীশুর ১২ জন শিষ্যের অন্যতম শিষ্য যুদাস (যিহুদা) প্রধান যাজকদের কাছ থেকে ত্রিশটি রুপোর টাকা নিল। তার বিনিময়ে সে যীশুকে শত্রুদের হাতে তুলে দিল।[২৮] যীশু আগে থেকেই সবকিছু জানতেন।

৩.২৫ শেষ ভোজ

যুদাস যেদিন বিশ্বাসঘাতকতা করে যীশুকে ধরিয়ে দিয়েছিল, সেদিন সন্ধ্যাবেলা যীশু এক ভোজের আয়োজন করলেন। যীশু রুটি হাতে নিয়ে তা আশীর্বাদ করলেন ও তা ছিঁড়ে শিষ্যদের দিয়ে বললেন, "গ্রহণ করে নাও, খাও, এ আমার দেহ।" তারপর তিনি দ্রাক্ষারসের পানপাত্র

হাতে তুলে নিলেন ও স্বর্গীয় পিতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে শিষ্যদের দিয়ে বললেন, "এ আমার রক্ত, নতুন সন্ধিরই রক্ত, যা অনেকের জন্য পাতিত।"[২৯] এরপর তাঁরা সামসঙ্গীত গাইতে গাইতে জৈতুন পর্বতের দিকে গেলেন।

৩.২৬ গেৎসিমানী বাগানে যীশু

ভোজের শেষে যীশু তার শিষ্যদের নিয়ে জৈতুন পর্বতের গেৎসিমানী বাগানে গেলেন এবং তাঁদের বললেন, "তোমরা এখানে বস, আমি ততক্ষণ প্রার্থনা করে আসি"। যীশু পিতর, যাকোব ও যোহনকে সাথে করে নিলেন। সেই সময় তিনি আশঙ্কায়, উদ্বেগে কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁদের বললেন, "দুঃখে আমি যেন মরতে বসেছি! তোমরা এখানে বরং অপেক্ষা কর আর জেগেই থাক।" তিনি তখন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন। প্রার্থনার সময় যীশু ৩ বার শিষ্যদের কাছে ফিরে আসলেন। তাঁদের বললেন, সে কি, তোমরা ঘুমোচ্ছ! এখনও বিশ্রাম করছো? না, যথেষ্ট হয়েছে। সময় এসে গেছে। দেখ, এবার মানবপুত্রকে শত্রুর হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে।"[৩০]

৩.২৭ মহাযাজকের দরবার

তারপর পূর্বপরিকল্পনা মতো যুদাস যীশুকে চুম্বন করল এবং শত্রুরা যীশুকে গ্রেপ্তার করলো। তারা যীশুকে ধরে মহাযাজকের বাড়িতে নিয়ে গেল। যীশুর বিরুদ্ধে তারা অনেক মিথ্যা সাক্ষ্য দিল। যীশু নিরবে সব অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করলেন।

৩.২৮ পিলাতের দরবারে যীশু

সকাল হলে তারা যীশুকে বেঁধে প্রদেশপাল পিলাতের কাছে নিয়ে গেল। পিলাত যীশুকে মুক্ত করে দেয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু জনতার চিৎকারে ভয় পেয়ে পিলাত যীশুকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়ে তাদের হাতে ছেড়ে দিলেন।

৩.২৯ সৈন্যদের হাতে যীশুর অপমান

পিলাতের বিচারে সিদ্ধান্ত হলো যে, যীশুর শাস্তি ক্রুশে মৃত্যুদণ্ড। প্রহার ও কষাঘাতের পর সৈন্যরা যীশুর কাপড় খুলে তাঁকে বেগুনী রঙের পোশাক পরালো এবং তাঁর মাথায় দিল একটি কাঁটার মুকুট। তাঁর ডান হাতে দিল একটি নলডাটা। তারা তাঁর কাঁটার মুকুট-পরানো মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করতে লাগলো, মুখে থুতু দিল, অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করলো, চড়-থাপ্পড় মারতে লাগলো, তাঁকে 'ইহুদিদের রাজা' বলে অপমান ও উপহাস করতে লাগলো।

৩.৩০ যীশুর ক্রুশবহন

তারা যীশুকে মারতে মারতে কালভেরী পর্বতের দিকে নিয়ে চললো। পথে যীশু ৩ বার পড়ে গেলেন। শত্রুরা তাকে টেনে-হিঁচড়ে তুললো ও ক্রুশ বহন করতে বাধ্য করলো।[৩১] তাঁর গা থেকে অঝোরে রক্ত ঝরতে লাগলো। যীশু খুবই দুর্বল হয়ে পড়লেন। পথে তারা শিমোন নামে সাইরিনির একজন লোকের দেখা পেল। সে খোলা মাঠ থেকে সেই পথ দিয়ে আসছিল। তারা তার কাঁধে সেই ক্রুশ চাপিয়ে দিল।

৩.৩১ যীশুর ক্রুশারোপণ

অবশেষে তারা কালভেরী পর্বতের 'গলগথা' অর্থাৎ 'খুলিতলা' নামক স্থানে পৌঁছলো। সেখানে তারা যীশুকে দু'জন দস্যুর সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ করলো। ক্রুশের উপর তিনি তিন ঘন্টা অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে নতমস্তকে মৃত্যুবরণ করলেন।[৩২]

সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের পর্দা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত দুইভাগ হয়ে গেলো, পাথর ফেটে গেলো, কবর খুলে গেলো ও অনেক মৃত ব্যক্তি কবর থেকে পুনরুত্থান করলো। যারা যীশুকে পাহারা দিচ্ছিলো তারা খুব ভয় পেয়ে গেলো এবং বলতে লাগলো, "ইনি সত্যিই ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।"[৩৩]

৩.৩২ যীশুর সমাধি

মানবজাতিকে পাপ ও শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যীশু ক্রুশীয় মৃত্যুকে বরণ করে নিলেন। সন্ধ্যা হলে আরিমাথেয়ার যোসেফ নামে একজন যীশুকে ক্রুশ থেকে নামিয়ে ক্ষৌম বস্ত্র

দিয়ে দেহটি জড়ালেন ও প্রায় ৩৩ কেজি গন্ধ নির্যাস মেশানো অগুরু মাখিয়ে পাথরে খোদাই-করা একটি নতুন সমাধি গুহায় যীশুকে সমাহিত করলেন।[৩৪] তারপর বড় একটি পাথর দিয়ে সমাধি গুহার মুখটি বন্ধ করে দিলেন। সেখানে পাহারা দেয়ার জন্য ফরিসীরা ও যাজকেরা প্রহরী রাখলেন।

৩.৩৩ যীশুর পুনরুত্থান

সপ্তাহের প্রথম দিন, রবিবার দিন সকালে বিরাট ভূমিকম্প হলো। প্রভুর একজন দূত স্বর্গ হতে নেমে এলেন এবং সমাধির মুখ থেকে সেই বড় পাথরটি সরিয়ে তার উপর বসলেন। প্রহরীরা ভয় পেয়ে মরার মতো পড়ে রইল। সকালে মাগদালার মারীয়া, যাকোবের মা মারীয়া ও সালোমে যীশুর সমাধি দেখতে আসলেন। তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন, কে সমাধির পাথরখানা সরিয়ে দিবে। কিন্তু তারা সেখানে গিয়ে দেখলেন পাথরখানা সরানো। তাঁরা ভিতরে গিয়ে দেখতে পেলেন একজন যুবক দীর্ঘ শুভ্র পোষাক পরে ডান দিকে বসে আছেন। তাঁরা চমকে উঠলেন। কিন্তু তিনি তাঁদের বললেন, “ভয় পেয়োনা; তোমরা তো নাজারেথের যীশুকে খুঁজছো, যাকে ক্রুশে দেয়া হয়েছিল? তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন, তিনি এখানে নেই।[৩৫] এই দেখ, তাঁকে এখানেই রাখা হয়েছিল! এখন যাও, তাঁর শিষ্যদের আর বিশেষ করে পিতরকে গিয়ে এই কথা জানাও, তিনি তোমাদের আগেই গালিলেয়ায় যাচ্ছেন। তোমরা সেখানেই তাঁর দেখা পাবে, তিনি তোমাদের যেমনটি বলেছিলেন।”

৩.৩৪ শিষ্যদের কাছে যীশুর দর্শনদান

পুনরুত্থান করার পর যীশু প্রথমে মাগদালার মারীয়ার কাছে দর্শন দিলেন। মারীয়া তা শিষ্যদের জানালেন। যীশু অন্যান্য শিষ্যকেও কয়েকবার দেখা দিলেন। সপ্তাহের প্রথম দিনে সন্ধ্যাবেলায় ইহুদীদের ভয়ে শিষ্যেরা একটি ঘরে দরজা বন্ধ করে একত্রে বসেছিলেন। যীশু সবার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং বললেন, “তোমাদের শান্তি হোক।”[৩৬] এই কথা বলে তিনি তাদের উপর ফুঁ দিয়ে বললেন, “তোমরা পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর। তোমরা যার পাপ ক্ষমা করবে, তার পাপ ক্ষমা করা হবে। যার পাপ ক্ষমা না করবে, তার পাপ ক্ষমা না-করাই থাকবে।”

৩.৩৫ শিষ্যদের প্রেরণ

যীশুর নির্দেশে তাঁর ১১ জন শিষ্য গালিলেয়ার দিকে একটি পাহাড়ে একত্রিত হলেন। তাঁরা সেখানে যীশুকে দেখতে পেলেন ও তাঁর আরাধনা করলেন। যীশু কাছে এসে তাঁদের বললেন, "তোমরা যাও, সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর; পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা নামের উদ্দেশ্যে তাদের দীক্ষাস্নাত কর। আমি তোমাদের যা যা আজ্ঞা করেছি, সেই সমস্ত তাদের পালন করতে শেখাও। আর দেখ, আমি প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি, শেষ দিন পর্যন্ত আছি।"[৩৭] এই বলে দুই হাত তুলে শিষ্যদের তিনি আশীর্বাদ করলেন।

৩.৩৬ যীশুর স্বর্গারোহণ

পুনরুত্থানের পর যীশু ৪০ দিন পৃথিবীতে ছিলেন। তিনি শিষ্যদের বিভিন্ন স্থানে দেখা দিয়েছেন ও নানা রকম নির্দেশ দান করেছেন। যীশু ঐশরাজ্যের বিষয়ে তাদের শিক্ষা দিতেন। অবশেষে তিনি শিষ্যদের বললেন, "পিতা যে সকল কাল বা লগ্ন নিজেরই অধিকারের অধীনে রেখেছেন, তা তোমাদের জানবার কথা নয়; কিন্তু তোমরা শক্তি লাভ করবে - সেই পবিত্র আত্মারই শক্তি, যিনি তোমাদের উপর নেমে আসবেন।" এই কথা বলার পর তিনি উপরের দিকে নীত হলেন এবং একটি মেঘবাহন এসে তাঁকে ঢেকে ফেলল। শিষ্যেরা তাঁর গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। যীশু স্বর্গে উন্নীত হলেন।[৩৮]

৩.৩৭ ঈশ্বরের পরিকল্পনায় খ্রিস্টমণ্ডলী

ঈশ্বরের পরিকল্পনায় খ্রিস্টমণ্ডলীর উপধারাগুলো হলো:

উপধারা - ১

<u>খ্রিস্টমণ্ডলীর নাম ও প্রতীকসমূহ</u>

খ্রিস্ট

যীশুর ভাষা ছিল হিব্রু ও আরামায়িক। পবিত্র বাইবেল লেখা হয়েছে হিব্রু ও গ্রীক ভাষায়। পরে তা অনুবাদ করা হয়েছে। 'খ্রিস্ট' একটি গ্রীক শব্দ। হিব্রু শব্দ 'মশীহ' থেকে এই শব্দটি অনুবাদ

করা হয়েছে। মশীহ শব্দের অর্থ 'অভিষিক্ত'। তাই মশীহ বা খ্রিস্ট শব্দের অর্থ অভিষিক্ত।[৩৯] খ্রিস্ট শব্দটি যীশুর নামের সাথে যুক্ত হয়েছে। কারণ তিনি পিতা কর্তৃক প্রেরিত বা অভিষিক্ত। পিতার ইচ্ছা ও পরিকল্পনা তিনি পরিপূর্ণ করেছেন।

মণ্ডলী

লাতিন ভাষায় ecclesia (ইহা গ্রীক শব্দ ek-klein থেকে এসেছে)। মণ্ডলী শব্দটির অর্থ হচ্ছে সভা বা সমাবেশ। সাধারণত ধর্মীয় উদ্দেশ্যে সমবেত জনগণকেই বুঝানো হয়েছে। মণ্ডলী হচ্ছে সেই জনগণ যা পরমেশ্বর সমগ্র বিশ্বে একত্রিত করেছেন। তার বাস্তব অস্তিত্ব স্থানীয় সমাজ সমূহে এবং তা মূর্ত হয়ে ওঠে উপাসনা অনুষ্ঠানে, সর্বোপরি খ্রিস্টপ্রসাদীয় ভোজসভায়।[৪০] মণ্ডলী ঐশবাণী থেকে এবং খ্রিস্টের দেহ হতে তার জীবনীশক্তি লাভ করে এবং এভাবেই সে নিজে হয়ে ওঠে খ্রিস্টের নিগূঢ় দেহ।

ক) খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রতীকসমূহ

১. মণ্ডলী হচ্ছে মেষপালের খোঁয়াড়স্বরূপ যার মধ্যে প্রবেশের একমাত্র ও আবশ্যকীয় দরজা হলেন স্বয়ং খ্রিস্ট।

২. মণ্ডলী হচ্ছে চাষের জমি, ঈশ্বরের কর্ষিত ভূমি।

খ) খ্রিস্টমণ্ডলীর আদি, ভিত্তি ও মিশনকর্ম

মণ্ডলীর রহস্যের অনুসন্ধান শুরু হয় পবিত্র ত্রিত্বের পরিকল্পনায় তার আদি এবং ইতিহাস ক্রমশঃ বাস্তবায়নের ওপর ধ্যানের মাধ্যমে।

খ্রিস্টমণ্ডলী

- জগতের সূচনা থেকে আভাসিত
- প্রাক্তন সন্ধিতে প্রস্তুতি
- খ্রিস্ট কর্তৃক স্থাপিত

- পবিত্র আত্মার দ্বারা প্রকাশিত

- গীরবে পরিপূর্ণ

গ) খ্রিস্টমণ্ডলীর রহস্য

খ্রিস্টমণ্ডলীর উপস্থিতি ইতিহাসের বাস্তবতায়। কিন্তু একই সময়ে সে ইতিহাসের অতীত। কেবলমাত্র 'বিশ্বাসের চোখ দিয়েই' তাকে দৃশ্যমান বাস্তবতায় একই সাথে ঐশ্বরিক জীবন বহনকারী রূপে আধ্যাত্মিক বাস্তবতায় দেখা যেতে পারে। তাই খ্রিস্টমণ্ডলী হলো:

১) একই সময়ে দৃশ্যমান ও আধ্যাত্মিক।

২) ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের মিলনের রহস্য।

উপধারা - ২

খ্রিস্টমণ্ডলী হলো ঈশ্বরের জনগণ, খ্রিস্টের নিগূঢ় দেহ ও পবিত্র আত্মার মন্দির।

উপধারা - ৩

ক) খ্রিস্টমণ্ডলী এক

খ) খ্রিস্টমণ্ডলী পবিত্র

গ) খ্রিস্টমণ্ডলী কাথলিক। সে ঘোষণা করে বিশ্বাসের পূর্ণতা। মুক্তিপথের সমগ্রতা সে তার নিজের মধ্যে বহন করে চলে ও অন্যদের নিকট তা প্রদান করে। সে সকল মানুষের নিকট প্রেরিত। সে সকল মানুষের উদ্দেশ্যে কথা বলে। সব যুগেই সে পরিব্যাপ্ত। সে 'আপন স্বভাবগুণেই মিশনারী'।

(দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা : খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রেরণকার্য - ২)

"কাথলিক"

কাথলিক শব্দের অর্থ সর্বজনীন।[৪১] খ্রিস্টমণ্ডলী দুই অর্থে কাথলিক :

প্রথমত, খ্রিস্টমণ্ডলী কাথলিক, কারণ খ্রিস্ট তার মধ্যে উপস্থিত। “খ্রিস্ট যেখানে বিরাজমান, সেখানেই কাথলিক মণ্ডলী।” খ্রিস্টমণ্ডলী পঞ্চাশত্তমীর দিনটিতেই ছিল কাথলিক।

দ্বিতীয়ত, খ্রিস্টমণ্ডলী কাথলিক, কারণ খ্রিস্ট কর্তৃক সে গোটা মানবজাতির নিকট মিশনকর্মে প্রেরিত হয়েছে।[৪২]

নির্দিষ্ট বা স্থানীয় খ্রিস্টমণ্ডলী হচ্ছে প্রথমত ডাইওসিস বা ধর্মপ্রদেশ। ডাইওসিস বলতে বুঝায় প্রৈরিতিক উত্তরাধিকারীত্বে অভিষিক্ত ধর্মপালের সঙ্গে বিশ্বাস ও সংস্কারসমূহ দ্বারা সংযুক্ত খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের একটি সমাজ।

ঘ) মিশনকর্ম

১) আদেশ

২) উৎস ও লক্ষ্য : পবিত্র ত্রিত্বের জ্বলন্ত ভালোবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত।

৩) প্রেরণা : সার্বজনীন পরিকল্পনায় বিশ্বাসী।

৪) পন্থাসমূহ : সেবা, বাণীপ্রচার, আনুগত্য।

ঙ) খ্রিস্টমণ্ডলী প্রৈরিতিক

খ্রিস্ট তাঁর মণ্ডলীকে পরিচালনা করেছেন পিতর ও অন্যান্য প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়ে যাঁরা তাদের উত্তরাধীকারী পোপ ও বিশপ সংঘের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন।

প্রেরিতদূতদের মিশন

যীশু হলেন পিতার প্রেরিতজন। তাঁর কর্মজীবন থেকেই তিনি নিজেই যাদের ইচ্ছা করলেন তাদের কাছে ডাকলেন, আর তিনি বারো জনকে এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করলেন; তাঁরা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন, তিনি তাদের প্রচার করতে প্রেরণ করবেন। তখন থেকেই তাঁরা হয়ে উঠেছিলেন প্রেরিতদূত। তাদের মধ্য দিয়ে খ্রিস্ট তাঁর নিজের মিশন চালিয়ে যাচ্ছেন। খ্রিস্টের প্রেরিতদূতগণ জানতেন যে, ঈশ্বর তাদেরকে আহ্বান করেছেন যেন তারা হতে পারেন এক নতুন সন্ধির

সেবাকর্মী, ঈশ্বরের সেবাকর্মী, খ্রিস্টের পক্ষে বাণীদূত, খ্রিস্টের সেবক ও ঈশ্বরের রহস্যগুলোর ধনাধ্যক্ষ।[৪৩]

বিশপগণ (প্রেরিতদূতদের উত্তরাধিকারী)

"তাঁদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব যেন তাঁদের মৃত্যুর পরও পালন করা হয়, সে জন্যে তাঁরা দানপত্র বা চুক্তিপত্রের মতো ব্যবস্থার মাধ্যমে তাঁদের নিকটতম সহকারীদের দায়িত্ব প্রদান করে গেছেন, যেন তাদের দ্বারা আরব্ধ কাজ সুসম্পন্ন ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাঁদেরকে অনুরোধ করেছেন, যেন ঈশ্বরের যে খ্রিস্টমণ্ডলীতে তাঁরা পবিত্র আত্মার দ্বারা পালক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন সেই মেষপালেরও তারা দেখাশুনা করেন। সেই অনুযায়ী প্রেরিতদূতেরা উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিযুক্ত করেছেন এবং নিয়ম করে গেছেন যেন অনুরূপভাবে তাদের মৃত্যুর পরেও উপযুক্ত ব্যক্তি তাদের সেবাকর্মের দায়িত্বভার হাতে নেন।"[৪৪](২য় ভাতিকান মহাসভাঃ খ্রিস্ট মণ্ডলী ২০ নং দ্রষ্টব্য, শিষ্যচরিত ২০:২৮; রোমের সাধু ক্লেমেন্ট ad cor 42,44:pg, 291-300)

"প্রেরিতদূতদের মধ্যে যিনি প্রধান সেই একমাত্র পিতরের নিকট প্রভু এক বিশেষ দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন; আর সেই দায়িত্ব পিতরের উত্তরাধিকারীদের নিকট প্রদান সাপেক্ষ, এবং এই ব্যবস্থা যেমন স্থায়ী, ঠিক তেমনি প্রেরিতদূতদের মাধ্যমে প্রাপ্ত, মণ্ডলীকে পালন করার দায়িত্ব ও স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত। আর এই স্থায়িত্ব অক্ষুণ্ন রাখা হচ্ছে বিশপদেরই পুণ্য অভিষেকের দ্বারা।" তাই খ্রিস্টমণ্ডলী এই শিক্ষা দিয়ে থাকে যে, "ঈশ্বর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার গুণে, খ্রিস্টমণ্ডলীর পালক হিসেবে বিশপগণ প্রেরিতদূতদের উত্তরাধিকারী। অতএব, যারা তাদের কথা শোনে, তারা খ্রিস্টেরই কথা শোনে, এবং যারা তাদের কথা অগ্রাহ্য করে, তারা খ্রিস্টকে ও যিনি খ্রিস্টকে পাঠিয়েছেন তাঁকেও অগ্রাহ্য করে।[৪৫]

প্রৈরিতিক কাজ

গোটা খ্রিস্টণ্ডলীই প্রৈরিতিক, আর এই প্রৈরিতিকতার মধ্যেই সাধু পিতর ও অন্যান্য প্রেরিত দূতদের মধ্য দিয়ে, তার উৎসের সাথে বিশ্বাস ও জীবনের একতায় সে অবস্থান করে; এই

অবস্থাতেই তাকে সারা পৃথিবীতে 'পাঠানো' হয়। বিচিত্র পন্থায় হলেও খ্রিস্টমণ্ডলীর সকল সদস্যই এই মিশনকর্মে অংশগ্রহণ করে থাকে।

খ্রিস্টমণ্ডলী তার গভীরতম ও চূড়ান্ত পরিচয়ের দিক থেকে এক, পবিত্র, কাথলিক ও প্রৈরিতিক। কারণ একমাত্র তারই মধ্যে 'স্বর্গরাজ্য', তথা 'ঐশ্বরাজত্ব' ইতোমধ্যে বিদ্যমান,এবং তার পূর্ণতা লাভ হবে যুগের অবসানে।

"এই হলো খ্রিস্টের একমাত্র মণ্ডলী, যাকে আমরা ধর্মবিশ্বাসমন্ত্রে এক, পবিত্র, কাথলিক ও প্রৈরিতিক বলে স্বীকার করি। সেই একই খ্রিস্টমণ্ডলী বিদ্যমান রয়েছে কাথলিক মণ্ডলীতে এবং পিতরের উত্তরাধিকারী ও তার সম্মিলিত সকল বিশপদের দ্বারা এর শাসনভার পরিচালনা করা হচ্ছে। তবে কাথলিক মণ্ডলীর দৃশ্য পরিসীমার বাইরেও সত্য ও পরিত্রাণের বহু উপায়ের সন্ধান পাওয়া যায়।"[৪৬](২য় ভাতিকান মহাসভা : খ্রিস্টমণ্ডলী)

উপধারা ৪

খ্রিস্টবিশ্বাসীবর্গ

এদের মধ্যে রয়েছেন যাজকশ্রেণী, ভক্তসাধারণ, উৎসর্গীকৃত সন্ন্যাসব্রতীগণ।

খ্রিস্টপ্রভু সাধু পিতরকে তাঁর খ্রিস্টমণ্ডলীর দৃশ্যমান ভিত্তি করেছেন। তিনি তাঁর কাছে খ্রিস্টমণ্ডলীর চাবি প্রদান করেছেন। রোমের মণ্ডলীর বিশপ, সাধু পিতরের উত্তরসুরি হচ্ছেন "বিশপ সংঘের মস্তক, খ্রিস্টের প্রতিনিধি, পৃথিবীতে সার্বজনীন মণ্ডলীর পালক।(খ্রিস্টমণ্ডলীর আইন সংহিতা # ৩৩১)
ঈশ্বরের ব্যবস্থার ফলে পোপ "বিশ্বাসীদের যত্ন নেয়ার কাজে সর্বোচ্চ, পরিপূর্ণ, প্রত্যক্ষ ও সার্বজনীন ক্ষমতার অধিকারী।"[৪৭] (২য় ভাতিকান মহাসভা : বিশপদের পালকীয় কার্যাবলী# ২)
বিশপগণ, পবিত্র আত্মার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রেরিতদূতদের স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁরা তাঁদের নিজস্ব স্থানীয় মণ্ডলীতে একতার দৃশ্যমান উৎস ও ভিত্তিস্বরূপ।[৪৮](২য় ভাতিকান মহাসভা :খ্রিস্টমণ্ডলী# ২৩)

বিশপগণ, তাদের সহকর্মী যাজকদের ও ডিকনদের সহায়তায়, সত্যিকার পালক হিসাবে, খাঁটি বিশ্বাস শিক্ষাদান, উপাসনা অনুষ্ঠান পরিচালনা, সর্বোপরি খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ এবং নিজস্ব মণ্ডলীগুলোকে পরিচালনা করার দায়াধিকারী। পোপের সঙ্গে সংযুক্ত ও তাঁর অধীন সকল স্থানীয় মণ্ডলীগুলোর জন্য চিন্তা-ভাবনা করার দায়দায়িত্বও বিশপদের উপর ন্যস্ত।

"ভক্তসাধারণ জাগতিক বিষয়াদি নিয়ে জগতের মধ্য থেকেই জগতে খামি হিসাবে, খ্রিস্টীয় চেতনা ও উৎসাহ নিয়ে প্রৈরিতিক কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য ঈশ্বর কর্তৃক আহূত।"[৪৯](২য় ভাতিকান মহাসভা : ভক্তজনগণের প্রৈরিতিক কাজ # ২২)

ভক্তসাধারণগণ খ্রিস্টের যাজকীয় দায়িত্বে অংশগ্রহণ করে থাকে। খ্রিস্টের সঙ্গে অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত থেকে তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও মাণ্ডলিক জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তাদের দীক্ষাস্নান ও হস্তার্পণ সংস্কারে প্রাপ্ত ঐশ-অনুগ্রহের সাক্ষ্য বহন করে। আর এইভাবে সকল দীক্ষাস্নানপ্রাপ্ত ব্যক্তি পবিত্রতার জন্য যে আহ্বান পেয়েছে তা পূর্ণ করে থাকে।

ভক্তসাধারণ তাদের প্রাবক্তিক দায়িত্ব অনুসারে "মানবসমাজের মধ্যে যে কোন পরিস্থিতিতে খ্রিস্টের সাক্ষী হবার জন্য আহূত।(২য় ভাতিকান মহাসভা : বর্তমান জগতে খ্রিস্টমণ্ডলী# ৪৩:৪)

ভক্তসাধারণ তাদের যাজকীয় দায়িত্ব অনুসারে পবিত্র জীবন যাপন ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে তাদের নিজেদের ও জগতের মধ্য থেকে পাপ নির্মূল করার আহবান পেয়েছে।(দ্রষ্টব্য : ২য় ভাতিকান মহাসভা : খ্রিস্টমণ্ডলী # ৩৬)

ঈশ্বরের নিকট উৎসর্গীকৃত জীবনের বৈশিষ্ট্য হলো খ্রিস্টমণ্ডলী কর্তৃক অনুমোদিত স্থায়ী জীবনাবস্থা গ্রহণ করে, প্রকাশ্যে মঙ্গলসমাচারের সুমন্ত্রণায় : দরিদ্রতা, কৌমার্য ও বাধ্যতার ব্রত গ্রহণ করা। দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে ইতোমধ্যে উৎসর্গীকৃত হয়ে, ঈশ্বরকে সর্বোপরি ভালবেসে, একজন ব্যক্তি নিজেকে সমর্পণ করেন এবং এভাবে ঈশ্বরের সেবা ও খ্রিস্টমণ্ডলীর কল্যাণে নিজেকে আরও গভীরভাবে নিবেদন করেন।

উপধারা - ৫

সিদ্ধগণের মিলন-সংযোগ খ্রিস্টমণ্ডলী। প্রেরিতগণের বিশ্বাসমন্ত্র প্রার্থনায় "পুণ্যময়ী কাথলিক মণ্ডলী" স্বীকার করার পর, "সিদ্ধগণের মিলন-সংযোগ" কথাগুলোর উচ্চারণ করা হয়।[৫০]

৩.৩৮ খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রসার

পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখতে পেলাম, ঈশ্বরপুত্র যীশুখ্রিস্ট সমগ্র জাতির কাছে মুক্তির বার্তা ঘোষণা ও তাদের মুক্তি সাধন করতে পৃথিবীতে এসেছিলেন। তাঁর মুক্তির বার্তা ও কাজ যাতে যুগে যুগে মানব জাতির পক্ষে ফলপ্রসূ হয় সেজন্য খ্রিস্টমণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত।

যীশু খ্রিস্টের একান্ত অভিপ্রায় ছিল, তাঁর স্বর্গারোহণের পরেও বস্তুবাদী পৃথিবীতে মানবজাতি তাঁর বাণী শুনবে এবং তা কাজে রূপায়িত করবে। মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যীশু শীর্ষ পরিচালকরূপে তাঁরই অন্যতম শিষ্য সাধু পিতরকে নিযুক্ত করলেন। তিনিই যীশুর জাগতিক প্রতিনিধি অর্থাৎ প্রথম পোপ। তাঁর সাহায্যকারী ছিলেন অন্যান্য শিষ্যরা। খ্রিস্টভক্তগণ মণ্ডলীর সদস্য। যীশুর শাশ্বত প্রেমের বাণীই মণ্ডলীর একমাত্র সংবিধান।

ঐশরাজ্যের প্রতীক হলো খ্রিস্টমণ্ডলী। ঐশরাজ্যের পরিচালকের পদে পিতরকে নিযুক্ত করতে গিয়ে যীশু তাঁকে বললেন, "তুমি পিতর (প্রস্তর) অর্থাৎ পাথর, এবং এই প্রস্তরের উপর আমি আমার মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করবো। নারকীয় শক্তি তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। আমি তোমাকে স্বর্গের চাবি দেব" (মথি ১৬:১৮-১৯)।

মণ্ডলীর পরিচালকগণকে যীশু বললেন, 'আমি তোমাদের যে শিক্ষা ও আদেশ দিয়েছি, তা পালন করতে সকলকে শিক্ষা দাও। জানবে জগতের শেষ দিন পর্যন্ত আমি তোমাদের সঙ্গে থাকবো' (মথি ২৮:২০)।

শিষ্যদের সহযোগিতায় যীশু তাঁর মণ্ডলী স্থাপন করলেন এবং সেই মণ্ডলীকে সঞ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করার জন্য পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। পবিত্র আত্মা

এসে শিষ্যদের কাছে যীশুর শিক্ষা ও তাঁদের দায়িত্ব-কর্তব্য বুঝিয়ে দিবেন। (দ্র. যোহন ১৪:২৫) পবিত্র আত্মা শিষ্যদের উপর অধিষ্ঠিত হলেন ও তাঁদের অনুপ্রাণিত করলেন পঞ্চাশত্তমীর দিনে।

ইহুদীদের পবিত্র নগরী জেরুশালেম। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের কাছেও স্থানটি পবিত্র। কারণ প্রায় দুই হাজার বছর আগে যীশুখ্রিস্ট প্রচার করেছিলেন তাঁর জীবন-দর্শন, সাধন করেছিলেন অলৌকিক কার্য এবং মানুষের কল্যাণে কষ্টভোগ করেছিলেন। মর্মান্তিক যন্ত্রণা ভোগ করে ক্রুশীয় মৃত্যুবরণ করেছিলেন। স্বর্গারোহণের মতো অলৌকিক কার্যও এই জেরুশালেমে ঘটেছিল। এছাড়া স্থানটি ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কাছেও পবিত্র; কারণ ইহুদীদের মহামন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর মুসলমানদের বিখ্যাত মসজিদ 'অমারের মসজিদ' (Mosque of the rock) বর্তমানে শোভা পাচ্ছে। এটি নির্মিত হয় সপ্তম শতাব্দীর শেষের দিকে।

জেরুশালেমের মহামন্দির নির্মাণের পর থেকে তাঁদের অনুসৃত প্রথা অনুযায়ী প্রতি বৎসর ইহুদীরা বিভিন্ন দেশ থেকে এসে জেরুশালেমে সমবেত হয়ে তাঁদের বার্ষিক 'পঞ্চাশত্তমী' উৎসব পালন করতেন। মিশরীয়দের দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার পর 'সীনাই' পর্বতে মোশী কর্তৃক ঈশ্বরের বিধান ঘোষণা করার কথা এই উৎসবে স্মরণ করা হতো।

'পঞ্চাশত্তমী' উৎসবটি আদিষ্ট তিনটি উৎসবের মধ্যে একটি। অন্য দুটি 'নিস্তার' ও 'শিবির' উৎসব। মিশরের সর্বাধিনায়ক ফারাউন রাজার নির্যাতন-নিষ্পেষণ থেকে মুক্তিলাভ স্মরণে 'নিস্তার' উৎসব পালিত হতো। আরব দেশের উত্তরে মরুভূমির বুকে ইহুদীরা যে চল্লিশ বৎসর ধরে তাঁবুতে বাস করেছিল, 'শিবির' উৎসবে সেই ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মরণ করা হতো।

'পঞ্চাশত্তমী' উৎসবের দিনে জেরুশালেমে বিভিন্ন দেশের নানা ভাষাভাষী ইহুদীগণ সমবেত হতেন। জীবনকালে ও স্বর্গারোহণের আগে যীশু তার শিষ্যদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি স্বর্গে ঈশ্বরের সমীপে উপস্থিত হওয়ার পর তাঁদের উপর 'পবিত্র আত্মা'-কে প্রেরণ করবেন।

৩.৩৯ পবিত্র আত্মার অবতরণ

পবিত্র আত্মার অবতরণের আশায় মারীয়া, শিষ্যগণ ও কয়েকজন অনুগামী একটি বন্ধ কক্ষে প্রার্থনারত অবস্থায় অপেক্ষা করছিলেন। হঠাৎ আকাশ থেকে প্রচণ্ড বাতাসের মতো একটা শব্দ

শোনা গেল। তারা আগুনের পিণ্ড দেখতে পেলেন, সেটা পৃথক পৃথক হয়ে প্রত্যেকের উপর নেমে এলো। তারা সকলে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হলেন ও নতুন নতুন ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। সেই সময় তাদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব দিব্য-প্রেরণা, গভীর জ্ঞান ও সাহসের সঞ্চার হয়েছিল। এমন অনুপ্রেরণা ও আবেগে যীশুর শিষ্যগণ প্রকাশ্যে জনতার সম্মুখীন হয়ে যীশুর বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পথে বের হয়ে পড়লেন।[৫১] প্রেরিতশিষ্যগণ নিজ মাতৃভাষায় উপদেশ দিলেও, শ্রোতারা বিভিন্ন ভাষাভাষী হলেও প্রত্যেকে তাদের নিজের ভাষায় উপদেশের মর্মার্থ স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন।

উল্লেখিত ভিন্ন ভাষাভাষী ইহুদী শ্রোতারা আশ্চর্য হয়ে বলাবলি করতে লাগল, কেমন করে শিষ্যগণ প্রত্যেক শ্রোতার মাতৃভাষায় উপদেশ দিতে সক্ষম হলেন। তখন শিষ্যবর পিতর শ্রোতাদের বুঝিয়ে দিলেন যে, এরূপ আশ্চর্য ঘটনা প্রমাণ করে যে. ইহুদিরা যাঁকে মুক্তিদাতা হিসাবে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং ক্রুশবিদ্ধ করেছেন, তিনিই ঈশ্বরপুত্র ও মানবজাতির প্রতিশ্রুত মুক্তিদাতা খ্রিস্ট। পিতর ইহুদিদের মনপরিবর্তন ও প্রায়শ্চিত্ত করতে এবং প্রভুর নামে দীক্ষিত হতে নির্দেশ দিলেন।

তাঁর উপদেশে প্রবুদ্ধ হয়ে সেদিন প্রায় তিন হাজার ইহুদি খ্রিস্টের অনুগামী হয়েছিলেন।

এইভাবে খ্রিস্টমণ্ডলী তাঁর দিগন্তপ্রসারী যাত্রা শুরু করলো। 'পবিত্র আত্মা'র প্রেরণায় খ্রিস্টধর্ম দিনের পর দিন সুপ্রোথিত বৃহৎ বৃক্ষের ন্যায় শাখা-প্রশাখা বিস্তার করতে লাগলো।[৫২] সেই থেকে খ্রিস্টমণ্ডলী আজ পর্যন্ত অবিরাম গতিতে পথ অতিক্রম করে চলেছে। 'পঞ্চাশত্তমী' উৎসবের দিন যারা পিতরের উপদেশ শুনেছিল, তারা নিজ নিজ দেশে ফিরে গিয়ে শ্রুত উপদেশের শিক্ষা ও মর্মবাণী দেশবাসীর কাছে প্রচার করেছিলেন। এরই ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে খ্রিস্টমণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হতে লাগলো।

স্বর্গারোহণের দিনে শিষ্যদের কাছ থেকে বিদায়ের ক্ষণে যীশু শিষ্যদের এই আদেশ দিয়েছিলেন, "সর্বত্র যাও এবং মানবজাতিকে আমার শিক্ষামন্ত্রে দীক্ষিত কর। আমার আদেশ পালন করতে বল, তবেই তারা পরিত্রাণ পাবে।" শিষ্যদের অলৌকিক কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন পবিত্র

আত্মা। সুতরাং শিষ্যদের আশ্চর্য ক্রিয়াকর্ম দেখে জনগণ অনায়াসে বিশ্বাস করলো যে, শিষ্যদের প্রচারিত খ্রিস্টধর্ম মানুষ কর্তৃক প্রবর্তিত নয়, বরং স্বয়ং ঈশ্বরের ঘোষিত সত্য ধর্ম।[৫৩]

৩.৪০ খঞ্জ বা খোঁড়া ব্যক্তির আরোগ্য লাভ

একদিন পিতর ও যোহন একসাথে জেরুশালেম মন্দিরে প্রার্থনা করতে গিয়ে প্রবেশদ্বারে একজন আজন্ম পঙ্গুকে দেখতে পেলেন। লোকটি তাদের কাছে সকরুণ দৃষ্টি নিয়ে ভিক্ষা চাইলো। পিতর বললেন, "আমার সোনা বা রুপো কিছুই নেই, তবে আমার পক্ষে যা করা সম্ভব, তাই করছি। তুমি যীশু খ্রিস্টের নামে উঠে চলাফেরা কর।" তৎক্ষণাৎ লোকটি উঠে দাঁড়ালো, স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে লাগলো এবং ঈশ্বরের স্তবগান করতে লাগলো।[৫৪] বহুলোক খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হচ্ছে দেখে ইহুদী নেতারা ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলেন। তাঁরা শিষ্যদের আশ্চর্য ক্ষমতা ও বাণী প্রচারে ঈর্ষান্বিত হয়ে পিতর ও যোহনকে কারারুদ্ধ করলেন। পরে তাঁদেরকে বিচার সভায় হাজির কওে খ্রিস্টের নামে প্রচার করতে নিষেধ করলেন, ভয়ভীতি প্রদর্শন করলেন এবং তাদেরকে প্রহার করলেন।

৩.৪১ প্রথম ধর্মশহীদ (৩৬ খ্রিঃ)

ধর্ম রক্ষার জন্য প্রথম শহীদ হয়েছিলেন ষ্টিফেন। তিনি ছিলেন ডিকন অর্থাৎ উপযাজক। তিনি যীশুর নামে নানা অলৌকিক কাজ করছিলেন। তিনি দুঃখী-দরিদ্র ও আর্তদের সেবা করতেন। তাঁর তীক্ষ্ণ ধর্মজ্ঞান দ্বারা তিনি খ্রিস্টধর্মবিরোধী ইহুদী শাস্ত্রীদের যুক্তিতর্কে পরাভূত করেছিলেন। সেহেতু ঈর্ষান্বিত হয়ে প্রতিবাদী ইহুদীরা তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করলো। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে তিনি বলেছিলেন, "প্রভু, এরূপ পাপকর্মের জন্য এদের অভিযুক্ত করো না।" তিনিও যীশুর মতো শত্রুদের ক্ষমা করেছিলেন।[৫৫]

৩.৪২ পিতরের কর্মতৎপরতা

ক্রমান্বয়ে প্যালেষ্টাইন-এর নিকটবর্তী স্থানগুলিতে, যেমন এশিয়া মাইনর অর্থাৎ বর্তমান তুরস্ক, ক্রীট এবং গ্রীসের প্রদেশগুলিতে খ্রিস্টধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৫৬] খ্রিস্টমণ্ডলীর অধ্যক্ষ হিসাবে পিতর নব প্রতিষ্ঠিত ধর্মাঞ্চলগুলি পরিদর্শন করতে যেতেন।

তিনি লিড্ডা (Lydda) নামক পঙ্গু ব্যক্তিকে নিরাময় করেন।

জাফ্‌ফা (Jaffa) নামক স্থানে ধর্মপরায়ণা মহিলাকে মৃত্যুর পর জীবিত করেন।

সিজারিয়ায় তিনি পৌত্তলিক নাগরিকদের কাছে ধর্মপ্রচার করেন।

কর্ণেলিয়াস নামক একজন বিগ্রহপূজক ঈশ্বরের নির্দেশ লাভ করে পিতরকে তার বাড়ীতে আসার জন্য পরিচারকদের মাধ্যমে অনুরোধ জানান। পিতর সেনাধ্যক্ষের বাড়ীতে গেলে কর্ণেলিয়াস তাঁর পদদ্বয় স্পর্শ করেন ও ঈশ্বরের কথা জানান। পিতরের মুখ থেকে খ্রিস্টবাণী শুনে তিনি সপরিবারে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হলেন।

খ্রিস্টধর্ম প্রচারের ফলশ্রুতিতে ক্রমান্বয়ে খ্রিস্টবিশ্বাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলো। তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন, পারস্পরিক সহানুভূতি ও হৃদ্যতা গড়ে উঠলো।[৫৭] অনেকে প্রেমবাণীতে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদের সহায়সম্বল দীনদুঃখীদের মাঝে বিলিয়ে দিল এবং মণ্ডলীর শ্রীবৃদ্ধির জন্য অনেকেই সর্বস্ব ত্যাগ করলো।

আনানায়াসও তার স্ত্রী সাফিয়ার সাথে পরামর্শ করে স্থির করলো, সম্পত্তি বিক্রয় করে পিতরের হাতে সেই অর্থ তুলে না দিয়ে বলবে তারা সমস্ত অর্থ মণ্ডলীকে দান করছে। এতে জনগণের কাছে তারা দয়ালু ও নিঃস্বার্থ বলে খ্যাতি লাভ করবে, আবার একই সাথে হাতে টাকা-পয়সাও থাকবে। আনানায়াস কিছু অর্থ পিতরের হাতে দিয়ে বললো যে সে সমস্ত অর্থই মণ্ডলীকে দান করেছে। ঈশ্বরের অলৌকিক শক্তিতে পিতর মিথ্যা কথা শুনে ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, তুমি মিথ্যাচার করছো! পিতরের ভর্ৎসনা শুনে আনানায়াস সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে মারা গেল।

এ ঘটনার ৩ ঘন্টা পর সাফিয়াও পিতরের কাছে এসে মিথ্যা কথা বললো। তখন পিতর বললেন, এই দেখ, যারা তোমার স্বামীকে সমাধি দিতে নিয়ে গিয়েছিল, তারা তোমাকেও এখনি সেখানে নিয়ে যাবে। সাথে সাথে সাফিয়া পিতরের পায়ের কাছে পড়ে মৃত্যুবরণ করলো। মিথ্যার পরিণাম কি ভয়াবহ! তা খ্রিস্টভক্তদের মধ্যে প্রচার হয়ে গেল।

৩.৪৩ খ্রিস্টভক্তদের উপর ইহুদী নেতাদের উৎপীড়ন (৪২ খ্রিঃ)

নব প্রবর্তিত ধর্মকে ধ্বংস করার জন্য জেরুশালেমের ইহুদী নেতারা খ্রিস্টমণ্ডলীর পরিচালকদের হত্যা করার চেষ্টা করলো।

রাজা হেরোদ আগ্রিপ্পা (Herod Agrippa) যীশুর শিষ্য যোহনের ভাই যাকোব (জেমস)এর শিরশ্ছেদ করেন। ইহুদী নেতাদের সমর্থন লাভের জন্য তিনি পিতরকে কারারুদ্ধ করলেন। যে রাতে পিতরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার কথা ছিল, সেই রাতে কারাগারে অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল। হঠাৎ উজ্জ্বল আলোতে কারাগার আলোকিত হলো। একজন দেবদূত সেখানে আবির্ভূত হয়ে পিতরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললেন। যে শৃঙ্খলে তাঁর হাত ও পা বাঁধা ছিল তা খসে পড়ল এবং পিতর কারাগার হতে বাইরে চলে এলেন। সেই রাতে পিতর একজন খ্রিস্টভক্তের বাড়ীতে গেলেন। দরজায় করাঘাত করতেই রোজা নামের এক পরিচারিকা দরজা খুলতে গিয়ে পিতরের কণ্ঠস্বর শুনে আনন্দিত হলেন। কারাগার হতে পিতরের মুক্তিলাভের কাহিনী শুনে তাঁরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন।[৫৮]

৩.৪৪ শৌলের মন পরিবর্তন

শৌল একজন ফরিশী ও গোড়া ইহুদী ছিলেন। তিনি ছিলেন নবদীক্ষিত খ্রিস্টভক্তদের শত্রু। সেদিন তিনি যীশুর কয়েকজন শিষ্যকে বন্দি করার জন্য সিরিয়া দেশের অন্তর্গত দামাস্কাস এর পথে যাচ্ছিলেন। চলার পথে তাঁর সম্মুখে একটি তীব্র আলোক উদ্ভাসিত হলো। তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। তখন একটি কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হলো, "শৌল, শৌল, তুমি আমায় উৎপীড়ন করছ কেন"? যে যীশুকে উৎপীড়ন করছ, তিনিই আমি। শৌল হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন ও তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারালেন। তাঁকে আনা হলো দামাস্কাস শহরে। ঈশ্বরের আদেশানুসারে 'আনানায়স্' নামক একজন খ্রিস্টভক্ত শৌলের আছে গিয়ে তাঁর উপর হস্ত প্রসারিত করে পবিত্র আত্মার আবির্ভাব কামনা করে তাঁকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করলেন। শৌল সমাজগৃহে নির্ভয়ে বাণী প্রচার করতে লাগলেন।[৫৯]

শৌল নতুন নাম গ্রহণ করলেন ‘পল’। ‘পল’ শব্দের অর্থ ‘ক্ষুদ্র’। ইহুদী নেতারা ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে হত্যা করার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠল। দামাস্কাস শহরের খ্রিস্টেও অনুগামীরা তাঁকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল। ৩৫ খ্রিঃ তিনি পুনরায় জেরুসালেমে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। এরপর পল শিষ্যদের সহযোগীতায় খ্রিস্টধর্মীয় তত্ত্ব প্রচার করতে লাগলেন।

৩.৪৫ পিতরের প্রাধান্য

পিতর হলেন খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রথম ‘পোপ’ এবং পল হলেন খ্রিস্টবাণী প্রচারের নির্ভীক ‘অগ্রদূত’। এ দুটি স্তম্ভের উপর নির্ভর করলো মণ্ডলীর উদ্যোগপর্ব ও বিকাশ।[৬০] তাঁরা রোমসাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে খ্রিস্টমণ্ডলীর দৃঢ় ভিত্তি রচনা করলেন। মাঝে মাঝে কিছু ভিন্ন ধর্মমত উদ্ভুত হয়েছিল, যা ভক্তদের মধ্যে বিভ্রান্তির কারণ হতো। (যেমন, যাদুকর সাইমনের ধর্মমত)

সাইমন প্রচার করতেন যে, ঈশ্বর নিজে জগৎ সৃষ্টি করেননি। তিনি দিব্যদূতগণের সাহায্যে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন। কালক্রমে তিনি নিজেই খ্রিস্টরূপে মানুষকে উদ্ধার করতে এসেছেন। প্যালেষ্টাইনের সামারিয়া প্রদেশে সাইমনের জন্ম। পিতর ও শিষ্যদের কাজ দেখে অর্থ দিয়ে সেই ক্ষমতা কিনতে চাইলেন। পিতর ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, যারা অর্থ দিয়ে ধর্মীয় পদ, পবিত্র বস্তুসামগ্রী কিনতে ও বিক্রয় করতে চায় তারা ‘সাইমনি’ পাপে কলুষিত হয়। শিষ্যেরা দেশদেশান্তরে গিয়ে ধর্মপ্রচারে নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হন। কিন্তু তারা সমাধানের জন্য জেরুশালেমে মিলিত হতেন।

যীশু যে-ঘরটিতে তাঁর শেষ ভোজের অনুষ্ঠান করেছিলেন সম্ভবত ৪৯ খ্রিঃ সেই গৃহে অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রথম “এক্যুমেনিক্যাল কাউন্সিল” (Ecumenical Council) অর্থাৎ আন্তর্জাতিক মহাধর্মসভা। এখানে পিতরের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছিল।

মহাধর্মসভার উদ্দেশ্য ছিল যীশুর বাণী প্রচার, তার অনুশীলন ও বাস্তবায়নের জন্য স্থান কাল পাত্র অনুসারে প্রচার পদ্ধতি কী হবে ও তা কীভাবে অনুসৃত হবে সেসব সঙ্কলিত করা। এই তত্ত্ব সংকলনকে ‘প্রেরিত শিষ্যদের বিশ্বাসমন্ত্র বলা হয়’। এতে খ্রিস্টমণ্ডলীর ধর্মতত্ত্বের সারমর্ম ও মূল শিক্ষা নিহিত।[৬১]

পিতর প্রথমে তাঁর পরিচালনা কেন্দ্র সিরিয়ার অন্তর্গত আন্টিয়োক শহরে স্থাপন করেন। যেহেতু রোম ছিল তখনকার সভ্য জগতের কেন্দ্র ও মণ্ডলী পরিচালনার উপযুক্ত স্থান, সেজন্য তিনি রোমে গিয়ে ২৫ বৎসর যাবৎ তাঁর ধর্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হলেন রোমের প্রথম বিশপ। পরবর্তী পোপগণও মণ্ডলীর মুখ্য অধ্যক্ষ এবং তাঁরা হলেন রোমের বিশপ।

৩.৪৬ পল (শৌল)এর প্রচারকার্য

৪৩-৪৪ খ্রিঃ পল ও তার সহযোগী বার্ণাবাস সিরিয়া দেশের অন্তর্গত আন্টিয়োক (Antioch) শহরে ধর্মপ্রচার করেন। পরে তারা সাইপ্রাস (Cyprus) দ্বীপের রাজধানী পাফ্‌স (Paphos) শহরে উপস্থিত হয়ে সেখানে রোমীয় শাসনকর্তা সের্জাস পাউলাস (Sergius Paulus) কে খ্রিস্টের বাণী শুনিয়েছিলেন।[৬২] সেখানে এলিমাস নামক এক বুদ্ধিমান (অথচ ভণ্ড) প্রবক্তা নানা প্রকার অযৌক্তিক প্রসঙ্গ তুলে পলের কথায় বাধা দিচ্ছিলেন। তখন পল তাকে বললেন, ‘শঠ ও প্রবঞ্চক’! আর কতদিন ঈশ্বরের সুন্দর পথে বাধার কাঁটা ছড়াবে? ঈশ্বর তোমাকে আঘাত করবেন এবং তুমি কিছুক্ষণের জন্য সূর্যালোক দেখতে পাবে না। তখন এলিমাস অন্ধ হয়ে গেলেন। তা দেখে মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে সের্জাসখ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হলেন ও প্রতারক প্রবক্তাকে রাজদরবার থেকে বিতাড়িত করলেন।

৩.৪৭ পলের প্রথম প্রচারযাত্রা (৪৫-৪৯ খ্রিঃ)

এরপর তাঁরা ক্রমান্বয়ে এশিয়া মাইনর (বর্তমান তুরস্ক) লিকাওনিয়ার প্রদেশের পের্গা (Perga), পিসিডিয়ার আন্টিয়োক (Antioch), ইকোনিয়াম (Iconium), ডের্বে (Derbe) প্রভৃতি শহরে প্রচার করেন ও বহু লোককে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেন।[৬৩]

৩.৪৮ দ্বিতীয় প্রচারযাত্রা (৫১-৫৪ খ্রিঃ)

এরপর সিলাস নামে একজন নতুন অনুগামীকে সঙ্গে নিয়ে পূর্বে প্রচারিত অঞ্চলগুলি দেখাশুনা কওে পল ফিলিপ্পি হয়ে ম্যাসেডোনিয়া ও গ্রীসে গিয়ে থেসালোনিকা শহরে খ্রিস্টমণ্ডলী প্রতিষ্ঠা

করেন।[৬৪] এরপর তিনি এথেন্সে গিয়ে বাণী প্রচার করেন। সেখান থেকে তিনি করিন্থ নগরে গেলেন।

সিরিয়ার আন্টিয়োক শহরে বিশ্রাম করার পর মহানগরী এফেসাস্ (Ephesus)এরখ্রিস্টমণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করার জন্য ৫৪-৫৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সেখানে অতিবাহিত করেন। সেখানে তিনি তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ পত্রগুলি রচনা করেন। এই পর্যায়ে প্রচার যাত্রায় তিনি জেরুসালেমে যাত্রা করেন।

জেরুসালেমে আসার পর খ্রিস্টভক্তগণ তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালো। কিন্তু প্রতিবাদী ইহুদী নেতারা তাকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। তাঁকে আন্দোলনকারী ভেবে কারাগারে নিক্ষেপ করলো। পল সেখানে সেনাপতির সামনে নিজের পরিচয় তুলে ধরে জনতার সামনে ভাষণ দিলেন। এতে প্রতিবাদীরা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। তারা রোমীয় শাসককে অনুরোধ জানালো তাঁকে যেন কশাঘাত করার আদেশ দেওয়া হয়। পল ছিলেন রোমান নাগরিক। সুতরাং সাংবিধানিক অধিকারবলে তিনি রোমান শাসককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'একজন রোমান নাগরিককে কশাঘাত করা ন্যায়সঙ্গত কিনা'? তখন ভয় পেয়ে শাসক তাঁকে মুক্ত করলেন এবং দূরে সিজারিয়া (Caesarea) অঞ্চলের প্রতিনিধির কাছে বিচারের জন্য প্রেরণ করলেন ৫৮ খ্রিঃ। রাজপ্রতিনিধির নাম ছিল ফেলিক্স। তিনি বুঝতে পারলেন যে পল নির্দোষ, তবুও ইহুদীদের শান্ত রাখার জন্য পলকে সেখানে দু'বছর(৫৮-৬০ খ্রিঃ) রাখলেন এবং তাঁর কাছ থেকে তিনি খ্রিস্টের বাণী শুনতেন। ৬০ খ্রিঃ ফেষ্টাস (Festus) সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক বিচারিত হওয়ার জন্য তাঁকে জেরুসালেমে প্রেরণ করলেন। অবশেষে পল নির্দোষ প্রমাণিত হলেন।

৩.৪৯ রোম অভিমুখে পলের যাত্রা

৬২ খ্রিঃ রোমসম্রাটের কাছে আপীলের ফলশ্রুতিতে 'খ্রিস্টের' জন্য বন্দী পল প্রহরীদের তত্ত্বাবধানে রোমের দিকে যাত্রা শুরু করলেন। তখনকার দিনে পালতোলা ক্ষুদ্রাকৃতি জাহাজের পক্ষে সমুদ্রযাত্রা ভয়াবহ ছিল। সমুদ্রযাত্রার সময় ভূ-মধ্যসাগর প্রচণ্ড ঝড়ে তরঙ্গবিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। ১৪ দিন ধরে ক্ষুদ্র জলযানটি ঝড়ের ধকল সহ্য করে ভেঙ্গে পড়লো। অবশেষে জাহাজটি মালটা (Malta) দ্বীপের কাছে ডুবে গেল। যাত্রীরা অতি কষ্টে প্রাণে বেঁচে গেলেন।

দ্বীপটির শাসনকর্তার নাম ছিল পুব্লিয়াস্ (Publius)। তিনি তাঁদেরকে তিন দিনের জন্য তাঁর প্রাসাদে আশ্রয় দিলেন। তখন পুব্লিয়াসের পিতা জ্বর ও আমাশয় রোগে আক্রান্ত ছিলেন। পল তাঁর মাথায় হাত রেখে প্রার্থনা করে তাঁকে সুস্থ করে তুললেন। এই রোগমুক্তির কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। তখন দ্বীপের বহুলোক পলের কাছে এসে আরোগ্য লাভ করতে লাগলো। এভাবে ৩ মাস এই দ্বীপে অবস্থান করে পল সেখানেখ্রিস্টের বাণী প্রচার করলেন। তারপর নৌকা যোগে ইটালীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। প্রথমে সিসিলি দ্বীপের সিরাকুস্ বন্দর হয়ে তিনি রোম অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে রোমের দক্ষিণে অবস্থিত পুতেত্তলি (বর্তমান পৎসুয়লি Pzzouli) নগরের বন্দরে উপস্থিত হলে সেখানকার খ্রিস্টভক্তগণ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। সেখানে এক সপ্তাহ অতিবাহিত করে তিনি রোমে এসে পৌঁছান। রোম নগরীতে পল নজরবন্দী হয়ে দু'বৎসর অতিবাহিত করেন। এর মধ্যেও তিনি খ্রিস্টের বাণী প্রচার করতে থাকলেন।[৬৫] অনেকে তাঁর মুখে খ্রিস্টধর্মের অমৃততত্ত্ব শুনে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হলো। এখানে রোমান আদালত বিচারে রায় দিল যে, পল নির্দোষ। এরপর তিনি মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে স্পেনের দিকে যাত্রা শুরু করলেন।

৩.৫০ রোমে পিতর (পিটার)

পিতর জেরুসালেমে জেমসকে রেখে রোমের দিকে যাত্রা করলেন। রোম ছিল বিশাল সাম্রাজ্যের রাজধানী। সেখান থেকে সভ্য জগতে ধর্মবিস্তার করার কাজ সহজ ছিল। তাই পিতর তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত রোমে অবস্থান করেন।

প্রাচীনকালে রোম নগরীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল বিশাল সাম্রাজ্য, যাকে বলা হয় রোম সাম্রাজ্য।[৬৬] এই সাম্রাজ্যকে কেন্দ্র করে পল্লবিত হয়েছিল প্রাচীন ইউরোপের সভ্যতা ও সংস্কৃতি। কালক্রমে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে এই সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটে। রোমীয় শাসনের ছায়াতলে বিকশিত হয়েছিল অভূতপূর্ব স্থাপত্য, ভাস্কর্য, শিল্পকলা, শ্রুতিমধুর ল্যাটিন সাহিত্য, সুষ্ঠু সামাজিক আইনশাস্ত্র ও আনন্দময় নাগরিক জীবন। এই সাম্রাজ্যেরও উত্থান ও পতন ঘটেছে।

৩.৫১ খ্রিস্টানদের উপর প্রথম নির্যাতন (৬৪ - ৬৮ খ্রিঃ)

রোম সম্রাট নিরো (Nero) ছিলেন নিষ্ঠুর ও দুশ্চরিত্র। তিনি তাঁর মাকে ও স্ত্রীকে হত্যা করেন। ৬০ খ্রিঃ রোম নগরীকে পুনর্গঠিত করার উদ্দেশে তিনি পুরাতন আবাসগৃহগুলো পুড়িয়ে ফেলার আদেশ দেন। কিন্তু যখন দেখলেন যে, রোম নগরী ধ্বংস হয়ে গেছে, তখন তিনি ঘোষণা দেন যে, খ্রিস্টানরাই এই অগ্নিকাণ্ডের হোতা।

ঐতিহাসিক সুয়েটোনিয়াস লিখেছেন, অগ্নিকাণ্ডের সময় নিরো তা দর্শন করে ও বীণা সাজিয়ে আনন্দ উপভোগ করতেন।

রোম নগরীর বীভৎস অগ্নিকাণ্ডের জন্য অভিযুক্ত খ্রিস্টানদের ক্ষুধার্ত ও হিংস্র পশুর সামনে ফেলে দিয়ে হত্যা করা হতো।তাদের পোশাকে আলকাতরা মেখে খুঁটির সাথে বেঁধে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হতো।

সে সময়ে রোমে 'সার্কাস'এর অনুরূপ গ্যালারী সমন্বিত গোলাকার মাঠ ছিল। সেখানে চারিদিকে লোক ভর্তি দর্শকদের সামনে এসব খ্রিস্টবিশ্বাসীদের হত্যা করে চিত্তবিনোদনের আয়োজন করা হতো।

৩.৫২ ধর্মশহীদ পিতর ও পল

সম্রাট নিরোর অত্যাচার-নির্যাতনের ফলশ্রুতিতে বহু নির্দোষ-নিরপরাধ খ্রিস্টান যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর কবলে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। তখন পলকেও পুনরায় গ্রেফতার করা হলো। তিনি পরে লিখেছেন, "আমি খ্রিস্টের পক্ষে প্রাণপণ শুভ সংগ্রাম করেছি, খ্রিস্টের প্রতি আমার বিশ্বাস অটুট রেখেছি। এবার সৎ জীবনযাপনের জন্য আমি লাভ করবো যথার্থ পুরস্কার।"[৬৭]

৬৭ খ্রিঃ প্রেরিতশিষ্য পিতর ও পল খ্রিস্টের সাক্ষীরূপে জীবন বিসর্জন দিলেন। রোম নগরী সাতটি ক্ষুদ্র পর্বত নিয়ে গঠিত। এর অন্তর্গত 'ভাটিকান' নামক ক্ষুদ্র পর্বতে ক্রুশকাষ্ঠেনিচের দিকে মাথা ঝুলিয়ে পিতরকে হত্যা করা হয়। এখন সে স্থানে পোপ মহোদয়ের বাসভবন। সেই স্থানটিকে মণ্ডলীর প্রথম মহাধর্মাধ্যক্ষ নিজ রক্ত বিসর্জনে পূত-পবিত্র করেছেন। এর অনতিদূরে

পলএর শিরশ্ছেদ করা হয়। শহীদদের রক্তে সিক্ত ও রঞ্জিত হয়ে অঙ্কুরিত মণ্ডলী এক বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানে সুশোভিত হয়ে উঠলো। এরই মধ্যে ধর্মবিশ্বাস রক্ষার্থে শতসহস্র খ্রিস্টান তাদের প্রাণ উৎসর্গ করলো।

৬৮ খ্রিঃ পিতর ও পলের মৃত্যুর একবছর পর নিরোর স্বৈরতান্ত্রিক অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে জনগণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হলো। রোম এর সেনেট্ (Senate) অর্থাৎ শাসক-সভা নিরোকে দেশের শত্রু ও মৃত্যুদণ্ড পাবার যোগ্য বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। পশ্চাতে ধাবিত সৈন্যদের দেখে তিনি নিজের তরবারি দ্বারা নিজ মস্তক ছেদন করে মৃত্যুবরণ করলেন। তখন রোমীয়রা উল্লাসে মেতে উঠলো। খ্রিস্টভক্তগণ তখন নির্ভয়ে ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টশহীদদের দেহাবশেষ সংগ্রহ করে যথোপযুক্ত স্থানে সমাহিত করে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের পুণ্যস্মৃতি সংরক্ষণ করতে লাগলো।

৩.৫৩ নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি

নিরোর পরবর্তী সম্রাট ভেস্পাসিয়াল ও তিতাস এর আমলে খ্রিস্টভক্তগণ অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ পরিবেশে জীবনযাপন করার সুযোগ লাভ করেছিল। রোমান সম্রাটদের মধ্যে যাঁরা খ্রিস্টানদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার চালিয়েছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন নিরো, ডমিসিয়ান, ট্রায়ান, মার্কাস, অরেলিয়াস, সেভেরাস, মাক্সিনিয়াস থ্রাক্স, ডেসিয়াস, ভালেরিয়ান, অলেরিয়ান ও ডাইওক্লেসিয়ান। নির্যাতন শুরু হয় ৬৪ খ্রিস্টাব্দে এবং শেষ হয় ৩১০ খ্রিস্টাব্দে। প্রায় ৩০০ বছর যাবৎ নির্যাতন-নিপীড়ন চলে। আসলে রোমীয় সম্রাটদের অত্যাচার-নির্যাতন নবপ্রবর্তিত খ্রিস্ট ধর্মের উপর গুরুতর আঘাত হানলেও তাকে নির্মূল করতে পারেনি। পক্ষান্তরে অত্যাচারের কুঠারাঘাতে মণ্ডলী অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তৎকালীন তর্কশাস্ত্রে সুদক্ষ ও সুপরিচিত লেখক টেরটুলিয়ান (Tertullian) লিখেছেন:‘খ্রিস্টানদের রক্তেই নতুন খ্রিস্টানদের বীজ’।[৬৮]

৩.৫৪ জেরুসালেমের ধ্বংসলীলা

৭০ খ্রিঃ জেরুসালেম নগরী ও প্যালেষ্টাইনের সর্বত্র গণআন্দোলন চলছিল। ভেস্পাসিয়ান ছিলেন বিদ্রোহযুগের রোমীয় সেনাধ্যক্ষ। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাথে যুদ্ধ করে প্যালেষ্টাইনের

ইহুদী শক্তিকে খর্ব করতে সক্ষম হলেও রাজধানী জেরুসালেম দখল করতে পারেননি। ভেস্পাসিয়ান সম্রাট পদ লাভ করে তাঁর নিজ পুত্র তিতাসকে সেনাপতির দায়িত্ব দিলেন এবং জেরুসালেমের পতন ঘটানোর আদেশ দিলেন। তিতাস জেরুসালেম অবরোধ কওে ফেললেন। জেরুসালেম সম্পর্কে প্রভু যীশুর ভবিষ্যদ্বাবাণীটি এভাবে পূর্ণ হলো। তবে যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে যে-গৃহে শেষভোজের অনুষ্ঠান করেছিলে এবং পবিত্র আত্মার অবতরণের দিন শিষ্যেরা যে গৃহটিতে অবস্থান করছিলেন তা ধ্বংস হয়নি। পরবর্তীকালে তা পুণ্যস্মৃতিমণ্ডিত স্থানে পরিণত হয়েছে।[৬৯]

৩.৫৫ কাটাকম্ব সমাধি স্থান

অত্যাচার ও উৎপীড়নের সময় নিহত খ্রিস্টভক্তদের মৃতদেহ প্রকাশ্যে সমাধিস্থ না করে কাটাকম্ব (Catacomb) নামক ভূ-গর্ভস্থ সুড়ঙ্গে সেগুলো সশ্রদ্ধায় সমাহিত করা হতো। রোমীয়রা উন্নত সংস্কৃতির মানুষ ছিল। তারা প্রস্তরনির্মিত অট্টালিকা, স্মৃতিরক্ষক তোরণ, সিংহদ্বার, সৌধ এবং সুন্দর গৃহাদি নির্মাণে দক্ষ ছিল। এসব নির্মাণকাজের জন্যতারা খনন করে ভূ-গর্ভ থেকে পাথর সংগ্রহ করতো। এভাবে ভূ-গর্ভে সুড়ঙ্গ সৃষ্টি হয়েছিল। এরূপ সুড়ঙ্গকে ‘কাটাকম্ব’ বলা হতো।[৭০] প্রায় ৩০০ বছর ধরে এরূপ কাটাকম্বএর অন্ধকার গুহায় ধর্মোপসনা অনুষ্ঠান করতে বাধ্য হয়েছিল খ্রিস্টের একনিষ্ঠ অনুগামীগণ।

৩.৫৬ মণ্ডলীর সংগঠন

ধর্মাচারণের বিরোধিতা ও অত্যাচার-নির্যাতনসত্ত্বেও রোম সাম্রাজ্যের সর্বত্র খ্রিস্টমণ্ডলী পুষ্প-পল্লবে সুশোভিত হতে লাগলো। এতেই প্রমাণ হয় যে, খ্রিস্টধর্ম স্বয়ং ঈশ্বর-প্রবর্তিত ধর্ম। পৃথিবীর দেশে দেশে খ্রিস্টমণ্ডলীর শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হলেও রোম নগরী আজো তার ‘হৃৎপিণ্ড’, তার ‘প্রাণকেন্দ্র’। আঞ্চলিক বা স্থানীয় মণ্ডলীগুলো মূলকেন্দ্রের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে। সেই রোম নগরীর প্রধান ধর্মাধ্যক্ষ বা বিশপ হলেন বিশ্বমণ্ডলীর প্রধান ধর্মগুরু অর্থাৎ পোপ।[৭১] প্রেরিতশিষ্য পিতর ছিলেন প্রথম পোপ। পিতরের মৃত্যুর পর পোপ-পদে যথাক্রমে অভিষিক্ত

হলেন লিন্াস (Linus ৬৭-৭৯ খ্রিঃ), আনাক্লিটাস (Anacletus ৭৯-৯০ খ্রিঃ), ক্লেমেন্ট (Clement ৯০-৯৯ খ্রিঃ)। যীশুখ্রিস্টের মূল শিক্ষা ছিল ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব।[৭২]

৩.৫৭ দ্বিতীয় নির্যাতনকাল (৯৪-৯৬ খ্রিঃ)

৯৪ খ্রিঃ ডোমিসিয়ান (Domitian) সম্রাটপদে অভিষিক্ত হন। তিনি সাম্রাজ্য ও সম্রাটের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে করতেন তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যাঁকে সবারই সেবা করতে হবে। রোমান ঐতিহাসিক দিওন ক্যাসিয়াস্ (Dione Cassius) লিখেছেন, "এই নিষ্ঠুর, বিচারশক্তিহীন ও বিবেকবর্জিত সম্রাটের আমলে অসংখ্য খ্রিস্টান ধর্মের জন্য প্রাণোৎসর্গ করে শহীদ হলেন এবং অনেকে হলেন নির্বাসিত। নাগরিকদের মনোরঞ্জনের জন্য তিনি সু-উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত রঙ্গশালায় তাদেরকে হিংস্র পশুর মুখে নিক্ষেপ করতেন। দর্শকগণ বিপুল উৎসাহের সাথে এরূপ বীভৎস হত্যাকাণ্ড উপভোগ করতো। ৯৬ খ্রিঃ একজন পরিচারিকার ছুরিকাঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়।"[৭৩]

পরবর্তী নবঅভিষিক্ত সম্রাটের নাম ছিল নের্ভা (Nerva), তিনি শান্তিপ্রিয় শাসক ছিলেন। তাঁর আমলে সমাজে উন্নতি দেখা দিল।

৩.৫৮ তৃতীয় নির্যাতনকাল (৯৮-১১৭ খ্রিঃ)

এ্যান্টনিন্এর বংশধর ট্রাজান (Trajan) সম্রাটের আমলে অনেকে প্রাণ হারিয়েছিল। রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এশিয়া মাইনর ছিল একটি প্রদেশ। এখানকার রোমীয় রাজপ্রতিনিধির নাম ছিল জুনিয়র প্লিনিয়াস (Plinius the Junior)। বিচারের জন্য অনেক খ্রিস্টানুসারীকে তাঁর কাছে আনা হয়েছিল। তিনি নিষ্ঠুর ছিলেন না। তিনি এত নিপীড়ন-অত্যাচার দেখে সম্রাটকে প্রেরিত একটি পত্রে লিখলেন, "খ্রিস্টধর্ম ক্রমশ সুবৃহৎ বৃক্ষের ন্যায় শাখা-প্রশাখায় বিস্তারলাভ করছে। অভিযুক্ত খ্রিস্টভক্তদের অভিযোগাদি আমি বিচক্ষণতার সাথে খতিয়ে দেখে বুঝতে পেরেছি যে, তারা সম্পূর্ণ নির্দোষ। ধর্মোপসনার জন্য তারা ভ্রাতৃত্বের মনোভাব নিয়ে সমবেত হয়। তারা শান্তিপ্রিয় সম্প্রদায়।"[৭৪]

বর্ণিত আছে যে, সম্রাট ট্রাজান ট্রেসিয়া দেশের সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করে বিজয়োৎসব স্বরূপ কলসিয়াম (রঙ্গভূমি)প্রাঙ্গণে, মোট দশহাজার মল্লযোদ্ধাকে (ক্রীড়াঅনুষ্ঠানে প্রদর্শিত যুদ্ধবন্দী) দফায় দফায় এগারো হাজার হিংস্র পশুর সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

৩.৫৯ ধর্মশহীদ সাধু ইগ্নেসিয়াস (১০৭ খ্রিঃ)

এ যুগের ধর্মশহীদদের মধ্যে স্মরণীয় একজন ব্যক্তি ছিলেন আন্টিয়োকএর বিশপ ইগ্নেসিয়াস। তিনি ছিলেন সিরিয়া দেশের নিবাসী। পিতর তাঁকে ধর্মপালকরূপে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। প্রচারকাজে ও গ্রন্থ রচনায় তিনি উদ্যমের সাথে খ্রিস্টবাণী ঘোষণা করতেন।[৭৫]খ্রিস্টান ধর্মাধ্যক্ষ হওয়ায় ১০৭ খ্রিঃ সূনোয় শাসকের নির্দেশানুসারে তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর।

এছাড়া সেনাবাহিনীর অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারী, জেনারেল প্লাসিডাস্ ও তাঁর সেনাপতি এবং তাঁদের সন্তানগণ, জেনারেলের স্ত্রী ফেলিতা ও দুই পুত্রও জীবন উৎসর্গ করলেন।

৩.৬০ ধর্মোপাসনাদি

ধর্মের কারণে নির্যাতন-নিপীড়নের যুগে প্রায়ই দেখা যেতো, সূর্যাস্তের সাথে সাথে শহর ও পল্লীর নারী-পুরুষ, যুবা-কিশোরসহ সকল খ্রিস্টভক্ত নিজ গৃহ ত্যাগ করে প্রার্থনা ও উপাসনার জন্য কোন এক স্থানে একত্রে মিলিত হচ্ছে। অভিজাত শ্রেণির‘সিসিল’ (Cecil) পরিবারের অট্টালিকাটি ধর্মক্রিয়া অনুষ্ঠানের জন্য মন্দিরে পরিণত হয়েছিল। সেখানে প্রথমে ধর্মসঙ্গীত গাওয়ার পর ‘বাইবেল’ থেকে নির্বাচিত অংশ পাঠ করা হতো। এই ধর্মানুষ্ঠানে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হতো, ভক্তদের মাঝে খ্রিস্টপ্রসাদ বিতরণ করা ছিল উপাসনার প্রধান অঙ্গ।

শনিবার ও রবিবারের মধ্যবর্তী রাত্রে উপাসনা অনুষ্ঠিত হতো। সেখানে মানুষ যেন সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়, দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়, বিশ্বে যেন শান্তি বিরাজ করে, অসুস্থ ব্যক্তিরা যেন সুস্থতা লাভ করে, খ্রিস্টভক্তরা যেন ন্যায়বিচার পায় ইত্যাদি সদুদ্দেশ্য নিয়ে প্রার্থনা করা হতো।[৭৬]

৩.৬১ চতুর্থ নির্যাতনকাল (১৬১-১৮০ খ্রিঃ)

নির্যাতিত খ্রিস্টভক্তদের মধ্য থেকেও এমন কয়েকজন বিদগ্ধ উপদেষ্টার আবির্ভাব ঘটেছিল, যাঁরা নির্ভয়ে সম্ভ্রান্ত ও সরকারী কর্মকর্তাদের সামনে হাজির হয়ে মিথ্যা অভিযোগের প্রতিবাদ করতেন এবংঅন্যায়ের প্রতিকার দাবী করতেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন গ্রীকভাষী সাধু জাষ্টিন। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত দার্শনিক ও বিগ্রহপূজক।

সাধু জাষ্টিন ছিলেন শ্রেষ্ঠ গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর (Plato +৩৪৭ খ্রিঃ পূর্ব) মতাদর্শে বিশ্বাসী। তিনি সক্রেটিসএর শিষ্য ও এ্যারিষ্টটলএর শিক্ষক। তিনি ও ফিলো (Philo)র যুক্তিসিদ্ধ দার্শনিক তত্ত্ব অনুসরণ করে সম্রাট, সম্রাটের প্রতিনিধি, ভিন্নধর্মের শাস্ত্রজ্ঞ, নাস্তিক, ইহুদি প্রমুখ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সঙ্গে যুক্তি-তর্কের আসরে অবতীর্ণ হয়ে প্রকাশ্য ভাষণে রোম সাম্রাজ্যের সকলঅধিবাসীকে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, ‘খ্রিস্টধর্ম সত্যিই ঈশ্বর-প্রবর্তিত ধর্ম’।[৭৭] জাষ্টিনের ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাদানের ফলশ্রুতিতে সম্রাট এ্যান্টনিস পিয়াস ১৪৭ খ্রিঃ এই অনুশাসন জারি করলেন যে, খ্রিস্টানদের উপর আর উৎপীড়ন করাচলবেনা।

সম্রাট মার্কাস, অরেলিউস (+১৮০ খ্রিঃ)এর পৌত্তলিক ধর্মগুরু ‘ডাইয়নেটাস’ জাষ্টিনের যুক্তিতর্কের কাছে পরাজিত হয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সম্রাটের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তাই ১৬৭ খ্রিঃ ৬৭ বৎসর বয়সে তাঁকে শিরশ্ছেদ করে হত্যা করা হয়। এছাড়া তাঁর ছয় অনুগামীকেও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

উপরন্তু তাঁর সময়ে গল্ (Gaul) অর্থাৎ ফ্রান্সের অন্তর্গত লিয়ং (Lyons) শহরের বিশপ ফটিনাস্সহ ৫০ জন খ্রিস্টভক্তকে হত্যা করা হয়।

১৬৬ খ্রিঃ সাধু জন (যোহনের)এর প্রিয় শিষ্য পলিকার্প (Polycarp)এর শিরশ্ছেদ করা হয়। তার বয়স হয়েছিল ৮৬ বৎসর। তিনি এশিয়া মাইনরের স্মির্ণা (Smyrna) নগরের ধর্মাধ্যক্ষ ছিলেন।

এ্যান্টনিন্এর বংশধরগণ প্রায় ১০০ বছর রোম সাম্রাজ্য শাসন করেছিলেন। এদের শাসনামলে বহু খ্রিস্টভক্ত মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল, তবুও ব্যাপক ভাবে বিরুদ্ধাচারণ করা হয়নি।

খ্রিস্টমণ্ডলী যতই নির্যাতিত ও অত্যাচারিত হতে লাগলো এবং তাকে ধ্বংস করার জন্য যতই প্রচেষ্টা চলতে লাগলো, ততই সকল প্রকার প্রতিকূলতা সহ্য করে তার শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে লাগলো।

৩.৬২ পঞ্চম নির্যাতনকাল (২০২-২১০ খ্রিঃ)

মার্কাস অরেলিয়াসএর পরবর্তী সম্রাট ছিলেন কম্মদাস্ (Commodus)। তাঁর মৃত্যুর পর সিংহাসন অধিকার করলেন সেপ্টিমিয়াস সেভেরাস (Septimius Severus)। তার জন্ম হয়েছিল আফ্রিকায়। তিনি খ্রিস্টানদের পক্ষ গ্রহণ করেন। কিন্তু ২০২ খ্রিঃ ইহুদীরা জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে বিভিন্ন অঞ্চলে আন্দোলন শুরু করায় তিনি খ্রিস্টানদের উপর দমন-নিপীড়নের নীতি গ্রহণ করেন। খ্রিস্টধর্ম উৎসারিত হয়েছিল ইহুদীদের মধ্য থেকে। তাই সেভেরাসএর ধারণা ছিল যে,খ্রিস্টানরাও ইহুদীদের আন্দোলনের সাথে যুক্ত। তিনি সব কিছু চিন্তা করে আইন প্রবর্তন করেন। খ্রিস্টানরা পুনরায় অত্যাচার-নির্যাতনের সম্মুখীন হলো। এই সম্রাটের আমলে ধর্মতত্ত্ববিদ ও জ্ঞানী লেখক সাধু আইরেনিয়াস (Ireneus) প্রাণ হারান। তিনি গল (ফ্রান্স) এর অন্তর্গত লিয়ং নগরের ধর্মাধ্যক্ষরূপে ২৪ বৎসর অতিবাহিত করেন।

এই নির্যাতনের যুগে খ্রিস্টীয় শহীদগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আফ্রিকার অন্তর্গত মিশর ও উত্তরপশ্চিমের অন্যান্য দেশের ধর্ম-শহীদগণ। শহরগুলির মধ্যে আলেকজান্দ্রিয়া ও কার্থেজছিল প্রসিদ্ধ ধর্মকেন্দ্র।

কার্থেজ নগরের এমফিথিয়েটারে ৭ই মার্চ ২০৩ খ্রিঃ পের্পেতুয়া (Perpetua) ও ফেলিসিতাস (Felicitas) ধর্মসাধিকাদ্বয়কে হিংস্র পশুর সম্মুখে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু তারা মারা যাননি। পরবর্তীতে ঘাতকের তরবারির আঘাতে তাঁদের অমর আত্মা স্বর্গ লাভ করল।পের্পেতুয়া সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। যথাসময়ে তিনি একজন উচ্চ বংশীয় যুবকের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ২২ বৎসর বয়সে তিনি একটি পুত্র-সন্তান লাভ করেন। ফেলিসিতাস ছিলেন একজন দুঃখী কৃতদাসী। দু'জনই খ্রিস্টান বলে পরিচিত হওয়ায় তাদের এ পরিণতি হলো।

আরও এক ভক্তিমতি নির্ভীক নারী স্বীয় খ্রিস্টবিশ্বাস রক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিলেন। তিনি হলেন সাধ্বী সিসিলিয়া। তিনি এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি সুগায়িকা ছিলেন।

সিসিলিয়ার স্বামী ভ্যালেরিয়ান ও তাঁর ভাই টিবুর্সিয়াস খ্রিস্টান হয়েছেন শুনে বিচারক দুই ভাইকে ধর্মত্যাগ করার আদেশ করলেন। কিন্তু অবিচল ও অটল বিশ্বাসের কারণে তাঁদের শিরশ্ছেদের আদেশ দেওয়া হয় ও তাঁদের ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। কিন্তু সিসিলিয়া অনেক আগেই তাঁর সমস্ত ধনসম্পদ দরিদ্রের দান করেছিলেন। এই সংবাদ শুনে বিচারক তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। তখন ঘাতক তরবারি দিয়ে তাঁর স্কন্ধে আঘাত করল।

খ্যাতনামা লেখক ও যুক্তিবাদী তের্তুলিয়ান (Tertullian +২৩০খ্রিঃ) খ্রিস্টধর্ম রক্ষার্থে উৎসর্গিত শহীদদের জীবন ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি ছিলেন একজন বিগ্রহপূজক সেনাপতির সন্তান ও একজন আইনজীবি। তাঁর ঐতিহাসিক ও যুক্তিসিদ্ধ রচনাগুলি মণ্ডলী সমর্থন করে থাকে।

তথ্যসমৃদ্ধ এসব নথিপত্র দ্বারা তের্তুলিয়ান প্রমাণ করলেন যে, নিরপরাধ খ্রীষ্টভক্তদের হত্যা করা অত্যন্ত নির্মম ও অযৌক্তিক কাজ। তাঁর একটি যুক্তিনির্ভর ভাষণ হল:‘আমরা নিরপরাধ খ্রিস্ট-অনুগামী হলেও তোমরা আমাদের দণ্ডিত করছ, নির্যাতন করছ এবং আমাদের চূর্ণ-বিচূর্ণ করছ। এরূপ নিষ্ঠুর হত্যালীলা চালালেও জানবে আমাদের এক-একটি রক্তবিন্দু হলোনতুন খ্রিস্টভক্ত উৎপন্নের বীজস্বরূপ’।[৭৮]এরপর সম্রাট উৎপীড়ন করা থেকে বিরত থাকলেন। এই অবসরে মণ্ডলীর সম্প্রসারণ কাজও বৃদ্ধি পেল।

সেভেরাসএর পরবর্তী সম্রাটদ্বয় কারাকাল্লা (Caracalla) ও হেলিবল্ড (Helibald)। এদের আমলে খ্রিস্টানরা শান্তি উপভোগ করল। ২২৫ খ্রিঃ আলেকজাণ্ডার সেভেরাস্ (Alexander Severus) সম্রাট পদে অভিষিক্ত হলেন। তিনি ছিলেন বিত্তবান ও কর্মনিষ্ঠ। সম্রাটের জীবনীতে লেখা আছে যে, তিনি খ্রিস্টের নামে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। যেখানে অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তির সাথে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তিও রেখেছিলেন।

৩.৬৩ ৬ষ্ঠ নির্যাতনকাল (২৩৫-২৩৮ খ্রিঃ)

২৩৫ খ্রিঃ রোম সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করলেন 'থ্রেসিয়া' দেশ থেকে আগত মাক্সিমিনাস্ থ্রাক্স (Maximinus Thrax)। তিনি ছিলেন দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ ও নৃশংস। তাঁকে বলা হতো 'বর্বর'। তিনি পোপ সাধু পনসিয়ান (Pontian), সাধু হিপ্পোনিটাস (Hipponytus) ও অন্যান্য বিশপকে সার্ডিনিয়া (Sardegna) দ্বীপে নির্বাসনে পাঠান। সেখানে তাঁদের মৃত্যু ঘটে।

৩.৬৪ সপ্তম নির্যাতনকাল (২৪৯-২৫১ খ্রিঃ)

পরবর্তী নব-অভিষিক্ত সম্রাটের নাম ডেসিয়াস (Decius)। তিনিও অত্যাচারী ছিলেন।

৩.৬৫ অষ্টম নির্যাতনকাল (২৪৭-২৫৯ খ্রিঃ)

এই সময় রোম সাম্রাজ্য পারস্য দেশের সঙ্গে যুদ্ধরত ছিল। যুদ্ধ চালানোর জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তাই অর্থমন্ত্রী মাক্রিনাস্ অনুশাসনপত্র দ্বারা খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে নির্যাতন ঘোষণা করতে সম্রাটকে প্ররোচিত করলেন। নতুন করে কেন উৎপীড়ন শুরু হলো, তা খ্রিস্টভক্তগণ বুঝতে পারল না। তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রোম সম্রাটের অনুরূপ অনুশাসনবিধি আফ্রিকাতেও কার্যকর করা হয়েছিল। সেখানকার কার্থেজ নগরের যশস্বী সাধু বিশপ সিপ্রিয়ান (Cyprian) ছিলেন অবস্থাপন্ন খ্যাতনামা বক্তা। ৫৬ বৎসর বয়সে তিনি খ্রিস্টধর্ম অবলম্বন করে সহায়-সম্পত্তি দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করেন। দেবার্চনা করতে অসম্মত হওয়ায় ২৫৮ খ্রিঃ তাঁর শিরশ্ছেদ করা হয়।

ভ্যালেরিয়ানের অত্যাচারের সময় আরও একজন মহাসাধক রোমে দণ্ডিত হন, যার নাম লরেন্স। লরেন্স ছিলেন একজন ডিকন অর্থাৎ উপ-যাজক। তিনি দরিদ্রদের সেবা করে তাদের মধ্যে মণ্ডলীর অর্থসম্পদ বিতরণ করতেন। এছাড়া তিনি মণ্ডলীর সম্পত্তি, উপাসনা ও যাগযজ্ঞের সামগ্রী, স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্মিত পাত্র প্রভৃতির রক্ষণাবেক্ষণ করতেন।সম্রাট তাঁর কাছে গিয়ে এসব

জিনিস দিয়ে দিতে বললেন। এতে লরেন্স তিন দিনের সময় চাইলেন। তিনদিন পর রোমের সব গরীব-দুঃখীদের ডেকে এনে তাদেরকে গচ্ছিত অর্থাদি দান করলেন। এরপর সবাইকে নিয়ে বিচারকের সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন, "এরা মণ্ডলীর সম্পত্তি, এরাইতো মণ্ডলীর গৌরব।"[৭৯] বিচারক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে লরেন্সকে একটি লোহার খাটে বেঁধে তাতে অগ্নিসংযোগ করার আদেশ দিলেন। ২৫৮ খ্রিঃ ১০ আগষ্ট তিনি দেহত্যাগ করেন।

২৫৮ খ্রিঃ কাটাকরের মধ্যে এক কিশোরকে দুর্বত্তরা আক্রমণ করলো। তার নাম ছিল তার্সিসিয়াস। সে প্রাণপণে পোপ মহোদয়ের দেয়াখ্রিস্টপ্রসাদের পাত্রটি বুকের মধ্যে চেপে ধরে রাখলো। এতে দুর্বত্তরা আরও ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে প্রস্তরাঘাত করতে লাগলো। অবশেষে সে মাটিতে পড়ে প্রাণত্যাগ করলো।

এই পর্বে পোপ সাধু স্টিভেন (Stephen) ও সাধু সিক্সটাস (Sixtus) ধর্মশহীদ হন। ২০৬ খ্রিঃ খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করার সময় সাধু সিক্সটাসএর শিরশ্ছেদ করা হয়। তাঁর সাথে আরও চারজন নিহত হন।

উল্লিখিত ধারাবাহিক বিবরণ পাঠ করে পাঠকগণ বুঝতে পারবেন যে, খ্রিস্টভক্তগণ কয়েক যুগ ধরে যেভাবে অত্যাচারিত হয়েছে, তা শুধু রোমীয় সম্রাটগণের স্বৈরাচারী শাসনের ফলশ্রুতি। ৩০০ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী যুগগুলিতে খ্রিস্টভক্তদের অনেকের মধ্যে এমন দৈবপ্রবণতা সঞ্চারিত হয়েছিল যে, তারা ভোগসর্বস্ব পার্থিব জীবন পরিত্যাগ করে একান্তভাবে ঈশ্বরের সেবায় আত্মনিয়োগ করতেন। তাদেরকে খ্রিস্টিয় সন্ন্যাসী বা অরণ্যবাসী বলা হয়। এসব নির্জনবাসী সন্ন্যাসীদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করে সেই অর্থ গরীবদের মধ্যে দান করা হতো। তাদের আদি বাসভূমি ছিল মিশর দেশের অরণ্যাঞ্চল বা মরুভূমি। তারা চটবস্ত্র পরিধান করতেন; তাদের খাদ্য ছিল বন্য ফলমূল। অরণ্যবাসী এই সকল তপস্বীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সাধু পল ও সাধু এন্টনি। এন্টনি ২০ বছর বয়সে ২৩৫ খ্রিঃ তার যাবতীয় সম্পদ দরিদ্রদের মাঝে বিলিয়ে দিয়ে নীলনদ ও লোহিত সাগরের মধ্যবর্তী জঙ্গল ও মরুভূমিতে বসবাস করতে লাগলেন। সাধু এন্টনি অলৌকিকভাবে পীড়িতদের সুস্থ করতেন এবং দর্শনার্থীদেরকে সৎ

জীবন যাপন করার পরামর্শ দিতেন।[৮০] অনেকে এন্টনীর মতো সন্ন্যাস-জীবন গ্রহণ করলো। ৩০৬ খ্রিঃ সেখানে সন্ন্যাসী পল্লী গড়ে উঠল।

পরবর্তীতে পৃথকভাবে কুটিরে বসবাসের প্রথা পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসীগণ একটি আশ্রমে বসবাস করতে লাগলেন। এরূপ সংঘবদ্ধ জীবনযাত্রা মিশরের দক্ষিণাঞ্চলে ৩৪৬ খ্রিঃ পাকোমিয়াস কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছিল।

২৬৮ খ্রিঃ ভ্যালেরিয়ান সম্রাটের উত্তরাধিকারী হলেন তাঁর পুত্র গাল্লিয়েনাস। খ্রিস্টধর্মের প্রতি তাঁর পিতার চিন্তাধারার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিলেন তিনি। যখন রাজ্যব্যাপী মহামারী দেখাদিয়েছিল, তখন খ্রিস্টভক্তগণ তাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন। এ মানবিক ঘটনা দেখে সম্রাট তাঁর স্ত্রীর কাছে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, খ্রিস্টভক্তগণ হচ্ছেন সাম্রাজ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ নাগরিক।[৮১] তখন শাসকগোষ্ঠীর সর্বোচ্চ মহল থেকে খ্রিস্টধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল।

৩.৬৬ নবম নির্যাতনকাল (২৭৫ খ্রিঃ)

গাল্লিয়েনাসএর মৃত্যুর পর নব-অভিষিক্ত সম্রাট হন অরেলিয়ান (Aurelian)। তিনি নতুন অনুশাসন প্রচার করেছিলেন যে, ‘সূর্য দেবতা’র পূজা করতে হবে। এতে সম্মত না হওয়ায় খ্রিস্টানগণ অত্যাচারিত হয়। তিনি ২৭৫ খ্রিঃ পারসিক শত্রুদের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য যুদ্ধ অভিযানে নিহত হন।

পরবর্তী সম্রাট হলেন ডাইওক্লেসিয়ান (Diocletian)। তাঁর সময়ে অনেকে অত্যাচারিত হয় ও প্রাণ হারায়। তাঁর শাসনামলে রোম সাম্রাজ্য পূর্ব ও পশ্চিমে দুইভাগে বিভক্ত ছিল। গালেরিয়াসকে পূর্বাঞ্চল (বর্তমান স্পেন) ও কনষ্টান্সিয়াসকে পশ্চিমাঞ্চল (বর্তমান ফ্রান্স) এর শাসনভার দেওয়া হয়। এই সময়ে জনগণের ২০% ছিল খ্রিস্টভক্ত এবং তাদের মধ্যে অনেকে দরকারী দপ্তর ও সেনাবাহিনীতে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন।

গালেরিয়াসের কর্তৃত্বাধীন অঞ্চলে বারবারা নামে এক যুবতী খ্রিস্টধর্ম রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন। তিনি খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেছিলেন। এই ধর্মের প্রতি তিনি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করতেন। এজন্য বারবারার বাবা ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বিচারকের সামনে নিলেন। বিচারক কষাঘাত করে তাকে কারাগারে পাঠালেন। দীর্ঘ দিন কারাভোগের পর বারবারার ধর্ম বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়ে উঠলো। তখন তার পিতা নিজেই মেয়ের শিরশ্ছেদ করলেন। আর সাথে সাথেই বারবারার পিতা বজ্রাঘাতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। এই সম্রাটের আমলে ২০ হাজার খ্রিস্টভক্ত প্রাণ হারিয়েছিল। ইতোপূর্বে এবারের মতো অত্যাচারের স্বরূপ এত অমানুষিক ও নিষ্ঠুর হয়নি।

৩.৬৭ দশম নির্যাতনকাল (৩০৩- ৩০৫ খ্রিঃ)

৩০৩ খ্রিঃ সম্রাটের পক্ষ থেকে পুনরায় উপর্যুপরি চারটি অনুশাসন জারি করা হলো। এই অনুশাসনের উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টধর্মকে সমূলে ধ্বংস করা। তখন বিভিন্ন অঞ্চলে রক্তক্ষয়ী প্রতিবাদ আন্দোলন দেখা দিল। বহুসংখ্যক খ্রিস্টভক্ত ধর্ম রক্ষার জন্য প্রাণ দিলেন।

থেবান (Theban) নামক সেনাবাহিনীতে সাধু সেনাপতি মরিস (Maurice) এর নেতৃত্বে বহুবীর সৈন্যর সমন্বয় ঘটেছিল। কথিত আছে, কয়েক হাজার বীর সৈনিক ধর্মের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেন।

৩০৪ খ্রিঃ অনেক সৈন্য ও বিশ্বস্ত কর্মচারী প্রাণ হারান। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সৈন্যাধ্যক্ষ সাধু সেবাষ্টিয়ান (Sebastian)। সেবাষ্টিয়ান ছিলেন সম্রাট ডাইওক্লেসিয়ানের দেহরক্ষী ফৌজের খ্যাতনামা সেনাপতি। সেবাষ্টিয়ান খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তার উৎসাহে আরো অনেকে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।[৮২] ৩০৪ খ্রিঃ সেবাষ্টিয়ানকে খোলা মাঠে এনে তার সামরিক পোষাক, তরবারি, বর্ম ও শিরস্ত্রাণ কেড়ে নিয়ে তাঁকেগাছের সঙ্গে বেঁধে তীরবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়।

সেবাষ্টিয়ানের মতো আরেকজন বীরাঙ্গনা তরুণী এই নিষ্ঠুর অত্যাচারের সময় নিজের প্রাণ উৎসর্গ করলেন। তার নাম আগ্নেস। খ্রিস্টান হওয়ার কারণে তাকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যার

নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অগ্নিশিখা ধার্মিকা বালিকাকে আবেষ্টন করে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলেও সেই আগুনের শিখা আগ্নেসের দেহকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করলো না। অবশেষে ঘাতক কুঠারাঘাতে তার শিরশ্ছেদ করলো।

৩১০ খ্রিঃ ম্যক্সিমিয়ান নিহত হন। ৩১১ খ্রিঃ গ্যালেরিয়াস প্রাণত্যাগ করেন। রোমের সার্বভৌম সম্রাট হওয়ার জন্য কনষ্টান্টাইন ও ম্যাক্সেন্সিয়াসের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চললো। কনষ্টান্টাইন ছিলেন সুদক্ষ, সাহসী ও বীর সেনাপতি। তিনি সুদূর ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে রোমের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচলনা করার সময় হঠাৎ মহাকাশে ক্রুশের প্রতিবিম্ব দেখতে পেলেন। সেই প্রতিবিম্বিত ক্রুশচিহ্নের উপর লেখা ছিল :'এই চিহ্নে তুমি জয়লাভ করবে'। ৩১২ খ্রিঃ ২৮ অক্টোবর সেই ক্রুশচিহ্ন অঙ্কিত পতাকা হাতে নিয়ে তিনি শত্রুবাহিনীর উপর ঝাপিয়ে পড়েন। তখন ম্যাক্সেন্সিয়াস 'টাইবর' নদীতে নিমজ্জিত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন।

বিজয়ী যোদ্ধা কনষ্টান্টাইন জয়ী হন। ৩১৩ খ্রিঃ 'মিলান' নগরীতে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের পূর্ণ অধিকার দেওয়া হলো।[৮৩]

ক্রমবিকাশমান খ্রিস্টমণ্ডলীর পক্ষে এই সুযোগ-সুবিধাকে অত্যন্ত শুভ বলা যেতে পারে। নব পল্লবিত বৃক্ষের ন্যায় মণ্ডলী সুশোভিত হয়ে উঠল। এভাবে পৌত্তলিকতার সমাপ্তি ঘটলো এবং খ্রিস্টধর্মের জয়যাত্রা সূচিত হলো।[৮৪]

৩.৬৮ বিভিন্ন ভ্রান্ত ধর্মমত

খ্রিস্টমণ্ডলী প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্যায় থেকে, এমনকি তার প্রতিষ্ঠাতা প্রভু যীশুর জীবনকালেও বাইরের যেমন শত্রু ছিল তেমনি অভ্যন্তরীণ শত্রুও রয়েছে। ভণ্ড খ্রিস্টানরা ভ্রান্তশিক্ষার মাধ্যমে খ্রিস্টকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীর সত্যকে বিকৃত করে। অতীতে এমন অনেক চেষ্টা হয়েছে। এদের মধ্যে শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গও ছিলেন। তাঁরা যীশু ও তার প্রেরিতশিষ্যগণের প্রচারিত মৌলিক তত্ত্বাদি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এমন বুদ্ধিদীপ্ত তীক্ষ্ণ ভ্রান্তমত প্রচার ও প্রবর্তন করেছিলেন যে, সাধারণ ভক্তদের পক্ষে সত্য-মিথ্যা পার্থক্য করা বা সত্য উপলব্ধি করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছিল।

এই ভ্রান্ত মতগুলো হলো নিম্নরূপ :

১) নসটিসিজম (Gnosticism)ঃ (১৩০-১৮০পর্যন্ত)

২) মন্টানিজম (Montanism) : ১৭২ খ্রিঃ

৩) মানিকেইজম (Manicheism) : ২৪০ খ্রিঃ

৪) অ্যারিয়ানিজম (Arianism) : ৩৩৬ খ্রিঃ

ভ্রান্ত মতবাদের গতি প্রতিরোধ করেন মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ার অরিজেন ও সিরিয়ার অ্যান্টিয়োক। অরিজেন (২৫৩ খ্রিঃ) ছিলেন তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ঐশতত্ত্ববিদ ও বিদগ্ধ খ্রিস্টান সাহিত্যিক। আর সাধু জন খ্রীসোষ্টম (John Chrisostom) ছিলেন যশস্বী ধর্মতত্ত্ববিদ। তিনি ছিলেন গ্রীক ভাষায় শ্রেষ্ঠ বাগ্মী। এরিয়াসের মতের প্রতিবাদ করেন সাধু আথানাসিয়াস।

৩.৬৯ মণ্ডলীর সাংগঠনিক কার্যক্রম

যীশুর শিষ্যগণের পদাধিকারী হিসাবে বিশপগণ নির্দিষ্ট যাজনক্ষেত্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এই যাজন ক্ষেত্রকে বলা হয় ডাইওসিস (ধর্মপ্রদেশ)। তাঁদের কাজে সহযোগিতা করার জন্য পুরোহিতদের অভিষিক্ত করে তারা সহকারী পদে নিয়োগ দিতেন। বিশপের পক্ষে পুরোহিতগণ খ্রিস্টভক্তদের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য ধর্মীয় সংস্কার অনুষ্ঠান, খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ, ধর্মোপাসনা অনুষ্ঠান পরিচালনা ও ধর্মশিক্ষা দান করতেন। ভক্তদের পার্থিব কল্যাণ সাধন ও দরিদ্রদের সেবার জন্য ‘ডিকন’(Deacon) পদাভিষিক্ত উপযাজক নিয়োজিত হতেন। বিশপের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ‘ডাইওসিস’এর অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র ধর্মাঞ্চলগুলি পরিচালনা করতেন পুরোহিতগণ। বৃহত্তর ডাইওসিস বা ধর্মপ্রদেশের তত্ত্বাবধায়ক হলেন মেট্রোপলিটন (Metropolitan) বিশপ বা প্যাট্রিয়ার্ক (Patriarch)। রোম সাম্রাজ্যের শেষ পর্যায়ে ১২,০০০০০০০ সাধারণ প্রজার মধ্যে খ্রীষ্টভক্তদের সংখ্যা ছিল এর পঞ্চাশ শতাংশ।[৮৫]

৩.৭০ রাজধানী কনষ্টান্টিনোপল

খ্রিস্টপূর্ব ৬৫ সাল থেকে বাইজান্টিয়াম তুরস্ক দেশের বর্তমান ইস্তাম্বুল ছিল গ্রীকদের সভ্যতা, কলাবিদ্যা ও সাহিত্যের বিশিষ্ট কেন্দ্র। ৩৩০ খ্রিঃ কনষ্টান্টাইন শহরকে রোমের রাজধানীতে পরিণত করেন। ৩৩৭ খ্রিঃ কনষ্টান্টাইন মৃত্যু শয্যায় খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে পরলোকগমন করেন। কনষ্টান্টাইন এর নামানুসারে শহরের নাম হয় 'কনষ্টান্টিনোপল'।[৮৬]

৩.৭১ স্থাপত্যকীর্তি

সম্রাট কনষ্টান্টাইন কর্তৃক ধর্মীয় স্বাধীনতা ঘোষণার পর খ্রিস্টীয় জগতের সর্বত্র বিশেষভাবে রোম নগরীতে গির্জা নির্মাণের কাজ শুরু হয়। এগুলো বিগত চতুর্থ শতাব্দীর স্থাপত্যকীর্তির সাক্ষ্য বহন করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো লাটেরান (Lateran) এ সাধু জন (যোহন) এর গির্জা। এটাকে নিখিল মাতৃস্বরূপা 'প্রধান গির্জা' বলে। ৩০৪ খ্রিঃ কনষ্টান্টাইন এটি নির্মাণ করে পোপ সিলভেষ্টারকে দান করেন। তৎসংলগ্ন লাটেরান প্রাসাদ ৩১১ খ্রিঃ থেকে ১৩০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত পোপের বাসগৃহ ও মণ্ডলীর কেন্দ্রীয় দপ্তর হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তাছাড়াও ৩৫২ খ্রিঃ একটি গির্জা নির্মিত হয় পুণ্যবতী মাতা মারীয়ার উদ্দেশ্যে। গির্জার নাম রাখা হয় 'সান্তা মারীয়া মাজ্জোরে'। আর একটি বিখ্যাত গির্জা হলো রোমের 'প্রাচীরের ওপাশে সাধক পল' এর গির্জা। উল্লিখিত গির্জাগুলি তৎকালীন স্থাপত্যরীতি ও উৎকর্ষের দিক থেকে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ।[৮৭]

৩.৭২ ধর্মভ্রষ্ট

পরবর্তীকালে ৩৬১ খ্রিঃ –৩৬৩ খ্রিঃ পর্যন্ত জুলিয়ান (Julian) রোমীয় সম্রাটের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন, তথাপি প্রাচীন পৌত্তলিক দর্শনশাস্ত্রের প্রতি তাঁর যথেষ্ট আকর্ষণ ছিল। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর প্রজাদেরকে পৌত্তলিকতাবাদে বিশ্বাসী হতে আদেশ করেন। ছাত্রদের পৌত্তলিকতা বিষয়ে শিক্ষার্জন করতে হয়। যীশু তাঁর মৃত্যুর কয়েকদিন আগে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, জেরুসালেম মন্দির ধ্বংস হবে ও তার একটি পাথর আরেকটি পাথরের উপর থাকবে না। ৭০ খ্রিঃ তা বাস্তবে পরিণত হয়।[৮৮] যীশুর বাণীটি মিথ্যা প্রমাণিত

করার জন্য মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল।

৩.৭৩ মণ্ডলীর প্রাথমিক পর্যায়ের ধর্মগুরু ও আচার্যগণ

মণ্ডলী প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্যায়ে যীশুর বাণী মুখে মুখে প্রচারিত হতো। কিন্তু কালক্রমে তা লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তাই যীশুর শিষ্যগণ নিজেরা বা অপরকে দিয়ে সুসমাচার, প্রেরিতশিষ্যদের কার্যাবলী বা বিভিন্ন উপদেশাশ্রয়ী পত্রাবলী লিপিবদ্ধ করে শাশ্বত বাণী সঞ্জীবিত করার ব্যবস্থা করেন। শিষ্যদের মৃত্যুর পর নতুন কোন বাণী ঘোষণা না করে খ্রিস্টমণ্ডলী যীশুর লিখিত বাণী ব্যাখ্যা করতে থাকে। মণ্ডলীর মধ্যে কোন ভ্রান্তমতবাদ উদ্ভুত হলে পোপ মহোদয় মণ্ডলীর অধ্যক্ষ ও ধর্মতত্ত্বের রক্ষক হিসাবে ধর্মসভা আহ্বান করতেন। যীশুর বাণীর আলোকে নবপ্রবর্তিত মত যে ভ্রান্ত তা প্রমাণ করতেন ও বিশ্বাসযোগ্য তত্ত্বাবলী ঘোষণা করতেন।

যীশুর বাণী ব্যাখ্যা করা ছাড়াও ধর্মবিষয়ে এমন কতিপয় অভিজ্ঞ ও দক্ষ ধর্মগুরু, ধর্মাচার্য ও সমালোচক আবির্ভূত হয়েছিলেন, যারা তাদের বুদ্ধিদীপ্ত শিক্ষা, রচনা ও উপদেশবাণী দ্বারা যীশুর শিক্ষার মূল তত্ত্বাবলী প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন।[৮৯] তাঁদের প্রচারিত যীশুর বাণীর ব্যাখ্যা 'উপদেশ পরম্পরা'র অন্তর্গত।

প্রথম দিকে যে সকল ধর্মগুরু ও ধর্মাচার্যগণ তাঁদের ব্যাখ্যা ও রচনা দ্বারা মণ্ডলীর মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষার প্রাণসঞ্চার করে গেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন :

- সাধু পোপ ক্লেমেন্ট
- সাধু বিশপ ইগ্নেসিয়াস
- সাধু পলিকার্প
- আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লেমেন্ট (+২১১ খ্রিঃ)
- অরিজেন (+২৫৩ খ্রিঃ)
- সাধু জাষ্টিন (+১৬৩ খ্রিঃ)
- সাধু আইরেনিয়াস (+২০০ খ্রিঃ)

- সাধু ব্যাসিল (+৩৭৯ খ্রিঃ)
- সাধু গ্রেগরী নাজিয়ান্সেন (+৩৯০ খ্রিঃ)
- নিসার সাধু গ্রেগরী (+৩৯৪ খ্রিঃ)
- সাধু জন খ্রিসোষ্টম (+৪০৭ খ্রিঃ)
- সাধু সিরিল (+৪৪৪ খ্রিঃ)
- সাধু সিপ্রিয়ান (+২০৮ খ্রিঃ)
- সাধু হিলারী (+৩৩৬ খ্রিঃ)
- সাধু আমব্রোস (+৩৯৭ খ্রিঃ)
- সাধু আগষ্টিন (+৪৩০ খ্রিঃ)
- সাধু যেরোম (+৪২০ খ্রিঃ)

৩৫৭ খ্রিঃ ডালমাজিয়া (বর্তমান যুগোশ্লাভিয়া) এ সাধু যেরোম জন্মগ্রহণ করেন। সন্ন্যাস জীবন অবলম্বন করে তিনি সিরিয়ার মরু অঞ্চলে প্রাচীন হিব্রু ভাষায় শিক্ষা লাভ করেন, যাতে পবিত্র বাইবেলের শব্দগত অর্থ সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে পারেন। এরপর তিনি বেথেলহেমে গিয়ে যীশুর জন্মস্থানের পাশে একটি গুহায় তপস্যা, প্রার্থনা ও বাইবেল অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। পরিশেষে তিনি হিব্রু, আরামীয় ও গ্রীক ভাষায় রচিত বাইবেলটি আধুনিক ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেন।[৯০]

তাঁর অনূদিত বাইবেলকে ‘ভালগেট’ বলা হয়। সাধু যেরোম খ্রিস্টীয় সাহিত্যের প্রথম ইতিবৃত্তও রচনা করেন। তিনি মণ্ডলীর প্রারম্ভিক কার্যাবলী এবং বিশিষ্ট খ্রিস্টীয় লেখকদের বিভিন্ন ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি অনুবাদ করেন। তিনি অরণ্যবাসী সন্ন্যাসীদের জীবন, ইতিহাস, ধর্মোপদেশ ও শিক্ষামূলক পত্রও ভাষান্তরিত করেছেন।

৩৬৪ খ্রিঃ থেকে ৩৭৮ খ্রিঃ পর্যন্ত পূর্ব রোম সাম্রাজ্য (বাইজান্টিয়াম)এর সম্রাট ছিলেন ভালেন্স (Valens)। তিনি ছিলেন কাথলিক মণ্ডলীর ঘোর শত্রু। ‘ভিসিগথ’ বা ‘পশ্চিম গথ’ নামে এক বর্বর জাতি ছিল। তারা রোম সাম্রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে বসতি স্থাপনের জন্য সম্রাটের কাছে অনুমতি

প্রার্থনা করেছিল। সম্রাট তাদের একটি শর্তে অনুমতি দিলেন। কনষ্টান্টিনোপলের বিশপ উলফিলাস (Ulfilas) বর্বর উপজাতিকে শিক্ষিত করার জন্য তাদের ভাষার ভিত্তিতে উপযোগী বর্ণমালা এবং প্রাথমিক স্তরে শিক্ষণীয় ব্যাকরণ ও পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। পরবর্তীকালে তাদের ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন।[৯১]

৩.৭৪ সাধু আমব্রোজ

দ্বি-খণ্ডিত সাম্রাজ্যের বিভাগ অনুযায়ী পশ্চিমে রোম সাম্রাজ্যের শাসকপদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন গ্রেসিয়ান +৩৩৮ খ্রিঃ। প্রাচ্য (বাইজান্টাইন) সাম্রাজ্যের শাসক হন মহান থিওডোসিয়াস ৩৯৫ খ্রিঃ।

গ্রেসিয়ানের মন্ত্রণাদাতা ছিলেন ইটালীর উত্তরাঞ্চলের শাসক প্রতিনিধি আমব্রোস। তাঁর শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্র ছিল ইটালীর উত্তরাঞ্চলের মিলান নগর। আমব্রোস খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাস করতেন। প্রজারা তাকে খুব সম্মান ও ভক্তি করতো। তাই মিলানের বিশপের মৃত্যুর পর তিনি নগরবাসীদের দাবী অনুযায়ী ৩৭৪ খ্রিঃ বিশপপদে অভিষিক্ত হলেন। তিনি ছিলেন উত্তম ধর্মপাল, জ্ঞানী ধর্মশিক্ষক ও খ্রিস্টধর্মতত্ত্বের একনিষ্ঠ রক্ষক।

সম্রাট থিওডোসিয়াসের আমলে 'নিসিয়া' ধর্মসভায় গৃহীত ধর্মতত্ত্ব তার রাজ্যে কার্যকর করেন। সেই সময় থেকেই কাথলিক ধর্ম প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রধর্মে পরিণত হয়। কিন্তু ভ্রান্ত শিক্ষা যেন না হয় সেদিকে তিনি সতর্ক ছিলেন।

মাসেদোনিয়াস ছিলেন কনষ্টান্টিনোপলের বিশপ। তিনি ও তাঁর অনুগামীরা যীশুখ্রিস্টের ঈশ্বরতত্ত্ব ব্যতীত 'পবিত্র আত্মার' ঐশ্বরিক সত্ত্বাকে অস্বীকার করতেন। ৩৮১ খ্রিঃ ১৫০ জন ধর্মাচার্য ও বিশপ এক ধর্মসভায় উল্লিখিত মতকে শাস্ত্রবিরোধী বলে তা বর্জন করলেন। অদূর ভবিষ্যতে এই মতবাদ সম্বন্ধে যাতে সন্দেহের বীজ অঙ্কুরিত হতে না পারে সেজন্য কাথলিক বিশ্বাসমন্ত্রে এই তত্ত্বটি সংযোজিত হলো :

"কাথলিক মণ্ডলী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, প্রভু ও জীবনদাতা পবিত্র আত্মা, পিতা ও পুত্র থেকে আগত। পিতা ও পুত্রেরই মতো তিনিও আরাধ্য ও সম-মহিমার যোগ্য।"[৯২]

ইতিমধ্যে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যে গ্রেসিয়াসের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা দ্বিতীয় ভ্যালেন্টিনিয়ান সম্রাট হলেন। তাঁর মৃত্যুতে থিওডোসিয়াস দুই সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করলেন। ৩৯৫খ্রিঃ থিওডোসিয়াসের মৃত্যুও পর তার দুই ছেলে হনোরিয়াস পাশ্চাত্য অঞ্চলের ও আর্কেডিয়াস প্রাচ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। হনোরিয়াস খুবই দুর্বল, অকর্মণ্য ও অনুপযুক্ত সম্রাট ছিলেন। সেই সুযোগে ৪০১ খ্রিঃ ভিসিগথদের নেতা আলেরিক দেশটি আক্রমণ করে।

৩.৭৫ সাধু আগষ্টিন

আফ্রিকার উত্তরাঞ্চলে তাগাস্তে নগরে ৩৫৪ খ্রিঃ ১৩ নভেম্বর আগষ্টিন জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই তিনি ছিলেন সত্যানুরাগী। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কার্থেজএর মহাবিদ্যালয়ে তিনি অলংকারশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। মাত্র ২০ বছর বয়সে তিনি অধ্যাপনা কাজে নিযুক্ত হন। তিনি নানা দার্শনিক তত্ত্বে ব্যুৎপত্তি অর্জন করে জ্ঞান-পিপাসা চরিতার্থ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কোন কিছুতেই তিনি শান্তি পাচ্ছিলেন না। ক্রমান্বয়ে তাঁর চরিত্র কলঙ্কিত হতে থাকে। তাঁর মা সাধ্বী মনিকা ছেলের হতবুদ্ধি ও চেতনা ফিরিয়ে আনার জন্য প্রার্থনা ও ক্রন্দন করতে থাকেন। পরবর্তীতে তাঁর মা ছেলেকে নিয়ে মিলান শহরে চলে যান। সেখানে আগষ্টিন দর্শনশাস্ত্রে ও সাহিত্যচর্চায় পারদর্শী হয়ে শিক্ষকতা করতে থাকেন। একদিন একটি উদ্যানে অবসর যাপনকলে আগষ্টিন সুস্পষ্টভাবে এই বাণী শোনলেন :‘বইটি নিয়ে পড়’। টেবিলের উপরে ছিল শাস্ত্রের পাণ্ডুলিপি। তিনি পলএর পত্রটির সেই স্থানটি পড়লেন যেখানে লেখা আছে, ‘চরিত্রহীন ব্যক্তিরা কখনও স্বর্গে যেতে পারে না’। অবশেষে আগষ্টিন নিজের ভুল বুঝতে পেরে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হলেন ও ৩৮৭ খ্রিঃ সৎ জীবনযাপন শুরু করলেন।

পরবর্তীতে তিনি খ্রিস্টমণ্ডলীর লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিশপ ও ধর্মাচার্য হন। তিনি যুক্তিযুক্ত জ্ঞানগর্ভ পুস্তকাদি রচনা করেন ও খ্রিস্টধর্মের তত্ত্বাবলী বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তিতর্কের দ্বারা বিশ্লেষণ করেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থদ্বয়ের নাম ‘স্বীকারোক্তি’ এবং ‘ঈশ্বরনগরী’।

আফ্রিকার হিপ্পো নগরের বিশপ পদে তিনি ৩৪ বছর আসীন থেকেও ভক্তদের মধ্যে দীনদরিদ্র সন্ন্যাসীদের মতো জীবনযাপন করেন। তিনি 'ঐশকৃপা' তত্ত্বের ব্যাখ্যা করে জ্ঞানগর্ভ পুস্তক রচনা করেছেন। তাই আগষ্টিনকে 'ঐশকৃপার আচার্য' বলা হয়।[৯৩]

আগষ্টিনএর জীবনকালে ৪০৫ খ্রিঃ একটি ভ্রান্ত মতবাদের উদ্ভব হয়। এই ধর্মমতবাদের নাম 'মেনাকিয়ানিজম'। সাধু আগষ্টিন ধর্মতত্ত্ব রক্ষার জন্য প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক ধর্মসভা আহবান করেন। মোট ১২৫ জন বিশপের উপস্থিতিতে মতবাদটি ভ্রান্ত বলে সিদ্ধান্ত হয়। তাদের সিদ্ধান্ত পোপ ১ম ইন্নোসেন্ট সমর্থন করেন।

৩.৭৬ বর্বরদের রোম আক্রমণ

হনরিয়াসের সময়ে বীর সেনাপতি ছিলেন ৪০৩ খ্রিঃ ষ্টিলিকো (Stilicho)। তিনি গথ্ সর্দারকে প্রতিরোধ করতে অগ্রসর হলেন। ষ্টিলিকো রোমীয় সেনাপতি হলেও তিনি ছিলেন ভাণ্ডাল উপজাতি বংশোদ্ভূত।

পরবর্তীতে সেনাপতির প্রতাপে ঈর্ষান্বিত হয়ে সম্রাট ও তাঁর কর্মচারীগণ ষড়যন্ত্র করে ৪০৮ খ্রিঃ ষ্টিলিকোকে হত্যা করেন।

প্রতিরোধকারীর অবসানে এ্যালরিক ইটালী আক্রমণ করেন ও রোমীয় সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন। ৪১০ খ্রিঃ পোপ ইন্নোসেন্টএর অনুরোধ সত্ত্বেও এ্যালরিক রোম নগরী ধ্বংস করলেন, তবে ধ্বংসের হাত থেকে মুক্ত রাখলেন গির্জাগুলি। কয়েকদিন পর ইটালীর দক্ষিণাভিমুখে অভিযান চালিয়ে এ্যালরিক হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। এ্যালরিকএর মৃত্যুর পর তার ভগ্নিপতি এ্যাটায়ুলফ (Ataulf) ভিসিগথদের নেতা হন। তিনি জাতীয় সৈন্যবাহিনী নিয়ে দক্ষিণাভিমুখে ধ্বংসাত্মক অভিযান চালাতে লাগলেন। বহু লোককে বন্দী করে তাদেরকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। এভাবে তিনি যখন নলা (Nola) নগরের কাছে এসে পড়লেন তখন বিশপ সাধু পলিনাস (Paulinus) +৪৩১ খ্রিঃ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। পলিনাস ছিলেন ঐ অঞ্চলের ভূতপূর্ব রাজপ্রতিনিধি ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও কবি। বিশপ পলিনাস নিজের জীবনের

বিনিময়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীদের মুক্তি প্রার্থনা করলেন। সাহসী বিশপের উত্তরে মুগ্ধ হয়ে বর্বর রাজা সকল বন্দীকে মুক্তি দিলেন।

এরপর ভিসিগথরা ইটালী ছেড়ে উত্তর স্পেন গিয়ে ঘাঁটি স্থাপন করল। স্পেনের রাজধানী হলো টলোসা (Tolosa)। এই রাজ্যটি রোম সাম্রাজ্যের সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ৪১৫ খ্রিঃ এ্যাটায়ুলফ স্পেনে নিহত হন। ভিসিগথরা পঞ্চম শতাব্দীতে কাথলিক ধর্ম গ্রহণ করে।[৯৪]

৩.৭৭ স্কটল্যাণ্ডে বর্বরদের মধ্যে ধর্মপ্রচার

রোম সাম্রাজ্যের বাইরে যত বর্বর ও উপজাতি ছিল, তাদের কাছে কেউ **খ্রিস্ট**বাণী প্রচার করতে যায়নি। ইংল্যাণ্ডএর যে অংশটি রোমীয়রা দখল করেছিল তা ‘বৃটেন‘ নামে পরিচিত। কিন্তু রোমীয়রা বৃটেন পরিত্যাগ করে চলে যাওয়ার পর দেশটি বর্বর ‘স্যাক্সন’দের কবলীকৃত হয়। এরা ডেনমার্ক, জার্মানি থেকে এসে ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণাংশ দখল করেছিল। এরা ছিল পৌত্তলিক। স্যাক্সন ছাড়াও স্কটল্যান্ডের অধিবাসীরাও পৌত্তলিকতা স্বীকার করতো। সুতরাং তাদের কাছে খ্রিস্টবাণী পৌঁছে দেবার প্রয়োজন দেখা দিল। স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী সাধু নিনিয়ান (Ninian) ৪৩২ খ্রিঃ রোমে গিয়ে খ্রিস্টধর্মের শিক্ষায় প্রবুদ্ধ হয়ে প্রথম বিশপপদে অভিষিক্ত হলেন। সাফল্যের সাথে তিনি খ্রিস্টমণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করেন।[৯৫] তাঁর মৃত্যুর পর সাধু পাল্লাডিয়াস (Palladius) +৪৫০ খ্রিঃ প্রচারকার্য চালান।

৩.৭৮ মণ্ডলীর প্রগতিশীল সংগঠন

মণ্ডলী ক্রমান্বয়ে তাঁর ধর্মীয় কার্যকলাপ ও শৃঙ্খলার সাথে সম্প্রসারিত করে অবিরাম গতিতে অগ্রসর হতে থাকলো এবং মানব-কল্যাণে সক্রিয় হতে লাগলো।

মণ্ডলীর মধ্যে ধর্মীয় সংস্কারগুলি যথা দীক্ষাস্নান, নিস্তারপর্ব বা পুনরুত্থান বিষয়ক উৎসবাদি সমারোহ সহকারে অনুষ্ঠিত হতে লাগলো।

মানুষের দুঃখ-কষ্ট নিবারণের জন্য মণ্ডলী নিঃস্ব দরিদ্রদের অন্ন-বস্ত্র ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছিল। আর্তদের কল্যাণে হাসপাতাল, বৃদ্ধাশ্রম, অনাথাশ্রম নির্মিত হয়। সেই সময়ের (+৩৭৯ খ্রিঃ)

নির্মিত সিজারিয়ার হাসপাতালটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মানব কল্যাণে ব্রতী মণ্ডলীর এসব কর্মসূচী দেখে বর্বররাও খ্রিস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। উপেক্ষিত ও অস্পৃশ্য মানুষদের সেবায় পুরোহিতদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগ দেখে বর্বররা খ্রিস্টধর্ম সম্বন্ধে উচ্চধারণা পোষণ না করে পারলো না। এজন্য তাদের বর্বর স্বভাব ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে খ্রিস্টীয় ভালবাসা ও দয়াধর্মে প্রভাবিত হয়ে খ্রিস্টীয় আদর্শ ও নীতির অনুসারী হলো। খ্রিস্টমণ্ডলী পঞ্চম শতব্দীতে জনসাধারণের কল্যাণের জন্য নানা ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে।[৯৬] সেখানে পাঠ্যবিষয় ছাড়াও প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যিকদের রচনা পাঠ করার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। এভাবে উর্বর ভূমির মতো খ্রিস্টীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি থেকে অনেক প্রতিষ্ঠিত উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সুনাগরিক তৈরি হয়েছিল। এই পঞ্চম শতাব্দীতেই কলাবিদ্যা, চারুকলা ও স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষ সাধিত হয়।

৩.৭৯ ভাণ্ডালদের আক্রমণ

আনুমানিক ৪০৯ খ্রিঃ আরো কয়েকটি নতুন বর্বর উপজাতির দল ইউরোপের পশ্চিম দিক দিয়ে স্পেনে প্রবেশ করে ও দেশটির দক্ষিণ অংশ দখল করে। এদের নাম অ্যালান (Alan), সুএভ (Swev) ও ভ্যাণ্ডাল (Vandal)। ভ্যাণ্ডালরা যেখানে যেতো সেখানেই লুণ্ঠন ও অত্যাচার চালাতো।

সৌভাগ্যক্রমে ৪২৮ খ্রিঃ ভাণ্ডাল নেতা জেনসেরিক (Genseric) ৮০,০০০ সৈন্যের নৌবহর নিয়ে স্পেন পরিত্যাগ করেন। এরপর তারা ভূ-মধ্যসাগর অতিক্রম করে আফ্রিকার উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত হিপ্পো নগর আক্রমণ করে এবং দীর্ঘ ১৪ মাস যাবৎ নগরটিকে অবরুদ্ধ করে রাখে। তখন বিশপ সাধু আগষ্টিনের বয়স ৭৬ বছর। তিনি বৃদ্ধ অবস্থাতেই নাগরিকদের মধ্যে সাহস ও সহিষ্ণুতা সঞ্চার করেন। ৪৩০ খ্রিঃ ২৮ আগষ্ট সাধু আগষ্টিন পরলোকগমন করেন। এরপর ভ্যাণ্ডালদের হাতে হিপ্পোর পতন ঘটে এবং শহরটি ধ্বংস হয়ে যায়।

৩.৮০ ধর্মভ্রষ্ট নেষ্টোরিয়াস

যে কোনো দেশে ভ্রান্ত ধর্মমতবাদের কারণে তীব্র বিরোধ সৃষ্টি হলে মণ্ডলী অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নেষ্টোরিয়াসের ভ্রান্ত মতবাদের প্রতিবাদ করেন আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সিরিল। ৪৪৪ খ্রিঃ উপদেশ, প্রবন্ধাবলী রচনা, শাস্ত্র ব্যাখ্যার মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেন যে, এই মতবাদের শিক্ষা অত্যন্ত আপত্তিকর ও ভ্রান্ত। সিরিল ৪৩১ খ্রিঃ এফেসাস নগরে মহাধর্মসভার আহ্বান করেন। এতে সভাপতিত্ব করেন সাধু সিরিল। সভায় পক্ষে-বিপক্ষের মতামত বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, যীশুখ্রিস্ট ঐশ্বরিক ও মানব স্বভাব সম্পন্ন হলেও তিনি ব্যক্তি হিসাবে এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ একজন মাত্র যীশু বিদ্যমান - তিনি ঈশ্বর-মানব-যীশু। যীশুর ঐশ-ব্যক্তিত্ব তাঁর ঈশ্বরতত্ত্বে ও মানবতত্ত্বে বিরাজমান।[৯৭] তাই নেষ্টোরিয়াসএর মতবাদ সম্পূর্ণ বর্জনীয় এবং কুমারী মারীয়াকে ‘ঈশ্বর-জননী’ বলে সম্বোধন করা যুক্তিযুক্ত।

৩.৮১ আয়ারল্যাণ্ড

৪৩২ খ্রিঃ পোপ সাধু প্রথম সেলেষ্টিন (Celestine) গ্রেট বৃটেন দ্বীপপুঞ্জের আন্তঃরাজ্য আয়ারল্যাণ্ড (Ireland) এ খ্রিস্টবাণী প্রচার করার জন্য প্রেরণ করেন সাধু পাল্লাডিয়াস ও সাধু প্যাট্রিককে। পরবর্তীকালে পাল্লাডিয়াস স্কটল্যাণ্ডে যান।

৩৮৭ খ্রিঃ বৃটেনে একটি সম্ভ্রান্ত পৌত্তলিক পরিবারে প্যাট্রিক জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৬ বছর বয়সে আইরিশ দস্যুদের হাতে ছয় বছর আয়ারল্যাণ্ডে বন্দী থাকেন। এরপর তিনি গল (Gaul) এ (বর্তমানে ফ্রান্সে) পলায়ন করেন। সেখানে বিশপ সাধু জের্মেন (Germain) এর তত্ত্বাবধানে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে ৪০ বছর বয়সে বিশপপদে অভিষিক্ত হন। তিনি বন্দী অবস্থায় আইরিশ ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তিনি দীর্ঘ ৩০ বছর আয়ারল্যাণ্ড দ্বীপে খ্রিস্টবাণী দৃঢ়তার সাথে প্রচার করেন। প্যাট্রিকের মৃত্যু ঘটেছিল ৩৯৩ খ্রিঃ। তখন থেকে আজ পর্যন্ত আইরিশ কাথলিক মণ্ডলী নিরবচ্ছিন্নভাবে প্যাট্রিকের অখণ্ড ধর্মবিশ্বাসের আদর্শ বহন করে আসছে।

৪৫৪ খ্রিঃ ইউটিকিস (Eutyches) নতুন ধর্মমত প্রচার করেন। মতটি বিশ্লেষণ করার জন্য কালসিডন শহরে ৪৫১ খ্রিঃ ধর্মসভার আহ্বান করা হয়। মতটির বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ করেন সাধু 'ফ্লেবিয়ান'। তার ফলে ফ্লেবিয়ান অত্যাচারিত ও প্রহৃত হয়ে ৪৪৯ খ্রিঃ প্রাণত্যাগ করেন।

এদিকে ৪৩০ খ্রিঃ সম্রাট থিওডোসিয়াস প্রাণত্যাগ করেন। শূন্য সিংহাসনে বসলেন মারসিয়াস ৪৫৭ খ্রিঃ। তিনি কালসিডান ধর্মমহাসভায় ইউটিকিসএর ভ্রান্ত মতবাদ বর্জন করলেন। খ্রিস্ট ভক্তগণ তা সানন্দে গ্রহণ করলো। তখন থেকেই প্রচলিত হয় যে, প্রত্যেক দেশে বা রাষ্ট্রে পোপের একজন প্রতিনিধি থাকবেন। পোপের এরূপ প্রতিনিধি নুনসিও (Nuncio) বা প্র-নুনসিও (Pro-Nuncio) নামে পরিচিত।[৯৮]

৩.৮২ এটিলা ও বর্বর হূনজাতি

এরা এসেছিল তুর্কীস্থান ও মঙ্গোলিয়া অর্থাৎ উত্তর চীন থেকে। এরা কুৎসিত, খর্বকায়, স্থূল ও বলিষ্ঠ ছিল। এদের চেহারা ছিল অদ্ভুত ও নিষ্ঠুর। এরা হূন নামে পরিচিত। এদের নেতার নাম এটিলা। এরা যেদিকে যেতো সেদিকেই নগর ও গ্রাম রক্তে ভাসিয়ে দিতো।

তৎকালীন রোম সম্রাট ৩য় ভালেন্টিনিয়ানের সময় ৪৫০ খ্রিঃ হূনরা গল (ফ্রান্স) আক্রমণ করে ও বহু নগর ধ্বংস করে দেয়। এদের প্রতিরোধ করতে গিয়ে প্রায় দু'লক্ষ যোদ্ধা প্রাণ হারায়। পরবর্তীতে ভীতসন্ত্রস্ত রোমীয় নাগরিকগণ সমবেত হয়ে পোপের কাছে গিয়ে প্রার্থনা জানিয়ে বলে, 'পবিত্র পিতা, আমাদের রক্ষা করুন'। তখন বৃদ্ধ পোপ রোমের ৪ জন প্রশাসনিক প্রতিনিধি নিয়ে অশ্বারোহণ করে হূনদের শিবিরে গিয়ে পৌঁছান। তাদের মধ্যে কী কথা হয়েছিল তা কেউ বলতে পারেনি। তবে হূন নেতা তার ফৌজকে উত্তর আল্পস পর্বতমালার অপর পারে (জার্মান) ফিরে যাওয়ার আদেশ দেন। তখনই মহামান্য পোপ শূন্য নীল আকাশের বুকে একটি ক্রুশ চিহ্ন অঙ্কন করলেন।

রোমীয়দের আনন্দ-উল্লাস ছিল ক্ষণস্থায়ী। ৪৫৫ খ্রিঃ ভ্যাণ্ডাল নেতা জেনসেরিক নৌবাহিনী নিয়ে রোমের নিকটবর্তী অঞ্চল দিয়ে স্থলপথে নগরাভিমুখে অভিযান করলেন। তখন রোমের সম্রাট ছিলেন ম্যাক্সিমাস পেট্রোনিয়াস (Maximus Petronius)। সিংহাসন লাভ করার জন্য তিনি

সম্রাট ৩য় ভ্যালেন্টিনিয়ানকে হত্যা করেছিলেন। এরপরই রোমের রাজনৈতিক পটভূমি বদলে গেল। মৃত সম্রাটের স্ত্রী প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ভ্যাণ্ডালদেরকে রোমে আহ্বান জানালেন। সম্রাট ম্যাক্সিমাস তার কোন প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করেননি বলে জনতা ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে টাইবের নদীতে নিক্ষেপ করে হত্যা করল। তাদের বিশ্বাস ছিল, এই বর্বরতার গতি রোধ করতে পারবেন পোপ লিও। অগত্যা পোপ কয়েকজন ধর্মযাজককে সঙ্গে নিয়ে জেনসেরিকের সাথে দেখা করতে গেলেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও ভাণ্ডালরা মহানগরী লুণ্ঠন করলো। হাজার হাজার পরিবার বিধ্বস্ত হলো, আগুনে সব পুড়ে গেল। অক্ষত রইল কেবল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি। এভাবে ১৪ দিন ধরে ধ্বংসলীলাও লুণ্ঠন চলেছিল। পোপমহোদয় যে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন তা স্মরণ করে রোমান নাগরিকগণ পরবর্তীকালে তাঁকে ‘মহান লিও’ উপাধিতে ভূষিত করেন। পোপ লিও ৪১৬ খ্রিঃ ১০ নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

৩.৮৩ ইটালীতে বর্বর রাজ্য প্রতিষ্ঠা

৪৭৬ খ্রিঃ বর্বর জাতি এরুলি (Eruli) নামক জার্মান উপজাতি প্রবেশ করেছিল। তাদের নেতা ওডোয়েক্রিস।

৪৭৪ খ্রিঃ সম্রাট যুবক রোমুলাস অগাষ্টাসকে বন্দী করে ১৩ বছর রেখে রোমের সিংহাসনের প্রতিপত্তি ভোগ করেছিল ওডোয়েক্রিস।

৪৯৩ খ্রিঃ ওডোয়েক্রিসকে পরাজিত ও হত্যা করে ‘অষ্ট্রোগথ’ বর্বর নেতা থিওডোরিক নিজেকে শাসক বলে ঘোষণা করেন। থিওডোরিক ও তার বংশধরগণ ৪৮৯-৫৫৩ খ্রিঃ পর্যন্ত ৬৪ বছর ইটালী দেশ শাসন করেছিল।

৩.৮৪ ফ্রাঙ্ক রাজ্য প্রতিষ্ঠা

৪৮৬ খ্রিঃ জার্মান উপজাতি ফ্রাঙ্ক নেতা ক্লভিস (Clovis) এর নেতৃত্বে রোমান বাহিনীকে পরাজিত করে গল (Gaul) দেশ দখল করল। তাদের নাম অনুসারে প্রাক্তন গল দেশটি “ফ্রান্স” নামে পরিচিত হলো।

রাজা ক্লভিস ক্লটিলডিস (Clotildes) নামে এক কাথলিক যুবতীকে বিবাহ করে খ্রিস্টধর্মে সুশিক্ষিত হন।

৪৯৬ খ্রিঃ ক্লভিস রেইম (Reims) এর বিশপ রেমিজিয়াস (Remigius) এর খ্রিস্টবাণী প্রচারে আকৃষ্ট হয়ে বড়দিনের উৎসব লগ্নে ৩,০০০ শ্রেষ্ঠ সামরিক ব্যক্তি নিয়ে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন। এই ফ্রান্সই কাথলিক ধর্মে উদ্বুদ্ধ প্রথম দেশ।[৯৯] রাজা ক্লভিস বিভিন্ন জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেন ও সুশাসন দ্বারা দেশের উন্নতি সাধন করেন।

৩.৮৫ সন্ন্যাসী সাধু বেনেডিক্ট

মানব ইতিহাসে যুগে যুগে এমন কিছু মানুষ আবির্ভূত হয়েছেন, যাদের নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার ও কঠোরতা যুক্তিতর্কের সীমা অতিক্রম করেছে। আবার একই যুগে এমন কিছু মহৎ, নিঃস্বার্থ ও ধার্মিক ব্যক্তি আবির্ভূত হয়েছেন, যারা পরোপকারের জন্য আত্মোৎসর্গ করেছেন।

৪৮০ খ্রিঃ ইটালীর দক্ষিণ অংশে অবস্থিত নরচিয়া নগরে এক সম্ভ্রান্ত ও অবস্থাসম্পন্ন পরিবারে বেনেডিক্ট জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রোম নগরে পড়াশুনা করেন। পরবর্তীতে তিনি সব ত্যাগ করে সুবিয়াকো (Subiaco) পার্বত্য অঞ্চলের নির্জন স্থানে একটি গুহায় সংযম, প্রার্থনা ও তপস্যায় কালযাপন করেন। আদর্শ জীবন গঠনের জন্য বেনেডিক্ট একটি সংবিধান রচনা করেন। এই বিধি ব্যবস্থাকে বলা হয় বেনেডিক্টএর বিধান গ্রন্থ।[১০০]

৫২৯ খ্রিঃ বেনেডিক্ট মন্তেকাসিনো (Montecassino) নামক একটি পাহাড়ে ধর্মমঠ প্রতিষ্ঠা করেন ও একটি ধর্মসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। সংঘবদ্ধ এরূপ সন্ন্যাসীদের 'বেনেডিক্টিন' বলা হয়।

ইউরোপের অন্ধকারাচ্ছন্নপ্রায় মধ্যযুগে মন্তেকাসিনো মঠটি ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের কাছে আলোকস্তম্ভস্বরূপ। বিদ্যাচর্চা ও কর্মচর্চা ছিল মঠটির হৃৎপিণ্ড।[১০১] তাঁদের পরিশ্রমের ফলেই সুপ্রচীন কালের গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য পাঠের সুযোগ আমরা এখন লাভ করছি।

৩.৮৬ ইংল্যাণ্ডে খ্রিস্টধর্ম প্রচার

পোপ গ্রেগরী ব্রিটেনের দুরবস্থা দেখে বেনেডিক্টিন সংঘের আগষ্টিন নামক একজন মহাধ্যক্ষকে ৪০জন সন্ন্যাসীসহ বৃটেনে প্রেরণ করেন। দীর্ঘপথ ভ্রমণের পর ৪১ জন মিশনারী ৫৯৭ খ্রিঃ বৃটেনে পৌঁছান। এখানকার রাজা এথেলবার্ট তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন। তাদের ধর্মীয় তত্ত্বগুলি শিক্ষা লাভের পর খ্রিস্টের জন্মোৎসবের দিনে ১০,০০০ নাগরিক খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়।[১০২]

ক্যান্টারবার শহরে সুদৃশ্য গির্জা নির্মিত হলো। এটি ইংল্যাণ্ডের মধ্যে বৃহত্তম। সাধু আগষ্টিন এই ধর্মাঞ্চলের প্রথম অভিষিক্ত বিশপ। ৬০৪ খ্রিঃ তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পোপ গ্রেগরী পুরোহিত ব্রতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

তাঁর প্রবর্তিত যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পর্কিত সঙ্গীত 'গ্রেগরিয়ান চ্যান্ট' (Gregorian Chant) অর্থাৎ গ্রেগরীর সুরলিপি নামে পৃথিবী খ্যাত। মহান পোপ গ্রেগরী তার কর্মব্যস্ত জীবন অতিবাহিত করে গেছেন। তিনি মণ্ডলীর সকল বিশপ এবং ফ্রান্স, স্পেন ও বৃটেনের শাসক সম্প্রদায়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। তিনি শিক্ষা সংস্কৃতির প্রবর্তন করে সমাজ উন্নয়নে তৎপর হন। ৬০৪ খ্রিঃ ১২ মার্চ তিনি ইহলীলা সংবরণ করেন। তিনিই মধ্যযুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন খ্রিস্টমণ্ডলীকে দেখিয়েছিলেন জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোকবর্তিকা।[১০৩]

৩.৮৭ জার্মানীতে প্রচার

সাধু বনিফাস সন্ন্যাসীদের কাছে শিক্ষা পেয়ে সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করলেন। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী পোপ ২য় গ্রেগরী তাকে ফ্রিসল্যাণ্ড প্রদেশে পাঠালেন। সেখানে গিয়ে বনিফাস ধর্মশিক্ষা দিলেন ও মণ্ডলী সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। তিনি বহু গির্জা, মঠ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ করলেন। জ্ঞানগর্ভ পত্র লেখা, কবিতা রচনা, উপদেশ, এমনকি জার্মান ভাষার উপযোগী ব্যাকরণও তিনি রচনা করেছেন।

৭৫৪ খ্রিঃ পোপ স্টীফেন ‘সাধু ডেনিস’ নামক গির্জায় আনুষ্ঠানিকভাবে পিপিনকে ফ্রাঙ্কদের রাজা ও মণ্ডলীর ‘রক্ষক’ উপাধিতে ভূষিত করলেন। রাজা পিপিন তাঁর ফৌজ নিয়ে আল্পস্ পর্বতমালা অতিক্রম করে ইটালীতে প্রবেশ করে দু’বার লম্বার্ড নেতা আষ্টুলফকে পরাভূত করলেন। তিনি অধিকৃত ও পুনরুদ্ধারকৃত অঞ্চলগুলি পোপকে দান করলেন। এরূপ দানকৃত সম্পত্তি ‘সাধু পিটারের ভূ-সম্পত্তি’বলে পরিচিত। এ দানের ফলশ্রুতিতে পোপের রাষ্ট্রএর সূত্রপাত।[১০৪]

৩.৮৮ পবিত্র রোম সাম্রাজ্য

শার্লামেনের আমলে ৭৬৮-৮১৪ খ্রিঃ পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যে মণ্ডলী একপ্রকার শান্তি ও নিরাপত্তা ভোগ করতে লাগলো। এই শান্তিপূর্ণ পর্বে খ্রিস্টমণ্ডলীর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছিল। রোম নগরীর অন্তর্গত পোপের ভূতপূর্ব বাসভবন ও মণ্ডলীর দপ্তরখানা লাটেরান থেকে সমগ্র খ্রিস্টজগতে অবাধে অনুশাসন জারি করা হতো। শার্লামেনের শাসনাধীন অঞ্চল বিশাল মহীরুহের মতো শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছিল স্পেনের উত্তরাঞ্চল, ফান্স, জার্মানি, ইউরোপের পূর্বাঞ্চলের ভূ-খন্ড এবং ইটালীর উত্তরাংশে। তিনি সুশাসনের সুবিধার জন্য সমগ্র রাজ্যকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেন ও তাঁর অধীন শাসকগণকে তিনি প্রশাসনিক বিভাগগুলির দায়িত্ব প্রদান করেন।

রাজা শার্লামেনএর উৎসাহে ধ্বংসপ্রাপ্ত চারুশিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটতে লাগলো। বর্বরদের শিক্ষিত করার জন্য তিনি সর্বত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন। তিনি ছিলেন ধর্মভীরু ও নিষ্ঠাবান খ্রিস্টভক্ত।

বড়দিনের উৎসবমুখর রাত্রির শোভাবর্ধন করেছিল অসংখ্য প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ। মহামান্য পোপ ৩য় লিও ৮১৬ খ্রিঃ (Leo) খ্রিস্টযাগ উপাসনার সময় শার্লামেনের মস্তকে মুকুট স্থাপন করে তাঁকে ‘পবিত্র রোম সাম্রাজ্য’এর (The Holy Roman Empire) সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। গির্জায় সমবেত উপাসকমণ্ডলীও তাতে সম্মতি প্রকাশ করে। এভাবেই ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য একটি অধ্যায় অর্থাৎ পবিত্র রোম সাম্রাজ্যএর সূচনা হয়।[১০৫]

৮১৪ খ্রিঃ ২৮ জানুয়ারী শার্লামেন ৭২ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। রোমীয় নাগরিকগণ নতুন আক্রমণের আশংকায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। এর পরবর্তীতে যা ঘটেছিল তাকে সভ্যতার মানদণ্ডে বলা হয় 'অন্ধকারময় যুগ'।

এরপর ৮৫৫ খ্রিঃ অভিষিক্ত হলেন ধর্মভীরু লুইস। ৮২৬ খ্রিঃ পোপ ২য় ইউজিন ধর্মসভা আহ্বান করে নির্দেশ দিলেন যেন বিশপ ও পুরোহিতগণের বাসভবনে কিশোরদের শিল্প ও সাহিত্য চর্চার সুযোগ দেয়া হয়। পরবর্তীতে নানাভাবে খ্রিস্টীয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বিদেশী আক্রমণকারীদের দ্বারা অত্যাচারিত ও বিধ্বস্ত হয়েছে। এর প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে উঠল ৮৪৭ খ্রিঃ নতুন পোপ সাধু লিওএর সময়ে। ৮৫৮ খ্রিঃ নতুন পোপ হলেন চতুর্থ সাধু প্রথম নিকোলাস। তাঁর সময়ে প্রাচ্য মণ্ডলীতে বিভেদ দেখা দেয়।

৩.৮৯ বুলগেরিয়ায় খ্রিস্টবাণী

বুলগেরিয়ার অধিবাসীরা ছিল পৌত্তলিক ও হূন বংশোদ্ভূত। তাদের দলপতি বরিস ৮৬৬ খ্রিঃ খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে রোমে তাঁর পুত্রকে পাঠিয়ে তাঁর শাসিত এলাকায় মিশনারীদের পাঠাতে পোপকে অনুরোধ করেন। দুই ভাই সাধু সিরিল ও সাধু মেথডিয়াস খ্রিস্টবাণী প্রচারের জন্য বুলগেরিয়া যান।

তাছাড়াও মরাভিয়া, হাঙ্গেরী ও চেকোশ্লোভাকিয়াতেও ধর্ম প্রচার করেন। শ্লাভদের কাছে ধর্মপ্রচার করে তাঁরা শ্লাভীয় বর্ণমালা আবিষ্কার করেন। এই বর্ণমালা থেকে রুশীয় বর্ণমালা সৃষ্টি হয়েছে।[১০৬] তাঁরা ব্যাকরণের প্রচলন ও শ্লাভীয় ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন।

ফ্রাঙ্ক সম্রাট শার্লামেনের শেষ বংশধর হলেন জার্মান রাজ 'মাসলচার্লস'। ৮৮১ খ্রিঃ পোপ ৮ম জন তাকে সম্রাট পদে অভিষিক্ত করেন। তার আমলে বিভিন্ন বিপর্যয় দেখা গিয়েছিল। ৮৯০ খ্রিঃ ও পরবর্তী বছরগুলিতে মাজার নামে আরো একটি বর্বর উপজাতি অভিযান চালিয়ে ধ্বংস ও হত্যাকাণ্ড শুরু করে। ৯১৫ খ্রিঃ পোপ ১০ম জন বেরেঙ্গারিয়াসকে 'পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য' এর সম্রাট উপাধিতে ভূষিত করেন। বেরেঙ্গারিয়াসের মৃত্যুর পর দেখা দিল ঘোর দুর্যোগ। এই জটিল আবর্তের মধ্যেও ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মতত্ত্ব অটুট ছিল। ৯৩১ খ্রিঃ নরম্যান বর্বর নেতা রলন

(Rollon) ফ্রান্সের অন্তর্গত রুয়েনের বিশপের হাতে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন ও অন্যান্য নরমানও মণ্ডলীভুক্ত হয়। এছাড়াও বোহেমিয়ার বর্বরগণ খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়।

দশম শতাব্দীতে জার্মানি থেকে খ্রিস্টান প্রচারকগণ বোহেমিয়াতে এসে যীশুর বাণী প্রচার করেন।[১০৭] তখন বোহেমিয়ার দেশের নেতা এবং অসংখ্য প্রজাও খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সাধ্বী লুডমিল্লা। তাঁর পৌত্র রাজা সাধু ওয়েনসেসলো। এই আদর্শ রাজা তাঁর দেশের প্রজাদের মধ্যে ধর্মীয়, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধন করেন।

৯৫৪ খ্রিঃ পৌত্তলিক নেত্রী ওলগা এবং ব্লাডিমির খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলেন। তাঁদের সৎ জীবনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রজারাও দলে দলে খ্রিস্টবিশ্বাসের মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করলো।

৩.৯০ পোল্যাণ্ডে খ্রিস্টমণ্ডলী

৯৬৬ খ্রিঃ পোল্যাণ্ডের রাজা মিয়েস্কো খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। এই সময়ে পোল্যাণ্ড রাজার আমন্ত্রণে জার্মানি ও বোহেমিয়ার মিশনারীগণ পোল্যাণ্ডে গিয়ে সেখানকার অধিবাসীদের কাছে খ্রিস্টবাণী প্রচার করেন ও মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করেন।[১০৮] ৯৭০ খ্রিঃ পসেন শহরে প্রথম একজন বিশপ অধিষ্ঠিত হন। ১০১২ খ্রিঃ কার্ডিনালগণ একজন দৃঢ়চেতা দূরদর্শী ব্যক্তিকে পোপ পদে অভিষিক্ত করেন। তাঁর নাম অষ্টম বেনেডিক্ট। ১০১৪ খ্রিঃ জার্মান রাজা ২য় হেনরিকে সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত করেন।

৩.৯১ হাঙ্গেরী

মণ্ডলীর কার্যকলাপ ক্রমাগত সম্প্রসারিত হতে লাগলো। হাঙ্গেরীতে স্বয়ং রাজা ষ্টিভেনএর প্রয়াসে সমগ্র দেশে খ্রিস্টধর্ম পল্লবিত হয়। তিনি বহু উপাসনাগৃহ নির্মাণ করেন এবং গির্জা-সংলগ্ন ভূমি মণ্ডলীকে দান করেন। তাঁর সময়ে ১০টি ডায়োসিস (ধর্মপ্রদেশ) গঠিত হয়। তিনি বহু ধর্মীয় মঠাশ্রম, বিদ্যালয়, বৃহদায়তন হাসপাতাল, অনাথ ও বৃদ্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। সাধু ষ্টিভেন মণ্ডলীর সাধক, বীর ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন।[১০৯]

এই সময়ে রোম নগরীতে বিপজ্জনক পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। যারা রোমে তীর্থ করতে যেতো তাদের নিরাপত্তা ছিল না। বিভিন্ন দেশের শাসকদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে সর্বত্র দেখা দিয়েছিল অনাচার, দুর্নীতি ও বিশৃংখলা। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর বিষয় ছিল 'ইনভেষ্টিচার' প্রথা।

মণ্ডলীর বিরোধিতা দমন করার জন্য দৃঢ়চেতা সাহসী পোপের প্রয়োজন ছিল। এই পরিস্থিতিতে সুদক্ষ ও ধার্মিক বেনেডিক্টিন সন্ন্যাসী হিলদেব্রান্ড (Hildebrand) পোপ হন। পোপ হিসাবে তিনি সপ্তম গ্রেগরী নামে পরিচিত। ১০৮৫ খ্রিঃ ২৫ শে মে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ১০৮৮ খ্রিঃ বেনেডিক্টিন সন্ন্যাসী দ্বিতীয় আর্বান (Urban) পোপ পদে অধিষ্ঠিত হন।

১০৯৫ খ্রিঃ ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত ধর্মসভা চলাকালীন সময়ে পোপ দ্বিতীয় আর্বান তীর্থভূমিকে মুক্ত করেন। প্যালেষ্টাইন ছিল বিশ্ববাসী খ্রিস্টভক্তদের পুণ্য তীর্থভূমি।[১১০] মুক্তিদাতা যীশুখ্রিস্ট এখানে জন্মেছিলেন, প্রেমধর্ম প্রচার করেছিলেন, মৃত্যুবরণ ও পুনরুত্থান করেছিলেন। ফলে প্যালেষ্টাইনের পবিত্র তীর্থস্থান উদ্ধার করার জন্য ১০৯৬ - ১২৯১ খ্রিঃ পর্যন্ত ইসলাম ধর্ম ও খ্রিস্টানদের মধ্যে যে সংগ্রাম হয় তাকে 'ক্রুসেড' (Crusade) বা ধর্মযুদ্ধ বলা হয়। খ্রিস্টান ধর্মের পবিত্র প্রতীক 'ক্রুশ' থেকে 'ক্রুসেড'নামের উৎপত্তি।[১১১] খ্রিস্টান যোদ্ধাদের গাত্রাবরণে বৃহৎ 'ক্রুশ'এর নকশা আঁকা থাকতো। ক্রুশের এই প্রতীক থাকায় তারা 'ক্রুসেড যোদ্ধা' নামে পরিচিত। ক্রুসেড যোদ্ধারা সাতবার পবিত্র তীর্থভূমিকে উদ্ধার করার জন্য অভিযান চালিয়েছে। এই অভিযানের সংখ্যা অনুসারে ক্রুসেডগুলো সাতটি বলে পরিগণিত।

১ম ক্রুসেড - ১০৯৬ - ১১০১ খ্রিঃ
২য় ক্রুসেড - ১১৪৫ - ১১৪৮ খ্রিঃ
৩য় ক্রুসেড - ১১৮৭ - ১১৯২ খ্রিঃ
৪র্থ ক্রুসেড - ১২০২ - ১২০৮ খ্রিঃ
৫ম ক্রুসেড - ১২১৯ - ১২২১ খ্রিঃ
৬ষ্ঠ ক্রুসেড - ১২৪০ - ১২৫৪ খ্রিঃ
৭ম ক্রুসেড - ১২৭০ খ্রিঃ

ক্রুসেড অভিযানের উদ্দেশ্য আংশিক ব্যর্থ হলেও এ থেকে অনেক আধ্যাত্মিক ও সামাজিক উন্নতি সাধিত হয়েছিল।

মধ্যযুগের বিচিত্র রঙ্গমঞ্চে অমিত শক্তি নিয়ে অবতীর্ণ হলেন একজন সন্ন্যাসী। তাঁর নাম ক্লেরভোর সাধু বার্ণার্ড। তিনি ছিলেন সাহিত্যিক ও ঐশতত্ত্ববিদ। ১১১৩ খ্রিঃ তিনি সিতো নামক বিখ্যাত বেনেডিক্টিন ধর্মমঠে প্রবেশ করেন। ৩৭ বছর মঠাধ্যক্ষ পদে থাকাকালীন তিনি ১৩৬টি ধর্মমঠ প্রতিষ্ঠা করেন। পোপের নির্দেশনা অনুযায়ী বার্ণার্ড ইউরোপের বিভিন্ন শাসকের কাছে গিয়ে পবিত্র ভূমি প্যালেষ্টাইনকে রক্ষা করার জন্য উৎসাহিত করলেন।

১১৩০ খ্রিঃ ২য় ইন্নোসেন্ট পোপ পদে অধিষ্ঠত হন। ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড ও জার্মানির শাসকগণ ধর্মীয় ব্যাপারে পোপের আনুগত্য স্বীকার করেন। ১১৩৩ খ্রিঃ পোপ জার্মানরাজ ৩য় লথের-কে ‘পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য’এর সম্রাট পদে অভিষিক্ত করেন। ১১৯৮ খ্রিঃ অন্যতম তৃতীয় ইন্নোসেন্ট নামে জ্ঞানী ব্যক্তি পোপ পদে অধিষ্ঠত হন। পোপ অসিসির ফ্রান্সিস ও গুজমান দু’জন সাধক ব্যক্তির কাছ থেকে প্রভূত সাহায্য পেয়েছিলেন।ফ্রান্সিস তার অনুগামীদের নিয়ে সন্ন্যাস-সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। ১০ বছরের মধ্যে সেই সংঘে ধর্মব্রতীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০০০। সন্ন্যাসীগণ ‘ফ্রান্সিসকান বা ক্যাপুচিন’ নামে পরিচিত। সন্ন্যাসব্রতীগণের মধ্য থেকে কয়েকজন পোপ, পোপের প্রতিনিধি এবং অনেক ধর্মপ্রচারক হয়েছিলেন। তাঁরা দূরবর্তী অঞ্চলে ধর্মপ্রচার করতে গিয়ে অনেকে ধর্মশহীদ হয়েছেন। আজ পর্যন্ত তাঁদের পরিচালনায় পবিত্রভূমির স্মৃতিচিহ্ন বা স্মারক দ্রব্যসামগ্রী সুরক্ষিত আছে। তাছাড়া তাঁরা বিদ্যালয়, আশ্রম ও বহু কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন।

সাধু ফ্রান্সিসের অনুকরণে ১২৫৩ খ্রিঃ যুবতী ক্লেয়ারসর্বস্বত্যাগী হয়ে একটি নারী ধর্মসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। তার সদস্যাগণ “ক্লেয়ারস’ নামে পরিচিত।ডমিনিক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্মসংঘের সদস্যদের নাম ‘ডমিনিকান’। এ সংঘটি ৩টি ভাগে বিভক্ত। উপরোক্ত দু’টি মণ্ডলীর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং মানুষের কল্যাণ সাধনকার্যে প্রভূত সহায়তা করেছে এবং এখনও করছে।

৩.৯২ স্থাপত্যের উন্নয়ন

এ সময়ে ইউরোপের সর্বত্র স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রশিল্পের উন্নতি সাধিত হয়। এসময় গথিক (Gothic) রীতি অনুসরণে প্যারিস, কলোন, ভিয়েনা, কান্টারবেরী, মিলান প্রভৃতি স্থানে নির্মিত ক্যাথিড্রাল গীর্জাগুলো ইউরোপের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় বস্তু।[১১২]

১৩৩৭ খ্রিঃ জিস্তো (Gistto) নামক ইটালীর শিল্পী, স্থপতি, চিত্রকর তাঁর অপূর্ব শৈল্পিক সৌন্দর্য দ্বারা উপাসনা গৃহগুলির শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন।

১২৭১ খ্রিঃ ২৭ মার্চ পোপপদে অধিষ্ঠিত হন ১০ম গ্রেগরি (Gregory X)। তিনি ছিলেন ধর্মভীরু, উদার ও শান্তিকামী। ১২৭৩ খ্রিঃ তিনি জার্মানির রাজা রুডল্‌ফ হাপসবার্গকে সম্রাট পদে অভিষিক্ত করেন। এই রাজবংশ ১২৭৩ খ্রিঃ হতে ১৭৪৫ খ্রিঃ পর্যন্ত জার্মানীর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল।

১২৫৫ খ্রিঃ মণ্ডলীর নক্ষত্রখচিত আকাশে আর একটি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রের আবির্ভাব ঘটে। তিনি মহান দার্শনিক ও ঐশতত্ত্ববিদ সাধু টমাস অ্যাকুয়াইনাস।[১১৩] তিনি ছিলেন ডমিনিকান ধর্মসংঘের সন্ন্যাসী। তিনি ধর্মতত্ত্বে মহাপণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিক আলবার্টএর শিষ্য ছিলেন। তাঁর রচিত ৬০ খানা গ্রন্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো সুম্মা থিওলজিকা (Summa Theologica) অর্থাৎ ধর্মতত্ত্বের সারাংশ।

আরও একজন মহান সাধক ও ধর্মাচার্য হলেন বনাভেঞ্চার। তিনি আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ পুস্তক রচনা করেন। তিনি ছিলেন ফ্রান্সিসকান ধর্মসংঘের ধর্মব্রতী ও ধর্মাধ্যক্ষ।

৩.৯৩ লিয়ং ধর্মসভা

১২৭৪ খ্রিঃ প্রাচ্য (গ্রীক) খ্রিস্টমণ্ডলীর সাথে ঐক্য স্থাপনের জন্য ফ্রান্সের অন্তর্গত লিয়ং এ মহাধর্মসভা আহূত হয়। এই সভায় উৎসাহদানে বাইজান্টাইন সম্রাট ৮ম মাইকেলের প্রচেষ্টা স্মরণীয়। এই সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, পোপের মৃত্যুর দশ দিনের মধ্যে কার্ডিনালগণ অবশ্যই পোপ নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। পোপ অভিষিক্ত না-হওয়া পর্যন্ত কার্ডিনালগণ বাইরের কোন ব্যক্তির সংস্পর্শে আসতে পারবেন না এবং তাঁরা একই গৃহে অবস্থান করবেন। কার্ডিনালদের এরূপ সমবেত হওয়াকে বলা হয় ‘কনক্লেভ’ বা রুদ্ধদ্বার সভা বা গুপ্ত সভা।[১১৪]এই ধর্মসভার আরেকটি লক্ষ্য হলো ধর্মসম্প্রসারণ।

১২৭৬ খ্রিঃ পোপ পদে অভিষিক্ত হন ২১তম জন (John XXI)। তিনি ছিলেন একজন বৈজ্ঞানিক। তিনি পাঁচ বৎসর যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাশাস্ত্রে অধ্যাপনা করেন ও ন্যায়শাস্ত্র বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। তার রচিত গ্রন্থ প্রায় ৩৩০ বৎসর ধরে শ্রেষ্ঠ পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পোপ জন রোম ও প্রাচ্য মণ্ডলীর মধ্যে ঐক্য রক্ষার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন। ১২৭৭ খ্রিঃ তাঁর মৃত্যু ঘটে।

১২৮০ খ্রিঃ ৩য় নিকোলাস পোপ পদে অধিষ্ঠিত হন। তাতার রাজার অনুরোধে পোপ পারস্য ও চীন দেশে ফ্রান্সিসকান মিশনারীদের খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। তাতার বলতে পশ্চিম এশিয়া মহাদেশের অঞ্চল বিশেষের অধিবাসীদের বুঝায়। তারা ছিল যাযাবর প্রকৃতির, রুক্ষ ও দৈহিক শক্তির অধিকারী। তাদেও নেতা ছিলেন চেঙ্গিস খাঁ।

পোপ ৮ম বনিফাস ছিলেন মহৎ ব্যক্তি। তিনি রোমে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পৃথিবীর অন্যতম ও বৃহৎ ভ্যাটিকান গ্রন্থাগারটি সম্প্রসারণ করেন।

মহান চিত্রকর ও স্থপতি জত্তোকে তিনি চিত্রাঙ্কনে উৎসাহিত করেন। তাঁরই উৎসাহে জত্তো বহু সংখ্যক গির্জা সজ্জিত ও অলংকৃত করেন।

১৩০০ খ্রিঃ পোপ বনিফাস সর্বপ্রথম 'জুবিলি'বা'পবিত্র বৎসর' প্রবর্তন করেন। পবিত্র উৎসবে খ্রিস্টভক্তদের পাপের অনুশোচনার জন্য প্রার্থনা, সৎকাজ, ধর্মোপাসনা, তীর্থভূমি দর্শন, মানব কল্যাণে ও সেবায় আত্মনিয়োগ প্রভৃতি শুভকর্মে আহ্বান করা হয়।

১৩০৯-১৩৭৬ খ্রিঃ পর্যন্ত পোপগণ দক্ষিণ ফ্রান্সে অবস্থিত এ্যাভিলনএ থেকে মণ্ডলীর কার্য পরিচালনা করেন।

ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিরোধ ও শত্রুতা চলতে থাকে। এই দুই রাষ্ট্রের পারস্পরিক সংগ্রাম ইতিহাসে 'শতবর্ষের যুদ্ধ' নামে অভিহিত। যুদ্ধ আরম্ভ হয় ১৩৩৯ খ্রিঃ ও সমাপ্তি ঘটে ১৪৫৩ খ্রিঃ।

ডমিনিকান ধর্মসংঘের তৃতীয় সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিনী ক্যাথেরিন (St. Catherine of Siena) পীড়িত ও দরিদ্রদের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেন।

১৪১২ খ্রিঃ ফ্রান্সের ডমরেনি নামক ক্ষুদ্র গ্রামের দরিদ্র পরিবারে জোয়ান (Joan) এর জন্ম হয়। তিনি 'St. Joan of Arc' নামে পরিচিত। ১৩ বছর বয়সে জোয়ান একটি ঐশ্বরিক প্রেরণা লাভ করেন। খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাসে দেখা যায়, মাঝে মাঝে ঈশ্বর কোন দুর্বল, নিঃস্ব বিনীত ব্যক্তিকে কোন মহৎ কার্য সম্পাদনের জন্য আহ্বান করেন। তেমনিভাবে জোয়ানও মহৎ কার্য সম্পাদনের জন্য ও দেশের মঙ্গল সাধন করতে গিয়ে স্বদেশীয়দের ষড়যন্ত্রে নিজের অমূল্য প্রাণ বিসর্জন দেন।

পোপ পঞ্চম নিকোলাস রোম নগরীকে সমগ্র পৃথিবীর শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্র ঘোষণা করে বিভিন্ন দেশের পণ্ডিত ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের ভ্যাটিকান ভবনে রক্ষিত মূল্যবান প্রাচীন পুঁথিসমূহ পড়ার আমন্ত্রণ জানান। তাঁরই প্রচেষ্টায় 'ভ্যাটিকান লাইব্রেরী' পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীন গ্রন্থাদি সংরক্ষণে ও আয়তনে খ্যাতি অর্জন করেছে।

১৪৫৪ খ্রিঃ পোপ ২য় পল লাইব্রেরিতে রক্ষিত পুঁথিগুলি ছাপানোর ব্যবস্থা করেন। ফলে সর্বস্তরের জনসাধারণ দুর্লভ পুস্তকাদি পড়ার সুযোগ লাভ করে।

৩.৯৪ ভৌগলিক আবিষ্কার

ক্রমাগত স্পেন ও পর্তুগাল রাজনৈতিক ও আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগলো।

১৪৯২ খ্রিঃ ৩রা আগষ্ট ইটালীয় নাবিক কলম্বাসএর নেতৃত্বে স্পেনের 'ফারাভেল' নামে তিনটি দ্রুতগামী ও হালকা জাহাজ ১২০ জন নাবিক নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা শুরু করে। কলম্বাস তাঁর আবিষ্কৃত ভূ-খণ্ডটির নামকরণ করেন 'Sam Salvador' অর্থাৎ 'পবিত্র ত্রাণকর্তা'।[১১৫] যীশুর পবিত্র নামকে সম্মানিত করার জন্যই তিনি এরূপ নামকরণ করেন। পরবর্তীতে তিনি আরও কিছু ভূ-খণ্ড আবিষ্কার করেন।

১৫১২ খ্রিঃ কলম্বাসের বন্ধু আমেরিগো ভেস্পুচ্চি (Amerigo Vespucci) বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জের একটি বিশাল ভূ-খণ্ড আবিষ্কার করেন। তাঁরই নামানুসারে ভূ-খণ্ডটির নামকরণ করা হয় 'আমেরিকা'। আবিষ্কৃত ভূ-খণ্ডে যীশুর প্রেমবাণী প্রচার করার জন্য নাবিকদের সহযাত্রী হতেন ফ্রান্সিসকান ও ডমিনিকান সন্ন্যাসীগণ। তাঁরা প্রথমে শান্তো দোমিঙ্গো (Santo Domingo) দ্বীপে প্রথম খ্রীষ্টবাণী প্রচার করেন।

স্পেন ও পর্তুগালের মধ্যে রাজনৈতিক মনোমালিন্যের কারণে পোপ ৬ষ্ঠ আলেকজাণ্ডার আমেরিকা ভূ-খণ্ডের উপর একটি কাল্পনিক রেখা অংকন করলেন উত্তর থেকে দক্ষিণে। এই রেখার পশ্চিমাঞ্চলের দেশগুলি স্পেন ও পূর্বাঞ্চলের দেশগুলি পর্তুগালের উপর ন্যস্ত হয়। পোপ মহোদয় নব আবিষ্কৃত ভূ-খণ্ডে খ্রিস্টবাণী প্রচারার্থে মিশনারীদের প্রেরণ করেন। বিজ্ঞান, সাহিত্য ও গণশিক্ষা প্রবর্তনে তিনি ছিলেন তৎপর।

উত্তরে অবস্থিত বৃহত্তম দ্বীপ গ্রীণল্যাণ্ডে খ্রিস্টবাণী প্রচারিত হয়। সেখানকার অধিবাসীরা হলো উইকিং ও এস্কিমো।

ভৌগলিক আবিষ্কারের পর থেকে ইউরোপে শুরু হয় নবজাগরণ, যাকে বলা হয় রেনেসাঁ। নবজাগরণের পৃষ্ঠপোষকতা করেন পোপ ২য় জুলিয়াস।[১১৬]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, মধ্যযুগে অনেক সামাজিক গোড়ামি ও ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা ছিল। এ সব ভ্রান্ত ধারণা উপেক্ষা করে বিশ্ব সামনের দিকে এগিয়ে এসেছে। মানুষের মধ্যে বিদ্যানুশীলনের ব্যাপক আগ্রহ দেখা দেয়।

পরবর্তীতে মণ্ডলীতে অনেক 'সংস্কার আন্দোলন' দেখা দেয়। মণ্ডলীর সেই যুগকে বলা হয় 'সংস্কার আন্দোলনের' যুগ।[১১৭]

৩.৯৫ কল্যাণকর্ম সাধন

১৫২৮ খ্রিঃ সাধু যেরোম মহামারীর সময় দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত চিকিৎসাধীন মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি অনাথদের জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন ও তাদের

ভরণপোষণের জন্য সর্বস্ব বিক্রি কওে দেন। তিনি সমাঙ্কা নামক স্থানে ধর্মসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংঘের সদস্য সমাঙ্কিয়ান নামে পরিচিত। তারা ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদান, পল্লীবাসীদের তত্ত্বাবধান ও পথভ্রষ্টা মেয়েদের জন্য আশ্রম স্থাপনের ব্যবস্থা করেন।

একই সময়ে সাধু কাজেটান (St. Cajetan) তিয়েনেতে 'থিয়েটাইন' নামক ধর্মসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হাসপাতাল, ওরাটরি (প্রার্থনা, সম্মেলন ও খেলাধুলার স্থান) প্রতিষ্ঠা ও ধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।

১৫৩৫ খ্রিঃ ১৫ই আগষ্ট 'যেজুইট' অর্থাৎ 'যীশু সংঘ' নামে ধর্মসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন লয়োলার সাধু ইগ্নেসিয়াস (St. Ignatius of Loyla)। এই সংঘের অন্যতম সদস্য হলেন সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার ও সাধু রবার্ট বেলারমিন।

আঞ্জেলা মেরিচি (St. Angela Merici) 'উরসুলাইন' (Ursuline) নামক একটি মহিলা ধর্মসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এদের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো যুবতীদের তত্ত্বাবধান করা ও তাদের শিক্ষা দেওয়া।

কিশোরদের সুপরিচালনার জন্য ঈশ্বর সাধু ফিলিপ নেরি (St. Philip Neri) কে অনুপ্রাণিত করেন। তিনি 'ওরাটরী' (প্রার্থনা ও ক্রিয়া কেন্দ্র) নামে একটি সংঘ স্থাপন করেন।

প্রাচীন একটি ধর্মসংঘের নাম 'কার্মেল' সংঘ যার প্রতিষ্ঠা করেন আভিলার সাধ্বী তেরেজা (St. Teresa of Avila)। স্পেনের আভিলা শহরনিবাসী সাধ্বী তেরেজা এর সংস্কার করে আদর্শ কার্মেল ধর্মমঠ স্থাপন করেন। এছাড়াও তিনি নতুন নতুন মঠ প্রতিষ্ঠা করেন ও জ্ঞানগর্ভ ঐশতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি রচনা করেন।

প্রায় একই সময়ে ক্রেমোনা নিবাসী সাধু এ্যান্টনিমারীয়া জাকারিয়া (A.M. Zaccaria) পীড়িতদের সেবা, তরুণতরুণীদের শিক্ষদান ও ধর্মপ্রচারের জন্য মিলান নগরে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য একটি করে ধর্মসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন।

পীড়িতদের সেবাযত্ন করার জন্য কামিল্লাস লেল্লিসএকটি ধর্মসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এর সদস্যগণ কামিলিয়ান নামে পরিচিত।

স্পেন নিবাসী যোসেফ কালাসানসিয়াস পরিত্যক্ত ও দরিদ্র কিশোরদের শিক্ষাদীক্ষার জন্য 'পিয়ারিষ্ট'নামে একটি ধর্মসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন।

আরও একজন স্পেনীয় ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিল। তাঁর নাম 'ঈশ্বরভক্ত জন' (St. John of God)। তিনি হাসপাতালে সেবাকার্যের জন্য 'চিকিৎসালয়ের ভ্রাতৃগণ' নামে একটি ধর্মসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি গ্রানাদা নগরের ছোট্ট একটি ঘর ভাড়া নিয়ে পরিত্যক্ত দুরারোগ্য রোগীদের নিয়ে এসে সেবা করতেন।

জনসাধারণের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব কল্যাণ সাধনের জন্য সালেসএর সাধু ফান্সিস ও পলের সাধু ভিনসেন্টের ধর্মসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়।

সাধু ফান্সিসএর সন্ন্যাসিনী ধর্মসংঘের নাম 'ভিসিটেশন' অর্থাৎ জনগণের সাথে সাক্ষাৎকার। উক্ত সিষ্টারগণের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো সেবা ও শিক্ষাদান।

সাধু ভিনসেন্ট ফ্রান্সের রাণী মার্গারেটের নির্দেশ অনুসারে 'ভিন্সেসিয়ান'নামে একটি ধর্মসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এর অপর নাম মিশনসংঘ। ধর্ম সংঘটি প্যারিস নগরীতে লাজারিষ্ট নামক স্থানে গঠিত হয়। ধর্মব্রতীদের উদ্দেশ্য পল্লীবাসীদের দুঃখ-দুরবস্থা ও শিক্ষার অভাব দূর করে উন্নতি সাধন করা।

সাধু ভিনসেন্ট পরিত্যক্ত হতভাগ্য শিশুদের সেবা ও শিক্ষাদানের জন্য 'চ্যারিটি সিষ্টারবৃন্দ' (Sisters of Charity) বা দয়াব্রতী ভগিনীগণ নামে নারী ধর্মসংঘ গঠন করলেন।

সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী (J.M Vianney) দরিদ্র, অনাথ বালিকাদের জন্য আর্স পল্লীতে একটি আশ্রম ও একটি ধর্মসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 'কিউরে অব্ আর্স' নামে পরিচিত।

৩.৯৬ আমেরিকায় প্রেমধর্মের বীজবপন

ষোড়শ শতাব্দীকে খ্রিস্টবাণী প্রচারের 'স্বর্ণযুগ' বলা যেতে পারে।[১১৮] মূল ভূখণ্ড আমেরিকার অন্যান্য দেশ আবিষ্কৃত হওয়ার সাথে সাথে মিশনারীগণ সেখানে গিয়ে প্রেমধর্মের বীজ বপন করেন। ফ্রান্সিসকান, ডমিনিকান, আগষ্টিনিয়ান, যেজুইট প্রভৃতি ধর্মসংঘের সদস্যগণ প্রচারক্ষেত্রে উত্তম কৃষকের মতো প্রচারকার্যে উৎসাহী হন।

১৫০৮ খ্রিঃ সমতার ভিত্তিতে স্পেনকে মেক্সিকো, পেরু, কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, প্যারাগুয়ে ও ফিলিপাইন ও ১৫১৫ খ্রিঃ পোপ দশম লিও পর্তুগালকে আফ্রিকা, এশিয়া (যথা ভারত), মালয়েশিয়া, চীন, ইন্দোচীন ও ব্রাজিলের উপর ধর্মীয় কর্তৃত্ব দান করেন। দেশগুলোতে ধর্মপ্রচার করেন ফান্সিসকান, ডমিনিকান, আগষ্টিনিয়ান প্রচারকগণ। পরবর্তীকালে যাজন ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেন যেজুইটগণ। এক একটি ধর্মসংঘ পৃথকভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে 'মিশনক্ষেত্র' পরিচালনা করেন। মিশন ক্ষেত্র বলতে সেই সব অঞ্চল, স্থান বা দেশ বুঝায়, যেখানে খ্রিস্টমণ্ডলী সুপ্রতিষ্ঠিত নয়।

১৬২২ খ্রিঃ ২২ শে জুন পোপ ১৫শ গ্রেগরি 'ধর্ম সম্প্রসারণ' নামে একটি সংস্থা স্থাপন করেন। সংস্থাটি একজন কার্ডিনাল এর পরিচালনাধীন। কোন্ দেশে, কোন্ ধর্মসংঘ প্রচার, ধর্মীয় ও সমাজকল্যাণমূলক কর্ম সম্পাদন করবে, তা নির্ধারণ করা উক্ত সংস্থার দায়িত্বভুক্ত। ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে খ্রিস্টমণ্ডলী সুপ্রতিষ্ঠিত হলো এবং পূর্ণ উদ্যমে খ্রিস্টবাণী প্রচারিত হতে লাগলো।[১১৯]

৩.৯৭ দক্ষিণ আমেরিকায় প্রচারকদের আগমন

স্পেন ও পর্তুগালের দখলদারগণ ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ আমেরিকার সর্বত্র উপনিবেশ স্থাপন করে। তাদের সহযাত্রী ফান্সিসকান, ডমিনিকান, যেজুইট মিশনারিগণ ধীরপদক্ষেপে প্রত্যেকটি যাজনক্ষেত্রে বিদ্যালয়, গির্জা ও সেমিনারী প্রতিষ্ঠা করেন।[১২০]

ষোড়শ শতাব্দীর শেষাংশে যেজুইট মিশনারিগণ উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে, ব্রাজিল ঔপনিবেশিক অঞ্চলগুলিতে এক লক্ষাধিক কৃষককে কৃষি-উন্নয়নের কার্যে নিযুক্ত করেন।

যেজুইট পুরোহিত পিটার ক্লাভের ক্রীতদাসদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে তাদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার জন্য ৪৪ বছর তাদের সাথে বসবাস করে ধর্ম বিষয়ে তাদেরকে শিক্ষিত করে তোলেন। ডমিনিকান পুরোহিতগণ পেরু দেশে খ্রিস্টমণ্ডলী সুপ্রোথিত করেন।

সাধ্বী রোজা-ই আমেরিকাবাসীদের মধ্যে প্রথম সাধ্বী। রাজধানী 'লিমা' নগরে তার জন্ম। তিনি ডমিনিকান সন্ন্যাসিনী হয়ে দরিদ্রদের সেবা, প্রার্থনা, উপবাস ও প্রায়শ্চিত্ত করেন।

তারই সমসাময়িক সাধু মার্টিন পরেস ডমিনিকান ধর্মসংঘে যোগদান করে 'ব্রাদার' ধর্মব্রতীরূপে সংঘের নির্দিষ্ট বাধ্যতামূলক নিকৃষ্ট কাজকর্ম বিনীত অন্তরে সম্পাদন করতেন। তিনি রোগীদের সেবা করতেন ও দরিদ্রদের মাঝে রুটি বিতরণ করতেন।

৩.৯৮ উত্তর আমেরিকায় খ্রিস্টবাণী প্রচার

সপ্তদশ শতাব্দীতে উত্তর আমেরিকায় অর্থাৎ কানাডা, ফ্লোরিডা ও ক্যালিফোর্ণিয়ায় খ্রিস্টের প্রেমবাণী প্রচারিত হয়।[১২১] ফরাসী দখলদারগণ উত্তর আমেরিকায় সেন্ট লরেন্স নদীর মোহনায় কুইবেক নামক স্থানে উপনিবেশ গড়ে তোলে। এই অঞ্চলে প্রধান মিশনারীরা হলেন ফরাসী যেজুইট ধর্মব্রতীগণ। মিশনারীগণ কৃষি উন্নয়নকর্মে তাদের উদ্বুদ্ধ করেন।

৩.৯৯ আফ্রিকায় ধর্মসম্প্রসারণ

১৪৯৮ খ্রিঃ ভারতে আগমনের পূর্বে পর্তুগীজরা পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিল। পর্তুগীজ মিশনারিগণ স্বদেশীয় বণিকদের সঙ্গে আফ্রিকায় গিয়ে মরক্কো, কঙ্গোতে খ্রিস্টমণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করেন। তারা আবিসিনিয় (ইথিওপিয়া)তেও প্রেমবাণীর বীজ বপন করেন।

মাত্র উনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকায় মণ্ডলী সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[১২২]

৩.১০০ চীনদেশে সু-সমাচার প্রচার

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ডমিনিকান ও ফান্সিসকান প্রচারকগণ চীনের কামবালুক (Cambaluc), জাইটুন (Zaitun) ও পিকিং নগরে যাজন ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করেন। তখন মঙ্গোলীয় রাজবংশ চীনে রাজত্ব করছিল। এই রাজবংশ খ্রিস্টধর্ম বিস্তারের কাজ সমর্থন করতো।

১৫৫০ খ্রিঃ ডমিনিকান ফাদার যাস্পার দ্য ক্রুজ (Jasper de Cruz) ও যেজুইট ফাদার রিচ্চি ও অন্যান্য প্রচারকগণ চীন দেশীয় খ্রিস্টমণ্ডলীকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গড়ে তোলেন।[১২৩]

ফাদার মাত্তেও রিচ্চি ১৫৭৮ খ্রিঃ মিশনারীরূপে চীন দেশে পর্দাপণ করেন। তিনি একজন ইটালীয় যেজুইট এবং একজন বৈজ্ঞানিক জ্যোতিষী ও সাহিত্যিক ছিলেন।

১৬৯৬ খ্রিঃ চীনে দীক্ষিত চৈনিক খ্রিস্টানদের সংখ্যা ছিল সর্বোচ্চ।[১২৪]

৩.১০১ জাপানে সু-সমাচার প্রচার

১৫৪৯ খ্রিঃ ফ্রান্সিস জেভিয়ার জাপানে সর্বপ্রথম খ্রিস্টের মুখনিঃসৃত প্রেমবাণী প্রচার করেন।[১২৫] স্বল্পকালের ব্যবধানে যেজুইট ও স্থানীয় প্রচারকগণের প্রচেষ্টায় খ্রিস্টভক্তদের সংখ্যা সহস্রাধিক হয়। উত্তরকালে ফান্সিসকান, ডমিনিকান ও আগষ্টিনিয়ান মিশনারিগণ প্রচারকাজে যোগদান করেন। ১৫৯৭ খ্রিঃ খ্রিস্টভক্তদের সংখ্যা দাড়ায় তিন লক্ষাধিক। জাপান শাসক এই চিন্তা করে ভীত হয়ে উঠেছিলেন যে, খ্রিস্টধর্ম প্রচারের অবকাশে বিদেশী শক্তি জাপানকে অধিকার করতে পারে। সুতরাং সেখানে খ্রিস্টবাণী প্রচার নিষিদ্ধ হয় এবং দুই শতাব্দী ব্যাপী খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধে অত্যাচার চলতে থাকে।

দুইশত বছর পর সেখানে প্রেমবাণী প্রচারের অনুমতি দেওয়া হয়। তখন খ্রিস্টভক্তের সংখ্যা ছিল ৫০,০০০। এই সময়ে কোরিয়াতেও (Korea) খ্রিস্টমণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হয়।[১২৬]

৩.১০২ ফিলিপাইনে খ্রিস্টবাণী প্রচার

১৫৬৪ খ্রিঃ স্পেন যখন ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ দখল করে, তখন আগষ্টিনিয়ান, ফান্সিসকান, ডমিনিকান ও যেজুইট ধর্মপ্রচারকগণ ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে মঙ্গলসমাচার প্রচার করেন।[১২৭]

সেখানে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে খ্রিস্টভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং অদ্যাবধি তারা অধিকাংশই নিষ্ঠাবান কাথলিক। মিশনারীগণ স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে নিপীড়িত জনসাধারণের পক্ষাবলম্বন করেন। তদুপরি প্রচারকগণ সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চায় উন্নতি সাধন করেন।
গ্যালিলিও গ্যালিলেই দূরবীক্ষণ আবিষ্কারক বৈজ্ঞানিক ও জ্যোতির্বিদ (১৬৪২ খ্রিঃ)। তিনি তাঁর বাস্তবমুখী জীবন দর্শনের মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, বস্তুকেন্দ্রিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন হয়েও তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত কাথলিক ধর্মানুরাগী।[১২৮] তিনি নিজ ধর্মে গভীর আস্থাবান ছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে ফ্রান্সে গণজাগরণ দেখা যায়, তা 'ফরাসী বিপ্লব'নামে পরিচিত। এ সময় দার্শনিক ও পণ্ডিতগণ জীবনদর্শন প্রচারে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রুশো, মন্তকিয়ে, দিদেরো, ভলতেয়র প্রমুখ দার্শনিক ও চিন্তানায়কগণ।

ফরাসী বিপ্লবের মুখ্য কারণগুলি ছিল ফরাসী রাজগণের স্বৈরতান্ত্রিকতা, আমলাতন্ত্রের স্বার্থপরতা, অনাচার ও বহুশ্রুত ও বিদগ্ধ ফরাসী দার্শনিকদের উত্তেজনামূলক তত্ত্ব প্রচার।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পৃথিবী যুক্তিবাদ ও বিপ্লবের যুগ নামে পরিচিত। ফ্রান্সের বিপ্লবীগণ সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার পর ১৮৪৮ খ্রিঃ ইটালিতেও তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে ব্যাপক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ১৮৩১ খ্রিঃ ইটালীতে ফরাসী বিপ্লবের প্রেরণায় এক নতুন গণবিপ্লব দেখা দিল। এই বিপ্লবের নেতা ছিলেন দেশপ্রেমিক ও লেখক যোসেফ মাৎসিনি। তিনি রাজ্যের অনুপযোগী আদালত ও বিচারবিধি এবং অপ্রচলিত শাসন প্রথার সংস্কার করলেন। ভ্যাটিকান ভবনে তিনি ঐতিহ্যের স্মারক নিয়ে একটি যাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ইটালীতে দশমিক মুদ্রা ব্যবস্থার প্রচলন হয়। চীন, উত্তর আমেরিকা, ভারত, ইথিওপিয়া প্রভৃতি দেশে খ্রিস্টবাণী প্রচার করার জন্য মিশনারী প্রেরণ করা হয়।[১২৯]

ইটালীর পিয়েডমন্ত প্রদেশে অবস্থিত টুরিন নগরে ইটালীর একত্রীকরণের যুগে ৩জন মহাসাধক ব্যক্তির কর্মক্ষেত্র রূপে প্রশংসিত হয়। তাদের মধ্যে একজন হলেন ফাদার জন বস্কো (ডন বস্কো)। নয় বছর বয়সেই তিনি দীন, আতুর ও অনাথ কিশোরদের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করবেন বলে সংকল্প গ্রহণ করেন।

১৮৪১ সালে জন বস্কো পুরোহিত পদে অভিষিক্ত হয়ে সাধারণের কাছে 'ডন বস্কো' নামে পরিচিত হন। পুরোহিত হয়ে তিনি পরিত্যক্ত, অনাথ ও কোমলমতি কিশোরদের আশ্রয় দানের উদ্দেশ্যে 'ওরাটরি' (ধর্মশিক্ষা দান, খেলাধুলা করার ও বাসযোগ্য গৃহ) স্থাপন করেন।

ডন বস্কো তাঁর সহকর্মীদের সমন্বয়ে একটি ধর্মসংঘ গঠন করেন। তার সংগঠনের নাম 'সালেসীয় (Salesian) ধর্মসংঘ'।

প্রতিষ্ঠাতা পিতা ডন বস্কোর জীবদ্দশা থেকে অদ্যাবধি সালেসীয় সংঘের ধর্মব্রতী সদস্যগণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছাত্রাবাস, বিদ্যালয়, শিল্পকারখানা, কলেজ, অনাথাশ্রম প্রভৃতি সেবা ও উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে অসংখ্য কিশোরের আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও দৈহিক উন্নতি সাধন করেছেন।

অপরদিকে কিশোরীদের সর্বাত্মক শিক্ষায় আলোকিত করার জন্য সাধ্বী মেরী মাজারেল্লোর সহযোগিতায় 'খ্রিস্টভক্তের সহায় মারীয়ার কন্যাগণ' সংঘ প্রতিষ্ঠিত করেন। এ সংঘের ধর্মব্রতিনীগণ বাণীপ্রচারে ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করেন। সম্প্রতি উভয় সংঘের কর্মোদ্যোগী অদম্য সদস্যগণ পৃথিবীর সর্বত্র পঠনপাঠনের উপযোগী সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কারিগরী বিদ্যালয়, বোর্ডিং স্কুল ও শিক্ষাদানের অপরাপর উপযোগী প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে থাকেন।

ডন বস্কো শুধু দক্ষ শিল্পী ও কর্মী ছিলেন না; তিনি ছিলেন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও লেখক। তিনি মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনের উপযোগী বহু সংখ্যক পুস্তক-পুস্তিকা ও গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেছেন।[১৩০]

(২) St. Joseph Cafasso/সাধু যোসেফ বাল্যকাল থেকেই 'ক্ষুদ্র সাধক' নামে পরিচিত। তিনি ডন বস্কোর আধ্যাত্মিক পরিচালক ছিলেন। পুরোহিতপদে ব্রতী হয়ে তিনি গভীর ধর্মজ্ঞান ও অকৃত্রিম ধর্মানুরাগের ফলে পুরোহিত প্রার্থীদের অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। পুরোহিতদের ধর্মজ্ঞান বৃদ্ধি করার জন্য তিনি তাদের উপযোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন।

(৩) সাধক যোসেফ কত্তোলেঙ্গো যখন দেখলেন দরিদ্র রোগীরা হাসপাতালে স্থান পাচ্ছে না, তখন একটি ঘর ভাড়া করে তিনি সেখানে আশ্রয়হীন রোগীদের আশ্রয় দেন। ফাদার কত্তোলেঙ্গো একটি নার্সিং সংস্থা গঠন করেন ও সেবাকার্যের জন্য একটি জমি ক্রয় করেন। বর্তমানে একটি সুবৃহৎ হাসপাতাল সেখানে বিরাজমান। সেখানে বৎসরে দশ সহস্রাধিক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীর সেবা শুশ্রূষা করা হয়। হাসপাতালটি 'ঈশ্বরের দয়ার ক্ষুদ্র গৃহ' নামে পরিচিত।[১৩১]

উনবিংশ শতাব্দীতে ইটালীর উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত লভেরে (Lovere) সাধ্বী বার্থালোমেয়া কাপিতানিও (St. Bartholomea Capitanio) ও সাধ্বী ভিনচেঞ্জা জেরোসা (St. Vichenca Jerosa) নামে দুজন যুবতী আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁরা সমগ্র পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষের মধ্যে আশ্বাস, সান্ত্বনা ও কল্যাণবারি সিঞ্চন করেছেন।

বার্থালোমেয়া বিদ্যার্জনে সার্থকতা অর্জন করার পর ছাত্রীদের ধর্মীয় ও নৈতিক বিষয়ে প্রবুদ্ধ করতেন। এছাড়াও তিনি রোগক্লিষ্ট মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করতেন। ১৮৩২ খ্রিঃ ২১ নভেম্বর তিনি 'Sisters of Charity' সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এর অন্য এক নাম 'মারীয়া বাম্বিনা'। সংঘটির মূল উদ্দেশ্য ছিল শিশু, অনাথ, দুঃস্থদের তত্ত্বাবধান এবং বৃদ্ধাশ্রম, ছাত্রাবাস, হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয় ও শিক্ষা উপযোগী সর্বস্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা।[১৩২]

দীর্ঘ দিন রাজনৈতিক সংঘর্ষের কারণে ইটালীতে যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিল তখন ফ্রাঞ্চেসকো কাব্রিনি (Francesco Cabrini) নামে এক যুবতী অভাবহেতু উদ্বাস্তু ও আমেরিকার অপরাপর দুঃস্থ পরিত্যক্ত জনগণের সেবা ও তত্ত্বাবধানে ব্রতী হন। বিশপের পরামর্শ অনুযায়ী ফ্রাঞ্চেসকো 'যীশুর পবিত্র হৃদয় মিশনারী' নামে একটি ধর্মসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্কুল, হাসপাতাল, অনাথাশ্রম, বৃদ্ধাশ্রম ও শিশু বিদ্যালয় স্থাপন করেন। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে তাঁর প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দুইশতাধিক অতিক্রম করেছিল। আমেরিকা ছাড়াও মাদার কাব্রিনির ধর্মসংঘ ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও বহু সংখ্যক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে থাকে।

১৮৭৮ খ্রিঃ ত্রয়োদশ লিও পোপ পদের জন্যনির্বাচিত হলেন। পোপ লিওর আধ্যাত্মিক পরিচালনার কালকে 'শান্তির যুগ' বলে অভিহিত করা হয়।[১৩৩]

১ম বিশ্বযুদ্ধ : ১ম বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল স্থলে, জলে ও অন্তরীক্ষে। ১৯১৪ খ্রিঃ ২৮ জুলাই শুরু হয় ও এর পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯১৮ খ্রিঃ ১১ নভেম্বর।[১৩৪]

২য় বিশ্বযুদ্ধ : (১৯৩৯ - ৪৫ খ্রিঃ) ১৯৩১ খ্রিঃ বিপুল ধ্বংসাত্মক বিপর্যয়ের প্রারম্ভে রোম নগরীতে পোপপদে অধিষ্ঠিত হন দ্বাদশ পিউস। তিনি দীন-দুঃখীর প্রতি সাহায্যের হস্ত সম্প্রসারিত করেন। ১৯০৩ খ্রিঃ পোপের একান্ত প্রচেষ্টায় রোমের অধিকাংশ অঞ্চল রক্ষা পায়। তাই নাগরিকগণ পোপকে 'নগর রক্ষী' বলে সম্বোধন করেন।[১৩৫] ১৯৫৮ খ্রিঃ ৯ই অক্টোবর পোপ ইহলোক ত্যাগ করেন।

১৯৫৮ খ্রিঃ ২৮ অক্টোবর পোপপদে আসীন হন ত্রয়োবিংশ জন। তিনি কারাগারে আসামীদের সাথে দেখা করতেন ও তাদের সান্ত্বনা দিতেন। হাসপাতালে রোগীদেরও তিনি সান্ত্বনা দিতেন। তিনি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সকলকে সক্রিয় হতে অনুরোধ করেন। শান্তিকামী পোপ হিসেবে ১৯৬০ খ্রিঃ তিনি 'শান্তি পুরস্কার' লাভ করেন।[১৩৬] ১৯৬৩ খ্রিঃ ৩রা জুন তাঁর মৃত্যু হয়।

১৯৬৩ খ্রিঃ ২১শে জুন পোপপদে অভিষিক্ত হন ৬ষ্ঠ পল। তিনি চারুকলা ও বিজ্ঞান শিল্পে উন্নতির জন্য একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি যেসব দেশ সফর করতেন, সেখানকার মাটি চুম্বন করে তিনি দেশটিকে সম্মানিত করতেন।[১৩৭] তিনি বিভিন্ন দেশে গিয়ে জনগণকে আশীর্বাদ করতেন। ১৯৭৮ খ্রিঃ ২৫ আগষ্ট তিনি দেহত্যাগ করেন।

দীর্ঘ ৪৫৫ বছর ধরে পোপপদ অলংকৃত করে আসছিল ইটালীয়রা। ইটালীর গণ্ডি অতিক্রম করে পোপ পদে অধিষ্ঠিত হন পোল্যাণ্ডের একজন কার্ডিনাল। তিনি ২৬৫ তম পোপ। তার প্রকৃত নাম চার্লস ওয়জটিনা (Charles Wsiyla) তিনি নতুন নাম ধারণ করেন '২য় জনপল'। ১৯৭৮ খ্রিঃ ২২শে অক্টোবর পোপ পদে অভিষিক্ত হয়ে তিনি অত্যাচারিত মানুষের মানবিক অধিকার

অর্জনের সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। পোল্যাণ্ড থেকে কমিউনিজমের বিদায়ে তাঁর ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। তিনি বিশ্বের ১৩০টি দেশ পরিক্রমা করেছেন। তাঁর বলিষ্ঠ ও সুদৃঢ় পরিক্রমা কালে খ্রিস্টের বাণী তিনি এমনভাবে বিশ্বময় বিস্তার করেছেন যে ক্ষেত্রে তিনিই হলেন ইতিহাস সৃষ্টিকারী ধর্মগুরু। ১৯৮১ সালে মেহমেট আলি আকসা কর্তৃক গুলিবিদ্ধ হয়েও তাঁর আততায়ীকে তিনি ক্ষমা দান করেছিলেন। তিনি ছিলেন ৩য় দীর্ঘতম মেয়াদের জনপ্রিয় পোপ।[১৩৮]

বর্তমান পৃথিবীতে কাথলিক ধর্মগুরু পোপের ভূমিকা যে সার্বিক ক্ষেত্রে কত গুরুত্বপূর্ণ ও সমগ্র বিশ্বে তিনি যে তাঁর কর্মধারার মাধ্যমে কতখানি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ববাসী তা উপলব্ধি করেছে। ২০০৫ খ্রিঃ ২রা এপ্রিল জনপল পরলোকগমন করেন।

২০০৫ খ্রিঃ ১৯ এপ্রিল পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট পোপপদে অভিষিক্ত হন। তিনি ছিলেন ২৬৬তম পোপ।

কাথলিক মণ্ডলী একবিংশ শতাব্দীতে অব্যাহত গতিতে তার কল্যাণ কর্ম করে চলেছে। এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় বহিঃশত্রু, অভ্যন্তরীণ প্রতিকূল শক্তি মাতা মণ্ডলীর প্রভূত ক্ষতি সাধন করতে সচেষ্ট ছিল ও আছে। কিন্তু সর্বপ্রকার অপচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবেশিত হয়েছে। পক্ষান্তওে শত্রুর আক্রমণ যত তীব্র হয়, কাথলিক মণ্ডলীও তদনুপাতে শক্তিশালী হতে থাকে।[১৩৯] মাতা মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা মুক্তিদাতা যীশু খ্রিস্টের বাণী চিরকাল শাশ্বত থাকবে। কাথলিক মণ্ডলীর নিরলস প্রচেষ্টায় বিশ্ববাসী উত্তরোত্তর সচেতন হয়ে পৃথিবীতে ধর্মবিশ্বাস ও সম্প্রীতি প্রবর্তনের জন্য বিভিন্ন কল্যাণকর সংস্থা গঠন করছে। তারা উপলব্ধি করছে যে, ধর্মবিস্তারের কাজকর্ম শুধু ধর্মমঠাশ্রয়ী, ধর্মানুরাগী সন্ন্যাস-সন্ন্যাসিনীদের জন্য নয়, তাঁরাও বিশ্ববাসীর সর্বাত্মক কল্যাণকর্মে আত্মনিয়োগ করে থাকেন।[১৪০]

মানুষ আত্মিক কর্মে অপেক্ষাকৃত সচেতন ও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। শুধু ঈশ্বরের প্রতি নয়, কিন্তু প্রতিবেশীর প্রতিও প্রেম-ভালবাসা প্রদর্শনের ন্যায় খ্রিস্টীয় কর্তব্যের কথা মানুষ বেশি বোঝে।

প্রোটেষ্টান্ট মতাবলম্বী প্রখ্যাত ইংরেজ ইতিহাসবিদ ও রাজনীতি বিশারদ টমাস ম্যাকলি (T. Macauly) লিখেছেন, 'রোমান কাথলিক মণ্ডলী অনির্বাণ দীপ্তিতে তখনও জ্বলতে থাকবে যখন দূরবর্তী নিউজিল্যাণ্ড থেকে আগত কোন পর্যটক নির্জন পরিবেশে ক্ষয়িষ্ণু লন্ডন সেতুর খিলানের উপর দণ্ডায়মান হয়ে মহোপাসনালয় সেন্ট পল গির্জায় ধ্বংসাবশেষের চিত্র অঙ্কন করবে'।[১৪১]

৩.১০৩ উপসংহার

পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা সবই সৃষ্টিকর্তার দান। তিনি সর্বশক্তিমান। অনাদিকাল থেকে তিনি আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। জগতের প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টির পেছনে একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে। আমরা তাঁকে স্মরণ করতে পারি সেবা, ধ্যান ও ভালোবাসার মাধ্যমে। জীবনে চলার জন্য তিনি বিভিন্ন পথ দেখিয়েছেন। তার মধ্য থেকে এমন একটি পথ আমাদের বেছে নিতে হবে যাতে আমরা সহজেই আমাদের উৎসের কাছে পৌঁছতে পারি। যীশুখ্রিস্ট নিজেই বলেছেন, "আমি পথ, আমিই সত্য, আমিই জীবন। আমাকে পথ করে না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না" (যোহন : ১৪:৬)।

আমাদের পরিত্রাণ সাধন করার জন্য যিশুখ্রিস্ট এ জগতে এসেছেন। তিনি অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করে মৃত্যুবরণ করেছেন; মৃত্যুর পর পুনরুত্থান করেছেন এবং স্বর্গারোহণ করেছেন। ঈশ্বর দয়ালু, পবিত্র ও ক্ষমাশীল। তিনি আমাদের এত ভালোবাসেন যে, এত পাপ করার পরও তিনি মানুষকে চিরতরে পরিত্যাগ করেননি। বরং প্রতি ক্ষেত্রে তাকে উদ্ধার করেছেন। পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা দেখতে পেয়েছি যে, খ্রিস্টমণ্ডলী প্রতিনিয়তই সেবা কাজের মধ্য দিয়ে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে চলেছে। তার এই উদার সেবাকাজ তাকে অধিকতর মহিমান্বিত করে তুলেছে।

আমরা আরো দেখতে পাই যে, যীশু তাঁর আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর মুক্তিদায়ী কাজের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি তাঁর প্রেরিতশিষ্যদের উপর সু-সমাচার প্রচার করার দায়িত্ব, ক্ষমতা ও অধিকার দিয়েছিলেন। প্রেরিতশিষ্যেরা তাঁদের সাধ্যানুসারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গিয়ে প্ররণকর্মী

হিসাবে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছেন। এভাবে খ্রিস্টমণ্ডলীও গরীব-দুঃখীদের প্রেমপূর্ণ সেবাযত্ন দিয়ে সারা পৃথিবীতে প্রেরণকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন।

আমরা আরো দেখতে পাই যে, গোড়ার দিকে খ্রিস্টভক্তদের উপর নানা ভাবে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার-নির্যাতন চলতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা সব সময় ঈশ্বরের প্রশংসা ও গুণগান করতো।

মণ্ডলীর ইতিহাস থেকে আমরা জানি যে, পিতর ছিলেন খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রথম পোপ এবং পল ছিলেন খ্রিস্টবাণী প্রচারের নির্ভীক অগ্রদূত। তাঁরা রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ ক'রে খ্রিস্টমণ্ডলীর ভিত্তি রচনা করেছেন। তাঁরা খ্রিস্টের পক্ষ নিয়ে প্রাণপণ সংগ্রাম করেছিলেন। খ্রিস্টের উপর বিশ্বাস রেখে তাঁরা বিশ্ববাসীর কল্যাণকর্মে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অনেক প্রেরণকর্মী তাদের নিজেদের জীবনকে খ্রিস্টের নামে সঁপে দিয়ে, অনেক ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে সেবা ও ভালোবাসার মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে আশ্বাস, সান্ত্বনা ও কল্যাণবারি সিঞ্চন করেছেন। তাদের মহান ব্রত প্রশংসার দাবী রাখে।

তথ্য সূত্র :

[১] প্রদীপ (Fr.Lucio), অনুবাদক, "নতুন মানুষের অবির্ভাব", জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যশোর, ৫ম প্রকাশ, ২০১০ খ্রিঃ। পৃষ্ঠা নং ২৩

[২]ঐ পৃষ্ঠা নং ৮

[৩] এল. গমেজ, সিঃ শিখা এল, সিএসসি; কস্তা, ফাঃ অনল টেরেন্স, সিএসসি; টি. গনসালভেজ, ফাঃ অসীম, সিএসসি; কস্তা, রবার্ট টমাস, "খ্রিস্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা', ৮ম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা। পৃষ্ঠা নং ২৩

[৪] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৩

[৫] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৩

[৬] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৪

[৭] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৪

[৮] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৪

[৯] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৪

[১০] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৪-২৬

[১১] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩৪-৩৫

[১২] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩৮

[১৩] ছোটদের বাইবেল, পৃষ্ঠা নং ২৩৭

[১৪] মঙ্গলবার্তা পৃষ্ঠা নং ১৯১

[১৫] ঐ, পৃষ্ঠা নং ১৯১

[১৬] ঐ, পৃষ্ঠা নং ১৯২

[১৭] ছোটদের বাইবেল, পৃষ্ঠা নং ৪৩

[১৮] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৪৪-৪৫

[১৯] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৪৫

[২০] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৪৬

[২১] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৪৬

[২২] ঐ, পৃষ্ঠা নং ১৯৬

[২৩] ঐ, পৃষ্ঠা নং ১৯৭

[২৪] এল. গমেজ, সিঃ শিখা এল, সিএসসি; কস্তা, ফাঃ অনল টেরেন্স, সিএসসি; টি. গনসালভেজ, ফাঃ অসীম, সিএসসি; কস্তা, রবার্ট টমাস, "খ্রিস্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা', ৮ম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা। ৮ম শ্রেণি, পৃষ্ঠা নং ৬৫

[২৫] মঙ্গলবার্তা পৃষ্ঠা নং ২০৫-২০৬ পৃঃ

[২৬] এল. গমেজ, সিঃ শিখা এল, সিএসসি; কস্তা, ফাঃ অনল টেরেন্স, সিএসসি; টি. গনসালভেজ, ফাঃ অসীম, সিএসসি; কস্তা, রবার্ট টমাস, "খ্রিস্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা', ৮ম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা। ৮ম শ্রেণি, পৃষ্ঠা নং ৩৬

[২৭] ছোটদের বাইবেল, পৃষ্ঠা নং ৭১

[২৮] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৭৩

[২৯] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৭৩-৭৪

[30] কস্তা, ফাদার বেঞ্জামিন, সিএসি এবং কুইয়া সিঃ ফিলোমিনা, সিএসসি, "খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা" ৯ম-১০ম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড, ঢাকা। পৃষ্ঠা নং ৭১

[31] ছোটদের বাইবেল, পৃষ্ঠা নং ৭৮

[32] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৭৯

[33] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৮০

[34] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৮০

[35] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৮১

[36] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৮৩

[37] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৮৪

[38]এল. গমেজ, সিঃ শিখা এল, সিএসসি; কস্তা, ফাঃ অনল টেরেন্স, সিএসসি; টি. গনসালভেজ, ফাঃ অসীম, সিএসসি; কস্তা, রবার্ট টমাস, "খ্রিস্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা', ৫ম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা। পৃষ্ঠা নং ৪৪

[39] কস্তা, ফাদার বেঞ্জামিন, সিএসি এবং কুইয়া সিঃ ফিলোমিনা, সিএসসি, "খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা" ৯ম-১০ম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড, ঢাকা। পৃষ্ঠা নং ৮

[40] "আমি পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি" পৃষ্ঠা নং ২১১

[41] ঐ, পৃষ্ঠা নং ২৩৫

[42] ঐ, পৃষ্ঠা নং ২৩৫

[43] ঐ, পৃষ্ঠা নং ২৪৩

[44] ঐ, পৃষ্ঠা নং ২৪৪

[45] ঐ, পৃষ্ঠা নং ২৪৪

[46] ঐ, পৃষ্ঠা নং ২৪৪-২৪৫

[47] ঐ, পৃষ্ঠা নং ২৬২

[48] ঐ, পৃষ্ঠা নং ২৬২

[49] ঐ, পৃষ্ঠা নং ২৬২

[50] ঐ, পৃষ্ঠা নং ২৬৩

[51] কলুস্‌সি, ফাঃ লুচানো, এসডিবি (ভিকার জেনারেল), "খ্রীষ্ট মণ্ডলীর ইতিহাস", ৪র্থ সংস্করণ, সেন্ট যোসেক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট অফ প্রিন্টিং, কৃষ্ণ নগর, নদীয়া, (পঃ বঙ্গ, ১৫) আগষ্ট, ২০০৫খ্রিঃ। পৃষ্ঠা নং ২

[52] ঐ, পৃষ্ঠা নং ২

[53] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৩

[54] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৪

[55] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৫

[56] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৫

[57] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৫

[58] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৭

[59] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৭

[60] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৮

[61] ঐ, পৃষ্ঠা নং ১০

[62] ঐ, পৃষ্ঠা নং ১০

[63] ঐ, পৃষ্ঠা নং ১০

[64] ঐ, পৃষ্ঠা নং ১০

[65] ঐ, পৃষ্ঠা নং ১২
[66] ঐ, পৃষ্ঠা নং ১৪
[67] ঐ, পৃষ্ঠা নং ১৬
[68] ঐ, পৃষ্ঠা নং ২১
[69] ঐ, পৃষ্ঠা নং ২৩
[70] ঐ, পৃষ্ঠা নং ২৩
[71] ঐ, পৃষ্ঠা নং ২৪
[72] ঐ, পৃষ্ঠা নং ২৪
[73] ঐ, পৃষ্ঠা নং ২৫
[74] ঐ, পৃষ্ঠা নং ২৮
[75] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৩০
[76] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৩১
[77] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৩৪
[78] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৪০
[79] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৪৪
[80] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৪৭
[81] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৪৮
[82] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৫২
[83] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৫৬
[84] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৫৬
[85] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৫৮
[86] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৬০
[87] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৬১
[88] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৬১
[89] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৬২
[90] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৬৩
[91] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৬৪
[92] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৬৫
[93] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৬৭
[94] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৬৯
[95] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৬৯
[96] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৭০
[97] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৭১
[98] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৭৪
[99] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৭৮
[100] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৮০
[101] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৮১
[102] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৮৩
[103] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৮৫
[104] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৮৯
[105] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৯৩
[106] ঐ, পৃষ্ঠা নং ৯৯
[107] ঐ, পৃষ্ঠা নং ১০১
[108] ঐ, পৃষ্ঠা নং ১০২
[109] ঐ, পৃষ্ঠা নং ১০৩
[110] ঐ, পৃষ্ঠা নং ১০৮
[111] ঐ, পৃষ্ঠা নং ১০৯
[112] ঐ, পৃষ্ঠা নং ১২৫
[113] ঐ, পৃষ্ঠা নং ১২৭
[114] ঐ, পৃষ্ঠা নং ১২৮
[115] ঐ, পৃষ্ঠা নং ১৪৬
[116] ঐ, পৃষ্ঠা নং ১৪৯

[117] ঐ, পৃষ্ঠা নং ১৫০
[118] ঐ, পৃষ্ঠা নং ১৭৫
[119] ঐ, পৃষ্ঠা নং ১৭৫
[120] ঐ, পৃষ্ঠা নং ১৭৫
[121] ঐ, পৃষ্ঠা নং ১৭৬
[122] ঐ, পৃষ্ঠা নং ১৭৭
[123] ঐ, পৃষ্ঠা নং ১৭৭
[124] ঐ, পৃষ্ঠা নং ১৭৭
[125] ঐ, পৃষ্ঠা নং ১৭৮
[126] ঐ, পৃষ্ঠা নং ১৭৮
[127] ঐ, পৃষ্ঠা নং ১৭৮
[128] ঐ, পৃষ্ঠা নং ১৭৮
[129] ঐ, পৃষ্ঠা নং ১৯৬
[130] ঐ, পৃষ্ঠা নং ২১৮-২২০
[131] ঐ, পৃষ্ঠা নং ২২১
[132] ঐ, পৃষ্ঠা নং ২২২
[133] ঐ, পৃষ্ঠা নং ২২৫
[134] ঐ, পৃষ্ঠা নং ২২৭
[135] ঐ, পৃষ্ঠা নং ২৩৬
[136] ঐ, পৃষ্ঠা নং ২৩৮
[137] ঐ, পৃষ্ঠা নং ২৩৯
[138] ঐ, পৃষ্ঠা নং ২৪২
[139] ঐ, পৃষ্ঠা নং ২৪৩
[140] ঐ, পৃষ্ঠা নং ২৪৪
[141] ঐ, পৃষ্ঠা নং ২৪৪

গ্রন্থপঞ্জি

❖ প্রদীপ (Fr.Lucio), অনুবাদক, "নতুন মানুষের অবির্ভাব", জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যশোর, ৫ম প্রকাশ, ২০১০ খ্রিঃ।

❖ বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, "কাথলিক মন্ডলীর ধর্ম শিক্ষা", প্রথম প্রকাশ (নিখিল সাধু সাধ্বীর মহাপর্ব), ১লা নভেম্বর, জুবিলীবর্ষ-২০০০ খ্রিঃ

❖ ছোটদের বাইবেল (পুরাতন ও নতুন নিয়মের কাহিনী), ৩য় সংস্করণ, ৩১ মার্চ, ২০০২ খ্রিঃ বর্ষ।

❖ এল. গমেজ, সিঃ শিখা, (সি.এস.সি.), কস্তা, ফাঃ অনল টেরেন্স (ডিসিএসসি), টি. গনসালভেজ, ফাঃ অসীম (সি.এস.সি), কস্তা, রবার্ট টমাস, "খ্রিস্ট ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা", ৭ম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

❖ এল. গমেজ, সিঃ শিখা, (সি.এস.সি.), কস্তা, ফাঃ অনল টেরেন্স (ডিসিএসসি), টি. গনসালভেজ, ফাঃ অসীম (সি.এস.সি), কস্তা, রবার্ট টমাস, "খ্রিস্ট ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা", ৮ম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

❖ কলুস্‌সি, ফাঃ লুচানো, এস ডি.বি (ভিকার জেনারেল), "খ্রীষ্ট মন্ডলীর ইতিহাস", ৪র্থ সংস্করণ, সাধু যোসেক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট অফ প্রিন্টিং, কৃষ্ণ নগর, নদীয়া, (পঃ বঙ্গ, ১৫) আগষ্ট, ২০০৫খ্রিঃ।

❖ কস্তা, ফাদার বেঞ্জামিন, সি এ.সি এবং কুইয়া মিঃ ফিলোমিনা সি.এস.সি, "খ্রিস্ট ধর্ম শিক্ষা" ৯ম-১০ম শ্রেণী, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

❖ এল. গমেজ, সিঃ শিখা, (সি.এস.সি.), কস্তা, ফাঃ অনল টেরেন্স (ডিসিএসসি), টি. গনসালভেজ, ফাঃ অসীম (সি.এস.সি), কস্তা, রবার্ট টমাস, "খ্রিস্ট ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা", ৫ম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতবর্ষে খ্রিস্টমণ্ডলী প্রতিষ্ঠায় কাথলিক মিশনারীদের অবদান

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৪.১	ভূমিকা	১৯৭
৪.২	ভারতে প্রথম খ্রিস্টবাণী প্রচার	১৯৭
৪.৩	সাধু বার্থলোমেয়ো	১৯৯
৪.৪	পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও খ্রিস্টীয় সম্প্রদায় গঠন	১৯৯
৪.৫	প্রাচ্যদেশীয় রীতিতে খ্রিস্টীয় উপাসনা	২০০
৪.৬	ভারতে পর্তুগীজদের আগমন	২০৪
৪.৭	সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার	২০৮
৪.৮	সম্রাট আকবরের ফরমান	২০৯
৪.৯	মিশনারীদের আগমন	২০৯
৪.১০	যেজুইটদের আগমন	২১০
৪.১১	সম্রাট আকবরের রাজসভায় যেজুইট যাজকগণ	২১১
৪.১২	আকবরের দরবারে প্রেমবাণী প্রচার	২১১
৪.১৩	আগস্টিনিয়ান ধর্মসংঘের যাজকদের আগমন	২১৪
৪.১৪	পূর্ববঙ্গে গমন	২১৫
৪.১৫	যেজুইটদের পুনরাগন	২১৫

৪.১৬ পূর্ববঙ্গে যশোহর রাজ্য ২১৬

৪.১৭ বাকলা (বরিশাল/বাখরগঞ্জ) ২১৬

৪.১৮ শ্রীপুর ২১৭

৪.১৯ চট্টগ্রাম ও দিয়াঙ্গা ২১৭

৪.২০ ডমিনিকান সংঘের যাজকগণ ২১৮

৪.২১ ঢাকা জেলায় খ্রিস্টবাণী প্রচার ২২১

৪.২২ কাথলিক মণ্ডলীর পুরোহিতগণ ২২২

৪.২৩ বঙ্গদেশে ভিকারিয়েট বিভক্ত ২২৬

৪.২৪ বঙ্গদেশে ভিকারিয়েট উপ-অঞ্চলে বিভক্ত ২২৬

৪.২৫ পালকীয় সফর (বিশপ অলিফ) ২২৮

৪.২৬ পশ্চিমবঙ্গ ধর্মাঞ্চল ২২৮

৪.২৭ পশ্চিমবঙ্গ সফর (বিশপ অলিফ) ও মধ্যবঙ্গ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ২৩১

৪.২৮ মধ্যবঙ্গ মিশনকর্মী গঠন ২৩১

৪.২৯ মিলান ফাদারদের আগমন ২৩২

৪.৩০ নদীয়ায় গ্রামঞ্চলে মিশন প্রতিষ্ঠা ২৩৩

৪.৩১ পশ্চিমবঙ্গে যেজুইটগণ ২৩৫

৪.৩২ উত্তরবঙ্গ ২৩৬

৪.৩৩ আসানসোল অঞ্চল ২৩৭

৪.৩৪ দার্জিলিংএর পার্বত্য অঞ্চল ২৩৮

৪.৩৫ ডন বস্কোর সালেসীয়দের আগমন ২৩৮

৪.৩৬ ভারতের স্বাধীনতা লাভ ও বঙ্গভঙ্গ ২৩৯

৪.৩৭ রাঘবপুর প্যারিশ ২৪১

৪.৩৮ বহরমপুর প্যারিশ ২৪১

৪.৩৯ উপসংহার ২৪২

ভারতবর্ষে খ্রিস্টমণ্ডলী প্রতিষ্ঠায় কাথলিক মিশনারীদের অবদান

৪.১ ভূমিকা

যীশু খ্রিস্টের দ্বাদশ শিষ্যের অন্যতম সাধু থোমাস / টমাস যীশুর মৃত্যুর কয়েক বৎসর পর খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতে আগমন করেন। সমগ্র ভারতে পর্তুগীজ মিশনারীগণ গোয়া থেকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ধর্মপ্রচার ও মিশন প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাই খ্রিস্টধর্ম প্রচারের প্রথম যুগে পর্তুগীজ যাজকরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাদের আগ্রহ, উদ্যম ও প্রয়াসের ফলে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টীয় সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হয়। পর্তূগীজদের পরে ইংরেজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও দিনেমারগণ আগমন করে। তবে কোন জাতিই পর্তুগীজদের মতো উদ্দীপনা নিয়ে খ্রিস্টবাণী প্রচার করেননি। তবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে পর্তুগীজরা খ্রিস্টবাণী প্রচারক ছিলেন না। তারা ছিলেন বণিক সম্প্রদায়ভুক্ত। তাদের সাথে ধর্মযাজক থাকতেন। মিশনারীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষে যীশুখ্রিস্টের নাম ও খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারিত হতে থাকে। এইসব বিদেশাগত মিশনারীদের খ্রিস্টবাণী প্রচারে অসীম উৎসাহ ও উদ্দীপনা, পরিশ্রম, ক্লেশভোগ, স্বার্থত্যাগ, অপরিচিতি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে জীবন যাপন করার মহান ব্রত অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে।

৪.২ ভারতে প্রথম খ্রিস্টবাণী প্রচার

৩২৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মহান সম্রাট আলেকজাণ্ডার তাঁর সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী নিয়ে পারস্য আক্রমণ করেন। দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ করার মানসে তিনি সিন্ধুনদ অতিক্রম করে ৩২৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে গ্রীক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন করে আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিকে অভিযান শুরু করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধক্লান্ত সৈনিকেরা অনিচ্ছা প্রকাশ করায় তাঁকে সেই অভিযান স্থগিত রাখতে হয়।

এরপর পারস্যে ফিরে গিয়ে তিনি ‘শুসা’ নগরে বিজয় অনুষ্ঠান উদযাপন করেন। পরবর্তী বৎসর, ৩২৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনে তিনি দেহত্যাগ করেন। তিনি যদিও সমগ্র ভারতবর্ষ দখল করতে পারেননি,

তথাপি তিনি প্রাচ্য দেশগুলোর কাছে ভারতের দ্বারোদ্ঘাটন করেন।[১] তখন অজ্ঞাত ভারত ভূমিকে অনেকেই জানতে পারল। এই অভিযানের পর থেকে ভারতবর্ষ ক্রমশ অন্যান্য দেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে শুরু করল।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য ভাগাভাগি করে নিলেন তাঁর সেনাপতিরা। মৌর্যরাজ চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকদের কবল থেকে পাঞ্জাব মুক্ত করলেন। গ্রীক সেনাপতি সেলিউকস (Seleukos Nicator) পুনরায় ভারতবর্ষে অভিযান চালিয়ে গ্রীকবিজিত অঞ্চলগুলো পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিচার-বিশ্লেষণ করার পর তিনি শক্তি পরীক্ষায় না নেমে মৈত্রী চুক্তি স্থাপন করলেন। এই চুক্তির ফলশ্রুতি হিসাবে গ্রীকগণ ভারতবর্ষে বসবাস ও ব্যবসা বাণিজ্য করার সুবিধাদি লাভ করে। এরপর ক্রমান্বয়ে ভারতবর্ষ গ্রীস, সিরিয়া, মিশরের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করল। ভারতের উত্তরাঞ্চলগুলো পাশ্চাত্য দেশের কাছে পরিচিত হয়।[২] ভারতীয় জীবনদর্শনের আদর্শ সম্রাট আশোকের মৃত্যুর পর (২৩২ খ্রিঃপূঃ) মৌর্য সাম্রাজ্যের অবনতি ঘটল। ঐতিহাসিকগণের তথ্যানুসারে মৌর্য-বংশের সর্বশেষ রাজা বৃহদ্রথ ১৮৫ খ্রিঃপূঃ নিহত হন। এরপর ভারতে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় ও বিদেশী অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। এই সময় থেকে খ্রিস্টের জন্মগ্রহণ কালাবধি ভারতের উত্তরাঞ্চল ও ব্যাকট্রিয়ায় গ্রীক শাসনের অবসান ঘটে।[৩]

ইতিমধ্যে রোম সাম্রাজ্য শক্তিশালী হয়ে উঠল। তার শক্তি ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত হতে থাকলো ইটালি, স্পেন, দক্ষিণ ফ্রান্স (গল), মিশর, উত্তর আফ্রিকা, প্যালেস্টাইন, ম্যাসেডেনিয়া, সিরিয়া, পারস্য প্রভৃতি দেশের দিকে।

ভারতের সাথে রোমের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল জল ও স্থলপথে। স্থলপথটি ছিল সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া ও পারস্যের মধ্য দিয়ে। আর জলপথটি ছিল ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়ে। মিশরের আলোকজান্দ্রিয়া বন্দরে এসে মিশরের স্থলপথ অতিক্রম করার পর লোহিত সাগর (Red Sea) ও আরব সাগর পার হয়ে ভারতের পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলো পর্যন্ত।[৪] ভারতের মালাবার উপকূলের প্রধান বন্দর ছিল ক্রাঙ্গানোর (Cranganore) ও পিরাক্কাদু (Pirakkadu), প্রধান রপ্তানিসামগ্রী ছিল মালাবার প্রদেশে

উৎপন্ন গোলমরিচ ও অন্যান্য মশলা। এছাড়া হস্তিদন্ত, রেশমী বস্ত্র, চিরহরিৎ সুগন্ধি চারাগাছ (Spikenard), বিভিন্ন আকৃতির মণি-রত্ন প্রভৃতির চাহিদা ছিল ইউরোপে।

৪.৩ সাধু বার্থলোমেয়ো

ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণে দেখা যায় যে, প্রাচীন ভারতের সাথে রোমের বাণিজ্য সম্পর্ক থাকার ফলে ভারতে খ্রিস্টবাণী প্রচার করাটা সহজ ছিল। ভারতে প্রায় ২০০০ বছর ধরেই খ্রিস্টধর্ম প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। কথিত আছে, যীশুর শিষ্য বার্থলোমেয়ো (Bartholomew) বোম্বাইয়ের উত্তরে 'কল্যাণ' নামক স্থানে 'বেনি ইস্রায়েল' নামক ইহুদী উপনিবেশে প্রথম খ্রিস্টবাণী প্রচার করেন।[৫] তিনি স্থানীয় রাজা পুলমভি (Pulomoavi/Polymius) এর বোনকে সেবাযত্ন দিয়ে সুস্থ করে তোলেন। তাঁর অলৌকিক কাজ দেখে ও তাঁর আদর্শ জীবনযাপনে মুগ্ধ হয়ে স্বয়ং রাজা ও তাঁর অসংখ্য প্রজাও খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়। তাতে রাজা পুলমভির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আস্ট্রেজেস্ (Astreges) ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে পদচ্যুত করেন এবং বার্থালোমেয়োকে লৌহদণ্ডের সাথে বেঁধে প্রহার করেতাঁর শিরশ্ছেদ করার আদেশ দেন। ঘটনার ৩০দিন পর আস্ট্রেজেস এক অদৃশ্য শক্তির দ্বারা কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে প্রাণ হারালেন। কথিত আছে, রাজা পুলমভি বিশপপদে অধিষ্ঠিত হয়ে ২০ বছর খ্রিস্টমণ্ডলী পরিচালনা করেন।

৪.৪ পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও খ্রিস্টীয় সম্প্রদায় গঠন

সম্ভবতঃ সাধু টমাস মেসোপটেমিয়া ও পারস্য দেশে খ্রিস্টবাণী প্রচার করার পর ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করেন। তখন উত্তর ভারতের পাঞ্জাবের রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন গণ্ডফারস (Gondophars)। সাধু টমাস হাব্বান (Habban) নামক একজন বণিকের সাথে ভারতে আসেন। গণ্ডফারস রাজার আমন্ত্রণেই তিনি এসেছিলেন। এরই নামাঙ্কিত মুদ্রা আফগানিস্তানে ও পাঞ্জাবে আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে সাধু টমাস যীশুর বাণী ও তাঁর অলৌকিক কার্যাবলী পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশবাসীর কাছে প্রচার করতে আরম্ভ করেন।[৬] তখন তা দেখে রাজা ও রাজপরিবারের অনেকেই খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। এই অঞ্চলের আরও অনেক লোকই দীক্ষা গ্রহণ করে। এভাবে এখানে খ্রিস্টান সমাজ ও খ্রিস্টমণ্ডলী (Christian Community and Church) প্রতিষ্ঠা করে কয়েক বৎসর পর জান্তিপুস গৌরাশ্ব নামক জনৈক ভারতীয় বিশপের হাতে দায়িত্ব অর্পণ করে সাধু টমাস মালাবারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

৫২ খ্রিঃ দক্ষিণ অভিমুখে যাত্রা করে তিনি ক্রাঙ্গানোর (Cranganore) এসে পৌঁছান। তারপর মালাঙ্কারা (Malankasra) নামক স্থানে নমপুদ্রি ব্রাহ্মণদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেন। পালাউর নামে অপর এক গ্রামেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। কথিত আছে, সাধু টমাসের আধ্যাত্মিক জীবন, আদর্শ ও সদাচার জনগণকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। ফলে অনেক বর্ণহিন্দু খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে। কালক্রমে নবদীক্ষিত খ্রিস্টানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে চেরা (Chera), বর্তমানে Kerala প্রদেশে সাতটি গির্জা নির্মাণ করেন যথাঃ ক্যাঙ্গানুর, পালুর (Palur), উত্তর পালুর, দক্ষিণ পল্লীপূরম, নিরানাম, নেল্লাকুল ও কুইলন।[৭] এগুলো ছিল কুইলন (Quilan) পালুর ও মালাঙ্কারা স্থানে।

এরপর মালাবার থেকে দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের করমণ্ডল সমুদ্র-উপকূল অঞ্চলে গিয়েও প্রচার কার্য চালাতে থাকেন। কিছু দিনের মধ্যে রাজা সগন (Sogon) ও অনেক স্থানীয় জনগণ খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। এরপর তিনি মাদ্রাজে (বর্তমানে চেন্নাই) অঞ্চলে ধর্মপ্রচার করেন।[৮] তাঁর বাণীপ্রচারের সাফল্য অ-খ্রিস্টান পুরোহিতগণের মনঃপুত ছিলনা। তারা ঈর্ষান্বিত হয়ে মাদ্রাজের নিকটবর্তী মাইলাপুরের একটি ছোট পাহাড়ে ৭২ খ্রিস্টাব্দের ৩রা জুলাই তীরবিদ্ধ করে তাঁকে হত্যা করে। তাঁর নশ্বর দেহ মাইলাপুরে 'সান থোম' গির্জায় সমাহিত আছে। স্থানটি আজও খ্রিস্টান-অখ্রিস্টান সকলের কাছে পুণ্যস্থানে পরিণত হয়ে আছে। টমাস যখনই কোন প্রার্থীকে দীক্ষিত করতেন তখনই উপযুক্ত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির উপর তার পরিচালনার দায়িত্ব দিতেন। তাদের বলা হতো প্রেসবিটার (Presbyter) অর্থ 'প্রবীণ' – এক কথায় বিশপ বা প্রধান পুরোহিতকে বুঝায়।

খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে সাধু থোমাসই এ দেশে খ্রিস্টমণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ভারতবর্ষে খ্রিস্টধর্ম প্রায় দুই হাজার বছরের প্রাচীন এক ঐতিহ্যমণ্ডিত ধর্ম।[৯]

৪.৫ প্রাচ্যদেশীয় রীতিতে খ্রিস্টীয় উপাসনা

মালাবারের গীর্জাগুলোতে যেসব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান হতো, তার সাথে ভারতবর্ষে মন্দিরের পূজা-উপাসনার যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল। সেই সময়ে রোমের সঙ্গে ভারতের কোনো যোগাযোগ ছিল না। তাই ভারতের এই ক্ষুদ্র খ্রিস্টমণ্ডলী পারস্যের খ্রিস্টধর্মের প্রধান কাথলিকধর্মগুরু (Chatholics)এর নির্দেশমতো পরিচালিত হতো। এসব রীতিনীতি যীশুর সময়ে পশ্চিম এশিয়ায় প্রচলিত ছিল। এই

পদ্ধতিকে সিরিয় উপাসনা পদ্ধতি বলে। এজন্য মালাবারের খ্রিস্টমণ্ডলী সিরিয়ান চার্চ নামেই খ্যাত হয়ে ওঠে। সাধু টমাসের মৃত্যুতে অঙ্কুরিত মণ্ডলী বিলীন হয়ে যায়নি। বরং খ্রিস্টভক্তদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।[১০] বহু গির্জা নির্মিত হয়েছে। অভিষিক্ত বিশপ ও পুরোহিতগণ খ্রিস্টভক্তদের পরিচালনার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

অবশ্য পরবর্তীকালে স্থানীয় রাজন্যবর্গ বলপ্রয়োগ করে খ্রিস্টানদের উৎপীড়ন করে খ্রিস্টান-অধ্যুষিত অঞ্চল মাদ্রাজের নিকটবর্তী মাইলাপুর (Mylapur) হস্তগত করেন। যারা হত্যাযজ্ঞ থেকে রেহাই পেয়েছিল তারা প্রাণভয়ে ভীত হয়ে নিজ জন্মভূমি, জমিজমা ও সহায়-সম্পত্তি ত্যাগ করে নৌকাযোগে মালাবার উপকূলে পালিয়ে যায়। তারা ত্রিবাঙ্কর বা কালিকট উপকূলে বসবাস করতে শুরু করে।

সাধু টমাসের মৃত্যুর পর মালাবারে অবস্থানকারী খ্রিস্টানদের সম্পর্কে ৩০০ বছরের কোন তথ্য জানা যায়নি। তবে শুধু জানা যায় যে, ১৮০ খ্রিস্টাব্দে মিশরের অন্তর্গত আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ ডিমেত্রিয়াস নামক জনৈক শাস্ত্রজ্ঞ পুরোহিতকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করা হয়েছিল। তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্মণদের কাছে খ্রিস্টবাণী প্রচার করা।[১১] তাঁর প্রচারক্ষেত্র ছিল বোম্বাইয়ের নিকটবর্তী কঙ্কন (Konkon) প্রদেশে।

সাধু টমাস বহু সংখ্যক নামবুদিরির (Nombudirir) ব্রাহ্মণদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেছেন। তবে ব্রাহ্মণ খ্রিস্টানদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতিনীতির কোন পরিবর্তন হয়নি। সুতরাং খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েও তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়গত সংস্কার অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন।

এসব উচ্চবংশীয় খ্রিস্টান দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী শূদ্র ও পঞ্চমদের কাছে খ্রিস্টবাণী প্রচার করতে সম্মত ছিলেন না। তাই দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ নিম্নবর্ণের সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ খ্রিস্টবাণী শ্রবণের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে দক্ষিণ ভারতে খ্রিস্টানদের সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে। খ্রিস্টধর্মের মধ্যে গতি সঞ্চার করার জন্য আসেন সিরিয়ার খ্রিস্টভক্তগণ।

৩৪৫ খ্রিস্টাব্দে বণিক টমাস কেনা (Thomas Cana)এর নেতৃত্বে বাগদাদ ও জেরুজালেম শহর থেকে একজন বিশপসহ ৭২টি পরিবারের আনুমানিক ৪০০ জন সদস্য মালাবার বা ক্রাঙ্গানোর

(Cranganor) উপকূলে এসে বসতি স্থাপন করে। টমাস কেনা ছিলেন একজন অবস্থাপন্ন ও মমতাশীল ব্যক্তি।[১২]

সিরিয়া ছিল রোম ও ভারতের মধ্যবর্তী বাণিজ্যকেন্দ্র। আগেই বলা হয়েছে, সিরিয়া, গ্রীস, পারস্য ও ইটালী থেকে আগত বণিক সম্প্রদায় ভারতের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য করতো। এই ব্যবসা সূত্রে খ্রিস্টান বণিকগণ ভারতে বসতি স্থাপন করে। ভারতীয় খ্রিস্টানরা নবাগত ভিন্‌দেশীয় খ্রিস্টানদের স্বাগত জানায়।

নবাগত খ্রিস্টানগণ ছিল অভিজাত ও উচ্চস্তরের। তারা নবাগতদের শ্রদ্ধা করতো, কারণ তারা ছিল প্রভু যীশুর শিষ্য সাধু টমাসের দেশের অধিবাসী। তারা নির্দ্বিধায় এদেশের মানুষের সাথে একসাথে ওঠাবসা করতে লাগলো, এমনকি বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হতে লাগলো। এভাবে সামাজিক রীতি-নীতি ও ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে মালাবারের খ্রিস্টানগণ বর্ণভেদ ভুলে গিয়ে এক অখণ্ডখ্রিস্টান সম্প্রদায়ে পরিণত হয়।[১৩]

টমাস কেনা স্থানীয় পেরুমাল (Perumal)এর সাথে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সেতু রচনা করে। ‘মুসিরিশ’ (Musiris) নামক উপকণ্ঠে অবস্থিত ‘মহাদেবর’ অঞ্চলটি লাভ করেন। শাসকের উদ্দেশ্য ছিল বণিকদের সহযোগিতায় দূরবর্তী দেশগুলোর সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য অব্যাহত রাখা। শাসক পেরুমাল টমাস কেনার কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে ‘পেরুম চেত্তি’ (Perum Chetty) অর্থাৎ ‘মহান বণিক’ উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি দেশের উন্নতিতে অবদান রেখেছিলেন বলে তাঁকে ‘রাভে কার্তান’ (Rave Kartan) কর্তাসূর্য উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

পরবর্তীকালে সিরিয়া থেকে আরও কয়েকজন বিশপ মালাবারএ আসেন। সিরীয় উপাসনা-পদ্ধতি অত্যধিক হৃদয়গ্রাহী ও আড়ম্বরপূর্ণ। আজ পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতের বহু খ্রিস্টান সিরীয় পদ্ধতি অনুসরণ করেন। সিরীয়রা ছিল খ্রিস্টধর্মে শিক্ষিত। এদিকে ব্রাহ্মণ খ্রিস্টানগণ তাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোনিবেশ করলো। তখনকার দিনে কেবল ‘নায়ার’ (Neyar) বংশীয়রা শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করতো। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণখ্রিস্টানগণ যখন সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে দেশ রক্ষায় ব্রতী হয় তখন মালাবারের খ্রিস্টানদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটতে থাকে।

ইতিহাস-রচয়িতা কৃষ্ণ আয়র লিখেছেন (Anantakrishna Ayor) সিরিয় খ্রিস্টানদের বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল।[১৪] তারা প্রাদেশিক শাসকের কর্তৃত্বাধীন না হয়ে সরাসরি রাজার অধীনে ছিল। সরকারী অনুষ্ঠানের সময় বিশপগণ রাজার পাশেই বসতেন। তখনকার শাসক ছিলেন 'ভালিয়ার ভাত্তাম' (Valiar Vattam), তিনি সুশাসক ছিলেন।

ক্রমশভারতের বুকে খ্রিস্টধর্ম সুপ্রোথিত হলো। কুইলন (Quilon) ক্রাঙ্গালোর (Cranganor) প্রভৃতির ভূ-স্বামিগণ অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে আগত খ্রিস্টানদের ভূ-সম্পত্তি দান করেন ও তাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমতি দেন।[১৫]

দক্ষিণ ভারতে খ্রিস্টধর্মের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই তথ্য সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী হলেন বিখ্যাত পর্যটক মার্কো পোলো। ১২৯৫ খ্রিঃ ভারত পর্যবেক্ষণ করে তিনি একটি বিবরণী লিপিবদ্ধ করে গেছেন।[১৬]

ষোড়শ শতাব্দীর পর পর্তুগীজদের আগমনে রোমীয় ও সিরীয় মণ্ডলীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। তবে ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মতত্ত্বের দিক থেকে দুই মণ্ডলীর মধ্যে ঐকমত্য ছিল।

১২৪১ খ্রিঃ পোপ ৯ম গ্রেগরী ও পরবর্তী পোপ ৪র্থ ইন্নোসেন্ট ইটালি থেকে ডমিনিকান ও ফ্রান্সিস্কান মিশনারীদের পাঠাতে চেষ্টা করেন।

১২৯৫ খ্রিঃ বিখ্যাত পর্যটক মার্ক পোলোর সঙ্গে দু'জন ফ্রান্সিস্কান সন্ন্যাসীকে পাঠানো হয়, কিন্তু তাঁরা অকালমৃত্যু বরণ করেন।

১৩২০ খ্রিঃ ৪জন ফ্রান্সিস্কান সন্ন্যাসীর সাথে জাহাজে করে ভারতের বোম্বাইয়ের নিকটবর্তী থানা ও বন্দরে পৌঁছান। প্রচারকগণ দক্ষিণাভিমুখে কুইলন (Quilon)এ যেতে মনস্থ করেন। কিন্তু সমুদ্রযাত্রা প্রতিকূল হওয়ায় থানায় থেকে গেলেন।

ইতিমধ্যে গুজরাটএর অন্তর্গত ব্রোচ্ (Broach) শহরে বিশপ জর্ডন একজন সহকারীর সাথে গিয়ে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেন।[১৭]

১৩২৪ খ্রিঃ ৫জন ডমিনিকান সন্ন্যাসী কানাডা, মহীশূর, মালাবার ও ত্রিবাঙ্কুরে এসে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেন। তাদের প্রচারের ফলে ১৩২৮ খ্রিঃ দশ হাজারেরও অধিক অধিবাসী খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়।[১৮]

১৩৪৭ খ্রিঃ ফ্রান্সিস্কান সন্ন্যাসী জন দে মারনেল্লি (J. de. Marnelli) পোপের প্রতিনিধি হয়ে ভারতে আসেন। তাঁর যাজনক্ষেত্র ছিল কুইলন। তিনি ভারতে এসে যথেষ্ট সম্মান অর্জন করেন।

৪.৬ ভারতে পর্তুগীজদের আগমন

প্রখ্যাত ভূ-পর্যটক ভাস্কো-দা-গামা আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারতে আসার নতুন জলপথ আবিষ্কার করেন এবং ১৪৯৮ খ্রিঃ ২৭শে মে দক্ষিণ ভারতের কালিকট বন্দরে এসে পৌঁছান। তারপর থেকেই পর্তুগীজরা ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করে। তাদের পরেই আসেন পর্তুগীজ মিশনারীগণ এবং তারা ভারতে নতুন ভাবে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন।[১৯]

পর্তুগীজদের বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিতে বণিকশ্রেণীর ধর্মপালের প্রয়োজনে খ্রিস্টমণ্ডলীর কেন্দ্র স্থাপিত হতে থাকে। ঐতিহাসিক তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে ১৫৩৪ খ্রিঃ গোয়া, কালিকট, চট্টগ্রাম ও বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী বহুস্থানে খ্রিস্টমণ্ডলী প্রসারিত হয়েছে।

ইউরোপীয়দের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী ভূ-পর্যটকগণের সঙ্গে প্রায়শ ধর্মপ্রচারকগণ থাকতেন। ভাস্কো-দা-গামার সঙ্গে ৫ জন মিশনারী ভারতে আসনে খ্রিস্টবাণী প্রচারের জন্য।[২০] কিন্তু তারা সকলেই স্থানীয় খ্রিস্টানবিরোধী শাসকের হাতে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

১৫০০ খ্রিঃ নৌ অধ্যক্ষ কাব্রাল (Cabral)এর সঙ্গে আরও নয়জন ফ্রান্সিস্কান মিশনারী ভারতে আসেন।[২১] তাঁরা অঙ্গদ্বীপ (Angediva) উপকূলে ২২জন ভারতীয়কে খ্রিস্টবিশ্বাসে দীক্ষিত করেন। তারা ১৫০১ খ্রিঃ আসেন কালিকটে। স্থানীয় লোকেরা তাদের তিন জনকে হত্যা করে। বাকি ছয় জন কানালরে ও কোচিনএ চলে যান। তবে মিশনারীদের হত্যা সংবাদ জ্ঞাত হয়েও ইউরোপ থেকে আরও ফ্রান্সিস্কান ধর্ম প্রচারকগণ ভারতে খ্রিস্টবাণী প্রচারে উৎসাহী হন।[২২]

১৫০৩ খ্রিঃ নৌ-অধ্যক্ষ আলফোনসো আলবুকুক (Alphons Albuququque) ভারতে পদার্পণ করেন, তখন তাঁর সঙ্গে একজন শিক্ষিত ডমিনিকান অধ্যক্ষ ও আরো চারজন ডমিনিকান ও ফ্রান্সিসকান মিশনারী আসেন। তারা কোচিনে ঘাঁটি স্থাপন করেন ও গির্জা নির্মাণ করেন। ঘাঁটি রক্ষার দায়িত্ব মাত্র ১০জন সৈন্যের উপর ন্যস্ত করা হয়। সৈন্যদের বিকল্প কাজ ছিল ভারত থেকে গোলমরিচ ক্রয় করে ইউরোপে রপ্তানি করা। পক্ষান্তরে প্রচারকগণ প্রচারকার্যে মনোনিবেশ করলেন। অধ্যক্ষ ফাদার গাসপার (Fr. Gaspar) সৈন্যদের মধ্যে বাস করতেন।

১৯০৬ খ্রিঃ পোপ ৬ষ্ঠ আলেকজাণ্ডার খ্রিস্টমণ্ডলীর উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ধর্মাধ্যক্ষরূপে ভারতে কর্মরত মিশনারীদের পত্রের মাধমে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

১৫১০ খ্রিঃ নৌঅধ্যক্ষ গোয়া দখল করেন। তখন একজন ডমিনিকান পুরোহিত ও কয়েকজন ফ্রান্সিসকান পুরোহিত ধর্মপ্রচার ও খ্রিস্টমণ্ডলী প্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করেন। পর্তুগীজ নরপতি ডম মানুয়েল (Dom Manuel) গোয়া ও পর্তুগীজ আবিষ্কৃত ভারতীয় অঞ্চলগুলোতে ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। পর্তুগীজরা ধর্মে রোমান কাথলিক। তাই পর্তুগীজদের মাধ্যমে ভারতে ধর্মপ্রচার ও বিস্তার করা সহজ হয় বলে মনে করে রোমের উচ্চতম ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ এক সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

১৫১৪ খ্রিঃ ৭জুন পোপ দশম লিও ও পর্তুগালের রাজার মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির সংক্ষিপ্তসার হলোঃ ভারতে নতুন নতুন খ্রিস্টীয় মিশন প্রতিষ্ঠা, ডাইওসিস বা ধর্মপ্রদেশ গঠন, ডাইওসিসের বিশপপদে নিয়োগ, উচ্চতর ধর্মযাজকদের মনোনয়ন করার ক্ষমতা পর্তুগালের রাজার হাতেই ন্যস্ত থাকবে। ভারতে পোপের কোন আদেশ বা নির্দেশ পর্তুগালের রাজার অনুমোদন ব্যতীত প্রেরণ করা যাবে না। মিশনারীগণ কেবলমাত্র পর্তুগালের জাহাজেই গমনাগমন করতে পারবেন। তার বিনিময়ে ভারতে খ্রিস্টমণ্ডলী প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার সমস্ত ব্যয়ভার পর্তুগালের রাজাই বহন করবেন। এই চুক্তি পাদ্রোয়াদো পর্তুগীজ (Padroado Portugues) বা পর্তুগীজ পৃষ্ঠপোষকতা নামে খ্যাত। এই ভাবে ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজ রাজশক্তির ছত্রছায়ায় ভারতে খ্রিস্টধর্মের আর একবার আগমন হলো।[২৩]

১৬১৪ খ্রিঃ মাদুরাই (Madurai) প্রদেশে ফুঞ্চল (Funchal) ডাইওসিস (ধর্মপ্রদেশ) গঠন করা হয়।

১৫১৫ খ্রিঃ ভারতীয় খ্রিস্টমণ্ডলীর ধর্মাধ্যক্ষরূপে আগমন করেন ডম ডুজার্তে নুনেন (Dom Dujarte Nunen)। তিনি ছিলেন কর্মঠ ব্যক্তি।

১৫১৫ খ্রিঃ ফ্রান্সিসকান অধ্যক্ষ ফাদার মানুয়েল (Manuel) প্রচারকসহ কুইলনে আসেন এবং ১,২০০ স্থানীয় অধিবাসীকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেন। খ্রিস্টভক্তের সংখ্যাধিক্য হেতু ১৫১৬ খ্রিঃ 'সাধু টমাস' নামে একটি শহর নির্মিত হয়।[২৪] তাদের জন্য উপাসনা গৃহাদি নির্মাণ করা হয়।

১৫১৮ খ্রিঃ পর্তুগীজরা সিংহল দ্বীপে (শ্রীলংকা) বাণিজ্যিক কর্তৃত্ব স্থাপন করলে, ফ্রান্সিসকান পুরোহিতগণ সেখানকার অসংখ্য অধিবাসীকে খ্রিস্টের প্রেমবাণীতে উজ্জীবিত করে তাদেরকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেন এবং মণ্ডলী পরিচালনার জন্য বিশপ নিযুক্ত করেন। বিশপের নাম জে ভাজ মন্তেইরো (J. Vaj Monteairo)।

১৫২৬ খ্রিঃ কয়েকজন ফ্রান্সিসকান মিশনারী গোয়া থেকে ম্যাঙ্গালোরে (Mangalore)খ্রিস্টবাণীর বীজ বপন করেন।[২৫] তাঁরা সেখানে তিনটি উপাসনা গৃহ নির্মাণ করেন।

১৫৩২ খ্রিঃ D. Cruz নামে একজন মুক্তো-ব্যবসায়ী তুতিকোরিন (Tuticorin)এ গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। তিনি সেখানকার জেলেদের মুসলমানগণ কর্তৃক অত্যাচারিত হতে দেখে অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি কয়েকজনকে কোচিনে নিয়ে এসে ধর্মশিক্ষায় শিক্ষিত করেন। পরে কয়েকজন পুরোহিতকে নিয়ে তিনি পুনরায় তুতিকোরিনে ফিরে আসেন। পুরোহিতগণ গ্রামাঞ্চল পরিভ্রমণ করে খ্রিস্টবাণী ঘোষণা করেন। ফলে ৩০টি পল্লীতে খ্রিস্টধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৬]

১৫৩৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ফ্রান্সিস্কান মিশনারীগণ ভারতে সাগ্রহে প্রচারকর্ম পরিচালান করেন। তবে ধর্মসংঘভুক্ত নন এমন কয়েকজন 'সেক্যুলার' পুরোহিত, ডমিনিকান পুরোহিত ও 'পরম পবিত্র ত্রিত্ব' ধর্মসংঘের পুরোহিতগণও প্রচারকার্যে অংশ গ্রহণ করেন।

১৫৩৪ খ্রিঃ গুজরাট নরপতি বাহাদুরশাহ্ (Bahadur Saha) চুক্তিসূত্রে 'বেসিন' (Bassein) অঞ্চলে কর্তৃত্ব করার অধিকার অর্জন করেন। উপরন্তু পূর্বপরিত্যক্ত থানা, সলসেট, বোম্বাই, মাহিম ও দিও এর

উপর পর্তুগীজদের কর্তৃত্ব স্বীকার করেন। এসব অঞ্চলসমূহে দুর্গ নির্মাণ ও ঘাঁটি স্থাপন এবং লোহিত সাগর থেকে আনীত পণ্যদ্রব্যের উপর বাণিজ্যিক শুল্ক আদায় করার অনুমতি দেন। সেই সহযোগিতার প্রতিদানে পর্তুগীজরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলো যে, তারা মুঘল সম্রাট হুমায়নের আক্রমণ প্রতিরোধে গুজরাট নরপতিকে সাহায্য করবে।

১৫৩৪ খ্রিঃ বেসিনে ফাদার আন্তনী খ্রিস্টবাণী প্রচার করেন ও একটি ধর্মমঠ ও গির্জা নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে আগাসি অঞ্চলে কর্মরত অবস্থায় এই উপাসনাগৃহ নির্মাণ এবং ৪০ জন অনাথ বালকের জন্য একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।[২৭] পরবর্তীকালে শত্রুরা গির্জাটি ধুলিসাৎ ও আশ্রমটি লুণ্ঠন করে।

আগাসি থেকে ফাদারএ্যান্টনি 'থানা' নগরে এসে একটি গির্জা ও একটি মঠ স্থাপন করেন। কথিত আছে, ঠিক এই জায়গায় দু'শত বৎসর পূর্বে ৪জন ফ্রান্সিসকান সন্ন্যাসী প্রাণ বিসর্জন দেন।

১৫৩৫ খ্রিঃ ফাদার এন্টনী মাউন্ট পইনসার (Mt. Painsar)এ অবস্থিত একটি বৃহৎ গুহাকে গির্জাঘরে রূপান্তরিত করেন এবং একশত অনাথকে সু-শিক্ষিত করার জন্য একটি বিদ্যালয় ও মঠ নির্মাণ করেন।

১৫৩৫ খ্রিঃ ফাদার এ্যান্টনি 'কারাঞ্জা' নামক স্থানে গমন করেন। সেখানে তিনটি গির্জা, ৪০ জন বালকের আবাসযোগ্য একটি অনাথাশ্রম নির্মাণ করেন।[২৮] এরপর তিনি চাউল (Chaul)এ যান এবং খ্রিস্টীয় উপাসনাগৃহ নির্মাণ করেন। তিনি পুরোহিত প্রার্থীদের জন্য শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।

১৫৩৭ খ্রিঃ গোয়া যাজন ক্ষেত্রটি মণ্ডলীর আইনবিধি অনুযায়ী ডাইওসিস (ধর্মপ্রদেশ)এ রূপান্তরিত হয়।

১৫৪২ খ্রিঃ মহামান্য বিশপ মানার (Manar) এর রাজভ্রাতাকে দীক্ষিত করে তাঁর খ্রিস্টীয় নামকরণ করেন আলফন্সো। বিশপ আলবুকেক তানোর (Tanor) এর বাণীকে খ্রিস্টবাণীর মন্ত্রে দীক্ষিত করেন।

১৫৩৭ খ্রিঃ ফাদার মিগেল ও আরও কতিপয় পুরোহিত 'পারাভাস'দের গ্রামে গমন করে খ্রিস্টবাণী প্রচার করেন এবং প্রায় ২০,০০০ স্থানীয় অধিবাসীকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেন।[২৯]

১৫৪৫ খ্রিঃ দিয়েগো দে বর্বাকে তানোরের রাজাকে ধর্মশিক্ষা দানের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। তানোর অধিপতি ধর্মশিক্ষান্তে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন। পরবর্তীকালে তিনি বিশপপদে অধিষ্ঠিত হন।

কানাড়ী দ্বীপকুঞ্জ, দাক্ষিণাত্য, সিংহল, বঙ্গদেশ, পেগু, মালাক্কা, চীন, আবিসিনিয়া (ইথিওপিয়া) থেকে আগত ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার জন্য ফাদার দিয়াগো একটি মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই পর্তুগীজ মিশনারীকে ভারতীয় ভক্তরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে, কারণ তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে ভারতীয় শিক্ষার মান উন্নত করার জন্য আত্মোৎসর্গ করেছেন।[৩০]

৪.৭ সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার

ভারতের যাজন ক্ষেত্রে আগত ও প্রচাররত পর্তুগীজ ও সিরীয় মিশনারীদের মধ্যে সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারএর নাম প্রাতঃস্মরণীয়। তিনি ১৫০৬ খ্রিঃ স্পেনের অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্বদেশে শিক্ষা লাভের পর তিনি ফ্রান্সে গমন করেন ও প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতিত্বের সাথে অধ্যয়নাদি সমাপ্ত করেন। দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে কর্মরত অবস্থায় তিনি সাধু ইগ্নেসিয়াসের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেন। তাঁর পরামর্শে ফ্রান্সিস স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত যেশুইট ধর্মসংঘের ব্রতাবলম্বী হয়ে ১৫৪২ খ্রিঃ ভারতে আগমন করেন। সাধু ফ্রান্সিস প্রথমে গোয়াতে ধর্মপ্রচারে ব্রতী হন।[৩১] পরবর্তীতে তিনি সেখানে পীড়িত, দরিদ্র, এমনকি কুষ্ঠরোগে আক্রান্তদেরও সেবা করতে লাগলেন।

তিনি প্রতিদিন কিশোরদের এক ঘণ্টার জন্য একত্রিত করতেন এবং গানের মাধ্যমে তাদের শিক্ষা দিতেন।[৩২] তারা নিজ নিজ বাড়ি গিয়ে তাদের মাতা-পিতা ও আত্মীয়দের গান শুনিয়ে অনুপ্রাণিত করতেন। এভাবে নাগরিকগণ খ্রিস্টের অনুরক্ত হয়ে ওঠে। তিনি স্থানীয় শাসকদের কাছ থেকে যে অর্থ-সাহায্য পেতেন তা দুঃস্থদের মধ্যে দান করতেন। তিনি সমুদ্র উপকূলে কয়েকটি ক্ষুদ্র উপাসনালয় নির্মাণ করেন।

তিনি ত্রিবাঙ্কুর, কুইলন, মানা, জাফনা দ্বীপ, মলুকাস দ্বীপপুঞ্জে খ্রিস্টবাণী প্রচার করেন।[৩৩] এভাবে ধীরে ধীরে ভারতে খ্রিস্টবাণী বিস্তার লাভ করে।

১৫৪৯ খ্রিঃ তিনি জাপানে দু'বছর অতিবাহিত করেন এবং ধর্মশিক্ষার জন্য একটি পুস্তিকা জাপানী ভাষায় অনুবাদ করেন। এরপর তিনি চীন দেশে যাত্রা শুরু করলেন। সেখানে 'সানচান' দ্বীপে পৌঁছে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই দ্বীপেই ১৫৫২ খ্রিঃ ৩রা ডিসেম্বর ৪৬ বছর বয়সে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর নশ্বর দেহ সমাধিস্থ হলেও অবিকৃত অবস্থায় ছিল। এক বৎসর পর তাঁর পুণ্য মরদেহ

গোয়ায় আনা হয়। অদ্যাবধি গোয়ায় 'বম্ যেশুস' (Bom Gesue) দয়ালু যীশু নামক গির্জায় তা অক্ষতপ্রায় অবস্থায় সংরক্ষিত আছে।

৪.৮ সম্রাট আকবরের ফরমান

১৫৭৩ খ্রিঃ আন্তোনিও ক্যাব্রাল (Cabral) নামে জনৈক পর্তুগীজ মুঘল সম্রাট আকবরের রাজদরবারে গমন করেন। ১৫৭৬ খ্রিঃ ক্যাপ্টেন তাভারেজ সম্রাট আকবরের রাজদরবারে গিয়ে হুগলীতে একটি বন্দর নির্মাণ করার আবেদনপত্র নিয়ে উপস্থিত হন। সম্রাট রাজদরবারে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য মনোযোগ দিয়ে শোনেন। তিনি পর্তুগীজদের আবেদনক্রমে হুগলীতে একটি বন্দর নির্মাণের অনুমতি দিলেন। বিনিময়ে ক্যাপ্টেন তাভারেজ সম্রাটকে প্রতিশ্রুতি দিলেন সে, তিনি নিজে এবং অন্যান্য পর্তুগীজ বণিক ও নাবিক অতঃপর হুগলীতে বসতি স্থাপন করবেন। সম্রাট তাকে 'ফরমান' (লিখিত অনুমতিপত্র) দান করলেন। এই অনুমতি পত্রের উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো 'বঙ্গদেশে মিশারীগণ খ্রিস্টধর্ম প্রচার করতে, গীর্জা ও কনভেন্ট নির্মাণ করতে পারবেন এবং সে সমস্ত ভারতীয় 'ইঞ্জিল' বা গসপেল (মঙ্গলসমাচার) এবং খ্রিস্টধর্মের বিধানসমূহ মান্য করে চলার আগ্রহ প্রকাশ করবে, তাদেরকে নির্দ্বিধায় খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করতে পারবেন'।[৩৪]

ক্যাপ্টেন তারাভেজ হুগলীর সন্নিহিত জমি অধিগ্রহণ করে সুপরিকল্পিতভাবে ১৫৭৯ খ্রিঃ বন্দর নির্মাণ করেন। একে পর্তুগীজ ভাষায় 'ব্যাণ্ডেল' বলে। তাই পরবর্তীতে এই বন্দরটি শুধুমাত্র ব্যাণ্ডেল নামেই পরিচিত হয়। কয়েক বছরের মধ্যেই ব্যাণ্ডেল বঙ্গ দেশের প্রধান ও মোগল সাম্রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর হয়ে উঠলো। সুদূর চীন, ম্যানিলা, মালাক্কা ও ভারতের অন্যান্য বন্দর থেকে এখানে বাণিজ্যপোত যাতায়াত করতে থাকলো। সারা বিশ্বেই বাণিজ্য খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো। এভাবে পর্তুগীজ বণিকদের সাহায্য ও সহযোগিতায় বঙ্গদেশে খ্রিস্টীয় মিশনারীদের আগমন সহজসাধ্য হয়ে উঠে।[৩৫]

৪.৯ মিশনারীদের আগমন

সপ্তগ্রাম বন্দরে

ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে যেমন পর্তুগীজরাই সর্বপ্রথম বঙ্গদেশে আগমন করে, তেমনি মিশনারীদের মধ্যে পর্তুগীজ মিশনারীগণই প্রথম বঙ্গদেশে পদার্পণ করেন।[৩৬] ১৫১৭ খ্রিঃ থেকে পর্তুগীজ বণিকগণ

তাদের বাণিজ্যতরী নিয়ে গোয়া ও বঙ্গদেশের মধ্যে যাতায়াত করতো। পর্তুগীজ রাজকীয় আইন অনুযায়ী প্রতিটি জাহাজে একাধিক ধর্মযাজক (Chaplain) থাকা বাধ্যতামূলক ছিল।

১৫৩৭ খ্রিঃ সপ্তগ্রাম (সাতগাঁও) এবং চট্টগ্রামে পর্তুগীজ উপনিবেশ স্থাপিত হয়। এ সময় থেকেই দুই উপনিবেশে পর্তুগীজদের মধ্যে ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনের জন্য এদেশে বসবাস করতে আরম্ভ করেন।

১৫১৪ খ্রিঃ পোপ ও পর্তুগালের রাজার মধ্যে সম্পাদিত 'পাদ্রোয়াদো পর্তুগীজ' চুক্তির ফলে পূর্ব-আফ্রিকা থেকে ভারত ও পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এক বিশাল ও বিস্তৃত গোয়া ধর্মপ্রদেশ (Diocese of Goa) গঠিত হয়।[৩৭] গোয়ার বিশপ তাঁর ধর্মপ্রদেশের কার্য পরিচালনার জন্য কয়েকজন পুরোহিতকে বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর প্রতিনিধি বা ভিকার জেনারেল হিসাবে নিয়োগ করেন। বঙ্গদেশের জন্য ফাদার জুলিয়ানো পেরেইরাকে তিনি ভিকার জেনারেল নিযুক্ত করেন এবং সপ্তগ্রামএ প্রধান কার্যালয় স্থাপন করার নির্দেশ দেন।

৪.১০ যেজুইটদের আগমন

হুগলীর প্রশাসনিক অধিকর্তা ক্যাপ্টেন পেদ্রো তাভারেজ হুগলীর বন্দর নির্মাণের কাজ আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে পর্তুগীজদের মধ্যে ধর্মীয় কার্যকলাপসম্পাদনের জন্য বঙ্গদেশে কয়েকজন মিশনারীকে প্রেরণ করার অনুরোধ জানান।

১৫৫৭ খ্রিঃ গোয়া ধর্মপ্রদেশকে দুই ভাগ করে কোচিন ও মালাক্কায় দু'টি ধর্মপ্রদেশ করা হয়। ধর্মপ্রদেশের বিভাজনের ফলে বঙ্গদেশ মিশনক্ষেত্রকে কোচিন ধর্মপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১৫৪২ খ্রিঃ থেকে কোচিন ও মালাবার অঞ্চলে যেজুইটগণ কর্মরত ছিলেন।

১৫৩৪ খ্রিঃ ১৫ই আগষ্ট সাধু ইগ্নেসিউস লয়োলা প্যারিসে যেজুইট বা যীশুসংঘের প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৫৪০ খ্রিঃ ২৭শে সেপ্টেম্বর পোপের অনুমোদন ও স্বীকৃতি লাভ করে। অতি অল্পকালের মধ্যেই যেজুইটদের পাণ্ডিত্য, জনসেবা ও ধর্মপ্রচারের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাই কোচিনের বিশপ

বঙ্গদেশের মতো নতুন ও সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রে খ্রিস্টধর্ম বিস্তারের জন্য ১৫৭৬ খ্রিঃ দু'জন পুরোহিত – ফাদার আন্তনি ভাজ ও ফাদার পেদ্রো ডায়াস–কে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন।[৩৮]

পুরোহিতগণ বঙ্গদেশে আগমন করার পর প্রথমেই তাঁরা পর্তুগীজ বণিকদের সাথে কাজ করতে আরম্ভ করেন। কিছুদিন পর পুরোহিতদ্বয় জানতে পারেন যে, অনেক পর্তুগীজ বণিক মোগল সম্রাটকে কর ফাঁকি দেয়। তাঁরা অবশেষে ঘোষণা দেন যে, যেসব বণিক মোগল সম্রাটকে কর ফাঁকি দেয় বা দিবে তাদের পরিবারের জন্য কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদন করা হবে না। এই ঘটনা আকবরের কর্ণগোচর হলে তিনি পুরোহিতগণের সততা ও ধার্মিকতায় মুগ্ধ হন।[৩৯] তিনি উপলব্ধি করেন যে. অন্যায় আচরণ করলে খ্রিস্টীয় ন্যায়নীতি তা বরদাস্ত করে না।

৪.১১ সম্রাট আকবরের রাজসভায় যেজুইট যাজকগণ

আকবর তাঁর মায়ের দিক থেকে সূফী মনোভাব পেয়েছিলেন। ঈশ্বরকে তিনি প্রেম, সৌন্দর্য ও মানবিক গুণের উৎসরূপেই কল্পনা করতেন, তবে কঠোর বিচারকরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না। মাতা মেরী ও যীশুর আত্মোৎসর্গের কাহিনী পর্তুগীজদের কাছ থেকে শোনার পর আকবরের হৃদয়ে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও করুণার উদ্রেক হয়েছিল।[৪০] সেই প্রেরণাতেই তিনি খ্রিস্টান মিশনারীদের তার রাজদরবারে আমন্ত্রণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

১৫৭৮ খ্রিঃ মার্চ মাসে ফাদার পেরেইরা দু'জন সহযোগীকে সঙ্গে নিয়ে ফতেপুর সিক্রিতে উপস্থিত হন। আকবর অধিকতর জানার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে গোয়ার আর্চবিশপ ও ভারতস্থিত যেজুইটদের প্রভিন্সিয়াল (আঞ্চলিক অধ্যক্ষ)-এর নিকট দু'জন সুপণ্ডিত ব্যক্তিকে তাঁর কাছে প্রেরণ করার অনুরোধ জানিয়ে পত্র লিখেন। প্রভিন্সিয়ালের নির্দেশে ১৯৭৯ খ্রিঃ ১৭ নভেম্বর ফাদার হেনরিকুয়েজ ও ফাদার আন্তোনিও মোনসারেট গোয়া থেকে আকবরের রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁরা ১৫৮০ খ্রিঃ ২৮ ফেব্রুয়ারী ফতেপুর সিক্রিতে আকবরের রাজদরবারে উপস্থিত হন।[৪১]

৪.১২ আকবরের দরবারে প্রেমবাণী প্রচার

১৫৮০, ১৫৯০, ১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে যেজুইট পুরোহিতদের একটি ক্ষুদ্র দল গোয়া থেকে মুগল সম্রাট মহামতি আকবরের দরবারে যান।[৪২]

সম্রাট আকবর ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ছিলেন ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি ভারতের প্রধান প্রধান ধর্মগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে যোগ্য ধর্মপ্রচারকদের তাঁর রাজদরবারে আহ্বান করে 'ইবাদতখানায়' বসে তাঁদের সঙ্গে ধর্মালোচনা করতেন।

তিনি সুপ্রসিদ্ধ কয়েকজন খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্ববিদ পুরোহিতদের সংবাদ পেয়ে যেজুইট ধর্মাধ্যক্ষের কাছে তাঁদের কয়েকজনকে রাজদরবারে পাঠানোর অনুরোধ জানান। তাঁর অনুরোধক্রমে ৩জন পুরোহিত রাজধানী দিল্লীর উদ্দেশ্যে প্রেরিত হন। আকবর সানন্দে তাদের কাছ থেকে একটি 'বাইবেল' উপঢৌকনরূপে গ্রহণ করেন।[৪৩]

আকবর খ্রিস্টধর্মের পৃষ্ঠপোষক হলেও তিনি যে এই ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তার কোন প্রমাণ নেই। তবে তিনি গীর্জাঘরে উপাসনায় ভক্তি সহকারে যোগদান করতেন।

তিনি পর্তুগীজ ভাষা ও খ্রিস্টধর্ম শিক্ষার জন্য পুত্র মুরাদকে ফাদার মন্তসেরাতের হাতে সমর্পণ করেন।[৪৪] এমনকি কোন রাজনৈতিক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েতিনি বহুবার যেজুইট পুরোহিতদের শরণাপন্ন হয়েছিলেন।

লাহোরে মুগল রাজধানী স্থানান্তরিত হলে আকবর কাথলিক পুরোহিতদের রাজদরবারে আনয়নের জন্য গোয়ার ধর্মাধ্যক্ষকে বারংবার অনুরোধ করেন।

১৫৯১ খ্রিঃ ধর্মজ্ঞানী পুরোহিতগণ তাঁর নতুন রাজধানী লাহোরে গমন করেন। সম্রাট তাঁদের উপর স্থানীয় শিক্ষাকেন্দ্রের পরিচালনার দায়িত্বভার ন্যস্ত করেন।[৪৫] এই শিক্ষাকেন্দ্রে সম্রাটের পুত্র, আমলা ও অভিজাত পরিবারের সন্তানরা পড়াশোনা করতো। তিনি কাথলিকদের জন্য উপাসনাগৃহ নির্মাণ করে দেন। এছাড়া একটি উচ্চমানের মহাবিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্বও তিনি পুরোহিতদের উপর ন্যস্ত করেন।

১৬০৫ খ্রিঃ ২৭শে অক্টোবর সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সেলিম (জাহাঙ্গীর) দিল্লীর মসনদে আরোহণ করেন। তিনি আগ্রায় একটি গীর্জা ও একটি মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনিও কাথলিক পুরোহিতদের শিক্ষা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতেন। গোয়া, দিল্লী ও লাহোরে কাথলিক মণ্ডলীর

যেসব উপকেন্দ্রগুলো অদ্যাবধি বিদ্যমান, সেগুলোর সঙ্গে সম্রাট জাহাঙ্গীরের পরধর্মসহিষ্ণুতার স্মৃতি জড়িত। কাথলিক ধর্মমতবাদ সম্প্রসারণে জাহাঙ্গীর ছিলেন পিতা আকবরের উত্তরসুরি।[৪৬]

(Fr. Robert De Nobili) একজন যেজুইট ধর্মব্রতী ছিলেন। তিনি ১৬২৮ খ্রিঃ গোয়া পৌঁছানোর দু'বৎসর পর তাঁকে তামিল ভাষা শিক্ষার জন্য মাদুরায় প্রেরণ করা হয়। এই নগরী তখন ন্যায়শাস্ত্র, ধর্মতত্ত্ব ও বিজ্ঞানচর্চার পীঠস্থান ছিল। তিনি প্রচারকাজের সফলতার জন্য হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি অনুকরণ করে পুরোহিতদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভারতীয় সন্ন্যাসীর বেশভূষা ধারণ করেন। তখন পোপ পঞ্চদশ গ্রেগরি 'ব্রাহ্মণ দে'নবিলির মহৎ উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তাকে উৎসাহিত করেন।

সাধু যোহন দে ব্রিতো যাজকীয় অভিষেক গ্রহণের পর ১৬৭৩ খ্রিঃ ভারতের মাদুরা নগরে আসেন। খ্রিস্টবাণী প্রচারের অভিযোগে তাকে ১৬৯৩ খ্রিঃ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী শিরশ্ছেদ করা হয়।

আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় ও পর্তুগীজ বণিকদের কর্মদক্ষতায় ১৫৭৯ খ্রিঃ এই বন্দরটির খ্যাতি দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। এই হুগলী বন্দর মোগল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরেই একটি স্বাধীন নগররাষ্ট্রে পরিণত হয়। হুগলীর এই বিশেষ মর্যাদা ও বাণিজ্যখ্যাতির ফলে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির লোক এসে এখানে বসতি স্থাপন করতে আরম্ভ করে। ক্যাপ্টেন পেদ্রো তাভারেজ ছিলেন হুগলীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনবান ব্যক্তি। হুগলীর পর্তুগীজদের অভাবনীয় অর্থনৈতিক উন্নতিতে আকৃষ্ট হয়ে বঙ্গদেশের বিভিন্ন প্রসিদ্ধ স্থানে বসতি স্থাপন করার ফলে খ্রিস্টানদের সংখ্যা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৪৭]

বিখ্যাত পর্যটক র‍্যালফ ফিচ (Ralf Fitch) ১৫৮৮ খ্রিঃ বঙ্গদেশে আগমন করেন। তাঁর বিবরণীতে পাওয়া যায় যে, সপ্তগ্রাম বন্দর কর্মব্যস্ত থাকলেও তার পূর্ব-গৌরব ছিল অস্তমিত হওয়ার পথে। পক্ষান্তরে হুগলী বন্দরের শ্রীবৃদ্ধির জোয়ার বাইতে শুরু করেছে। কালক্রমে হুগলীতে খ্রিস্টানের সংখ্যা দশ হাজার অতিক্রম করে।[৪৮] অথচ এই বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় কার্যক্রম, আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য কোন পুরোহিত ছিল না। বিশপ আন্দ্রেয়ার ব্যক্তিগত উদ্যম, আগ্রহ ও কর্মতৎপরতায় বঙ্গদেশে মিশনারী প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৪.১৩ আগস্টিনিয়ান ধর্মসংঘের যাজকদের আগমন

আগস্টিনিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত (Canon Regular of St. Augustine) পুরোহিতগণ ১৫৮৯ খ্রিঃ থেকে কোচিন ধর্মপ্রদেশে ধর্মপ্রচার, মিশন পরিচালনা ও শিক্ষাদান কার্যে ব্যস্ত ছিলেন।

১৫৯০ খ্রিঃ ৫জন মিশনারী কোচিন থেকে সমুদ্রপথে যাত্রা করে বর্ষাকালে হুগলী বন্দরে অবতরণ করেন। স্থানীয় পর্তুগীজ ও দেশীয় খ্রিস্টানগণ মহা আনন্দে ও ধূমধামের সাথে তাদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে। হুগলীতে সাময়িকভাবে ৪টি গির্জিকা (Chapel) নির্মিত হয়। পুরোহিতগণ গির্জিকাগুলোতে খ্রিস্টীয় উপাসনা ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদন করতে থাকেন। উপাসনাকালে এই বৃহৎ সম্প্রদায়ের স্থান সংকুলান হতো না। তাই নেতৃবৃন্দ হুগলীতে বৃহৎ গির্জা নির্মাণ করে স্থানীয়ভাবে মিশনকেন্দ্র স্থাপনের আবেদন করে। অতঃপর তাঁরা হুগলীর ক্যাপ্টেনের সক্রিয় সহযোগিতায় হুগলীর উত্তরে নদীর তীরে গির্জা ও কনভেন্ট নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ করেন। খ্রিস্টীয় সম্প্রদায় এই গির্জা নির্মাণের উপকরণ সরবরাহ করে মিশনারীদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল। অবশেষে ১৫৯৯ খ্রিঃ ১৫ আগষ্ট মহাগির্জার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হলো। ব্যাণ্ডেলের এই গির্জা অতীতের বহু কীর্তি-কাহিনী ও গৌরবের স্মৃতি বক্ষে লালন করে, যুদ্ধজনিত বহু দুঃখ ও বেদনার ক্ষতচিহ্ন অঙ্গে ধারণ করে জাতি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বহু শোকার্ত ও বেদনার্ত প্রাণের অশ্রুজলে সিক্ত হয়ে, বহু পুণ্যার্থী ও পুণ্যজনের চরণধুলিতে মণ্ডিত হয়ে, ইতিহাসের নীরব সাক্ষীরূপে আজও সগৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।[৪৯]

বঙ্গদেশে প্রেরিত এই ৫জন মিশনারীর ধর্মপ্রচার কার্যের বিস্তৃত বিবরণ অবগত হওয়ার পর কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত প্রীত হয়ে আরো ৭জন মিশনারীকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৬০০ খ্রিঃ ৭জন মিশনারী হুগলীতে আগমন করেন। তাঁদেরসহ বঙ্গদেশে মিশনারীর সংখ্যা হলো ১২ জন। তাঁরা বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে গমন করেন।

আগস্টিনিয়ান ফাদারগণ বাহাদুর খাঁর অনুমতিক্রমে হিজলীতে একটি মিশন প্রতিষ্ঠা করেন এবং 'জপমালার রাণী' নামাঙ্কিত করে একটি গির্জা নির্মাণ করেন। হিজলী ও তমলুকের মধ্যবর্তী বঞ্জ নামক স্থানে (বর্তমানে হলদিয়া গেঁওয়াখানি) পর্তুগীজদের সংখ্যা অধিক ছিল। তাই এই অঞ্চলে তাঁরা ৩টি গির্জা ও একটি হাসপাতাল নির্মাণ করেন। এখানে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সব সম্প্রদায়ের মানুষ

চিকিৎসার সুযোগ পেতো। হিজলী রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে উড়িষ্যার পিপলীতে ফাদারগণ একটি ক্ষুদ্র মিশন ও গির্জা স্থাপন করেন। এই গির্জাগুলোকে কেন্দ্র করে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে ফাদারগণ খ্রিস্টবাণী প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।[৫০]

৪.১৪ পূর্ববঙ্গে গমন

এরপর তাঁরা ঢাকা শহরের উপকণ্ঠে নারিন্দায়, কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুরে, নারিকুল ও নাগরীতে মিশনকেন্দ্র স্থাপন করে স্থানীয় জনসাধারণের কাছে খ্রিস্টবাণী প্রচার করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সমন্বয়ে গঠিত সুবৃহৎ এই বঙ্গদেশে পুরোহিতের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। পরবর্তীতে আগস্টিনিয়ান, যেজুইট ও ডমিনিকান সম্প্রদায়ের যাজকদের যৌথ প্রয়াসে বঙ্গদেশের বিভিন্ন এলাকায় খ্রিস্টবাণী প্রচারিত হতে থাকে এবং বিভিন্ন স্থানে খ্রিস্টমণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।[৫১]

আগস্টিনিয়ান সম্প্রদায়ের ফাদারগণ হুগলী, হিজলী, পিপলী, তমলুক এবং ঢাকা, নরিকুল ও নাগরীতে মিশনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে এসব অঞ্চলে খ্রিস্টবাণী প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তারা হুগলীতে প্রধান কার্যালয় স্থাপন করে বঙ্গদেশের মধ্য অঞ্চল ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে খ্রিস্টবাণী প্রচারে রত আছেন।[৫২]

৪.১৫ যেজুইটদের পুনরাগমন (১৫৯৮ খ্রিঃ)

২৯শে মে ৪জন যেজুইট ফাদার সামুদ্রিক ঝড়তুফানের মধ্য দিয়ে যাত্রা করে হুগলীতে অবতরণ করেন। প্রবল ঝড়ের মধ্য দিয়ে আসার সময় তাঁরা কুমারী মারীয়ার কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে প্রার্থনা জানায়। তাঁরা সংকল্প করেন যে, মায়ের কৃপায় তাঁরা যদি ঝড়ের কবল থেকে রক্ষা পান, তবে তাঁরা জাহাজের সম্মুখভাগের মাস্তুলটি কৃপা-চিহ্ন বা স্মরণচিহ্ন হিসাবে কোন এক স্থানে স্থাপন করবেন। ব্যাণ্ডেলমঠের প্রবেশদ্বারের পাশে বসানো সেই মাস্তুলটি আজও বিদ্যমান।

যেজুইট বা যীশু-সংঘ প্রতিষ্ঠার অল্পকালের মধ্যেই শিক্ষাবিদ হিসাবে যেজুইট ফাদারদের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তারা এখানে একটি হাসপাতাল নির্মাণ করেন। তাদের পরিকল্পনা ছিল চট্টগ্রামে তাঁদের প্রধান কার্যালয় স্থাপন করে তাঁরা পূর্ববঙ্গে খ্রিস্টবাণী প্রচার করবেন।

৪.১৬ পূর্ববঙ্গে - যশোহর রাজ্য

আধুনিক কালের যশোহর, খুলনা ও ২৪ পরগনা নিয়ে ছিল যশোহর রাজ্য। এই রাজ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকরি উপলক্ষে বহু পর্তুগীজ ও পর্তুগীজদের দ্বারা দীক্ষিত কিছু সংখ্যক বাঙ্গালী খ্রিস্টানদের বসতি গড়ে উঠেছিল। যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য পর্তুগীজদের কাছ থেকে যেজুইট ফাদারদের পাণ্ডিত্য ও উন্নত লোকসেবাব্রতের কথা অবগত হন। তখন তিনি তাঁর রাজ্যে কর্মকেন্দ্র স্থাপন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

১৫৯৯ খ্রিঃ মে মাসে ফাদার ডি'সুজা বাংলাদেশের সাতক্ষীরা শহরের পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে সুন্দরবনের জঙ্গলে মাটির প্রাচীর দিয়ে নির্মিত ও পরিখাবেষ্টিত দুর্গনগরী যশোহর-রাজ প্রতাপাদিত্যের রাজধানী চাঁদকোনে উপস্থিত হন। তিনি একাই যশোহর রাজ্যে খ্রিস্টবাণী প্রচার করতে থাকেন।[৫৩]

৪.১৭ বাকলা (বরিশাল/বাখরগঞ্জ)

ফাদার ফারনানদেস রাজা প্রতাপদিত্যের সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য চাঁদকোনে এসে পৌঁছান। একমাস অতিবাহিত করার পর তিনি কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেখান থেকে তিনি চট্টগ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন। চট্টগ্রাম থেকে চাঁদকোনে আসার পথে ফাদার ফনসেকা বাকলা বন্দরে উপস্থিত হন। এই বন্দরে পর্তুগীজ ও খ্রিস্টানদের বসতি ছিল। এখানে পুরোহিত না থাকায় তাঁরা ধর্মীয় উপাসনার সুযোগ পাননি। সেই সময় বাকলার রাজা ছিলেন রামচন্দ্র। তার বয়স ছিল ৮/৯ বছর মাত্র। তিনি ফাদারকে তাঁর রাজ্যে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের অনুমতি দেন[৫৪] ও গির্জা নির্মাণের অনুরোধ জানান।

১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২০ শে নভেম্বর ফাদার চাঁদকোনে উপস্থিত হন। অন্যান্য ফাদারদের সঙ্গে একান্তে আলোচনার পর তিনি চাঁদকোনে খ্রিস্টান মিশন ও কর্মক্ষেত্র স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেন।

চাঁদকোনের সংলগ্ন ইছামতি নদীর তীরে ঈশ্বরীপুরে জমি প্রাপ্তির পর তিনি গীর্জা নির্মাণের কাজ শুরু করেন। এর নামকরণ হয় 'যীশুর গির্জা' (Church of Gesue)। এটিই বঙ্গদেশে যেজুইটদের দ্বারা নির্মিত প্রথম গির্জা। ১৬০০ খ্রিঃ ১লা জানুয়ারি এর উদ্বোধন কার্য সম্পন্ন করা হয়। তবে এর অস্তিত্ব

এখন নেই। এই স্থান এখন ঈশ্বরীপুরের জঙ্গল নামে পরিচিত। এই গীর্জার ধবংসাবশেষ এখন পুরোহিতদের গবেষণার বিষয় মাত্র।

৪.১৮ শ্রীপুর

কেদার রায়ের রাজধানী ছিল পদ্মার তীরে অবস্থিত শ্রীপুর। এখানে অনেক পর্তুগীজ ও খ্রিস্টানদের বসবাস ছিল। এখানে ফাদার ফারনানদেজ খ্রিস্টানদের তত্ত্বাবধান করতেন ও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদন করতেন।[৫৫] এখান থেকে ৪জন বাঙ্গালী যুবক পুরোহিতপদপ্রার্থী হিসাবে ধর্মশিক্ষার জন্য গোয়ার সেমিনারীতে প্রবেশ করেন। তাদের মধ্য থেকে একজন পুরোহিত হিসাবে অভিষিক্ত হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তিনিই প্রথম বাঙ্গালী ধর্মযাজক; তাঁর নাম ম্যানুয়েল গ্রাসিয়া। ১৬৩২ খ্রিঃ সম্রাট শাহজাহানের মুগলবাহিনী ব্যাণ্ডেল আক্রমন করেন। তীব্র যুদ্ধের সময়ে সেখানকার পর্তুগীজ খ্রিস্টান ও যাজকদের বন্দী করে আগ্রায় নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে ফাদার ম্যানুয়েল ছিলেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারাগারে অকথ্য অত্যাচার ও নিপীড়নের ফলে ১৬৩০ খ্রিঃ ২৩ মার্চ তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

৪.১৯ চট্টগ্রাম ও দিয়াঙ্গা

১৫৯৯ খ্রিঃ যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের আহ্বানে যেজুইটদের প্রধান ও আরো ৪জন চাঁদকোনে গমন করেন এবং সেখান থেকে তাঁরা কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুরে গমন করেন। সেখান থেকে তাঁরা চট্টগ্রামে আসেন ও স্থায়ীভাবে বসবাস করার মনস্থ করেন।

চট্টগ্রাম ছিল আরাকান রাজ্যের অন্তর্গত। সেখানে আরাকান রাজার সাথে সুসম্পর্ক থাকার কারণে তাঁরা গির্জা তৈরির অনুমতি লাভ করেন। ১৬০০ খ্রিঃ ২৪শে জুন সেই নতুন গির্জার উদ্বোধন করা হয়।

চট্টগ্রামের ২০ মাইল দক্ষিণে কর্ণফুলি নদীর অপর পাড়ে দিয়াঙ্গায় পর্তুগীজদের একটি ক্ষুদ্র উপনিবেশ ও বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। সেখানেও তারা একটি গির্জা নির্মাণ করেন।[৫৬]

৪.২০ ডমিনিকান সংঘের যাজকগণ

ডমিনিকান সম্প্রদায়ের ফাদারগণ দিয়াঙ্গাতে তাদের প্রধান কার্যালয় স্থাপন করে যেজুইট ফাদারদের সহযোগী হয়ে চট্টগ্রাম ও মেঘনা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে খ্রিস্টবাণী প্রচার করতে থাকেন।

১৬০১- ১৬০৫ খ্রিঃ পর্যন্ত তারা পূর্ববঙ্গে অবস্থান করেন। তারা দিয়াঙ্গাতে একটি গির্জা নির্মাণ করেন। ইতিমধ্যে আরও ৪জন যেজুইট ফাদার চট্টগ্রামে আগমন করেন। এই নবাগত ফাদারদের সন্দীপে প্রেরণ করা হয়। তাঁরা সেখানে গির্জা নির্মাণ করেন এবং তার নিকটবর্তী দ্বীপগুলোতে খ্রিস্টবাণী প্রচারে ব্যস্ত থাকেন।[৫৭]

বঙ্গদেশে খ্রিস্টবাণী প্রচার ও খ্রিস্টমণ্ডলী প্রতিষ্ঠার কাজ যখন দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলছিল, সেই সময় খ্রিস্টমণ্ডলীর উপর ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসে। শুরু হয় সন্দীপের যুদ্ধ। ফলে চট্টগ্রাম, দিয়াঙ্গা, সন্দীপ ও চাঁদকোন (যশোহর) এলাকায় যেজুইট ফাদারদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত খ্রিস্টমণ্ডলী বিলুপ্ত হয়ে যায়। তখন যাজকগণ হুগলীতে চলে আসেন।

১৬০৬ খ্রিস্টাব্দের শুরু থেকে পূর্ববঙ্গে খ্রিস্টমণ্ডলী পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস আরম্ভ হয়। ১৬০৬ খ্রিঃ ৯ই জানুয়ারী পোপ ৫ম পল মাইলাপুর (চেন্নাই)কে কেন্দ্র করে নতুন ধর্মপ্রদেশ গঠন করেন।[৫৮] সমগ্র বঙ্গদেশ মাইলাপুর ধর্মপ্রদেশের অঞ্চলভুক্ত হয়। তখন বঙ্গদেশে আগস্টিনিয়ান সম্প্রদায়ের ফাদারগণ কর্মরত ছিলেন। তাঁদের সহায়তা করার জন্য ফ্রান্সিসকান সন্ন্যাসব্রতীগণ বঙ্গদেশে এসেছিলেন।

আগস্টিনিয়ান ফাদারগণ ১৬০১ খ্রিঃ শ্রীপুরের খ্রিস্টমণ্ডলীর পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শ্রীপুর ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জ মহকুমায় পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। বাংলার বারো ভূঁইয়াদের অন্যতম চাঁদরায় ও কেদার রায়ের রাজধানী হিসাবে শ্রীপুর বঙ্গদেশের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে গেছে।

আগস্টিনিয়ান ফাদারগণ শ্রীপুর থেকে ক্রমান্বয়ে ঢাকা, লরিকুল, কাত্রাবু প্রভৃতি স্থানে খ্রিস্টবাণী প্রচার করেন ও খ্রিস্টমণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করেন।[৫৯]

১৬০৮ খ্রিঃ সুবাদার ইসলাম খাঁ ঢাকাকে বঙ্গদেশের রাজধানীতে পরিণত করার পর থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। পর্তুগীজদের ঢাকায় বসতি স্থাপনের পরেই আগস্টিনিয়ান ফাদারগণ ১৬১২ খ্রিঃ ঢাকায় গমন করেন এবং নারিন্দায় গির্জা নির্মাণ করেন। ঢাকাকে কেন্দ্র করে তাঁরা নিকটবর্তী অঞ্চলগুলোতে খ্রিস্টবাণী প্রচার করতে থাকেন।[৬০]

ঢাকা থেকে ২৮ মাইল দক্ষিণে পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল লরিকুল। এটা একটা নদীবন্দর ছিল। আগস্টিনিয়ান ফাদারগণ এখানে একটি গির্জা নির্মাণ করেন।

ঢাকা জেলার শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল 'কাত্রাবু' নামে একটি বাণিজ্য কেন্দ্র। পর্তুগীজরা এখানে তাদের প্রভাব- প্রতিপত্তি বিস্তার করেছিল। আগস্টিনিয়ান ফাদারগণ এখানে মিশনকেন্দ্র স্থাপন করেন ও একটি গির্জা নির্মাণ করেন।

১৬১৫ খ্রিঃ সন্দীপের ২য় যুদ্ধ শুরু হয়।

১৬১৬ খ্রিঃ এযুদ্ধের অবসান ঘটে।

১৬১৬ খ্রিঃ সমগ্র বঙ্গদেশে ৬জন যেজুইট ফাদার ছিলেন। তাদের মধ্যে ১জন ঢাকায়, ৪জন ব্যাণ্ডেলে ও ১জন শ্রীপুরে।

১৬১৭ খ্রিঃ যেজুইট ফাদারগণ ব্যাণ্ডেলে তাদের আবাসিক গৃহ ও কলেজভবন নির্মাণের কাজ আরম্ভ করেন। ব্যাণ্ডেল থেকেই ফাদারগণ পিপলী ও হিজলীর মিশনকেন্দ্রগুলো দেখাশুনা করতে থাকেন।

১৬২১ খ্রিঃ আরাকানী ও পর্তুগীজদের মধ্যে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়। শান্তিচুক্তি স্থাপনের পর চট্টগ্রাম, দিয়াঙ্গা ও সন্দীপে নতুন ভাবে খ্রিস্টমণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হয়।[৬১] আগস্টিনিয়ান ফাদারগণ এসব মণ্ডলী পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

১৬০২ খ্রিঃ সংঘটিত প্রথম সন্দীপ যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত বঙ্গদেশে খ্রিস্টবাণী প্রচার ও প্রতিষ্ঠার পক্ষে এক অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান ছিল।

আগস্টিনিয়ান ফাদারদের লিখিত বিবরণী থেকে জানা যায় যে, ১৬০১-১৬০২ খ্রিঃ পর্যন্ত সমগ্র বঙ্গদেশে ৬২,৬০৬ জন খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়। বঙ্গদেশের বর্তমান খ্রিস্টান জনসংখ্যার অনুপাতে প্রায় ৪০০ বছর আগে এদেশের খ্রিস্টান জনসংখ্যা আশাতিরিক্ত বলে মনে হয়।[৬২] তবে পর্তুগীজরাই ছিল সংখ্যাধিক্য।

১৬২২ খ্রিস্টাব্দের পর বঙ্গদেশের খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা হয়।

মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর তার উদারচেতা পিতা সম্রাট আকবরের মতোই খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। এমন কি তিনি মোগল সাম্রাজ্যে মিশনারীদের গির্জা নির্মাণ ও নবদীক্ষিত খ্রিস্টানদের সাহায্যের জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করতেন। কিন্তু পর্তুগীজ জলদস্যুদের অপকর্মের জন্য তিনি পর্তুগীজদের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। ফলে তিনি পশ্চিম ভারতে পর্তুগীজদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। তবে যে সমস্ত পর্তুগীজ মিশনারী খ্রিস্টধর্মপ্রচারে রত ছিলেন, তাদের উদ্যম ও উৎসাহ, কায়িক পরিশ্রম ও ক্লেশভোগ, ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে।[৬৩]

১৬৩২ খ্রিঃ হুগলীর যুদ্ধ শুরু হয়। পর্তুগীজরা মোগলদের কাছে পরাজিত হয়। ফলে মোগলদের হাতে অনেক পর্তুগীজ ও বাঙ্গালী খ্রিস্টানরা বন্দী হয়। তাদের মধ্যে ফাদার ম্যানুয়েল গ্রাসিয়া ছিলেন শ্রীপুরের অধিবাসী এবং প্রথম বাঙ্গালী পুরোহিত। তিনি ১৬৩৪ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে জুন কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন।

১৬৮২ খ্রিঃ আগস্টিনিয়ান ফাদারদের লিখিত Analecta Augustiniana নামক বিবরণীতে জানা যায়, সমগ্র বঙ্গদেশে তখন খ্রিস্টানদের সংখ্যা ছিল ২৭ হাজার। তার মধ্যে পূর্ববঙ্গে ১৪,১২০ জন ও পশ্চিম বঙ্গে ১২,৮৮০ জন। এরা সবাই ছিল প্রাপ্ত বয়স্ক।[৬৪]

পর্তুগীজ ফাদারগণ ১৫৭৬-১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বঙ্গদেশে গিয়ে খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন, তার মধ্যে পর্তুগীজ ও ফিরিঙ্গীগণই ছিল আর্থিক দিক দিয়ে সচ্ছল। পক্ষান্তরে বাঙালী খ্রিস্টানগণ ছিল কৃষক শ্রেণীর, দিনমজুর ও হতদরিদ্র। তবে ব্যতিক্রমী ছিলেন বাংলার বারো ভূঁইঞাদের অন্যতম ফরিদপুর শহরের কুড়ি মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ভূষণা রাজ্যের রাজপুত্র খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত দোম আন্তনিও ডি'রোজারিও। সে যুগে স্বনামধন্য বঙ্গসন্তান ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে এমন এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন যে, তাকে ঘিরে ভারত ও ইউরোপে প্রচণ্ড বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলা ভাষার প্রথম

মুদ্রিত গদ্যপুস্তক 'ব্রাহ্মণ রোমান কাথলিক সংবাদ' গ্রন্থের লেখক হিসাবে একজন নিষ্ঠাবান খ্রিস্টান, খ্রিস্টধর্ম শাস্ত্রবিদ ও খ্রিস্টধর্মের প্রচারক হিসাবে তিনি ছিলেন বহুল আলোচিত ব্যক্তি।[৬৫]

সারা ভারতে 'আগস্টিনিয়ান সংঘ' ও 'যেজুইট সম্প্রদায়ের' মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে সারা ভারতে যেজুইটগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও বঙ্গদেশে আগস্টিনিয়ান ফাদারদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব ছিল।

যেজুইটরা প্রথম বঙ্গদেশে আসেন। হুগলীতে একসময় তাদের বিরাট মিশন বা কর্মক্ষেত্র ছিল। তারা সেখানে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে জনগণের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। আরাকান, কোচবিহার ও ব্রহ্মদেশের পেগু অঞ্চলে তাদের প্রতিষ্ঠা ছিল।

১৯১৮ খ্রিঃ ডোম আন্তনিও পরিচয় করিয়ে দেন ফাদার হোস্টেন, বঙ্গদেশে কর্মরত পর্তুগীজ ফাদারদের স্বহস্তে লিখিত বহু পত্র ও প্রতিবেদন থেকে। ড. মুখোপাধ্যায় প্রত্যক্ষদর্শীর লিখিত বিবরণ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে আন্তনিওকে রূপকথার জগৎ থেকে তুলে এনে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে দিয়েছেন।

জার্মানীতে মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে প্রোটেস্টান্ট বা প্রতিবাদী ধর্মমতের উদ্ভব হয়। পর্তুগীজদের পরে তারা বঙ্গদেশে আগমন করেন। তারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সদস্য ছিলেন। এগুলো হলো :

ব্যাপ্টিস্ট মিশনারী সোসাইটি	(B.M.S)
চার্চ মিশনারী সোসাইটি	(C.M.S)
লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি	(L.M.S)
ওসেনিয়ান মেথোডিস্ট	(W.W.M.S)

বাঙ্গালী কাথলিক সমাজ যখন অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত, সামাজিক অনাচার ও দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে মৃতপ্রায়, ঠিক সেই সময় প্রোটেষ্টান্ট মিশনারীদের আগমন ঘটে।

৪.২১ ঢাকা জেলায় খ্রিস্টবাণী প্রচার

ডোম আন্তনীও ২৩ বৎসর বয়সে খ্রিস্টধর্মতত্ত্বে ও পর্তুগীজ লিখিত ও কথ্য ভাষার প্রচারে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ফাদার মানুয়েল যখন চট্টগ্রাম ছেড়ে গোয়ায় বদলী হন, তখন দোম আন্তনিও ঢাকায় গমন

করেন। সেখানে তিনি তার স্বজাতি একটি মেয়েকে বিয়ে করে দু'জনেই খ্রিস্টধর্ম প্রচার শুরু করেন। তিনি দুই বছরের মধ্যেই ভাওয়াল অঞ্চলের ২০ হাজারের বেশি লোককে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেন।[৬৬] শায়েস্তা খাঁ তাকে কিছু জমি দান করেন ও চারটি গ্রামের চৌধুরী পদ (শাসনকর্তা) দান করেন।

পরবর্তীতে যেজুইটগণ ঢাকায় আগমন করেন। তখন দোম আন্তনিত্তর বয়স ৩৫-৪০ বৎসরের মধ্যে। তিনি ধর্মনগরে জীবন যাপন করতেন। তিনি ভালো ক্যাটেখিজম (ধর্মশিক্ষা পুস্তক) তৈরি করেছেন।

৪.২২ কাথলিক মণ্ডলীর পুরোহিতগণ

১. Religious Priest (সংঘভুক্ত) - সন্ন্যাসব্রতী যাজক
(যেজুইট, হলিক্রস, আগস্টিনিয়ান, সালেসীয়) সংসারের সাথে পৈতৃক ভাবে যোগাযোগ থাকেনা

২. Secular Priests (গৃহী যাজক)তাঁরা বিশপের অধীনে থেকে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করেন, চিরকৌমার্য ব্রত পালন করেন (গোয়ানিজ ফাদারগণ)।

১৭৬৪ খ্রিঃ রাজা বল্লভ সেন পর্তুগীজ আগস্টিনিয়ান যাজক ফাদার রাফায়েলকে শিবপুর তালুকটি দান করেন। রাজা তাঁর ব্যক্তিত্ব ও ধার্মিকতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। কালক্রমে শিবপুর অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল একটি প্রধান ধর্মপ্রচার কেন্দ্রে পরিণত হয়। শিবপুরে পাদ্রীদের জমিদারী প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় লোকমুখে এই স্থানের নাম পাদ্রীশিবপুর হিসাবে প্রচলিত হয়ে ওঠে।

ঢাকা জেলার হাসনাবাদ অঞ্চলে দোস্ত মুহাম্মদ ওসমান নামে এক মুগল জায়গীরদার ছিলেন। সেই সময় ফাদার রাফায়েল হাসনাবাদ অঞ্চলে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন। ১৭৭৪ খ্রিঃ তিনি জায়গীরদার বা জমিদার হয়ে ওঠেন।

১৬৩৪ খ্রিঃ সম্রাট শাজাহান ব্যাণ্ডেলে ৭৭৭ বিঘা জমি দান করেন।

১৮৩৪ খ্রিঃ ১৮ এপ্রিল পোপের নির্দেশে 'বঙ্গদেশে ভিকারিয়েট অ্যাপোস্টলিক' (পোপের প্রতিনিধি ধর্মাঞ্চল) গঠিত হয়। যিনি ধর্মাঞ্চল পরিচালনা করেন তাঁকে বলা হয় Vicar Apostolic। বঙ্গদেশের মিশন পরিচালনার দায়িত্ব ইংরেজ যেজুইটদের হাতে ন্যস্ত করা হয় এবং ফাদার রবার্ট সেন্ট লেজের (এস জে) কে ভিকার অ্যাপোস্টলিক নিযুক্ত করা হয়।

১৮৩৪ খ্রিঃ ৫ অক্টোবর ফাদার সেন্ট লেজের, এস জে, ৫জন ফাদার, দু'জন ব্রাদার কলকাতায় আগমন করেন। তারা ১৮৩৫ খ্রিঃ হতে ১৮৩৮ খ্রিঃ পর্যন্ত বঙ্গদেশের কাথলিক মণ্ডলী পরিচালনা করেন। তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টবাণী প্রচার করা, কাথলিক মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করা, শিক্ষা ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে জনসেবা করা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করা।

বঙ্গদেশে তখন যাজকের সংখ্যা ছিল ১৮জন। এর মধ্যে থেকে ২জন স্কুল পরিচালনায় নিযুক্ত হওয়ায় বাকি ১৬ জন যাজক মিশন পরিচালনায় কাজ শুরু করেন। এই সময় ঢাকা জেলার নাগরী, পাঞ্জোরা ও হাসনাবাদে তিনজন গোয়ানীজ পাদ্রোয়াদো যাজক ছিলেন। তারা ছিলেন ভিকার অ্যাপোস্টলিকের বিরোধী।

১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা জুলাই ফাদার হিপোলিতুস মরো (Moreau) ঢাকায় গমন করেন। তখন ঢাকা জেলার কাথলিকদের সংখ্যা ছিল ৯,২১০ জন।[৬৭] এরা ৪টি গির্জার অধীনে বসবাস করতো।

যথা :

১। 'ভক্তিরাণীর' গির্জা- ২০০ জন, আমপট্টিতে (১৮১৫ খ্রিঃ)

২। 'সাধু নিকোলাসের' গির্জা- ৪,০০০ জন, নাগরীতে (১৬৭৭ খ্রিঃ)

৩। 'জপমালার রাণী'- ১০জন, তেজগাঁও (১৬৭৭ খ্রিঃ)

৪। 'জপমালার গির্জা'- ৫,০০০ হাসনাবাদে (১৭৭৭ খ্রিঃ)

ঢাকা জেলার ২৩টি গ্রামে কাথলিকগণ বসবাস করতো।[৬৮]

ফাদার মরো দুসে পরিবারের তালুক থেকে প্রাপ্ত জমির উপর একটি অস্থায়ী গির্জা নির্মাণ করেন এবং তুমিলিয়া নামক স্থানে একখণ্ড জমি কবরস্থানের জন্য নির্দিষ্ট করেন।

ফাদার মরোর অনুরোধে ফাদার চ্যাডউক (Chadwick) কে ঢাকায় প্রেরণ করেন। এরপর একটি নৌকা ক্রয় করে বিভিন্ন গ্রামে কাথলিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে আরম্ভ করে।

১৮৪১ খ্রিঃ চট্টগ্রামে ফাদার গোয়ারাঁ (Goiran) কে প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে গির্জাঘর ও যাজকভবন নির্মাণ করেন এবং ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

বিশপ লুই তাবেদ ২য় ভিকার অ্যাপোস্টলিক নিযুক্ত হন। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে কলকাতাবাসীদের মন জয় করেন।

১৬৯৫ খ্রিঃ আগস্টিনিয়ান ফাদার অ্যামব্রোজ নাগরী নামক স্থানে জমি ক্রয় করেন এবং ১৭৫০ খ্রিঃ সেখানে গির্জা ও স্কুলঘর নির্মাণ করেন। তার পর থেকে খ্রিস্টীয় কেন্দ্র রূপে নাগরীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে।[৬৯]

১৫৮৮ খ্রিঃ ফরাসীরা হুগলীর নিকটবর্তী চন্দন নগরে বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করেন। সাথে সাথে আগস্টিনিয়ান পুরোহিত এবং প্রচারকগণও সেখানে গির্জা নির্মাণ করে খ্রিস্টবাণী প্রচারে প্রবৃত্ত হন।[৭০] ১৬৯৬ খ্রিঃ ফরাসী যেজুইট পুরোহিতগণও উক্ত অঞ্চলে মিশনারী কার্যক্রম শুরু করেন।

১৬৮৬ খ্রিঃ ২৩ ডিসেম্বর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্যাধ্যক্ষ জোব চার্ণক (Job Charnoek) বাংলায় সুবাদারের সঙ্গে বিবাদ করে হুগলীর কুঠি পরিত্যাগ করেন এবং ১৬৯০ খ্রিঃ আগষ্ট মাসে সুতানুটি গ্রামে কুঠি নির্মাণ করে কোলকাতা মহানগরীর পত্তন করেন। চার্নকের প্রদর্শিত পথে কতিপয় কিনটেল (ফিরিঙ্গি) পর্তুগীজ রাজকর্মচারী ও আগস্টিনিয়ান মিশনারী কলকাতায় আসেন এবং পরবর্তীতে ‘মুর গিহাটা’ নামক অঞ্চলে একখণ্ড জমি কিনে ১৭০০ খ্রিঃ একটি ক্ষুদ্র উপাসনালয় নির্মাণ করেন। অচিরেই উপাসনা গৃহটি সম্প্রসারিত হয়ে ১৭০৭ খ্রিঃ ‘পবিত্র জপমালা মারীয়া’ (Most Holy Rosary) ক্যাথিড্রাল এ পরিণত হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কলকাতা ইংরেজ সরকারের রাজধানীতে পরিণত হয় এবং তখন থেকে এর শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে শুরু করে। ১৮০৮ খ্রিঃ Mrs. Elizabeth নামে এক পর্তুগীজ মহিলা বৈঠকখানায় একটি গির্জা নির্মাণ করেন। এটি ‘শোকময়ী মাতা মারীয়ার গির্জা’ (Our Lady of Dolours) নামে পরিচিত।

১৮৩৪ খ্রিঃ পবিত্র হৃদয়এর নামে উৎসর্গীকৃত গির্জাটি Mrs. Sabina D’Souza এর অর্থানুকূল্যে নির্মিত হয়।

১৮৩৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ভারতে খ্রিস্টীয় ধর্মপ্রচারের দায়িত্ব পতুর্গীজ মিশনারীদের উপর ন্যস্ত ছিল। পরবর্তীকালে প্রাচ্যদেশে ধর্মবিস্তারের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য ধর্মগুরু পোপ বিশেষ কয়েকটি কেন্দ্রে বৃটিশ যেজুইট প্রচারকদের নিয়োগ করেন। ‘অ্যাপোস্টলিক ভিকারিয়েট’ (Apostolic Vicariate) ধর্মীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থানুযায়ী কাথলিক অধ্যুষিত অঞ্চলকে ধর্মপ্রদেশ হিসাবে পরিচালনা করার দায়িত্ব দেন যেজুইট পুরোহিতদের উপর। পর্তুগীজদের তত্ত্বাবধানে ছিল ভারতের তিনটি বৃহৎ ধর্মপ্রদেশ। উল্লিখিত ৩টি ধর্মপ্রদেশ হওয়ায় পাদ্রোয়াদো (Padroado) তত্ত্বাবধান ধর্মাধ্যক্ষ বিশপ নিয়োগে পর্তুগাল সরকার হস্তক্ষেপ করলে পোপের সঙ্গে পাদ্রোয়াদো নিয়ে উক্ত দেশের মতানৈক্য দেখা দেয়।

১৮৩৫ খ্রিঃ পর্তুগাল সরকার পর্তুগীজ পুরোহিতদের পরিচালনাধীন ধর্মসংঘটি বাজেয়াপ্ত করে দেন। ফলে পর্তুগীজ মিশনারীদের কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের কাথলিক মণ্ডলীর দায়িত্বভার অর্পিত হয় ফাদার রবার্ট লেজের উপর। তিনি ছিলেন ভিকার অ্যাপোস্টলিক।

বাংলার বৃহৎ ধর্মাঞ্চল (ভিকারিয়েট) ১৮৫০ খ্রিঃ দ্বি-খণ্ডিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ (অধুনা বাংলাদেশ ও আসাম) নামে ধর্মাঞ্চল গঠিত হয়।[৭১] পশ্চিমবঙ্গ ধর্মাঞ্চলে বেলজিয়ান যেজুইট ও পূর্ববঙ্গ ধর্মাঞ্চলে জার্মান মিশনারী ও ‘পবিত্র ক্রুশ’সংঘের কর্মীদের দায়িত্ব গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

১৮৫৫ খ্রিঃ মধ্যবঙ্গ (Central Bengal) ধর্মাঞ্চল গঠন করে PIME মিশনারীদের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়।[৭২]

পাদ্রোয়াদো যাজকদের অসহোযোগিতার দরুন কাথলিক মণ্ডলীতে যখন দুর্দশা নেমে আসে, তখন বিশপ কেরু বঙ্গদেশের কাথলিক মণ্ডলীকে একটি সম্মানজনক অবস্থানে নিয়ে আসেন।[৭৩]

১৮৪১ খ্রিঃ ১৮ই সেপ্টেম্বর আয়ারল্যাণ্ডের রাফর্থানাম থেকে লরেটো সিস্টারগণ কলকাতায় আগমন করেন। বিশপ কেরুতাঁদের জন্য চৌরঙ্গীর কয়েক শ’ গজ উত্তরে চল্লিশ হাজার টাকায় একটি বাড়ি ক্রয়

করে সেখানে তাদের আশ্রয় দেন। কালক্রমে এই বাড়িটি বাংলার শিক্ষা জগতের অতিপরিচিত ও প্রশংসিত 'লরেটো হাউজ' নামে বিখ্যাত হয়ে ওঠে।[৭৪]

১৮৪১ খ্রিস্টাব্দের ১১ নভেম্বর বিশপ কেরু লরেটো হাউজের কাছে একটি গির্জার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ও তার নাম দেন 'সেন্ট টমাস চার্চ'। এই চার্চসংলগ্ন অঞ্চলে ইউরোপীয় এবং এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা থাকতেন। তাই একে 'সাহেব পাড়া' বলা হয়। এইসব সাহেবদের প্রচেষ্টায় বেরিয়াল গ্রাউণ্ড রোডের নাম পরিবর্তন করে 'পার্ক স্ট্রীট' নামকরণ করা হয়। 'সেন্ট টমাস চার্চ' কথাগুলো অনেকে উচ্চারণ করতে পারতো না; তাই এটি 'চৌরঙ্গী গির্জা' নামেই পরিচিত হয়ে ওঠে। বিশপ কেরুর নিরলস প্রচেষ্টা লক্ষ্য করে পোপ ষষ্ঠদশ গ্রেগরী সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ১৮৪৩ খ্রিঃ ২রা জুন তাঁকে আর্চবিশপ পদে উন্নীত করেন।

৪.২৩ বঙ্গদেশে ভিকারিয়েট বিভক্ত

বঙ্গদেশের ধর্মাঞ্চল আয়তনে ছিল বিশাল ও বিস্তৃত। এই ধর্মাঞ্চলের অন্তর্গত ছিল দক্ষিণ বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চল, ওড়িশার পূর্বাঞ্চল, ব্রহ্মদেশের আরাকান ও সমগ্র আসাম অঞ্চল।[৭৫]

১৮৪৫ খ্রিঃ চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে পূর্ববঙ্গ এবং কলকাতাকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গ ভিকারিয়েট গঠন করা হয়।[৭৬]

৪.২৪ বঙ্গদেশে ভিকারিয়েট উপ-অঞ্চলে বিভক্ত

বঙ্গদেশ 'ইউরোপীয়দের সমাধিক্ষেত্র' – ইউরোপে এমনটি প্রচারিত হওয়ার পর কোন ইংরেজ বা আইরিশ যাজক বঙ্গদেশে আসতে রাজী হতেন না। অথচ এ অঞ্চলে যাজকদের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। এরূপ পরিস্থিতিতে আর্চবিশপ কেরু বঙ্গদেশ ধর্মাঞ্চলকে কয়েকটি উপ-অঞ্চলে বিভক্ত করে বিভিন্ন ধর্মসংস্থার উপর দায়িত্বভার অর্পণ করেন।

তিনি দার্জিলিং ও হাজারিবাগ জেলাকে বিচ্ছিন্ন করে তার পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত করেন পাটনার ভিকার অ্যাপোস্টলিকের উপর।

অনুরূপভাবে ওড়িশায় কটকসহ ‘মহানদী’ নামে নদের দক্ষিণ অঞ্চলটি বিশাখাপট্টলমের ভিকার অ্যাপোস্টলিকের হাতে অর্পণ করা হয়।

সমগ্র অসম অঞ্চলটিকে পরিচালনার জন্য ‘প্যারিশের বিদেশী মিশন’ (Foreign Mission of Paris) নামক ধর্মসংঘের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়।[৭৭] তারা সানন্দে অসম মিশন ক্ষেত্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কারণ তার ফলে তাদের অসম থেকে তিব্বতে সরাসরি যাওয়ার সুবিধা ছিল।

পশ্চিমবঙ্গের কাথলিকদের বৃহত্তর অংশই ছিল বাঙ্গালী ও হিন্দুস্তানী। তারা কলকাতার অলিগলি, বস্তি ও সন্নিহিত জেলাগুলোতে বসবাস করতো।

পূর্ববঙ্গ ধর্মাঞ্চল

১৮৪৫ খ্রিঃ এখানে ১৩,০০০ কাথলিকের বসবাস ছিল। বিশপ টমাস অলিফ ছিলেন অত্র অঞ্চলের পরিচালনার দায়িত্বে। ইতোপূর্বে এখানে ৩জন যাজক কর্মরত ছিলেন।

১৮৪১ খ্রিঃ ফাদার বার্বে চট্টগ্রামে ছিলেন এবং সেখানে তিনি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কাথলিকদের সংখ্যা ছিল ১,৬০০: চট্টগ্রামে ছিল ৬০০ জন, জামালখানে ৩০০জন ও কাঠালিয়ায় ১০০জন।[৭৮]

১৮৪৩ খ্রিঃ তিন জন যাজক নোয়াখালী (ভুলুয়া) গমন করেন। সেখানে ৬৩৩জন কাথলিক ছিল।[৭৯] তিনি গির্জা নির্মাণের জন্য ১০০ টাকা সংগ্রহ করেন। ফাদার জুবিবুরু তা দিয়ে গির্জা ও যাজকভবনের জন্য জমি ক্রয় করেন।

১৮৪৩ খ্রিঃ ফরাসী যাজক ফাদার গোঁয়ারা বরিশালে গমন করেন। তিনি সেখানে ১টি গির্জা, একটি স্কুলঘর ও যাজকভবন নির্মাণ করেন। এখানে কাথলিকের সংখ্যা ছিল ১,০০০ জন।[৮০]

ফাদার জুবিবুরু মর্দেপুর কিছু খ্রিস্টানদের সন্ধান পান যারা ৪০ বছর যাবৎ কোন যাজকের সংস্পর্শে আসেনি।

৪.২৫ পালকীয় সফর (বিশপ অলিফ)

১৮৪৫ খ্রিঃ আগষ্ট মাসে বিশপ অলিফ চট্টগ্রামে আসেন এবং এখানে সদর দপ্তর স্থাপন করেন। সেখান থেকে ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ ও পল্লী মিশনকেন্দ্র তুমুলিয়ায় গমন করেন।

১৮৪৫ খ্রিঃ ১৬ নভেম্বর তিনি আবার চট্টগ্রামে আসেন। অতঃপর ঢাকা জেলার বান্দুরা পল্লীতে তিনি নতুন গির্জার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তাঁর সাথে আসেন একজন ফাদার, একজন লরেটো সিষ্টার (মাদারসহ), একজন সেমিনারীয়ান ও মিঃ ক্লোন। তিনি চট্টগ্রামে ও ঢাকায় একটি লরেটো কনভেন্ট স্কুল স্থাপনের জন্য মাদারকে দায়িত্ব দেন।

১৮৪৬ খ্রিঃ সেপ্টেম্বর মাসে আবার বিশপ বঙ্গদেশ পরিদর্শনে যান। তিনি বরিশাল জেলায় শিবপুর, বরিশাল শহর ও নোয়াখালী হয়ে ঢাকায় উপস্থিত হন। তবে কাথলিকদের সংখ্যা তখন ঢাকাতেই বেশি ছিল। তাই ভিকারিয়েট সদরদপ্তর স্থানান্তরিত করেন ঢাকায়। তখন ভারপ্রাপ্ত পুরোহিত ছিলেন ফাদার স্ট্রেসী।

১৮৫৩ খ্রিঃ ১৭ জানুয়ারী ৮জন সদস্যের একটি কর্মীদল কলকাতায় এসে পৌঁছান। তারা নৌকাযোগে পূর্ববঙ্গে উপস্থিত হয়ে দলে দলে ভাগ হয়ে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বরিশাল ও ঢাকায় কাজ শুরু করেন।

১৭ সেপ্টেম্বর ফ্রান্সের মার্সেই বন্দর থেকে ২য় দলটি জাহাজযোগে নভেম্বরে কলকাতায় এসে পৌঁছে। এরপর নৌকাযোগে ৮ নভেম্বর বরিশাল হয়ে তাঁরা ঢাকা পৌঁছেন।

অদ্যাবধি তারা বাংলাদেশে তাদের সেই কাজ সাফল্যের সঙ্গে করে যাচ্ছেন।[৮১]

৪.২৬ পশ্চিমবঙ্গ ধর্মাঞ্চল

আর্চবিশপ কেরুর পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁরা কাজ শুরুর করেন। বিশপ অলিফের অনুরোধে ফাদার জুবিবুরুকে পশ্চিমবঙ্গে প্রেরণ করা হয়।

কৈখালি (২৪ পরগনা)

ফাদার জুবিবুরুকে কলকাতা থেকে ১৬ মাইল দক্ষিণে কৈখালি গ্রামে প্রেরণ করা হয়। তিনি কৈখালি গ্রামে আসার পূর্বেই লণ্ডন মিশনারী, ব্যাপ্টিস্ট মিশনারী, এস,পি,জি মণ্ডলী - গাংরাই, টালিগঞ্জ ও

মিঠাপুকুরে কেন্দ্র স্থাপন করেন। ১৮৪৮ খ্রিঃ জনৈক কাথলিক ভদ্রলোক, মিঃ মাইকেল ক্রো ২৪ পরগনার জেলাশাসক ও কালেক্টর হয়ে আসেন। তিনি সুন্দরবন অঞ্চল পরিদর্শন করতেন। কৈখালি গ্রামে ও তার নিকটবর্তী গ্রামে খ্রিস্টানদের বসতি আছে জানতে পেরে তিনি সেখানকার খ্রিস্টান ও হিন্দুদের কাছে কাথলিক ধর্মশিক্ষা ব্যাখ্যা করতে থাকেন। তিনি বাংলা ভাষায় দক্ষ ছিলেন। সেই সময় ধর্মতলায় অবস্থিত সেক্রেড হার্ট গির্জাটি ছিল বাঙ্গালী কাথলিকদের মূলকেন্দ্র।[৮২]

১৮৪৪ সালে ফাদার ভারাল্লি (Varalli) এই গির্জা পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। ফাদার ভারাল্লি আর্চবিশপের নির্দেশে কয়েকবার কৈখালি গ্রামে গমন করেন। তিনি সেখানে ২৩জন ছেলেমেয়েকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেন।

১৮৪৪ খ্রিঃ ২৬শে মে কলকাতার কাথলিকদের মুক্ত হস্তে দান করার জন্য প্রতিটি গির্জায় লিখিত আবেদন জানান। সেই অর্থ দিয়ে গির্জা নির্মিত হয়।

১৮৪৪ খ্রিঃ ফাদার জুবিবুরু এখানে আসেন। তাকে সাহায্য করেন মাইকেল ক্রো ও তাঁর পত্নী।

কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

১৮৩২ খ্রিঃ সি,এম,এস (Church Missionary Society) মিশনারীগণ নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে এবং উত্তর দিকে চাপড়া, রতনপুরও বল্লভপুর গ্রামে খ্রিস্টধর্ম প্রচারেরত ছিলেন।[৮৩]

১৮৪৫ খ্রিঃ ফাদার জুবিবুরু এপ্রিল মাসে কৃষ্ণনগরে আসেন এবং একমাসের মধ্যে ১২জন পুরুষ, ৪জন মহিলা ও ৫জন শিশুকে দীক্ষাস্নাত করেন। দ্বিতীয় বার তিনি কৃষ্ণনগরে এসে কালনায় নীলকুঠিতে বিশ্রাম করেন। এরপর তিনি বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শন করেন ও ধর্মশিক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকেন।

১৮৪৫ খ্রিঃ অক্টোবর মাসে তিনি আবার কৃষ্ণনগরে আসেন। সেখানে তিনি ১০০ জনকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেন এবং ৬০০ জনকে ধর্মশিক্ষা দিয়ে প্রস্তুত করেন। তিনি সেখানে গির্জা নির্মাণের জন্য জমি কিনেছিলেন।

১৮৪৫ খ্রিঃ ১২ ডিসেম্বর ফাদার জুবিবুরু আর্চবিশপের অনুমতিক্রমে কাথলিক যাজক ও ভক্তমণ্ডলীর কাছে কৃষ্ণনগর গির্জাঘর নির্মাণের জন্য অর্থসাহায্যের আবেদন করেন। সংগৃহীত অর্থ দিয়ে ফাদার জুবিবুরু ১৮৪৬ খ্রিঃ ২৪শে জানুয়ারী গির্জার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

১৮৪৭ খ্রিঃ ২৪ সেপ্টেম্বর গির্জাটিতে প্রথম খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। গির্জাটির নামকরণ করা হয় 'কার্মেল এর রাণী মারীয়া'। ফাদারকে দুই জায়গায় যাতায়াতের টানাপোড়েনের কারণে কাথলিক মণ্ডলীকে তিনি মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে পারেননি। তাঁর একার পক্ষে তা করা সম্ভব হয়নি। ফলে তিনি কৃষ্ণনগর ত্যাগ করেন।

১৮৫২ খ্রিঃ কৃষ্ণনগরে কলেরা রোগ মহামারীরূপে দেখা দেয়। রোগীদের চিকিৎসার জন্য কোন গৃহ না পেয়ে গির্জাটিকে হাসপাতালরূপে ব্যবহার করা হয়।

১৮৫৫ খ্রিঃ প্রথম পর্যায়ের ৩জন পুরোহিতের মধ্যে ফাদার এল লিমানা (Fr. L. Limana) কৃষ্ণনগরে বাণীপ্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। ফাদার ছিলেন PIME সম্প্রদায়ভুক্ত মিশনারী। তিনি চারজন সিস্টারও সহকারিণীকে নৌকাযোগে কৃষ্ণনগরে আনয়ন করেন। সেখানে তিনি ৬/৭টি কাথলিক পরিবারের সন্ধান পান। তাদের জন্য স্থায়ী বসতবাটি নির্মাণের জন্য তিনি এক খণ্ড জমি ক্রয় করেন। পরবর্তীতে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য তিনি একটি আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

ফাদার লুইজি ১৮৫৬ খ্রিঃ ৬ জুলাই কৃষ্ণনগরে আগমন করেন। ফাদার জুবিবুরু কর্তৃক দীক্ষিত কাথলিকগণ অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে ৬/৭টি কাথলিক পরিবারের সন্ধান পান এবং তাদের সাথে বসবাস করেন। যারা মফঃস্বল অঞ্চল থেকে কৃষ্ণনগরে এসেছিলেন তারাও কাথলিক ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল।

মেদেনীপুর-বালেশ্বর-চাইবাসা

কলকাতা থেকে মেদেনীপুর অনেক দূরের পল্লী অঞ্চল। এখানে অনেক ব্রিটিশ নাগরিকর আবাস। পল্লী অঞ্চলে যাজকগণ যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে আর্চবিশপ কেরু ফাদার জুবিবুরুকে মেদেনীপুওে প্রেরণ করেন। ফাদার সেখানে ব্রিটিশ নাগরিকদের সংঘবদ্ধ করে কাথলিক সমাজ গঠন করেন।[৮৪]

এই সংবাদ শুনে উড়িষ্যার বালেশ্বর থেকেও তাঁর ডাক আসে। তিনি বালেশ্বর গিয়ে বিদেশী কাথলিকদের সংঘবদ্ধ করেন। এসময় উড়িষ্যায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ঘটে। অনাহারে বহু লোক মারা যায়। পিতামাতা হারিয়ে বহু শিশু অনাথ হয়ে পড়ে। ফাদার জুবিবুরু বালেশ্বর থেকে কিছু দূরে কৃষ্ণচন্দ্রপুর নামক স্থানে একখণ্ড জমি কিনে অনাথ শিশুদের আশ্রয় দানের ব্যবস্থা করেন।

এরপর তিনি দক্ষিণ বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চলের চাইবাসার গমন করেন। সেখানে ওঁরাওদের মধ্যে কাথলিক মণ্ডলী স্থাপনের সূচনা করেন। একই সঙ্গে মেদেনীপুরের ঝাড়গ্রামে তিনি আদিবাসী সাঁওতালদের মধ্যেও কাথলিক মতাদর্শ প্রচার করেন।[৮৫]

পরবর্তীকালে জুবিবুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে বেলজিয়ামের যেজুইটগণ সমগ্র ছোটনাগপুর অঞ্চল ও ঝাড়গ্রামে কাথলিক মণ্ডলী স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে ফাদার জুবিবুরুর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। সেকালে যাতায়াতের বাহন ছিল পালকি, ঘোড়া, গরুর গাড়িও নৌকা। ফাদার জুবিবুরু গরুর গাড়ি ও নৌকাতে যাতায়াত করতেন। তদুপরি বঙ্গদেশের প্রচণ্ড গরম ও বর্ষাকালের স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় তাঁর শরীরে নানা রোগের উপসর্গ দেখা দেয়। তাই আর্চবিশপ স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য তাঁকে তাঁর জন্মভূমি স্পেনে প্রেরণ করেন এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

৪.২৭ পশ্চিম বঙ্গ সফর (বিশপ অলিফ) ও মধ্যবঙ্গ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব

ফাদার জুবিবুরু পশ্চিমবঙ্গের পল্লী অঞ্চলে কাথলিক মণ্ডলী স্থাপনের সম্ভাবনার একটি রূপরেখা তৈরি করেন। বিশপ অলিফ গৌহাটি কাথলিক মিশনের ভারপ্রাপ্ত ফাদার ক্রিককে নিয়ে ১৮৫১ খ্রিঃ জানুয়ারী মাস থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত মধ্যবঙ্গের বিভিন্ন স্থান সফর করেন। তিনি বহরমপুর, কৃষ্ণনগর ও যশোহরে আবাসিক যাজক নিয়োগ করার অনুরোধ করেন। কারণ মধ্যবঙ্গের জেলাগুলোতে অনেক আইরিশ ও ফরাসী পরিবারবর্গ বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করছিল। এরা সবাই ছিল কাথলিক। তাদের বেশির ভাগই নীলকুঠির মালিক। আবার কেউ কেউ অন্যান্য পেশায় লিপ্ত ছিল। ১৮৫১ খ্রিঃ ৮ সেপ্টেম্বর আর্চবিশপ কেরু ধর্মসম্প্রসারণ করার প্রস্তাব পেশ করেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ডনবস্কোর সালেসীয় সংঘের ব্রতধারীগণ কর্মরত।[৮৬]

৪.২৮ মধ্যবঙ্গ মিশনকর্মী গঠন

ধর্মসম্প্রসারণ সংস্থার অধ্যক্ষ কার্ডিনাল ফ্রান্সোনি (Cardinal Fransoni) আর্চবিশপ কেরুকে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের শুরুতেই জানালেন যে, তিনি যদি সম্মত হন তাহলে ‘ফরেন মিশন সোসাইটি অফ মিলান’ (মিলানের বিদেশী মিশনসংঘ) নামে নবপ্রতিষ্ঠিত ধর্মসংঘটি মধ্যবঙ্গের মিশন পরিচালনার ভার গ্রহণ করতে পারে। এতে আর্চবিশপ খুশি হয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন।

আয়তন : মধ্যবঙ্গের মিশন ক্ষেত্রটি ছিল বিশাল। উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উপকূলএর মধ্যবর্তী জেলা বগুড়া, রাজশাহী, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, যশোহর এবং সুন্দরবনের অংশ নিয়ে গঠিত মধ্যবঙ্গ মিশন। পরবর্তীকালে জলপাইগুঁড়ি ও খুলনা জেলা ও মধ্যবঙ্গ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হয়। এ সময় মধ্যবঙ্গের আনুমানিক ১,০০০ কাথলিক বিভিন্ন স্থানে বসবাস করতো।[৮৭] শুধু বহরমপুরেই ১১৭জন কাথলিক ছিল। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করার জন্য বেদী ও সব রকমের ব্যবস্থাসহ একটি উপাসনা গৃহও আছে। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোহর, খুলনা জেলাগুলোতে বহু পূর্ব থেকে প্রোটেস্টান্ট মিশনারীগণ তাঁদের মিশনকেন্দ্র স্থাপন করে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে রত ছিলেন। শুধু বহরমপুরের সৈন্যাবাসে বহু ইংরেজ ও আইরিশ কাথলিক ছিল। তারা দেশী ও বিদেশী কাথলিকদের ধর্মীয় তত্ত্বাবধান ও পরিচর্যার জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৮৪১ খ্রিঃ বহরমপুরে একজন কাথলিক পুরোহিত (চ্যাপলেইন)কে মাসিক ৫০টাকা ভাতা মঞ্জুর করে নিয়োগ দেয়। ফাদার এন্ড্রু ও'সালিভ্যান (Andrew O'Sullivan) প্রথম কাথলিক পুরোহিত। কালক্রমে ফাদার বাঘাউস, ফাদার বক্কাচ্চি সেখানকার পালপুরোহিত ছিলেন। তিনি এখানে একটি স্কুল স্থাপন করেন। ছাত্র ছিল প্রায় ১২০জন।

৪.২৯ মিলান ফাদারদের আগমন

ইটালির মিলান নগর থেকে আগত ফাদারদের নাম 'মিলান ফাদার'। এদের পোষাকী নাম (Pontifici Institute delle Missioni Estere Di Milana), সংক্ষেপে PIME (পিমে)। মনসিনিয়র মারিননি সেন্ট কালচেরো সেমিনারী থেকে ৭জন পুরোহিত ও একজন ধর্মশিক্ষককে ভারতে প্রেরণ করার ব্যবস্থা করেন।[৮৮]

১৮৫৫ খ্রিঃ ২১ মার্চ রোম ত্যাগ করে তাঁরা নেপলস বন্দর থেকে সমুদ্র যাত্রা শুরু করেন। ১৮৫৫ খ্রিঃ ১৭ই মে কলকাতায় পদার্পণ করেন।

১৮৫৫ খ্রিঃ ৫ই জুন মঙ্গলবার গঙ্গানদী দিয়ে নৌকাযোগে বহরমপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। ১২ দিন পর ১৭ই জুন সন্ধ্যায় গন্তব্যস্থানে গিয়ে পৌঁছায়। বহরমপুর এসে ৪জন মিশনারী ইংরেজি ভাষার চর্চা করেন। বাংলা ও হিন্দি শেখার জন্য তাঁরা একজন ব্রাহ্মণকে শিক্ষক হিসাবে মনোনীত করেন।

নতুন মিশনারীগণ খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারেন, এখানে কাথলিকের সংখ্যা ৩০০ জন। অথচ ধর্মসম্প্রসারণ সংস্থা জানিয়েছিল যেএখানে ১০০০ জনের বসবাস। মিশনারীদের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা

হলো, কলকাতার সন্নিহিত অঞ্চল ও বহরমপুরের সাধারণ মানুষের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। মানুষের দরিদ্রতা, অনাহার দেখে তাঁরা মানসিকভাবে আঘাত প্রাপ্ত হন। তাই শিশুদের জন্য তাঁরা খাদ্য, বস্ত্র ও শিক্ষাদানের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

ফাদার পারিয়েত্তি বহরমপুর মিশনের ভার গ্রহণের সময় সেখানে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ১৫৪জন কাথলিক ছিল। তারা সকলেই আইরিশ। এছাড়া মুর্শিদাবাদ নবাবের কর্মচারীদের মধ্যে ১৮জন কাথলিক ছিল। তবে তাদের জীবনযাত্রায় খ্রিস্টীয় ভাবের লেশমাত্র ছিলনা। ফাদার বাংলা ভাষা রপ্ত করার পর বাংলায় ধর্মশিক্ষা দিয়ে ৮জনকে কাথলিক ধর্মে দীক্ষিত করতে সক্ষম হন। তিনি উপলব্ধি করলেন, শিক্ষা ছাড়া কাথলিকদের উন্নত করা সম্ভব নয়। তিনি সেখানে বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন।

আর্চবিশপ গোথালসের পরিচালনায় সুন্দরবন অঞ্চল, মেদেনীপুর জেলা, উড়িষ্যার বালেশ্বর ও বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চল ধর্মপ্রচার ও মিশন প্রতিষ্ঠার কাজ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে থাকে।[৮৯]

৪.৩০ নদীয়ায় গ্রামাঞ্চলে মিশন প্রতিষ্ঠা

১৮৬০ খ্রিঃ ফাদার ব্রিওস্কি কৃষ্ণনগর থেকে দেরিয়াপুর ও তার চারিদিকের গ্রামগুলোতে খ্রিস্টবাণী প্রচার করেন। সেখান থেকে কয়েক মাইল দূরে ভবরপাড়া (মুজিবনগর) অবস্থিত। ভবরপাড়ার নিকটে বৈদ্যনাথ তলায় সাপ্তাহিক হাট বসতো। সেখানে তিনি গ্রামের লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন ও প্রচার করতেন। তিনি দেরিয়াপুর ও ভবরপাড়ার কয়েকটি পরিবারের নিকিরি সম্প্রদায়ের লোকদের ধর্মশিক্ষা দেওয়ার পর দীক্ষিত করেন।[৯০]

১৮৬২ খ্রিঃ ২০শে মে ফাদার ব্রিওস্কি ভবরপাড়ার বাসিন্দা প্রথম দলটিকে দীক্ষিত করেন এবং উপাসনার জন্য এক কামরাবিশিষ্ট একটি মাটির ঘর তৈরি করেন।

১৮৬৪ খ্রিঃ ১৫ আগষ্ট ফুলবাড়ী ও বেতবেড়িয়া গ্রামের স্থানীয় কিছু মানুষকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা হয়। মেয়েদের ধর্মশিক্ষার জন্য তিনি সিস্টারদেরকে ফুলবাড়ীতে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

১৮৮৬ খ্রিঃ নদীয়ায় বন্যা দেখা দেয়। বন্যার পর মহামারী রূপে দেখা দেয় কলেরা ও অন্যান্য সংক্রমক রোগ। ফাদার কলেরা রোগীদের সেবাকার্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন। অবশেষে তিনি কলেরায় আক্রান্ত হন ও মৃত্যুবরণ করেন।

(১৮৬৬ খ্রিঃ ১৬ জুলাই) ফুলবাড়ীর ক্ষুদ্র গির্জাঘরে তাকে সমাহিত করা হয়।

যশোহর

ইতিমধ্যে ইটালী থেকে আরও কয়েকজন সিস্টার কৃষ্ণনগর ও যশোহরে আসেন। তারা চিকিৎসা কেন্দ্র খুলে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও সেবা দিতেন।

ফাদার আন্তনিও মারিয়েত্তি ২৭ বছর বয়সে যশোহরে আগমন করেন। সেখানে 'কিনটাল' (Indo Pastuguee) নামে কিছু কাথলিক বাস করতো। এছাড়াও কিছু কাথলিক নীলকর সাহেব জেলার বিভিন্ন স্থানে বাস করতেন।[৯১]

১৮৫৬ খ্রিঃ ৭ আগষ্ট তিনি বেশ কয়েকজনকে কাথলিক মণ্ডলীভুক্ত করেন ও ছেলেদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে স্কুল খোলেন।

বাদপুকুরিয়ায় ফাদার জনৈক মনমোহন ঘোষ নামক একজন শিক্ষিত ব্যক্তিকে ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়ে যশোহরের ধর্মশিক্ষক (ক্যাটেখিষ্ট) নিযুক্ত করেন। ফাদারের উৎসাহে মনমোহন ঘোষ ২৭ পৃষ্ঠার 'যশোহরের কাথলিক মণ্ডলীর ইতিহাস' নামক বাংলা ভাষায় একটি পুস্তক রচনা করেন। এটাই বঙ্গদেশে কাথলিক মণ্ডলীর ইতিহাসের প্রথম মৌলিক রচনা।[৯২] মিলানের সংগ্রহশালায় পুস্তকটি রক্ষিত আছে।

যশোহর থেকে ২০ মাইল দক্ষিণে বক্সপুল গ্রামের কিছু সংখ্যক অধিবাসীকে যশোহর শহরে এনে একটি কাথলিক পল্লী গঠন করেন। যশোহর থেকে ২০ মাইল দূরে জগদানন্দ কাঠিপল্লী। গ্রামের মোড়ল রামচরণএর নেতৃত্বে ও উৎসাহে বহু লোক ধর্ম শিক্ষা গ্রহণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। তিনি নিকটবর্তী গ্রামগুলোতে প্রচারকার্য চালাতেন। কালক্রমে এই অঞ্চলে কাথলিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

যশোহর থেকে ১৫ মাইল দূরে শিমুলিয়া গ্রামের কিছু লোককেও তিনি খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেন। ১৮৫৯ খ্রিঃ যশোহর জেলায় বাঙ্গালী কাথলিকদের সংখ্যা হয় ১১৫জন।

ফাদার মারিয়েত্তির কাজকর্মের সংবাদ সুদূর দক্ষিণে সুন্দরাম অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। অঞ্চলটি বহু দ্বীপের সমষ্টি। নৌকা ছিল একমাত্র বাহন।

যশোহর থেকে ৮০ মাইল দক্ষিণে মালগাজি নামক একটি গ্রাম ছিল। সেখানে মৎস্যজীবীরা বাস করতো। ফাদার সেই গ্রামে গিয়ে ধর্মশিক্ষা দিতেন।

১৮৬০ খ্রিঃ ২৭শে মে প্রথম একটি দলকে তিনি কাথলিক মণ্ডলীভুক্ত করেন। ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় ফাদারকে জনপ্রিয় করে তোলে।[৯৩]

১৮৬৪ খ্রিঃ তিনজন সিস্টার ইটালী থেকে যশোহরে পৌঁছান। তারা ধর্মশিক্ষা ও নারীশিক্ষা দিতেন। বঙ্গদেশের প্রতিকূল আবহাওয়ায় ইটালিয়ান ফাদারগণ প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। তাই ফাদার মারিয়েত্তি হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে দার্জিলিংএর কাছে সোনাদায় স্বাস্থ্য নিবাস নির্মাণ করেন।

১৮৭০ খ্রিঃ ১৯শে জুলাই পোপ নবম পিয়ূস 'প্রিফেকচার অ্যাপস্টোলিক' পর্যায়ে উন্নীত করেন ও মধ্যবঙ্গকে সম্পূর্ণ আলাদা করেন। নিম্নলিখিত অঞ্চলগুলি নিয়ে মধ্যবঙ্গ প্রিফেকচার গঠিত হয়েছে। নদীয়া, যশোহর, মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী, বগুড়া, মালদহ, সুন্দরবনের কিয়দংশ, বর্ধমানের একাংশ, জলপাইগুড়ি ও খুলনা। পরে যুক্ত হয় ভুটান, আসাম, কোচবিহার, দিনাজপুর, রংপুর ও ফরিদপুরের একাংশ। পরবর্তীতে ফাদার আন্তনিও মারিয়েত্তি এই নবগঠিত বিশাল প্রিফেকচারের প্রথম প্রিফেক্ট অ্যাপোস্টলিক বা উপধর্মপাল নিযুক্ত হন এবং 'মনসিনিয়র' উপাধি প্রাপ্ত হন।

৪.৩১ পশ্চিমবঙ্গে যেজুইটগণ

১৮৫৯ খ্রিঃ ছয়জন বেলজিয়ান যেজুইটকে সঙ্গে নিয়ে ফাদার হেনরী দেপেলচ্যাঁ কলকাতার মাটিতে পদার্পণ করেন। এদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিমবঙ্গে তাদের মিশনকাজের সূচনা হয়। তারা পুনরায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজটি শুরু করেন। সেন্ট টমাস গির্জা ও ধর্মপল্লী পরিচালনার দায়িত্বও তাঁরা গ্রহণ করেন।

মেদেনিপুর বালেশ্বর, ঝাড়গ্রাম

আর্চবিশপ জ্ঞানহ্যল কলকাতার বাইরে খ্রিস্টবাণী প্রচার ও খ্রিস্টমণ্ডলী প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। ফাদার সার্পাট বালেশ্বর গমন করে একটি গির্জা ও একটি অনাথাশ্রম নির্মাণ করেন।

১৮৬৯ খ্রিঃ ফাদার স্টরম্যান চাইবাসায় গমন করেন ও চাইবাসাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে ছোটনাগপুর মিশন। ফাদার চার্লস সাফঝাড় গ্রামে সাঁওতাল ও অন্যান্য তপসিলী সম্প্রদায়ের মধ্যে কাজ শুরু করেন। সেখানে ঝাড়গ্রামের সন্নিহিত এলাকায় ও জুয়ালডাঙ্গার হরিজন সম্প্রদায় ও সাঁওতালদেরকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেন। পরবর্তীতে খ্রিস্টানদের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকলে ফাদার পূর্ণ উদ্যমে মালভূম (পুরুলিয়া) জেলায় খ্রিস্টধর্ম প্রচার আরম্ভ করেন। এ থেকেই সেখানে শুরু হয় সাঁওতাল মিশন।[৯৪]

ফাদার জুবিবুরু ও ফাদার গফিনেতকে ২৪ পরগনায় 'কাথলিক মণ্ডলীর জনক' বলা হয়।[৯৫] তাদের সৃষ্ট ক্ষুদ্র ও দুর্বল মণ্ডলীকে একটি দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর দাঁড় করান ফাদার এডমণ্ড দেপেলচ্যাঁ। সে জন্য তাকে ২৪ পরগনা 'মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা' বলে গণ্য করা হয়।[৯৬]

১৮৭৩ খ্রিঃ ফাদার দেলপ্লাস বাসন্তীতে, ১৮৭৪ খ্রিঃ খাড়িতে, ১৮৭৫ খ্রিঃ বৈদ্যপুরে, ১৮৭৬ খ্রিঃ রাঘবপুরে, ১৮৭৭ খ্রিঃ মোড়াপাইতে মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একটি গ্রামে ২/৩ মাস অবস্থান করে ধর্মশিক্ষা দিতেন। এসময় তিনি অনেককেই খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেন।

১৮৮০ খ্রিঃ বিবরণ থেকে জানা যায়, ২৪ পরগনায় কাথলিকের সংখ্যা ৪০০ জন। এর মধ্যে রাঘবপুর- ২০৮ জন, ঝাঁঝরায়- ১১৫, সালপুকুর- ৫৪, জিয়াদারগোতে- ২৩জন। মোট ৬জন ফাদার ২৪ পরগনার মিশনগুলি চালাতে থাকেন।[৯৭] পরবর্তীতে ফাদারদের অসুস্থতা বা মৃত্যুর কারণে কেন্দ্রগুলি কর্মীশূন্য হয়ে পড়ে। ফলে অনেক কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে জন্ম হয় ছোটনাগপুরে রাঁচী মিশনের। এখানে মুণ্ডা, ওঁরাও আদিবাসীরা খ্রিস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ওঠে। রাঁচী মিশনে সমগ্র অঞ্চল জুড়ে স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৭ খ্রিঃ এটি আলাদা ডাইওসিসে পরিণত হয়।

৪.৩২ উত্তর বঙ্গ

ফাদার ফ্রান্সিস রক্কা ১৮৯২ খ্রিঃ ইটালি থেকে বঙ্গদেশে আগমন করেন। বিশপ পৎসি তাঁকে পাকুড়িয়া গ্রামে মিশনে প্রেরণ করেন। ফাদার রক্কা পাকুড়িয়া গিয়ে একটি কুঁড়েঘরে বাস করতে থাকেন ও পাশ্ববর্তী গ্রামগুলিতে ধর্মপ্রচার করতে থাকেন। তিনি একটি ছোট্ট পাকা গির্জা নির্মাণ করেন।

১৯০১ খ্রিঃ পাকুড়িয়া মিশনে পরিণত হয়। ১৮৯৫ খ্রিঃ তিনি পদ্মার উত্তরের দিকে কোচবিহার দেশীয় রাজ্যে গমন করেন ও ২০০ জন কাথলিকের সন্ধান পান। এরা ছিল কোচবিহার রাজ্যের রেলকর্মাচারী ও সকলেই ছিল গোয়ানীজ। উত্তরবঙ্গে অন্যতম বৃহৎ রেলের জংশন স্টেশন সৈয়দপুরে গিয়ে কাথলিকদের নিয়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠান করেন।[৯৮] হিমালয়ের পাদদেশে ডুয়ার্স অঞ্চলে কর্মীদের মধ্যে অনেক কাথলিক আছে। এরা ছোটনাগপুর থেকে এসে চা বাগানে কাজ করছে। ১৯০০ খ্রিঃ এখানে একটি অস্থায়ী গির্জা নির্মিত হয়।

দিনাজপুর জেলায় বহু আদিবাসীর বসবাস রয়েছে। ফাদার রক্কা আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে যাতায়াত করে তাদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেন। ১৯০১ খ্রিঃ দিনাজপুর জেলার ধানজুরি গ্রামে প্রথম সাঁওতাল মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। পদ্মার উত্তরে রাজশাহী জেলায় অনেক পাহাড়িয়া উপজাতি লোকের বসবাস ছিল। এরা হিমালয়ের অরণ্যময় পাদদেশ থেকে এসে সমভূমিতে বসবাস করতে আরম্ভ করে। এদের অনেকেই দিনাজপুর গিয়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে। এদের কথা শুনে অন্যান্যরাও আগ্রহ প্রকাশ করে। ১৯০৩ খ্রিঃ একজন কাটেখিস্ট (ধর্মশিক্ষক) আন্ধারকোটা অঞ্চলে ১৭০ জনকে দীক্ষিত করেন ও একটি মিশন কেন্দ্র স্থাপন করেন। এভাবে কৃষ্ণনগর ডাইওসিসের অন্তর্গত উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের নিয়ে দুইটি মিশনকেন্দ্র স্থাপিত হয়।[৯৯]

১৯০৫ খ্রিঃ বিশপ পৎসি ৫০ বৎসর ভারতে জনকল্যাণমূলক কাজ করার পর ইহলোক ত্যাগ করেন।

১৮৮৬-১৯০৫ খ্রিঃ কৃষ্ণনগর ডাইওসিসএর প্রথম বিশপ ফ্রান্সিসকো পৎসি (পি.মে)

বিশপ পৎসির মৃত্যুর পর কৃষ্ণনগরের দ্বিতীয় বিশপ শান্তিনো তাভেজ্জা (পি.মে.) মনোনীত হন। তখন পুরোহিতের সংখ্যা ছিল ৮জন। এ ছাড়া সেখানে ছিল ১জন ব্রাদার, কিছু কাটেখিস্ট ও ১৬ জন সিস্টার। ডাইওসিসে কাথলিকের সংখ্যা ছিল ৪,৬০০ জন।[১০০]

৪.৩৩ আসানসোল অঞ্চল

১৯৩৮ খ্রিঃ ফাদার মুলেকেস আসানসোল মিশনের পরিচালনায় ছিলেন। এতদঞ্চলে উন্নতির সম্ভাবনা দেখে ফাদার পসেলে একটি গির্জা নির্মাণ করেন। ফাদার রোন্যান্ডের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও যোগ্য পরিচালনায় আসানসোল মণ্ডলী একটি দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে মানকর, পামাগড়, চেলিয়াডাঙ্গায় খ্রিস্টানদের বসবাস রয়েছে। সমগ্র আসানসোলকে ফাদার রোন্যান্ড ১৯৫১ সালে তিন ভাগে বিভক্ত করে ৩জন ফাদারকে দায়িত্ব দেন। অঞ্চলগুলো হলো :

১। কুলটি, দিশেরগর, চিত্তরঞ্জন, বার্ণপুর -(ফাঃ পাসেনে)

২। অণ্ডাল, রানীগঞ্জ, জামুরিয়া- (ফাঃ ড্রাগম্যান)

৩। পানাগর, বর্ধমান- (স্টীলোমানকর)[১০১]

৪.৩৪ দার্জিলিংএর পার্বত্য অঞ্চল

দার্জিলিং অঞ্চলটিকে পার্বত্য ও সমতল অঞ্চলে ভাগ করা যায়। পার্বত্য অঞ্চলে দার্জিলিং, কার্শিয়ং ও কালিমপুং অবস্থিত। সমতল অঞ্চলে শিলিগুড়ি ও গয়াগঙ্গা অবস্থিত। তবে শিলিগুড়ি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ক্রমবর্ধমান শহর ও বাণিজ্য কেন্দ্র হয়ে উঠতে থাকে।

১৯৪৭ সালে দার্জিলিং জেলায় মিশন পরিচালনার ভার কানাডার ইংরেজিভাষী যেজুইট ফাদারদের উপর অর্পণ করা হয়। তখন কানাডা থেকে ৫জন ফাদার দার্জিলিং আসেন। তাঁরা প্রথমেই নেপালী ভাষা শিখতে শুরু করেন। দার্জিলিংএর পার্বত্য অঞ্চলে অনেক আদিবাসীরা বাস করছিল। তাদের ধর্মশিক্ষা দিয়ে অনেককে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা হয়। গয়াগঙ্গায় রয়েছে বিশাল ও বিস্তৃত চা-বাগান এলাকা। তাই এখানে কাথলিক শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

কাথলিক সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকায় ১৯৫৫ খ্রিঃ শিলিগুড়িতে একটি গির্জা নির্মিত হয়। ১৯৫৬ খ্রিঃ দার্জিলিং কলকাতা থেকে স্বতন্ত্র হয়ে একটি স্বশাসিত মিশনে পরিণত হয়।

১৯৫৪ খ্রিঃ এই অঞ্চলে কাথলিকদের সংখ্যা ছিল দার্জিলিং - ১,০০৩ জন, কার্শিয়াং- ১,০০৬ জন ও গয়াগঙ্গায় ৫,৩৪২ জন = মোট ৭,৩৪১ জন।[১০২]

৪.৩৫ ডন বস্কোর সালেসীয়দের আগমন

সালেসীয় ধর্মসংঘের প্রতিষ্ঠাতা ডনবস্কো। প্রকৃত নাম ফাদার জনবস্কো। ফাদার শব্দের প্রতিরূপ শব্দ ডন। তিনি ডন বস্কো নামে পরিচিত হয়ে উঠেন। ঐ নামেই আজ তাঁরা গোটা বিশ্ব পরিচিত। সালেসীয় ফাদারগণ ডন বস্কোর আদর্শ ও শিক্ষা নীতিকে ফলপ্রসূ করার জন্য পৃথিবীর সব দেশেই গড়ে তুলেছেন সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কারিগরি বিদ্যালয়, কিণ্ডারগার্টেন স্কুল, অনাথাশ্রম ও শিক্ষাদানের উপযোগী অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ।

১৯০৬ খ্রিঃ ফাদার তমাসিসের নেতৃত্বে ৫জন সালেসিয়ান প্রথম ভারতের মাদ্রাজ প্রদেশের তাঞ্জোর জেলায় আগমন করেন। এখানে তাঁরা উত্তর আর্কট জেলার ভেলোরে নতুন মিশন প্রতিষ্ঠা করেন।[১০৩]

১৯২২ খ্রিঃ ১৩ই জানুয়ারী ফাদার লুইস মাথায়াসের নেতৃত্বে ১১জন সালেসীয়ান শিলংএ আগমন করেন। তারা শিলং,গৌহাটি, রালিয়ং, আসাম ও ভূটানে মিশন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আসামে তাঁরা খাসিয়া, গারো ও অন্যান্য পাহাড়ীয়া জাতির কাছে পূর্ণ উদ্যমে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।[১০৪]

১৯২৮ খ্রিঃ ২১শে জুলাই মনসিনিয়র ইমানুয়েল বার্স কৃষ্ণনগরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তখন কৃষ্ণনগর ডাইওসিসের অন্তর্গত ছিল নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোহর ও খুলনা। কাথলিকের সংখ্যা ছিল ৮,২০০ জন। এখানে ৩টি প্যারিশ বা মিশনকেন্দ্র ছিল। কাথলিকদের সংখ্যা ছিল কৃষ্ণনগরে ১৩০০জন, ভবরপাড়ায় ৩০০জন, শিমুলিয়ায় ১৪০০জন। বাকি কাথলিকগণ খুলনা ও সুন্দরবন অঞ্চলে বাস করতো।[১০৫] কৃষ্ণনগর ডাইওসিসে ১৯টি গির্জা, ৪০টি চ্যাপেল ও ২৩টি প্রাথমিক স্কুল ছিল।

রাণাবন্দ : ১৮৯২ খ্রিঃ ফাদার জোসেফ মাক্কি রাণাবন্দে গির্জা নির্মাণ করেন। রাণাবন্দ গ্রামটি কৃষ্ণনগর থেকে ১৮ মাইল উত্তর পূর্বে একটি বড় খালের ধারে অবস্থিত। রাণাবন্দের কাথলিকের সংখ্যা ছিল ৪০০ জন।[১০৬]

কৃষনগরের তৃতীয় বিশপ স্টিফেন ফেরান্দো, এসডিবি (ধর্মীয় প্রশাসক)

তিনি খুলনা মিশন, ভবরপাড়া, রাণাবন্দ ও চারাতলা গ্রামে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করেন ও কাথলিক মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করেন।[১০৭]

৪.৩৬ ভারতের স্বাধীনতা লাভ ও বঙ্গভঙ্গ

১৯৪৭ খ্রিঃ ১৫ আগষ্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। ঐ সময়ে ভারতকে খণ্ডিত করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। বঙ্গদেশের দুই তৃতীয়াংশ পূর্বাঞ্চল পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং এর নামকরণ হয় পূর্ব পাকিস্তান। ডাইওসিসের অন্তর্ভুক্ত খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর ও নদীয়া জেলার অর্ধেকেরও বেশি পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে কৃষ্ণনগর ডাইওসিসের আয়তন ক্ষুদ্র হয়ে পড়ে। মুর্শিদাবাদ জেলাও খণ্ডিত নদীয়ায় রাণাঘাট ও কৃষ্ণনগর মহকুমার মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ল। ফলে কৃষ্ণনগর ও রাণাবন্দ দুটি মিশনকেন্দ্র বা ধর্মপল্লী রইল। পূর্ব পাকিস্তান, বিশেষভাবে ঢাকা জেলা থেকে বহু কাথলিক

কৃষ্ণনগরে বসতি স্থাপন করার আশায় বিশপ মরোর শরণাপন্ন হলো। পরবর্তীতে ফাদার গবেত্তি কৃষ্ণনগরে নগেন্দ্র নগর ও আমবাগান পল্লীতে জমি কিনে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত কাথলিকদের কাছে বিক্রি করতে থাকেন। ফলে কৃষ্ণনগর শহরে কাথলিক বসতি অঞ্চল বিস্তৃত হতে থাকে। তিনি সিস্টারস অফ মেরী ইম্মাকুলেট সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৪৮ খ্রিঃ ১২ ডিসেম্বর।

১৯৫২-৫৩ খ্রিঃ নদীয়া জেলার মালিয়াপোঁতা, বহিরগাছি, লক্ষীপুর, বারাসাত, চাঁদড়া, চারাতলা, বেতবেড়িয়া, বালিউড়া, হৃদয়পুর, প্রভৃতি গ্রামের গির্জাগুলি ভেঙ্গে নতুন পাকা গির্জা নির্মাণ করেন।

রাণাবন্দ প্যারিশের অধীন ধর্মপল্লীগুলি হলো : ভাতগাছি, গোংড়া, মহোখোলা, শিকড়া ও নারায়ণপুর।

পরবর্তীতে ১৯৫০ খ্রিঃ বিশপ মরো মালিরাপে তাঁকে একটি পূর্ণাঙ্গ প্যারিসে পরিণত করেন। ১৯৫০ খ্রিঃ মালিয়াপোতা প্যারিসে কাথলিকের সংখ্যা ছিল ৬৫০ জন। এই প্যারিশের অধীন ধর্মপল্লীগুলি হলো বেতবেড়িয়া, ফুলবাড়ি, হাঁটরা, শলূয়া, কেশবপোতা, পুঁটিমারী, বালিউড়া, হাউলিয়া।[১০৮]

১৯৩৮ খ্রিঃ এক ভয়াবহ বন্যার পর মালিয়াপোঁতা থেকে কয়েকটি কৃষক পরিবার রাণাঘাটের বেগোপাড়ায় বসবাস করতে আসেন।

১৯৫৩ খ্রিঃ রাণাঘাট প্যারিশে উন্নীত হয়। রাণাঘাট মহকুমা ও ২৪ পরগনায় বনগাঁ মহকুমা এই প্যারিশের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯৬৪ খ্রিঃ বনগাঁ ও ঠাকুর নগরে দুটি নতুন প্যারিশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৬৭ খ্রিঃ রাঘবপুর প্যারিশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

কল্যাণী শহরের পূর্ব দিকে কেষ্টপুর গ্রামে কিছু ওরাওঁ, সাওঁতাল, নেপালী, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ও কিছু বাঙ্গালীর বসবাস ছিল। এদের মধ্যে বেশির ভাগই কাথলিক ছিল। ফলে একে প্যারিশে পরিণত করা হয়। এই প্যারিশের অধীনে দেবগ্রামে একটি গির্জা নির্মিত হয়। এই সময় দেবগ্রামের ক্যাথলিকের সংখ্যা ছিল ২৫৪ জন।

বিশপ মরোর কার্যকালের শেষ সময়ের পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, সমগ্র রানাঘাট প্যারিশের কাথলিকদের সংখ্যা ছিল ৩,৩৪০ জন।[১০৯] রানাঘাট কেন্দ্রের অধীনে ধর্মপল্লীগুলি হলোঃ দেবগ্রাম, গাংলাপুর, শিকরিপাড়া ও বাংগুলুর।

৪.৩৭ রাঘবপুর প্যারিশ

১৯৪৭ খ্রিঃ ভারত ও বঙ্গদেশ বিভক্ত হওয়ার সময় রাঘবপুর (হাবিবপুর) পূর্ব পাকিস্তানের একটি ছিটমহলে পরিণত হয় এবং নাম হয় ‘নববাংলা কো-অপারেটিভ কলোনী’।

১৯৫০ খ্রিঃ ভারত সরকার এই ছিটমহলটি পূর্ব পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে আলোচনা সাপেক্ষে অধিগ্রহণ করে ও সেখানে মধ্যবিত্ত উদ্বাস্তু ও প্রাক্তন সরকারের কাছ থেকে আলোচনাসাপেক্ষে অধিগ্রহণ করেন এবং সেখানে মধ্যবিত্ত উদ্বাস্তু ও প্রাক্তন সরকারী কর্মচারীদের বসবাসের ব্যবস্থা করেন।

১৯৫৪ খ্রিঃ এখানে একটি গির্জা ও ফাদারদের একটি আবাসগৃহ নির্মাণ করেন। বিশপ মরো তা আশীর্বাদ করেন ও প্যারিশ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫৪ খ্রিঃ সেখানে মাত্র ৫টি কাথলিক পরিবার ছিল। এর পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা জেলা থেকে বহু সংখ্যক কাথলিক পরিবার এখানে এসে বসতি স্থাপন করতে আরম্ভ করে। এই কাথলিকদের অধিকাংশই বিত্তশালী হয়ে উঠেন।[১১০]

৪.৩৮ বহরমপুর প্যারিশ

বহরমপুরে প্রায় ১০০ বছর পূর্বে মিলান ফাদারদের নির্মিত গির্জাটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। বিশপ মরো সেখান থেকে ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে বহরমপুরে নতুনভাবে মিশন স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

১৯৫৫ খ্রিঃ জুন মাসের মধ্যেই তিনি একটি ছোট গির্জা নির্মাণ করেন। এখানে কাথলিকদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলা নিয়ে গঠিত হয় বহরম প্যারিশ। এখানে প্রায় ২০টি গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সাঁওতালদের মধ্যে প্রচারকার্য চালানোর জন্য ফাদার তপ্প খুব পরিশ্রম করেন। তারই পরিশ্রমের ফলে ১৯৬৪ খ্রিঃ আজিমগঞ্জে সাঁওতাল কাথলিক মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়।[১১১]

ফাদার তপ্পবহরমপুরে পালপুরোহিত নিযুক্ত হয়ে সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলায় পরিভ্রমণ কালে দেখতে পান, পূর্ব পাকিস্তান থেকে, বিশেষত দিনাজপুর জেলা থেকে বহু সাঁওতাল কাথলিক উদ্বাস্তু হয়ে এই জেলায়

অস্থায়ীভাবে বসবাস করছে। তখন ফাদার তাদের এই জেলাতেই বসবাস করার জন্য অনুরোধ করেন। ফাদার এখান থেকেই পিরেনতলা, হারনালভাঙ্গা, চণ্ডীগ্রাম, নিমগান্দিয়া, কাচিয়া প্রভৃতি গ্রামগুলিতে গিয়ে ধর্মীয় কাজ করতে থাকেন।[১১২]

৪.৩৯ উপসংহার

যীশু খ্রিস্টের আদর্শ ও শিক্ষার ধারক ও বাহক কাথলিক ধর্ম তার সূচনা কাল থেকে অপর ধর্ম ও সমাজের গ্রহণযোগ্য ধর্মতত্ত্ব, আচার-আচরণ সাদরে বরণ করে নিয়ে দিনে দিনে পুষ্টি ও বৃদ্ধি লাভ করেছে।

কার্ল এ্যাডামের বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Spirit of Catholicism'(কাথলিক ধর্মের মর্মবাণী) এর জার্মান ভাষা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন ফাদার জাস্টিস ম্যাককান। এই গ্রন্থ থেকে সংশ্লিষ্ট অংশটুকু সংযোজন করা হলো। আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি, আজকের কাথলিক ধর্মের চেয়ে কয়েকশ বছর পরের কাথলিক ধর্ম আরও বৈচিত্র্যময়, তেজোদীপ্ত এবং নানাবিধ অভ্রান্ত ধর্মবিশ্বাস, নীতিশাস্ত্র, ধর্মীয় বিধি এবং উপাসনা পদ্ধতির সমন্বয়ে হয়ে উঠবে আরও পুষ্ট ও সম্পদবান।[১১৩]

জগতের প্রত্যেক জাতির প্রতিটি মানুষের জীবন তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল এবং সেই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও জাতিসত্তা বিশ্বের অমূল্য সম্পদ। পৃথিবীর দূর-দূরান্তে মিশনারীগণ যে ধর্মীয় ভাবপ্রবাহের সৃষ্টি করেছেন, সেই প্রবাহের স্রোতধারায় বিশ্বের প্রতিটি মানুষের আচার-আচরণ, জাতীয় ও ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রবাহিত হয়ে কাথলিক মণ্ডলীর অঙ্গনে প্রবেশ করেছে এবং সে সমস্তই পবিত্র আত্মার সংযোগে পরিশুদ্ধ হয়ে, মণ্ডলীর অভ্রান্ত ধর্মশিক্ষায় একত্রিত হয়ে একটি শুদ্ধ ও পবিত্র ভাবধারায় পরিণত হয়েছে এবং এই ভাবধারা বেগবতী নদীর আকার ধারণ করে প্রবল বন্যার মতো মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে তাদের হৃদয়, আত্মা ও মনকে পবিত্র, সঞ্জীবিত ও সমৃদ্ধ করে নিজস্ব গতিতে নিত্য প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এটিই কাথলিক ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ।

উপরোক্ত আলোচনায় দেখতে পাই যে, মিশনারীগণ বিভিন্ন পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতেন। যেমন: সবাইকে একত্রিত করে, গানের মাধ্যমে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাঁরা মানুষকে যীশুর কথা শোনাতেন, হাট-বাজারে বা

মেলায় গিয়ে তাঁরা জনগণের কাছে যীশুর বাণী ব্যাখ্যা করতেন ও খ্রিস্টধর্ম বিষয়ক পুস্তক-পুস্তিকা বিলি করতেন। এভাবেই ধীরে ধীরে ভারতবর্ষে খ্রিস্টবাণী প্রচার বিস্তার লাভ করে।

তথ্য সূত্রঃ

---

[১] কলুস্‌সি, ফাঃ লুচানো, এসডিবি, (ভিকার জেনারেল), "খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাস" ৪র্থ সংস্করণ, সাধু যোসেফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট অফ প্রিন্টিং, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, পঃ বঙ্গ। ১৫ই আগষ্ট, ২০০৫ খ্রিঃ। পৃষ্ঠা নং ১৮

[২] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৮

[৩] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৮

[৪] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৮

[৫] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৯

[৬] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৯

[৭] ঐ পৃষ্ঠা নং ২০

[৮] সরকার, লুইস প্রভাত, "বঙ্গদেশে খ্রীষ্টধর্ম ও খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়", জয় গুরু ইম্প্রেশন, কলকাতা-৭০০০০৬, প্রথম সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা নং ২

[৯] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩

[১০] কলুস্‌সি, ফাঃ লুচানো, এসডিবি, (ভিকার জেনারেল), "খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাস" ৪র্থ সংস্করণ, সাধু যোসেফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট অফ প্রিন্টিং, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, পঃ বঙ্গ। ১৫ই আগষ্ট, ২০০৫ খ্রিঃ। পৃষ্ঠা নং ১৩১

[১১] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৩২

[১২] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৩২

[১৩] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৩২

[১৪] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৩৩

[১৫] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৩৪

[১৬] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৩৫

[১৭] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৩৫

[১৮] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৩৫

[১৯] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৭৯

[২০] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৭৯

[২১] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৭৯

[২২] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৭৯

[২৩] সরকার, লুইস প্রভাত, "বঙ্গদেশে খ্রীষ্টধর্ম ও খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়", জয় গুরু ইম্প্রেশন, কলকাতা-৭০০০০৬, প্রথম সংস্করণ, ২০০২। পৃষ্ঠা নং ৪

[২৪] কলুস্‌সি, ফাঃ লুচানো, এসডিবি, (ভিকার জেনারেল), "খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাস" ৪র্থ সংস্করণ, সেন্ট যোসেফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট অফ প্রিন্টিং, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, পঃবঙ্গ। ১৫ই আগষ্ট, ২০০৫ খ্রিঃ। পৃষ্ঠা নং ১৮০

[২৫] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৮০

[২৬] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৮০

[২৭] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৮০

[২৮] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৮১

[২৯] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৮২

[৩০] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৮২

[31] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৮২

[32] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৮৩

[33] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৮৩-১৮৪

[34] সরকার, লুইস প্রভাত, "বঙ্গদেশে খ্রীষ্টধর্ম ও খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়", জয় গুরু ইম্প্রেশন, কলকাতা-৭০০০০৬, প্রথম সংস্করণ, ২০০২। পৃষ্ঠা নং ১১

[35] ঐ পৃষ্ঠা নং ১১

[36] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৫

[37] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৫

[38] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৬

[39] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৬

[40] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৭

[41] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৭

[42] কলুস্সি, ফাঃ লুচানো, এসডিবি,(ভিকার জেনারেল), "খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাস" ৪র্থ সংস্করণ, সেন্ট যোসেফ ট্রেনিং ইনিস্টিটিউট অফ প্রিন্টিং, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, পঃ বঙ্গ। ১৫ই আগষ্ট, ২০০৫ খ্রিঃ। পৃষ্ঠা নং ১৮৫

[43] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৮৫

[44] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৮৫

[45] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৮৭

[46] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৮৭

[47] সরকার, লুইস প্রভাত, "বঙ্গদেশে খ্রীষ্টধর্ম ও খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়", জয় গুরু ইম্প্রেশন, কলকাতা-৭০০০০৬, প্রথম সংস্করণ, ২০০২। পৃষ্ঠা নং ১৯

[48] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৯

[49] ঐ পৃষ্ঠা নং ২১

[50] ঐ পৃষ্ঠা নং ২২

[51] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৩

[52] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৪

[53] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৬

[54] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৮

[55] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩০

[56] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩০-৩১

[57] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩১

[58] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩৬-৩৮

[59] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩৭

[60] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩৭

[61] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩৮

[62] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩৯

[63] ঐ পৃষ্ঠা নং ৪১

[64] ঐ পৃষ্ঠা নং ৬২

[৬৫] ঐ পৃষ্ঠা নং ৬৫

[৬৬] ঐ পৃষ্ঠা নং ৬৭

[৬৭] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৬৯

[৬৮] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৬৯

[৬৯] কলুস্‌সি, ফাঃ লুচানো, এসডিবি, (ভিকার জেনারেল), "খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাস" ৪র্থ সংস্করণ, সেন্ট যোসেফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট অফ প্রিন্টিং, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, পঃ বঙ্গ। ১৫ই আগষ্ট, ২০০৫ খ্রিঃ। ঐ পৃষ্ঠা নং ১৯৪

[৭০] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৯৪

[৭১] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৯৫

[৭২] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৯৫

[৭৩] সরকার, লুইস প্রভাত, "বঙ্গদেশে খ্রীষ্টধর্ম ও খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়", জয় গুরু ইম্প্রেশন, কলকাতা-৭০০০০৬, প্রথম সংস্করণ, ২০০২। পৃষ্ঠা নং ১৭৭

[৭৪] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৭৭

[৭৫] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৮০

[৭৬] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৮০

[৭৭] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৮৩

[৭৮] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৮৩

[৭৯] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৮৪

[৮০] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৮৪

[৮১] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৮৪-১৮৫

[৮২] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৮৮

[৮৩] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৮৯

[৮৪] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৯৩

[৮৫] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৯৪

[৮৬] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৯৫

[৮৭] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৯৬

[৮৮] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৯৮

[৮৯] ঐ পৃষ্ঠা নং ২০৫

[৯০] ঐ পৃষ্ঠা নং ২১৮

[৯১] ঐ পৃষ্ঠা নং ২২০

[৯২] ঐ পৃষ্ঠা নং ২২০

[৯৩] ঐ পৃষ্ঠা নং ২২২

[৯৪] ঐ পৃষ্ঠা নং ২২৫

[৯৫] ঐ পৃষ্ঠা নং ২২৭

[৯৬] ঐ পৃষ্ঠা নং ২২৭

[৯৭] ঐ পৃষ্ঠা নং ২২৮

[৯৮] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৬১

[৯৯] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৬২-২৬৩

[১০০] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৬৪

[১০১] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৯০

[১০২] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৯৮

[১০৩] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩০৪

[১০৪] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩০৫

[১০৫] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩০৬

[১০৬] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩০৮

[১০৭] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩০৯

[১০৮] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩৪০

[১০৯] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩৪৩

[১১০] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩৪৪

[১১১] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩৪৪

[১১২] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩৪৬

[১১৩] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩৬৯

গ্রন্থপঞ্জি

❖ সরকার, লুইস প্রভাত, “বঙ্গদেশে খ্রীষ্টধর্ম ও খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়”, জয় গুরু ইস্প্রেশন, কলকাতা-৭০০০০৬, প্রথম সংস্করণ, ২০০২।

❖ কলুস্সি, ফাঃ লুচানো, এসডিবি, (ভিকার জেনারেল), “খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাস” ৪র্থ সংস্করণ, সেন্ট যোসেফ ট্রেনিং ইনিস্টিটিউট অফ প্রিন্টিং, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, পঃ বঙ্গ। ১৫ই আগষ্ট, ২০০৫ খ্রিঃ।

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতবর্ষের বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে কাথলিক মিশনারীদের ভূমিকা

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৫.১	ভূমিকা	২৫০
৫.২	নতুন খ্রিস্টউয় সমাজ ভারতের সমাজ ব্যবস্থার অঙ্গীভূত	২৫০
৫.৩	আর্চবিশপ কেরু (১৮৪০-১৮৫৫ খ্রিঃ)	২৫২
৫.৪	পশ্চিমবঙ্গ ভিকারিয়েটে যেজুইটগণ	২৫৬
৫.৫	সিস্টার্স অব চ্যারিটির শিমুলিয়ায় আগমন অঞ্চল	২৫৭
৫.৬	কৃষ্ণনগরে দ্বিতীয় বিশপ শান্তিনো তাভেজ্জা (পিমে) ১৯০৬ - ১৯২৮	২৫৭
৫.৭	আসানসোল অঞ্চল	২৫৯
৫.৮	মিশনারীজ অব চ্যারিটির প্রতিষ্ঠা	২৫৯
৫.৯	শহরে পানীয় জল সরবরাহ	২৬২
৫.১০	এক্সরে মেশিন ও থিয়েটার হল	২৬২
৫.১১	পুস্তক প্রকাশনা	২৬৩
৫.১২	জনকল্যাণমূলক কাজ	২৬৩
৫.১৩	উপসংহার	২৬৪

বিভিন্ন সামজিক কর্মকাণ্ডে কাথলিক মিশনারীদের ভূমিকা

৫.১ ভূমিকা

মানুষ কখনো বিচ্ছিন্ন হয়ে দ্বীপের মতো বাস করতে পারে না, কারণ মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে বাস করার জন্য তাকে নিয়মকানুন মেনে সবার সাথে মিলেমিশে বসবাস করতে হয়। সমাজে এক সাথে থাকতে গেলে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ার প্রয়োজন পড়ে, আদান-প্রদানের দরকার পড়ে। তবে পাওয়ার চাইতে যারা দেওয়ার উপর বেশি জোর দেয় তারাই বেশি সুখী হয়। সুতরাং খ্রিস্টমণ্ডলী বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে নিজেদেরকে উদারভাবে বিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা বিশ্বাসী ভক্তদের অন্তরে ভ্রাতৃপ্রেম সৃষ্টি করার ও সকলকে প্রেমের বন্ধনে জীবন যাপন করতে উদ্দীপিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। যীশু খ্রিস্ট তার প্রচার জীবনে যাদের মনোনীত করেছিলেন তারা সবাই সাধারণ মানুষ ছিলেন। যাদের কাছে তাঁরা মঙ্গলবাণী প্রচার করেছিলেন তারা প্রায় সবাই ছিল সমাজের দরিদ্র, অবহেলিত, লাঞ্ছিত, অভাবী, দুঃখী, বিধবা, অসুস্থ ও পঙ্গু। তেমনিভাবে খ্রিস্টমণ্ডলী যীশুর নির্দেশিত পথে চলে সামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছেন।

৫.২ নতুন খ্রিস্টীয় সমাজ ভারতের সমাজ-ব্যবস্থার অঙ্গীভূত

সাধু থোমাস ভারতে পদার্পণ করার অব্যবহিত পরেই ভারতের তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থা ও কৃষ্টির সঙ্গে খ্রিস্টীয় সমাজ নিজেকে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত করে। এভাবে তার জীবনযাত্রার মধ্যে ভারতীয় রূপটিই ফুটে ওঠে। তাই মালাবারের হিন্দু-খ্রিস্টান নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের কাছে তিনি 'থোমাস সন্ন্যাসী' নামে অভিহিত হয়ে থাকেন। থোমাস সন্ন্যাসীর দ্বারা দীক্ষিত খ্রিস্টানগণ তাদের ধর্মান্তরপূর্ব হিন্দু নাম ও পদবী অপরিবর্তিত রাখে। হিন্দু সমাজের তৎকালীন জাতিভেদ বা বর্ণভেদ প্রথায় তিনি হস্তক্ষেপ করেননি। ফলে তাঁর দীক্ষিত খ্রিস্টানগণ ধর্মান্তরিত হলেও হিন্দু জাতিভেদ প্রথার পরিমণ্ডলের মধ্যে রয়ে গেল। সেই জন্য নতুন খ্রিস্টীয় সমাজ – ব্রাহ্মণ খ্রিস্টান

ও অব্রাহ্মণ খ্রিস্টান – এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে রইল। ধর্ম পৃথক হলেও খাদ্য, পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ ও প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় তারা ভারতের সনাতন প্রথা মেনে চলতেলাগলো।[১]

সাধু থোমাস যে সাতটি গির্জা নির্মাণ করেছিলেন সেগুলো হিন্দু মন্দিরের আদলেই নির্মিত হয়েছিল।

হুগলির জনসাধারণের আশা পূরণ হলে তারা একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করার জন্য আবেদন জানায়। ফাদারগণ তাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। সেই সময় সহায়-সম্বলহীন ও আশ্রয়হীন রোগাক্রান্ত মানুষের মৃতদেহ পথেপ্রান্তরে ও নদী তীরে পড়ে থাকতে দেখা যেতো। তাদের গলিত লাশ শৃগাল-কুকুর ও শকুনিরা নিয়ে টানাটানি করতো। এমন নারকীয় দৃশ্য দেখে ফাদারগণ মর্মাহত হতেন। এই সব দুঃস্থ, দরিদ্র ও মুমূর্ষু মানুষদের খোঁজ খবর কেউ রাখতো না। মৃত্যুপথযাত্রী এই সব মানুষ তাদের জীবনের শেষ মুহূর্তে যেন একটু সহানুভূতি, একটু সেবাযত্ন, একটু ভালবাসার ছোঁয়া পেতে পারে এই উদ্দেশ্যে যেজুইটগণ হুগলীতে একটি হাসপাতাল স্থাপন করেন।[১] ফাদার আঁদ্রে বুএজ হাসপাতালটিকে পরিপূর্ণ রূপ দেওয়ার দায়িত্বে রয়ে গেলেন।

আড়াইশ' বছর ধরে বিদেশী শাসনের উৎপীড়নেরফলে বাঙ্গালী সমাজ তার মানসিক ও চারিত্রিক পরিচয় হারিয়ে ফেলেছিল। সমাজ যখন নিরাশায় আচ্ছন্ন হয়ে মৃতপ্রায় হয়ে দিন কাটাচ্ছিল সেই সময়ে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ঘটে। তার প্রেম ও ভক্তির উদার ধর্মমতে মানুষে মানুষে ভেদ নেই, উঁচুনীচু জাতির বাছবিচার নেই, হিন্দু-মুসলমান প্রভেদ নেই। সেখানে স্থান ছিল সবারই। এভাবে সমাজে অবহেলিত অসংখ্য নরনারীর মনে নতুন আশা সৃষ্টি হওয়ার ফলে তারা মাথা তুলে দাঁড়াবার পথ খুঁজে পেল। তিনি ভক্তিরস আস্বাদন ও প্রকাশের জন্য প্রবর্তন করলেন 'নাম সংকীর্তনের'।[২] তাঁর জীবনকাল ছিল ১৪৮৬খ্রিঃ হতে ১৫৩৩ খ্রিঃ পর্যন্ত।

সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে শ্রীচৈতন্যের এই অভাবনীয় প্রভাব উপলব্ধি করে ৩ জন মিশনারী বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তারা হলেন ফাদার পিটার গমেজ, ফাদার বেনেডিক্ট রড্রিক্স ও ফাদার জন দ্য ক্রুজ।

৫.৩ আর্চবিশপ কেরু(১৮৪০-১৮৫৫)

তিনি একটি ডিসপেনসারী ও কয়েকটি অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। সে সময়ে কলকাতায় যে রাস্তাটি Burial Ground Road (কবরখানা রোড) নামে পরিচিত ছিল, আজকে সেই রাস্তাটির নাম পার্ক স্ট্রীট। Burial Ground Road এর আশেপাশের অঞ্চলটিকে শহরতলী বা উপকণ্ঠ হিসাবে ধরা হতো। এই রোডে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের একটি চ্যাপেল কলকাতায় বসবাসরত কাথলিকদের উপাসনার জন্য ব্যবহৃত হতো। এই চ্যাপেলটিই ছিল দক্ষিণ কলকাতার প্যারিশ চার্চ। এর আশেপাশে কোন বাড়িঘর ছিল না। সন্ধ্যা হলেই সেখানে শিয়ালের ডাক শোনা যেতো। এই রোডের দক্ষিণের বাড়িটিই পরবর্তীতে ‘লরেটো হাউস’ নামে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। বঙ্গদেশে লরেটো সিষ্টারগণই প্রথম কাথলিক সন্ন্যাসিনী। এটাই তাঁদের প্রথম কনভেন্ট।

এই লরেটো হাউস নামক গৃহটির একটি অতীত ঐতিহ্য আছে। এই বাড়িটিই বাংলার গভর্নও Mr. Henry Vansittart এর বাগানবাড়ি হিসেবে নির্মিত হয়েছিল। পরে এই বাড়িতেই বাংলার প্রধান বিচারপতি স্যার এলিজা ইম্পে (Elijahl Impey) কিছু দিন বাস করেন। এই বাড়িতেই কলকাতার এ্যাংলিকান চার্চের বিশপ হেবারও (R. Heber) কিছুদিন বাস করেন।

বিশপ কেরু ১৮৪২ খ্রিঃ সেন্ট টমাস চার্চ ও তার সংলগ্ন একটি ছোট্ট বাসগৃহ নির্মাণ করেন। তবে কেউই সেই বাসগৃহে বাস করার সুযোগ পাননি। পরবর্তী সালে লরেটো সিস্টারগণ এই গৃহটিকে পরিবর্তন করে একটি শিক্ষায়তনে পরিণত করেন। এই গৃহটি বর্তমানে লরেটো হাউসের ট্রেনিং কলেজ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।[৩]

সেই সময়ে পার্কস্ট্রীটে ‘সাঁ সুসি’ (Sams Souci) নামক একটি থিয়েটার হল ছিল। থিয়েটার হলের প্রবেশদ্বারের দুই পাশে অপূর্ব কারুকার্যখচিত দুটি সু-উচ্চ পিলার ছিল। পিলার দুটি

কলকাতায় দর্শনীয় সৌধগুলির মধ্যে অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য নিদর্শন হিসাবে গণ্য হতো।[৪] ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে এটি সম্পূর্ণ হয়।

১৮৪১ খ্রিঃ ৮ই মার্চ কলকাতার বহু অভিজাত ও গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে একটি নাটক মঞ্চস্থ করার মাধ্যমে এই হলের উদ্বোধনকার্য সম্পন্ন হয়।

সেই সময় অভিনেত্রী শ্রীমতি লিচ মঞ্চে অভিনয় করতেন। কোন এক নাটকের দৃশ্যে অভিনয় করার সময় মঞ্চে আগুন লেগে যায়। তখন তিনি সেই আগুনে দগ্ধ হয়ে ১৮৪৩ খ্রিঃ ২রা নভেম্বর ৩৪ বৎসর বয়সে মারা যান। হলের পাশেই অভিনেত্রীর বাড়ি ছিল। এটি তখন কলকাতার আর্চবিশপ ভবন। এখনো দেখা যায় ছোট ছোট পাথরজমানো মোজাইক করা মেঝে, খিলান করা ছাদ, সু-উচ্চ দরজা ও জানালা, উপরে উঠবার কাঠের সিঁড়িতে কারুকার্য করা, কাঠের রেলিং দেড়শত বৎসরের অতীতকে আঁকড়ে ধরে আছে।

বিশপ কেরু ফাদার টমাস আলিফকে ভিকার এ্যাপোস্টলিক নিযুক্ত করার পর মিশন পরিচালনার জন্য আয়ায়ল্যাণ্ডের মিশনপ্রেমীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেন। তিনি এই টাকা দেশীয় কাথলিকদের শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যয় করার মনস্থ করেন।[৫] এরপর তিনি আইরিশ খ্রিস্টিয়ান ব্রাদারদের অনুসরণে একটি দেশীয় ব্রাদারদের সংঘ ও লরেটো সিস্টারদের অনুকরণে দেশীয় সিস্টারদের সংঘ স্থাপন করেন। তিনি তাদের হাতেই দেশীয় কাথলিক ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের দায়িত্ব ন্যস্ত করতে আগ্রহী ছিলেন।

১৮৫২ খ্রিঃ কৃষ্ণনগরে কলেরা রোগ মহামারী রূপে দেখা দেয়। তখন চিকিৎসার জন্য কোন গৃহ না পেয়ে শহরের কর্তৃপক্ষ সরকারের মাধ্যমে কাথলিক গীর্জাটি হাসপাতাল হিসাবে ব্যবহার করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। আর্চবিশপ কেরু সানন্দে অনুমতি প্রদান করেন। ফলে গীর্জাটির অবলুপ্তি ঘটে।

ফাদার জুবিবুরুর নিকট উড়িষ্যার বালেশ্বর থেকে ডাক আসে। তখন সেখানে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ চলছিল। অনাহারে বহু লোক মারা যাচ্ছিল। পিতামাতা হারিয়ে বহু শিশু অনাথ হয়ে পড়েছিল।

তখন ফাদার কৃষ্ণচন্দ্রপুর নামক স্থানে একখণ্ড জমি কিনে অনাথ শিশুদের আশ্রয় দানের ব্যবস্থা করলেন।[৬] সে যুগে যাতায়াতের বাহন ছিল পালকি, ঘোড়া, গরুর গাড়ি ও নৌকা।

মধ্যবঙ্গের জেলাগুলোতে কোথাও কোথাও প্রোটেস্টান্ট মিশনারীগণ হাসপাতাল স্থাপন করে জনসাধারণের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

মধ্যবঙ্গের বহরমপুরে ৪জন মিশনারী ১৮৫৫ খ্রিঃ ১৭ই জুন পৌঁছান। তাঁরা মিলান থেকে যতটুকু ইংরেজি শিখে এসেছিলেন তা চর্চার মাধ্যমে আরও বেশি করে রপ্ত করেছিলেন। আর্চবিশপ কেরু ফাদারদের বাংলা ও হিন্দি শেখানোর জন্য একজন ব্রাহ্মণকে তাদের সঙ্গে প্রেরণ করেন। ছয় মাসের মধ্যে তারা বাংলা ও ইংরেজি ভাষা আয়ত্তে এনে কথাবার্তা বলতে সক্ষম হন।

নবাগত এই মিশনারীদের অত্যন্ত বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা হলো কলকাতার সন্নিহিত অঞ্চলেও বহরমপুরে সাধারণ মানুষের দরিদ্রতা। কলকাতার আর্চবিশপ কেরু সীমাহীন অভাবগ্রস্ত পিতা মাতার পরিত্যক্ত ছেলেমেয়েদের রাস্তা থেকে তুলে এনে তাদের লালন পালনের জন্য একটি অনাথ ভবন তৈরি করেন। এই সব অনাথ শিশুদের খাদ্য, বস্ত্র ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার জন্য তিনি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।[৭]

বিশপ আলিক ফাদার পারিয়েত্তির হাতে ৮০০ টাকা দিয়ে কৃষ্ণনগরে ফাদার জুবিবুরু ১৮৪৭ খ্রিঃ প্রতিষ্ঠিত হাসপাতাল হিসাবে ব্যবহৃত গির্জাটি কৃষ্ণ নগর কমিটির কাছ থেকে পুনরুদ্ধার করার নির্দেশ দেন। হাসপাতালটি অন্যত্র স্থানান্তরিত হলে গির্জাটি ভগ্নপ্রায় অবস্থায় পড়েছিল।

১৮৬০ খ্রিঃ ১৭ মার্চ মাসে ইটালী থেকে সিস্টারস অফ চ্যারিটির ৪ জন সিস্টার ও একজন সহযোগী কৃষ্ণনগরে পদার্পণ করেন। ফাদার লিমানা তাদের উপর বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান ও পরিচালনার ভার দেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানকার্য ছাড়াও সিস্টারগণ মায়েদের ধর্মশিক্ষা দান ও রোগীদের চিকিৎসা করতে থাকেন। তাদের দাতব্য চিকিৎসালয়ে রোগীদের ভিড় দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরবর্তীকালে সিস্টারদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তারা সুদূর পল্লী অঞ্চলে মিশনের কাজে সহযোগীতা করার জন্য প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও কাজে ব্রতী হন।[৮]

১৮৬৫ খ্রিঃ নভেম্বর মাসে আরো দুইজন সিস্টারদের কৃষ্ণ নগরে প্রেরণ করেন। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্নে ফুলবাড়ী বয়স্কা মহিলা ও কিশোরী বালিকারা নীতি ও ধর্ম শিক্ষায় জ্ঞান অর্জন করতে থাকে।[৯]

মধ্যবঙ্গের মানুষের কাছে দুর্ভিক্ষ, বন্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কোন নতুন ঘটনা নয়। ১৮৬৬ খ্রিঃ বর্ষাকালে এক ভয়াবহ বন্যায় নদীয়া নিমজ্জিত হয়। বন্যার পরেই মহামারীরূপে দেখা দেয় কলেরা ও অন্যান্য মারাত্মক রোগ-ব্যাধি। ফুলবাড়ী, ভবরপাড়া ও নিকটবর্তী গ্রামের অধিবাসীরা চরম দুরবস্থার মধ্যে পতিত হয়। ফাদার ব্রিওস্কি জাতিধর্ম নির্বিশেষে তার সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে কলেরা রোগীদের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়েন।[১০] অবশেষে তিনিও কলেরায় আক্রান্ত হয়ে ১৬ই জুলাই মৃত্যুবরণ করেন।

১৮৬৬ খ্রিঃ ফাদার ব্রিওস্কির অনুকরণে চ্যারিটি সিস্টারগণও আপ্রাণ চেষ্টা করেন। সেই মহামারীর কবল থেকে যেসব ছেলেমেয়ে রক্ষা পেয়েছিল, তাদেরকে তাঁরা কৃষ্ণনগরে একটি ক্ষুদ্র বাসগৃহে আশ্রয় দেন।

তখনকার দিনে অল্পবয়সী মেয়েদেরকে পাত্রস্থ করা হতো। তিনি এসব মেয়েদের জন্য একটি স্কুল খোলেন এবং তারা যেন বিবাহিত জীবনে আদর্শ সহধর্মিণী ও জ্ঞানী হতে পারে, সে জন্য তাদের গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতেন।[১১]

ইটালী থেকে আরো কয়েকজন সিস্টার আসার পর তাঁরা কৃষ্ণনগর ও যশোহরে একটি করে বহির্বিভাগীয় চিকিৎসাকেন্দ্র খোলেন। প্রতিদিন সেখানে বহু রোগী বিনামূল্যে চিকিৎসা ও সেবা পেতো। পরবর্তীতে তাঁরা ভবরপাড়ায় একটি ডিসপেনসারী খোলেন।[১২]

বঙ্গদেশের প্রতিকূল আবহাওয়ায় ইটালিয়ান ফাদারগণ প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। সেই জন্য ফাদার মারিয়েত্তি হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে দার্জিলিংএর কাছে সোনাদায় একটি স্বাস্থ্যনিবাসনির্মাণ করেন। বয়স্ক ফাদারদের অবসর যাপনের জন্য তিনি সেখানে আরও একটি গৃহ নির্মাণ করেন। সম্ভ্রান্ত ও বিত্তশালী ঘরের সন্তান হিসাবে ফাদার মারিয়েত্তি তাঁরই আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে স্বাস্থ্যনিবাস ও বৃদ্ধাশ্রম নির্মাণ করেন।[১৩]

৫.৪ পশ্চিমবঙ্গ ভিকারিয়েটে যেজুইটগণ

১৮৬৬-৬৭ খ্রিঃ বালেশ্বরে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তখন ফাদার সাপার্ট জাতিধর্ম নির্বিশেষে বহু মানুষের জীবন রক্ষা করেন। দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে বহু মানুষ প্রাণ হারায়, অনেক শিশু অনাথ হয়ে পড়ে। এই সব অনাথ শিশুদের জন্য তিনি একটি অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৮৬৮ খ্রিঃ কলকাতা থেকে ক্রুশভক্ত কন্যা সংঘের তিনজন সিস্টার বালেশ্বরের এই অনাথ আশ্রম পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[১৪]

১৮৬৬-৬৭ খ্রিঃ মধ্যবঙ্গের সমস্ত মিশনকেন্দ্রগুলির মধ্যে নদীয়ার ফুলবাড়ি ছিল সবচেয়ে বিতর্কিত মিশন। ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় কৃষ্ণনগরে ফাদার লুইজি লিমানা ও ফুলবাড়িতে ফাদার লুইজি ব্রিয়স্কি জাতিধর্ম নির্বিশেষে দুর্ভিক্ষ-কবলিত মানুষদের প্রাণ বাঁচাতে অকাতরে সাহায্যদান করেন। এভাবে বহু মানুষ অনাহার ও অপুষ্টির করালগ্রাস থেকে রক্ষা পায়।

১৮৮৩ খ্রিঃ সিস্টারস্ অফ চ্যারিটির সিস্টারগণ ফাদার উঠেতির তত্ত্বাবধানে ভবরপাড়ায় অসুস্থ ও বৃদ্ধাদের জন্য একটি আশ্রম নির্মাণ করেন। ১২ জন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এই আশ্রমে আশ্রয় পায়।[১৫]

ফাদার কান্দিনো উচের্তি (Fr. Candino Ucherti) ১৮৮৪ খ্রিঃ পাকুড়িয়া গ্রামে কলেরার প্রাদুর্ভাব ঘটলে গ্রামের ক্যাথলিকদের অনুরোধে পাকুরিয়া গমন করেন ও তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। তিনি নিজেও কলেরা রোগগ্রস্তদের সেবা-শুশ্রূষা করতে আরম্ভ করেন। ঘটনা চক্রে তিনি নিজেও আক্রান্ত হন। এপ্রিল মাসে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৮৯৩ খ্রিঃ ২৪শে মে সমগ্র ২৪ পরগণায় বয়ে যায় প্রাণঘাতী ঘূর্ণিঝড়; আর সেই সঙ্গে বৃষ্টিপাত। আচমকা এই ঝড় ও বন্যায় ২৪ পরগণা ডুবে গেল জলের নিচে। মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়লো।বাবা-মায়েরা তাদের ছেলেমেয়েদের বোর্ডিংএ নেওয়ার জন্য দলে দলে ফাদারদের কাছে এসে আকুল আবেদন জানাতে লাগলো। তখন ফাদার মান ও ফাদার গ্রেগরী উপায়ন্তর না দেখে ১০ জুলাই ১৮৯৩ খ্রিঃ সেখানে বোর্ডিং খুললেন। খালের পাশে দুটি ঘরের মধ্যে ছেলে মেয়েদের রাখা হয়। একটিতে ৮২ জন ছেলে ও অপরটিতে ৫৮ জন মেয়ে।[১৬]

১৮৯৭ খ্রিঃ কলকাতার শহরতলীতে দেখা দিল মহামারী। তখন ফাদারগণ তাদের সেবা যত্নে রত ছিলেন।

৫.৫ সিস্টারস্ অব চ্যারিটির শিমুলিয়ায় আগমন

১৮৬৪ খ্রিঃ থেকে চ্যারিটি সম্প্রদায়ের সিস্টারগণ যশোহর শহরে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং আরো অনেক কল্যাণকর কাজ করছিলেন। কিন্তু অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুর জন্য তাঁরা তাঁদের যশোহর শহরের বাসগৃহ ও আশ্রম বন্ধ করে দেন এবং শিমুলিয়া গ্রামে তাদের বাসগৃহ ও কনভেন্ট স্থাপন করেন।

১৮৮৭ খ্রিঃ সিস্টারগণ একটি ছাত্রী নিবাস ও বিধবাদের জন্য একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরা ছোট ছেলেমেয়েদের সাধারণ শিক্ষা ও ধর্মশিক্ষা দিতে থাকেন এবং রুগ্নপীড়িতদের ঔষধপত্র দিয়ে সেবা করতে থাকেন।[১৭]

ফাদার নাভা যাজকদের জন্য শিমুলিয়ায় গৃহ নির্মাণ করেন ও বিশপ পৎস্যির নির্দেশে ছাত্রাবাস নির্মাণ করেন। বিভিন্ন গ্রাম থেকে ছেলেদের নিয়ে এসে এখানেই তিনি তাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন।

১৮৯৭ খ্রিঃ কৃষ্ণনগর ডাইওসিসে ছিল দুর্যোগের বছর। ১১ই এপ্রিল এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে, ক্যাথলিক স্কুল, বসতি ও তার সংলগ্ন বাড়িঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এরপর ১২ই জুলাই ভয়াবহ ভূমিকম্পে আসাম ওবঙ্গদেশ বিধ্বস্ত হয়। আগুন ও ভূমিকম্পের পর নির্ধারিত সময়ে মৌসুমি বায়ু না আসায় দেখা দেয় খরা আর দুর্ভিক্ষ। তখন ফাদার জোসেফ মাক্কি (Joseph Macchi) বিশপ পৎস্যির নির্দেশে দুর্ভিক্ষ কবলিত সব ধর্মের লোকদের সাধ্যমতো খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করে তাদের প্রাণ বাঁচাতে সাহায্য করেন।

৫.৬ কৃষ্ণনগরে দ্বিতীয় বিশপ শান্তিনোতাভেজ্জা (পিমে) (১৯০৬-১৯২৮)

ফাদার নাভা শিমুলিয়া মিশনে তার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। ১৯১৯ খ্রিঃ পরপর দুই বার ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে যশোহর ও সুন্দরবনের মালাগাছি গ্রামের গির্জাগুলো বিধ্বস্ত হয়।

ফাদার মারিয়েত্তির রেখে-যাত্তয়া অর্থ দিয়ে ফাদার নাভা ঐ সমস্ত গির্জা ও বাসগৃহ পুনর্নির্মাণ করেন। তিনি একজন দক্ষ কারুশিল্পী ও স্থপতি ছিলেন। ফাদার নাভাকে শিমুলিয়ায় 'ক্যাথলিক মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।[১৮]

১৯০৭ খ্রিঃ নদীয়া জেলায় আর একবার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ইংরেজ সরকার গরিবদুঃখীদের সাহায্যার্থে কিছু অর্থ ও খাদ্য দ্রব্য সরবরাহ করে। তখন সরকার ফাদার সাক্কিকে ত্রাণসামগ্রী বন্টনের জন্য সাহায্যকারী হিসাবে নিযুক্ত করে। দুর্ভিক্ষের প্রকোপ শেষ হলে ফাদার সাক্কি দুঃস্থ গ্রামবাসীদের আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য গ্রামীণ সমবায় ব্যাংক গঠন করার দিকে মনোনিবেশ করেন। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ভবরপাড়া ও রানাবন্দ – এই দুটি গ্রামে সমবায় ব্যাংক স্থাপিত হয়। ইংরেজ সরকার এই উদ্যোগকে পূর্ণ সমর্থন করে এবং তা সফল করার জন্য সহযোগিতা করতে থাকে। তার ফলে অন্যান্য মিশনকেন্দ্রগুলিতে সমবায় ব্যাংক স্থাপিত হতে থাকে।[১৯]

মেয়েদের সাধারণ শিক্ষা ও ধর্মশিক্ষা দানের জন্য সিস্টারস অফ চ্যারিটি সম্প্রদায়ের সিস্টারগণ উত্তরবঙ্গে আসেন। তারা ধানজুরিতে প্রথম কনভেন্ট স্থাপন করেন। এখানে তারা একটি কুষ্ঠাশ্রমও খোলেন।[২০] এসব কাজে নিষ্কলঙ্কা মারিয়ার ভগিনীগণ তাঁদের সহযোগিতা করেন।

ফাদার গাব্রীচ একটি প্রসূতিসদন নির্মাণ করেন এবং Daughters of the Cross সিস্টারদের উপর এই প্রসূতি সদন পরিচালনার ভার অর্পণ করেন।[২১]

ইতিমধ্যে বাসন্তীতে একটি কারিগরী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ব্রাদার ভিদমার ছাত্রদের কাঠের কাজ শেখানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।[২২]

ফাদার আর্নেস্ট মেদেনীপুর স্কুলের সঙ্গেই দরিদ্র ছেলেমেয়েদের জন্য নির্মল হৃদয় আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে তাদের সাধারণ শিক্ষা ও ধর্মশিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। সেই সঙ্গে তিনি আদিবাসী ছাত্রদের জন্য একটি হোস্টেল চালু করেন।

৫.৭ আসানসোল অঞ্চল

আসানসোল অঞ্চলে যখন বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে, তখন এসব শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন ইউরোপিয়ান বা আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ারগণ। তাদের সাথে আসানসোলের ফাদারদের সখ্যতা ছিল। ফাদারদের সুপারিশক্রমে রাঁচী, বেতিয়ার বহু লোক চাকুরির সুযোগ লাভ করে। এর ফলে চেলিয়াডাঙ্গায় ক্যাথলিকদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১৯৫২ খ্রিঃ থেকে বর্ধমান জেলার আরও উন্নতি হতে থাকে। ঐ সময় দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন, মাইথন বাঁধ তৈরি, পাঞ্চেৎ বাঁধ তৈরি ও দুর্গাপুর ব্যারেজ তৈরির বিশাল কর্মকাণ্ড শুরু হয়।[২৩] Andrew Yule ও Bengal Coal কোম্পানীর ম্যানেজারগণ বরাকর থেকে দু'মাইল দূরে Saneteria তে হাসপাতাল তৈরি করে আসানসোলের ফাদারকে এই হাসপাতালে সেবাকার্য পরিচালনা করার জন্য বারোজন সিস্টারকে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করেন। পরবর্তীতে সিস্টারগণ কর্মস্থলে যোগ দেন।

৫.৮ মিশনারীজ অফ চ্যারিটির প্রতিষ্ঠা

১৯১০ খ্রিঃ ২৬ আগষ্ট মাদার তেরেজার জন্ম হয় যুগোশ্লাভিয়ার স্কোপজি শহরে। তাঁর সন্ন্যাসপূর্ব নাম কুমারী আগ্নেস বোজাহিউ। তিনি যেখানে পড়াশুনা করতেন সেখানে কলকাতার যেজুইট ফাদারদের কাজকর্মের খবরাখবর যেতো। সব জানার পর আগ্নেশের মধ্যে সন্ন্যাব্রতী হওয়ার ইচ্ছা জন্মায়। সেই সময় কলকাতায় লরেটো সিস্টারগণ একটি স্কুল চালাতেন।

১৯২৮ খ্রিঃ২৬ সেপ্টেম্বর লরেটো হাউজের প্রধান কার্যালয় আয়ারল্যাণ্ডের বথকার্নহোমে গমন করেন। ১৯২৯ খ্রিঃ ৬ই জানুয়ারি তিনি কলকাতায় পদার্পণ করেন।

১৯৩১ খ্রিঃ ২৪ শে মে আগ্নেশব্রতগ্রহণ করে টেরেজা নাম ধারণ করেন ও এন্টেলীর সেন্ট মেরীজ হাইস্কুলে শিক্ষিকা হিসাবে কাজে যোগ দেন।

১৯৪৭ খ্রিঃ ভারত স্বাধীন হওয়ার পরই তিনি ভারতের নাগরিকত্ব লাভ করেন। ১০ই সেপ্টেম্বর বার্ষিক নির্জন ধ্যানের জন্য তিনি ট্রেনে চড়ে দার্জিলিং যাচ্ছিলেন। যাবার পথে, ট্রেনের মধ্যেই

তিনি শুনতে পেলেন যীশুর দৈব আহ্বান। এই আহ্বান ছিল দরিদ্রতম মানুষের জন্য কাজ করার উদ্দেশ্যে একটি নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের।

১৯৪৮ সালে লরেটো কনভেন্ট ত্যাগ করার অনুমতি পাবার পর টেরেজা চলে গেলেন পাটনায়। সেখানে মেডিকেল মিশনারী সিস্টারদের আশ্রমে রোগীদের শুশ্রূষা ও বহির্বিভাগে চিকিৎসার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন।

১৯৪৮ খ্রিঃ ২১শে ডিসেম্বর কলকাতায় মতিঝিল বস্তিতে তিনি তার দয়া ও প্রেমের কাজ আরম্ভ করেন। এই বস্তির মধ্যেই মাসিক পাঁচ টাকা ভাড়ায় তিনি একখানি ছোট্ট ঘর ভাড়া নিলেন।

১৯৪৯ খ্রিঃ ফেব্রুয়ারি মাসে মধ্য-কলকাতায় সহৃদয় বাঙ্গালী ক্যাথলিক মাইকেল গোমেজ তার ঘরের দোতলায় তাকে আশ্রয় দিলেন। এভাবে মিশনারীজ অফ চ্যারিটি নামক সু-বৃহৎ বৃক্ষের বীজ অংকুরিত হলো।

আস্তে আস্তে তা বাড়তে লাগলো, করতে লাগলো শক্তি সঞ্চয়, পরিণত হলো একটি মহীরুহে এবং বিস্তার করতে লাগলো অনেক শাখা-প্রশাখা।[২৪]

১৯৫৪ খ্রিঃ কালীঘাট মন্দিরের ধারে রাস্তায় পড়ে থাকা মুমূর্ষুদের জন্য খোলা হলো 'নির্মল হৃদয় আশ্রম'। ১৯৫৫ খ্রিঃ পরিত্যক্ত ও অনাথ শিশুদের জন্য তৈরি হলো 'শিশু ভবন'। দেশ-বিদেশে খোলা হলো নতুন নতুন আবাসের বুনিয়াদ। হাজার হাজার দরিদ্র মানুষ, অসহায় অনাথ শিশু, আশ্রয়হীন মানুষ এর শাখা-প্রশাখায়, এর পল্লবের ছায়ায় আশ্রয় নিতে লাগলো।[২৫]

১৯৬২ খ্রিঃ ম্যানিলা থেকে মাদার টেরেজা পেলেন 'ম্যাগসেসাই' পুরস্কার এবং ভারত সরকারের কাছ থেকে পেলেন 'পদ্মশ্রী' সম্মান। এরপর থেকেই মাদার তেরেসার কর্মযজ্ঞের খবর ছড়িয়ে পড়তে লাগল বিশ্বের সর্বত্র। অসংখ্য পুরস্কার ও বিপুল দানে বিভূষিতা হলেন মাদার। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টরেট উপাধি দিয়ে সম্মানিত করে।

দেশ বিদেশের রাষ্ট্রপ্রধানেরা তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী হলেন। বিভিন্ন দেশ থেকে তাঁর ডাক আসতে লাগলো, সেখানে যেন তিনি তার আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

মনসিনিয়র বার্স যারা স্কুলে পড়েনা বা পড়ার সুযোগ পায়না, সেই সব ছেলেদের জন্য অরাটরি বা ক্লাস প্রতিষ্ঠা করে তাদের নীতিশিক্ষা ও খেলাধুলা শেখানোর ব্যবস্থা করলেন। কৃষ্ণনগরে ব্রাদার উতারি একটি অরাটরি প্রতিষ্ঠা করেন এবং খ্রিস্টান, অখ্রিস্টান ছেলেদের নৃত্য, গীত, ব্যায়াম ও নীতিশিক্ষা দিতে থাকেন।[২৬]

১৯৩৩ খ্রিঃ ফাদার সাঞ্চেস রানাবন্দের পালকপুরোহিত নিযুক্ত হন। কৃষ্ণনগর থেকে রানাবন্দে নৌকা করে যেতে হতো। তাই গ্রামবাসীদের সুবিধার জন্য রানাবন্দে ঘাটের উপরে একটি 'হাট' প্রতিষ্ঠা করা হয়।[২৭] এতে জনসাধারণ বিশেষভাবে উপকৃত হয়।

মনসিনিয়রস্কুদেরি মিউনিসিপ্যালিটির অনুমতি নিয়ে শহরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য চার্চের সামনে রাস্তা তৈরি করে প্রধান রাস্তার সংযোগ স্থাপন করেন।

এছাড়া তিনি খুলনা শহরের মালগাজি, সুন্দরবন অঞ্চল, ফরিদপুর জেলায় বানিয়ারচকের লুপ্তপ্রায় মিশনগুলি পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করেন।

১৯৩৭ খ্রিঃযশোহর শহরে একটি ক্যাটেখিস্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেন। রোমের ধর্মসম্প্রসারণ সংস্থার প্রিফেক্টকার্ডিনাল বিয়ন্দির অনুমতি নিয়ে বিশপ মরো কৃষ্ণনগরে ১৯৪৮ খ্রিঃ সিস্টারস অফ মেরী ইম্মাকুলেট সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। সংঘের চলতি নাম দেন 'সিস্টারস অফ মেরী ইম্মাকুলেট' (S.M.J.)

সিস্টারদের দয়া, জনসেবা বিশেষত অসহায় ও রোগগ্রস্তদের সেবা, মহিলা ও বালিকাদের শিক্ষাদান, কষ্টকর জীবন যাপন ও তাদের আত্মত্যাগ ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় হয়ে আছে।[২৮] এই সিস্টারদের বৃহত্তর অংশই ছিলেন ইটালীয়ান।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে পৃথিবীর অনেক দেশে সিস্টারস অফ মেরী ইম্মাকুলেটের শাখা রয়েছে।

বিশপ মরো ১৯৪৯ খ্রিঃ আমেরিকায় গমন করেন ও কৃষ্ণনগর ডাইওসিসের জন্য অর্থ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করেন। তিনি ৩০টন লৌহ দ্রব্যের মধ্যে দুটি জীপগাড়ি, একটি Willys Jeep Station Wagon, একটি ট্রাক্টর, ৬টি অটোমেটিক লেদ মেশিন, একটি

HammondOrgan, ৭টি টেপরেকর্ডার, ৩টি Film Projector,তিনটি জেনারেটর, ৫০ বাক্স টিনজাত খাদ্য, দশ বাক্স শিশুদের বই, ২৪টি চুল কাটার যন্ত্র, ৩০বাক্সঔষধ ও ডাক্তারি যন্ত্রপাতিএবং আরও অনেক কিছু নিয়ে আসেন।[২৯]

বিশপ মরো ১৯৫০ খ্রিঃ কৃষ্ণনগর চার্চের সম্প্রসারণের কাজ শুরু করেন ও তা শেষ হয় ১৯৫২খ্রিঃ।

৫.৯ শহরে পানীয় জল সরবরাহ

কৃষ্ণনগর শহরে ২২ হাজার লোকের জন্য ১৯২৩ খ্রিঃ প্রথম পানীয় জলের ব্যবস্থা চালু হয়। ১৯৩৮ খ্রিঃ একটি বড় ফিল্টার বসিয়ে জল পরিশোধন করার ব্যবস্থা করা হয়। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৫২-৫৩ খ্রিঃ শহরের জনসংখ্যা ৭০ হাজার অতিক্রম করে। ফলে মানুষ নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়। বিশপ মরো নানা আলোচনায় প্রসঙ্গটি উপস্থাপন করেন। তখন তিনি কমিশনারদের সহযোগিতায় সরকারের অনুমোদন লাভ করেন। বিশপ আমেরিকায় তার শুভানুধ্যায়ীদের কাছে অর্থ সাহায্যের আবেদন জানান। সব মিলিয়ে শহরের পানীয় জলের প্রকল্পটির অর্থের সংস্থান করে তা স্থাপন করেন।[৩০]

৫.১০ এক্সরে মেশিন ও থিয়েটার হল

কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতালে T.B.বিভাগে কোন (X-Ray)মেশিন ছিল না। বিশপ মরোর অনুরোধে নিউ ইয়র্কের সিআরএস (Catholic Relief Service)এখানকার জন্য এক্সরে মেশিনের ব্যবস্থা করে দেন। এতে নদীয়াবাসীদের দীর্ঘদিনের একটি অভাব পূরণ হওয়ায় বিশপ মরোর কাছে তারা ঋণী হয়ে আছে।[৩১]

সিনেমার মতো থিয়েটারও চিত্তবিনোদনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। শিক্ষার ও দৃশ্যমান বাহন। বিশপ মরো একটি ছোট থিয়েটার হল নির্মাণ করেন।[৩২]এই হলে চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হতো। কিন্তু এতে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি।

একটি বড় থিয়েটার হল নিমার্ণের পরিকল্পনার কথা তিনি আমেরিকার ওহাইও রাজ্যের সিনসিনাটি শহরের গুণমুগ্ধ বন্ধুদের কাছে পত্র যোগে ব্যক্ত করেন। কিছু দিনের মধ্যেই সমস্ত কাঠামো কলকাতা বন্দরে এসে পৌঁছে যায়। ১৯৫৭ খ্রিঃ পুনর্নির্মাণের কাজ শেষ হয়। আয়তনে থিয়েটার হলটি ১৪ ফুট লম্বা ও ৮০ ফুট চওড়া। এই হলে চলচ্চিত্র প্রদর্শন, নাটক মঞ্চস্থ করা, সভা, সেমিনার ও বক্তৃতা করার সব ব্যবস্থা করা হলো। ফলে এই থিয়েটার হলটি শুধুমাত্র কাথলিক চার্চ নয়, বরং সমগ্র কৃষ্ণনগরের জন্য একটি গৌরবের বিষয় হয়ে রইল।[৩৩]

৫.১১ পুস্তক প্রকাশনা

বিশপ মরো ফিলিপাইনে ইংরেজিতে বহু ধর্মশিক্ষার বই রচনা করেন। তাঁর বইগুলো বাংলায় অনুবাদ করে তিনি প্রচার করার সিদ্ধান্ত নেন।

বিশপ মরো ফিলিপাইনে চার্চের চত্বরে ১৯৬৭ খ্রিঃ ‘সাধু যোসেফ প্রেস’ প্রতিষ্ঠা করেন। দুইটি উদ্দেশ্যে প্রেসটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমত, বাংলা ভাষায় প্রকাশনা, দ্বিতীয়ত, যুবক-যুবতীদের প্রেস সংক্রান্ত বিষয়ে কর্মশিক্ষা দিয়ে ছাপাখানার কাজে তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে সাহায্য করা।[৩৪]

৫.১২ জনকল্যাণমূলক কাজ

১৯৫০ খ্রিঃ থেকে নদীয়ার জেলখানা ও সরকারী হাসপাতালের পরিদর্শক নিযুক্ত হন। বিশপ মরো ত্রুটিবিচ্যুতিগুলো গোপন রিপোর্টে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করতেন এবং তা সংশোধনের চেষ্টা করতেন।

১৯৬০-৬৯ খ্রিঃ বিশপ মরো পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় রেডক্রস সোসাইটির মুখ্য উপদেষ্টা ছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি বহু জনহিতকর কাজ করেন।

১৯৬৭ খ্রিঃ কৃষ্ণনগর শহরে নদীয়া স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ করার সময় বিশপ মরো একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি মোটা অংকের অর্থ সংগ্রহ করে দেন। খেলার জগতে তার উজ্জ্বল ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

কদমতলা ঘাটের কাছে শিশুউদ্যান, শ্রেষ্ঠ কৃষ্টি ও সংস্কৃতি কেন্দ্র, নগেন্দ্রনগর অঞ্চলের শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার এবং কৃষ্ণনগর টাউন হলের সংলগ্ন শ্রী অরবিন্দ ভবনের (Students Health Home) তাঁর ব্যক্তিগত সহযোগিতা ও আর্থিক অনুদানে উপকৃত হয়েছে।[৩৫]

এছাড়াও জনসেবামূলক সব কাজের মাধ্যমে বিশপ মরো জনগণের মধ্যে এক গভীর বিশ্বাস, সখ্যতা ও প্রীতির পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেন।

৫.১৩ উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, বিভিন্ন সমাজিক কর্মকাণ্ডে কাথলিক মিশনারীদের অবদান অনস্বীকার্য। ইতিহাস পড়ে এবং বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে প্রায়শই খরা, বন্যা, মহামারী ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ ক্রমাগত লেগেই থাকতো । ফলে সাধারণ মানুষ নানা রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে অকালেই প্রাণ হারাতো। নানাপ্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করে অনেক মিশনারীও প্রাণ হারিয়েছেন। তাদেরকে আমরা শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করি এবং তাদের অবদান অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করি। তখনকার দিনে গ্রামেগঞ্জে কোনো হাসপাতাল ছিল না, সেখানে কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা ভাল চিকিৎসক ছিল না। তদুপরি সমাজে ছিল নানা প্রকার কুসংস্কার, ছিল ধর্মীয় গোঁড়ামি ও নানাপ্রকার সামাজিক বিধিনিষেধ। এমন পরিস্থিতিতে মিশনারীগণ ছিলেন দরিদ্র জনগণের বন্ধু, ছিলেন প্রেমপূর্ণ সেবা ও আধ্যাত্মিক শক্তির বাহক। নানা প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে তারা অসহায় মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন এবং তাদের একান্ত আপনজন হয়ে তাদের জীবন রক্ষার জন্য নিজেদের জীবন বাজি রেখে সেবা দিয়ে মানুষের মন জয় করেছেন। এভাবে তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও মাতৃসদন প্রতিষ্ঠা করেছেন। এসব প্রতিষ্ঠানে সেবার মান ছিল উন্নত, মানবিকতাপূর্ণ, বিশ্বাসযোগ্য ও অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়বহুল। তাঁরা ছেলেমেয়েদের জন্য পাঠশালা ও স্কুল নির্মাণ করেছেন এবং নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদাভাবে বোর্ডিং নির্মাণ করে সেখানে তাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছেন। এছাড়া বন্যা, খরা ও দুর্ভিক্ষ কবলিত এলাকায় গিয়ে সকল ধর্মের লোকদের জন্য সাধ্যমতো প্রয়োজনীয়

খাদ্যের সংস্থান করেছেন এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করে তাদের প্রাণ বাঁচাতে এগিয়ে এসেছেন। তাদেরকে তারা বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ দিতেন। এভাবে সহৃদয় মিশনারীগণ নিঃস্বার্থ সেবা দিয়ে দুঃস্থ অসহায় মানুষদের ভালোবেসে, একান্ত আপনজনের ন্যায় তাদেরকে আপন ভেবে কাছে টেনে নিয়ে সামনের দিকে চলতে শিখিয়েছেন। তারা জনগণের মধ্যে সম্প্রীতি ও বিশ্বাসের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন।

তথ্য সূত্র :

---

[১] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৫
[২] ঐ পৃষ্ঠা নং ৪৩
[৩] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৭৭-১৭৮
[৪] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৭৯
[৫] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৭৯
[৬] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৯৩
[৭] ঐ পৃষ্ঠা নং ২০০
[৮] ঐ পৃষ্ঠা নং ২১৮
[৯] ঐ পৃষ্ঠা নং ২১৯
[১০] ঐ পৃষ্ঠা নং ২১৯
[১১] ঐ পৃষ্ঠা নং ২২০
[১২] ঐ পৃষ্ঠা নং ২২০
[১৩] ঐ পৃষ্ঠা নং ২২৩
[১৪] ঐ পৃষ্ঠা নং ২২৪
[১৫] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৪২
[১৬] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৪৯
[১৭] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৬৫
[১৮] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৬৫-২৬৬
[১৯] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৭০
[২০] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৭৮
[২১] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৭৮
[২২] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৮৮
[২৩] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৯৪
[২৪] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৯৯
[২৫] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৯৯
[২৬] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩০৭
[২৭] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩০৮
[২৮] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩২৩
[২৯] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩২৫
[৩০] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩২৯
[৩১] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩২৯
[৩২] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩২৯
[৩৩] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩৩০
[৩৪] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩৩০
[৩৫] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩৩১

গ্রন্থপঞ্জি

❖ সরকার, লুইস প্রভাত, "বঙ্গদেশে খ্রীষ্টধর্ম ও খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়", জয়গুরু ইম্প্রেশন, কলকাতা ৭০০০০৬, প্রথম সংস্করণ, ২০০২।

❖ পিনোস, ফাঃ লুইজী, পিমে, "খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রেরণকাজে আনন্দ", প্রকাশনা পিমে মিশনারীগণ, সুইহারী, দিনাজপুর, ২০০৫খ্রিঃ।

❖ ডি'কস্তা, যেরোম, "বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী', (প্রথম খণ্ড), প্রতিবেশী প্রকাশনী, আগষ্ট, ১৯৮৮খ্রিঃ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগ গ্রহণ

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৬.১	ভূমিকা	২৬৮
৬.২	আগস্টিনিয়ান ধর্মসংঘের যাজকদের আগমন	২৬৯
৬.৩	বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে অবদান	২৭০
৬.৪	শিক্ষায় সাফল্য	২৭২
৬.৫	আর্চবিশপ কেরু (১৮৪০-১৮৫৫ খ্রীঃ)	২৭৬
৬.৬	পূর্ববঙ্গ ধর্মাঞ্চল (১৯৪৫ খ্রিঃ)	২৭৭
৬.৭	বিশপ টমাস অলিফ (১৮৫৫-১৮৫৯ খ্রিঃ)	২৭৮
৬.৮	মধ্য বঙ্গ মিশনের অগ্রগতি	২৭৮
৬.৯	পশ্চিমবঙ্গ ভিকারিয়েটে যেজুইটগণ	২৮০
৬.১০	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	২৮২
৬.১১	কৃষ্ণনগরে ২য় বিশপ শান্তিনো তাভেজ্জা	২৮৩
৬.১২	দার্জিলিং এর পার্বত্য অঞ্চল	২৮৬
৬.১৩	ডন বস্কোর সালেসীয়দের আগমন	২৮৭
৬.১৪	লুইস এল আর মরো এসডিবি (১৯৩৬-৬৯)	২৮৮
৬.১৫	শিক্ষা	২৮৯

৬.১৬ সিস্টারস অফ মেরী ইম্মাকুলেট ২৯০

৬.১৭ খুলনা প্যারিশ ২৯০

৬.১৮ উপসংহার ২৯১

শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগ গ্রহণ

৬.১ ভূমিকা

শিক্ষা হচ্ছে সভ্যতার বিকাশ ও উন্নয়নের চাবিকাঠি। প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে ধনসম্পদের প্রাচুর্য ছিল। এদেশের মানুষের জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত সহজ-সরল। মিশনারীরা তাদের মাঝে ধর্মবিশ্বাস বিস্তারের উদ্দেশ্যে শিক্ষাদান কাজে ব্রতী হতেন। ধর্মপ্রচার ও শিক্ষা বিস্তার – এই দু'য়ের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল। তারা শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করতেন।

যীশুর সাক্ষাৎশিষ্য সাধু থোমাস-ই খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতে খ্রিস্টমণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, খ্রিস্টধর্ম ভারতে প্রায় দুই হাজার বৎসরের প্রাচীন এক ঐতিহ্যমণ্ডিতধর্ম।[১]

খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দী থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত পোপগণের পক্ষে প্রাচ্যের খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে ভারতের খ্রিস্টমণ্ডলী নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেও খ্রিস্টধর্ম বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। প্রায় দেড় হাজার বছর যাবৎ নিঃসঙ্গ থেকেও একমাত্র হিন্দু ধর্মাবলম্বী জনগণের উদার মানসিকতা ও সহনশীল মনোভাবের জন্যই ভারতে খ্রিস্টধর্ম টিকে রইল।

পর্তুগীজদের আগমনের ফলে ভারতে নবরূপে খ্রিস্টধর্মের প্রচারের উদ্যোগ দেখা যায়।

ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজ রাজশক্তির ছত্রছায়ায় ভারতে খ্রিস্টধর্মের আর একবার আগমন ঘটে।

রোমান কাথলিক ধর্মের ভাষা হলো লাটিন।[২]

পর্তুগীজ বণিকদের সাহায্য ও সহযোগিতায় ভারতে খ্রিস্টীয় মিশনারীদের আগমন সহজসাধ্য হয়ে ওঠে।[৩]

১৫১৭ খ্রিঃ থেকে পর্তুগীজ বণিকগণ তাদের বাণিজ্য তরী নিয়ে গোয়া ও বঙ্গদেশের মধ্যে যাতায়াত করতো। আর সেই সময় থেকেই মিশনারীগণ এই সব বণিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন।

৬.২ আগস্টিনিয়ান ধর্মসংঘের যাজকদের আগমন

১৫৮৯ খ্রিঃ থেকে আগস্টিনিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত পুরোহিতগণ ধর্মপ্রচার, মিশন পরিচালনা ও শিক্ষা দান কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন।[৪]

যেজুইট বা যীশুসংঘ প্রতিষ্ঠার অল্প কালের মধ্যে শিক্ষাবিদ হিসাবে যেজুইট ফাদারদের খ্যাতি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে।[৫]

পশ্চিম ভারতে পদার্পণ করা মাত্রই তাঁরা সেই সব অঞ্চলে বেশ কয়েকটি অতি উচ্চমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে শিক্ষাদান কাজ শুরু করেন।

১৫৯৮ খ্রিঃ আগষ্ট মাসে উচ্চতর শিক্ষার জন্য সাধু পৌলের নামাঙ্কিত 'সেন্ট পলস কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া এখানে তাঁরা একটি বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেন। মিশনারীদের পরিচালিত হুগলীতে এই প্রথম দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হলো।[৬] ফাদার আঁদ্রে তাঁর দায়িত্বে ছিলেন। তবে এই দুটি প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব এখন আর নেই।

যেজুইট ফাদারগণ ব্যাণ্ডেলেই তাদের প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাপন করতে উদ্যোগী হন। তাঁরা ১৬১৭ খ্রিঃ বাসগৃহ ও কলেজগৃহ নির্মাণের কাজ শুরু করেন।[৭] নির্মাণকাজ শেষ হয় ১৬২১ খ্রিঃ। ১৬২০ খ্রিঃ ফাদার মাইকেল দ্য ফারিয়া (De Faria) কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

১৬২২ খ্রিঃ যেজুইট ফাদার পিটার গমেজ ব্যাণ্ডেলের সেন্ট পলস কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ফাদার বেনেডিক্ট রড্রিক্স ঐ কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। গৌড়বঙ্গে মুসলিম আধিপত্য বিস্তারের পর লক্ষণ সেনের রাজধানী নবদ্বীপের গৌরব ধীরে ধীরে অস্তমিত হতে থাকলেও নবদ্বীপ তখন পূর্ব ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠ ছিল। সারা ভারত থেকে শত শত পড়ুয়া নবদ্বীপে

আসতো বিদ্যার্জনের জন্য। বিদ্যাচর্চাই ছিল তখন নবদ্বীপবাসীদের জন্য গৌরবের বিষয়। নানা তত্ত্বের ও সূত্রের কূটপ্রশ্নের বিচারে মত্ত নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা জ্ঞানমার্গের পথে বিচরণ করতেন।

যেজুইট ফাদারগণ নানা ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করে ১৬৪০ খ্রিঃ আগ্রা ও লাহোর কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করে ব্যাণ্ডেলে প্রত্যাবর্তন করেন। তারা এখানে কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষাদানের কার্যে ব্যাপৃত থাকেন।

ভারতে পর্তুগীজদের একচেটিয়া প্রভাব ও প্রতিপত্তি দুর্বল হওয়ার মুখে ইউরোপের অন্যান্য দেশ ইংরেজ, ওলন্দাজ ও দিনেমার বণিকরা ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

৬.৩ বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে অবদান

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো বাংলা গদ্য সাহিত্যের উন্নয়নকল্পে এই পর্তুগীজ ফাদারদের অগ্রণী ভূমিকা বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। মূলত ধর্মপ্রচারের সুবিধার্থে অতি সাধারণ লোকের জন্য তৎকালীন সহজবোধ্য চলিত বাংলায় তাঁরা কয়েকটি ধর্মপুস্তক রচনা করে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই বাংলা গদ্য সাহিত্যের একটি নব দিগন্ত উন্মোচন করেন।[৮]

১৫৯৯ খ্রিঃ ঢাকা জেলার শ্রীপুরে যেজুইট ফাদার ফ্রান্সিস ফারনান্দেজ হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের তুলনায় খ্রিস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরার জন্য কথোপকথনের ভঙ্গিতে একটি 'ক্যাটেকিজম' (প্রশ্নোত্তরে ধর্মশিক্ষা) পুস্তক রচনা করেন। ঐ একই বছর যশোহর রাজ্যের রাজধানী চাঁদকোনে অপর একজন যেজুইট ফাদার দোমিঙ্গো ডি'সুজা আর একটি 'ক্যাটেকিজম' পুস্তক রচনা করেন। তিনি তার পুস্তিকাটি সহজবোধ্য চলিত বাংলায় অনুবাদ করেন।

১৬৮২ খ্রিঃ ৩ জন ধর্মযাজক: ফাদার মার্কোস আন্তনিও সনতুচ্চি, ফাদার ইগ্নাসিউস গমেজ ও ফাদার মানুয়েল সয়রবা একত্রে মিলে বাংলার শব্দ তালিকা, ব্যাকরণ, খ্রিস্টিয় প্রার্থনামালা ও খ্রিস্টধর্মের মূল শিক্ষা বাংলায় রচনা করেন।[৯]

১৭১২-১৪ খ্রিঃ ফাদার আন্তনিও ক্লুদিউস বার্বিয়ে বাংলায় একটি ছোট ক্যাটেকিজম রচনা করেন।

আগস্টিনিয়ান সম্প্রদায়ের পর্তুগীজ ফাদার মানুয়েল দা আসুম্পসাও রচনা করেন 'কৃপাশাস্ত্রের অর্থভেদ'।[১০] এর এক পৃষ্ঠায় রোমান হরফে বাংলা ও অন্য পৃষ্ঠায় পর্তুগীজ ভাষা ব্যবহৃত হয়েছিল।

১৭৪৩ খ্রিঃ পুস্তকটি পর্তুগালের লিবসন থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। রোমান হরফে মুদ্রিত হলেও বাংলা ভাষায় এটিই অন্যতম মুদ্রিত পুস্তক।[১১]

বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে ফাদারের বিশেষ অবদান হলো বাংলা ব্যাকরণ ও বাংলা-পর্তুগীজ ও পর্তুগীজ-বাংলা শব্দকোষটি।[১২]

এই শব্দ কোষটি লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। বহু নিরীক্ষার পর পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এই শব্দকোষটি রচনা করেছেন পর্তুগীজ ভাষায় সুপণ্ডিত স্বনামধন্য বঙ্গসন্তান 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' গ্রন্থের রচয়িতা ভূষণার ধর্মান্তরিত রাজপুত্র দোম আন্তনিও।

সে যুগে এই স্বনামধন্য বঙ্গসন্তান ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে এমন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন যে, তাঁকে ঘিরে ভারত ও ইউরোপে এক প্রচণ্ড বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি লেখক, খ্রিস্টধর্মবিদ ও খ্রিস্টধর্মের সার্থক প্রচারক হিসাবে বহুল আলোচিত ব্যক্তি ছিলেন।

১৯১৪ খ্রিঃ প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও গবেষক যেজুইট ফাদার হোস্টেন (Fr. H. Hosten, S.J) Bengal Past and Present নিবন্ধে 'The Three First Type Printed Bengali Books'আলোচনা প্রসঙ্গে দোম আন্তনিও নামক লেখকের সঙ্গে বাঙ্গালীর প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন। ড. মুখোপাধ্যায় প্রত্যক্ষদর্শীর লিখিত বিবরণ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে দোম আন্তনিওকে রূপকথার জগৎ থেকে তুলে এনে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে দিয়েছেন।

৬.৪ শিক্ষায় সাফল্য

মিশনারীদের অন্যতম প্রধান অবদান হচ্ছে, এদেশে তারাই প্রথম ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন করেন। ইংরেজি শিক্ষাকে মূলত খ্রিস্টধর্ম প্রচারের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চাইলেও তাঁদের সে আশা পূরণ হয়নি।

মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলোকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায় :

১। ইউরোপীয় ছেলেমেয়েদের জন্য বোর্ডিং স্কুল

২। ভারতীয় খ্রিস্টান ছেলেমেয়েদের জন্য বোর্ডিং স্কুল

৩। রোমান কাথলিক ছেলেমেয়েদের জন্য বোর্ডিং স্কুল

তবে ২য় ও ৩য় স্তরের স্কুলগুলোতে অখ্রিস্টান ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হতে পারতো না।

১৮৩৩ খ্রিঃ কলকাতার বাইরে ৫৮টি মিশন স্কুল ছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

চুচুঁড়ায়	- ৬টি স্কুল।
শ্রীরামপুরে	- ১ বোর্ডিং স্কুল।
কালনা ও কাটোয়াতে	- ১টি করে কেন্দ্রীয় স্কুল।
কলকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চল	- ৪৫টি মিশন স্কুল।
কলকাতার বাইরে	- ২২টি মিশন বালিকা বিদ্যালয়।
কলকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চল	- ৯টি বালিকা বিদ্যালয়।

ইউরোপীয় ছেলেমেয়েদের স্কুলের শিক্ষার মান ছিল খুবই উন্নত। অন্যান্য বিষয়ের সাথে এখানে ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা শিক্ষা দেওয়া হতো। এই স্কুলগুলো ছিল নামিদামী মিশনারী তৈরি করার প্রতিষ্ঠান। অন্যান্য স্কুলগুলোতে পাঠ্যবিষয় ছিল ইংরেজি, ফারসী এবং বাংলা ভাষা, খ্রিস্টধর্মের

মৌলনীতি, খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বের প্রাথমিক জ্ঞান, অংক, ইতিহাস, ভূগোল এবং প্রাথমিক জ্যোতির্বিদ্যা।

উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারীগণ শ্রীরামপুরে ১৮১৮ খ্রিঃ একটি কলেজ স্থাপন করেন। এই কলেজ স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষে যদি খ্রিস্টধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তবে ভারতীয়দেরই খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের তুলনামূলক শিক্ষা লাভ করে খ্রিস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে হবে। সেজন্য এই কলেজে পালি ও সংস্কৃত ভাষাশিক্ষা ও চর্চার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। তবে কিছু কিছু নির্বাচিত ছাত্রের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে দক্ষতা অর্জনের ব্যবস্থা করা হয়। এখানে ইউরোপীয় ছাত্রদের হিব্রু, গ্রীক, ল্যাটিন ও বাংলা ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হতো। এছাড়াও তাদের অংক, দর্শনশাস্ত্র, রসায়ন এবং খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাসও পড়তে হতো। ভারতীয় খ্রিস্টান ও অখ্রিস্টান ছাত্রদের সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজি, বিভিন্ন ধর্মমত, চরিত্রগঠন, জ্যোতির্বিদ্যা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় গ্রহণ করতে হতো।

১৮২০ খ্রিঃ হাওড়ার শিবপুরে বিশপ মিডলটন বিশপস কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এটি মিশনারীদের স্থাপিত দ্বিতীয় কলেজ।[১৩] এই কলেজ মূলত ইউরোপীয় ও ভারতীয় যুবকদের ভাবী মিশনারী হিসাবে তৈরি করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই এখানকার পাঠ্যক্রমে খ্রিস্টধর্মতত্ত্ব এবং খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাসই প্রাধান্য পায়। এখানেও হিব্রু, গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা, প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস, দর্শনশাস্ত্র, অংক পাঠ্য বিষয় ছিল।

১৮৩০ খ্রিঃ রেভাঃ আলেকজাণ্ডার ডাক কলকাতায় জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৪০ খ্রিঃ এই প্রতিষ্ঠানের নামকরণ হয় স্কটিশ চার্চ কলেজ। তিনি কলেজটিকে একটি ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। এই কলেজের পাঠ্যক্রমে ছিল ইংরেজি সাহিত্য ও ব্যাকরণ, বীজগণিত ও পাটিগণিত, ভূগোল, রাজনীতি, পদার্থ বিদ্যা, প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস, ইংরেজি ও বাংলায় রচনা ও অনুবাদ, বাইবেল ও খ্রিস্টধর্মের সংক্ষিপ্তসার।

এই ৩টি মিশনারী কলেজের মধ্যে শ্রীরামপুর কলেজ ও স্কটিশ চার্চ কলেজ ভারতের ভবিষ্যৎ শিক্ষানীতির নির্ধারক হয়ে ওঠে।[১৪]

বাংলা ভাষায়ঃ বাংলা গদ্যের সুগঠনে এই সময়ের মিশনারীদের অবদান উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারী রেভাঃ উইলিয়াম কেরী ও যশুয়া মার্শম্যানের। তারা দু'জনেই প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ফলে বাংলা ভাষায় দক্ষতা অর্জন করা তাঁদের পক্ষে সহজসাধ্য হয়ে উঠেছিল। ১৮০১ খ্রিঃ কেরী ও তার সহযোগীদের চেষ্টায় শ্রীরামপুর থেকে নিউ টেস্টামেন্টের বাংলা অনুবাদ বাংলা হরফেই মুদ্রিত হয়। বাংলা ভাষায় বক্তব্যকে সর্বজনবোধ্য করতে হবে, প্রথম থেকেই এই আকাঙ্ক্ষা শ্রীরামপুরের লেখকদের প্রভাবিত করেছিল।

১৮০০ খ্রিঃ ৪ঠা মে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮০১ খ্রিঃ কেরী এই কলেজে সংস্কৃত ও বাংলার শিক্ষক নিযুক্ত হন। বাংলা গদ্যপুস্তক রচনার জন্য কেরী একদল নির্ভরযোগ্য শিক্ষক রচয়িতা খুঁজে বের করেন।

১৭৯৩-১৮০০ খ্রিঃ পর্যন্ত কেরী বাংলার অনেক গ্রামে অনেক মানুষের সাথে মেলামেশা করার ফলে তিনি সাধারণ জনগণের জীবনযাত্রা, লৌকিক ভাষা ও তাদের ধর্মবোধ সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত হতে পেরেছিলেন।

১৮০১ খ্রিঃ বাংলা ফ্রেইজ (বাগ্‌বৈশিষ্ট্য)ও ইডিয়মের (বাগ্‌ধারা) বৈচিত্র্যপূর্ণ 'কথোপকথন' প্রকাশিত হয়।[১৫] একই বছরে কেরী তার সহকর্মী মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সহযোগিতায় 'বাংলা ব্যাকরণ' রচনা ও প্রকাশ করেন।[১৬]

১৮০০-১৮০৯ খ্রিঃ মধ্যে তিনি সমগ্র বাইবেলের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত করেন।[১৭]

১৮০২ খ্রিঃ কেরীর সম্পাদনায় কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারতের প্রথম মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

১৮১২ খ্রিঃ প্রকাশিত হয় 'ইতিহাসমালা'।[১৮] এই পুস্তক বিভিন্ন বিষয়ের ১৫০টি গল্পের সমষ্টি।

১৮১৫-২৫ খ্রিঃ বাংলা-ইংরেজি অভিধান সংকলিত হয়। ১৮১৫ খ্রিঃ এই অভিধানের প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

এভাবে অনুবাদ, সংকলন ও সম্পাদনার মাধ্যমে কেরী বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সেবা করে গেছেন। বিদেশী হয়েও বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির জন্য এমন নিষ্ঠা প্রদর্শনের জন্য বাঙ্গালী জাতি চিরকাল তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।[১৯]

ফাদার সেন্ট লেজের ৫জন ব্রিটিশ ও ফরাসী যেজুইট যাজক ও দু'জন যেজুইট ব্রাদার নিয়ে ১৮৩৪ খ্রিঃ ৫ই অক্টোবর কলকাতা এসে পৌঁছান। ঐ বছরেই তিনি কলকাতায় 'সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন।[২০] কয়েক বছর পরে আর্চবিশপ কেরু'সেন্ট জন্স স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন।[২১]

১৮৩৫ খ্রিঃ বঙ্গদেশের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসরেই সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা অনুমোদন করা হয় এবং এদেশীয় জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। কারণ এর মধ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ধীরে অথচ দৃঢ়ভাবে বণিক থেকে শাসকে পরিণত হয়ে ওঠে। সুতরাং দেশের অধিবাসীদের শিক্ষাদান করা একটি নৈতিক কর্তব্য বলে তাঁরা মনে করতে থাকেন। এই প্রচেষ্টার ফলে ভারতে তিন শ্রেণীর বিদ্যালয়ের উদ্ভব হলো।

যথা :

১। মাতৃভাষার মাধ্যম বিদ্যালয়।

২। প্রোটেস্টান্ট মিশনারী কর্তৃক পরিচালিত ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়।

৩। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত সরকারী বিদ্যালয়।

এই সরকারী বিদ্যালয়ে ইংরেজি অথবা মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা শুরু হয়।

১৮৩৫ খ্রিঃ গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিকএর আমলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সরকার স্থির করেন যে, ধর্মীয় ব্যাপারে নিরপেক্ষ থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ও কলেজে ইংরেজির মাধ্যমে লোকায়াত্ত শিক্ষা দেওয়া হবে। এর দুই বৎসর পর ১৮৩৭ খ্রিঃ ফারসী ভাষার পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা অফিস আদালতে ব্যবহৃত হতে থাকে।

ফাদার সেন্ট লেজের বঙ্গদেশের কাথলিক মণ্ডলীর শিক্ষা ও ধর্মচর্চায় পর্তুগীজ ভাষার পরিবর্তে ইংরেজি ভাষার প্রবর্তন করেন। কাথলিক ছেলেদের ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি সদ্য প্রতিষ্ঠিত সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলটিকে সুসংগঠিত করতে প্রয়াসী হন এবং দুইজন শিক্ষাবিদ যেজুইট ফাদারের উপর স্কুলটি পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন।

১৮৪১ খ্রিঃ পূর্ববঙ্গে একমাত্র চট্টগ্রামে কিঞ্চিৎ আশার আলো দেখা দেয়। ফাদার গোয়াঁরা চট্টগ্রাম মিশনের ভারপ্রাপ্ত হওয়ার পর সেখানে একটি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।[২২] কারণ বঙ্গদেশের সকলেই ইংরেজির মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করতে আগ্রহী ছিল।

অল্প কয়েকজন যাজক দিয়ে মিশনগুলো চালানো সম্ভব ছিল না বলে ১৮৩৬ খ্রিঃ ফাদার লেজের সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল বন্ধ করে দেন। কলকাতায় কাথলিক ছাত্রগণ যাতে ইংরেজি শিখতে পারে ও ইংরেজির মাধ্যমে অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করতে পারে তার জন্য তিনি সেই যুগের কল্পনাতীত এক পন্থা অবলম্বন করেন।

১৮৩৬ খ্রিঃ প্রটেস্টান্ট মণ্ডলীর এ্যাংলিকান এবং প্রেজবিটেরিয়ান সম্প্রদ্রায়ের বিশপগণ কলকাতায় 'La Martiniere' নামক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরেজির মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাদানের সঙ্গে খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা দান করা ছিল এই স্কুল প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য।

৬.৫ আর্চ বিশপ কেরু (১৮৪০-১৮৫৫ খ্রিঃ)

বিশপ কেরু শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিসেবা ও কাথলিকদের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা জাগ্রত করার জন্য কয়েকটি বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে কাথলিক ছেলেমেয়েদেরকে ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষা দান করার জন্য ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[২৩]

১৮৪০এর কলকাতার সাথে আজকের কলকাতার আয়তন ও চেহারার আকাশপাতাল পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

মূলত কলকাতার ইংরেজি স্কুল স্থাপন ও পরিচালনার জন্য যেজুইট সংঘের যাজকগণ সক্রিয় ছিলেন। তবে বিভিন্ন রেষারেষির কারণে বেরিয়ান রোডের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজটি ১৮৪৬ খ্রিঃ ২৭শে আগষ্ট বন্ধ হয়ে যায়।

৬.৬ পূর্ববঙ্গ ধর্মাঞ্চল (১৮৪৫)

১৮৪৩ খ্রিঃ ফাদার গোয়াঁরা (Goiran) নামক একজন ফরাসী যাজক বরিশাল গমন করেন ও কলকাতার কাথলিকদের অর্থ সাহায্যে সেখানে একটি বিদ্যালয় নির্মাণ করেন।[২৪]

১৮৪৫ খ্রিঃ বিশপ অলিফ চট্টগ্রামে পৌঁছান এবং সেখানে কনভেন্ট-স্কুল স্থাপনের নির্দেশ দেন।

১৮৪৬খ্রিঃ লরেটো সিস্টারগণ চট্টগ্রামে 'বেথলেহেম কনভেন্ট' ও ঢাকার 'নাজারেথ' কনভেন্ট স্থাপন করেন। আর্থিক অনটন থাকা সত্ত্বেও তাঁরা এই দু'টি শহরের শিশুদের শিক্ষাদান কার্যে রত ছিলেন।

১৮৪৬ খ্রিঃ ২৪ জানুয়ারি ফাদার জুবিবুরু কৃষ্ণনগরে বিদ্যালয়গৃহের নির্মাণকাজ শুরু করেন। ফাদার জুবিবুরু কৃষ্ণনগরে একজন আগন্তুক মিশনারী ছিলেন। তাঁর একার পক্ষে দুঃসাধ্য কাজ করা সম্ভব ছিলনা। কৃষ্ণনগর, চাপড়া, রতনপুর, বল্লভপুর, কার্পাসডাঙ্গা ও শোলো – এই ৬টি মিশনকেন্দ্রে মোট ৭৭জন যাজক, ২ জন ইউরোপীয় শিক্ষক, প্রায় ১০০জন বাঙ্গালী শিক্ষক ও ৩৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল।[২৫]

মধ্যবঙ্গ মিশন :'ফরেন মিশন সোসাইটি অফ মিলান' মিলানের বিদেশী সংঘ নামে নব প্রতিষ্ঠিত ধর্মসংঘটি মধ্যবঙ্গের মিশন পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। প্রচলিত নাম মিলান ফাদার। পোশাকী নাম (Pontifico Institute Delle Mission Esleredi Milan) PIME। মধ্যবঙ্গের জেলাগুলোতে বহু পূর্ব থেকেই প্রোটেস্টান্ট মিশনারীগণ বিভিন্ন স্থানে প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করে ছাত্রছাত্রীদের প্রাথমিক শিক্ষা দিতে থাকেন।

১৮৪৫ খ্রিঃ ফাদার বক্কাচ্চি (Boccacci) বহরমপুরে হিন্দু ছেলেদের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ে প্রায় ১২০ জন ছাত্র ছিল।

৬.৭ বিশপ টমাস অলিফ (১৮৫৫-১৮৫৯)

আর্চবিশপ কেরুর মৃত্যুর পর বিশপ টমাস অলিফ কেরুর উত্তরাধিকারী মনোনীত হয়েছিলেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ ভিকার এ্যাপোস্টলিক। তিনি কলকাতায় এসে লক্ষ্য করেন যে আর্চবিশপ কেরুর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর কাজকর্ম যথেষ্ঠ সন্তোষজনক। কেবলমাত্র সেন্ট জনস্ কলেজটিই রুগ্ন। এই কলেজের ছাত্রসংখ্যা ছিল মাত্র ৩০ জন।[২৬]

১৮৫৫ খ্রিঃ ডিসেম্বর মাসে ফাদার পারিয়েত্তি কলকাতায় গমন করেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, শিক্ষা ছাড়া কাথলিকদের উন্নতি সম্ভব নয়। সেই জন্য তিনি মিলানে মনসিনিয়র মারিননিকে বিদ্যালয়ভবন নির্মাণের জন্য অর্থ পাঠানোর অনুরোধ করেন। কারণ একটি ভগ্নপ্রায় গৃহেই তিনি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন।

ফাদার লুইজি লিমানা ১৮৫৬ খ্রিঃ ৬ জুলাই কৃষ্ণনগরে আগমন করেন। তিনি কাথলিক ছেলেদের লেখাপড়া শেখার জন্য বহরমপুরে পাঠান। কিন্তু বহরমপুরের স্কুলটি পর্যাপ্ত ভবনের অভাব ও অর্থাভাবে বন্ধ হয়ে গেলে তিনি কৃষ্ণনগরে একটি আঞ্চলিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ফাদার আন্তনিও মারিয়েত্তি ১৮৫৬ খ্রিঃ জুলাই মাসে যশোহরে আগমন করেন। তিনি চারজন সন্তানকে নিজের কাছে রেখে সাধারণ শিক্ষা ও ধর্মশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। তবে অর্থাভাবে তিনি সেই মুহূর্তে কোন বিদ্যালয় স্থাপন করতে পারেননি।

৬.৮ মধ্যবঙ্গ মিশনের অগ্রগতি

১৮৫৯ খ্রিঃ জুলাই মাসের শেষের দিকে ফাদার পারিয়েত্তি বহরমপুরের বিদ্যালয় ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। কিন্তু তা বাস্তবে রূপ নিতে পারেনি। তিনি অসুস্থ হয়ে ১৮৬৪ খ্রিঃ ৩০ নভেম্বর পাটনার বাকীপুরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৮৫৬ খ্রিঃ ফাদার লিমানা নবগঠিত কাথলিক সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি অনাথাশ্রম নির্মাণ করেন।[২৭] ৫জন ছাত্র নিয়ে ক্লাস শুরু হয়। একজন বাঙ্গালী হিন্দু বাংলা ও অংকের শিক্ষক হন এবং ফাদার লিমানা ধর্মশিক্ষা দিতে থাকেন।

ইতিমধ্যে ফাদার লিমানার স্কুলে ৩০ জন ছাত্র ও ১০ জন ছাত্রী ভর্তি হয়। ধর্মশিক্ষক সেসানা ছেলেদের দেখাশোনার ভার ও ফাদার লিমানা কয়েকজন বাঙ্গালী মহিলার সহযোগিতায় মেয়েদের দেখাশোনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিছু দিনের মধ্যেই স্কুলের সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ফাদার লিমানা বুঝতে পারলেন যে, তিনি যদি শুধুমাত্র স্কুল নিয়ে ব্যস্ত থাকেন তাহলে ধর্মপ্রচার ও মিশনের কাজ ব্যাহত হবে। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, কোন ধর্মসংঘের সিস্টারদের কৃষ্ণনগরে নিয়ে এসে তিনি মেয়েদের শিক্ষার ভার তাদের হাতে তুলে দিবেন।

অবশেষে ১৮৬০ খ্রিঃ ১৭ই মার্চ ইতালী থেকে সিস্টারস অফ চ্যারিটির ৪জন সিস্টার ও ১জন সহকারী কৃষ্ণনগরে পদার্পণ করেন।

এই সিস্টারগণ কৃষ্ণনগরে পৌঁছানোর পরপরই ফাদার লিমানা বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান ও তার পরিচালনার ভার তাদের উপর অর্পণ করেন। প্রকৃতপক্ষে কাথলিক বালিকাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের শুভ সূচনা তাদেরই অবদান। সিস্টারগণ আপ্রাণ চেষ্টা করে বাংলা শিখাতে থাকেন এবং কয়েকজন বাঙ্গালী হিন্দু মহিলার সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান কার্য পরিচালনা করতে থাকেন। কিছুদিনের মধ্যেই এই প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

১৮৬৪ খ্রিঃ সিস্টারগণ যশোহরে আগমন করেন। ফাদার মারিয়েত্তি সিস্টারদের জন্য একটি বাসভবন ও একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তবে সিস্টারদের সংখ্যা সীমিত থাকায় উদ্দেশ্য তাৎক্ষণিকভাবে সফল হয়নি। কারণ ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন সিস্টার দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে, স্যাঁতস্যাতে ঘরে বসবাসের কারণে এবং অনাহার ও অপুষ্টিতে মৃত্যুবরণ করেন। খ্রিস্টবাণী প্রচার ও মানবসেবায় নিবেদিতপ্রাণ এই মহীয়সী নারীদের নাম খ্রিস্টমণ্ডলীতে ভাস্বর হয়ে আছে।

১৮৫৬ খ্রিঃ ৭ই আগষ্ট ফাদার আন্তনিও মারিয়েত্তি বেশ কয়েকজনকে কাথলিক মণ্ডলীভুক্ত করেন এবং এদের ছেলেদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে একটি স্কুল খোলেন।

ফাদার মারিয়েত্তির উৎসাহে মনমোহন ঘোষ ২৭ পৃষ্ঠার 'যশোহরের কাথলিক মণ্ডলীর ইতিহাস' নামক বাংলা ভাষায় একটি পুস্তক রচনা করেন।[২৮] এটি বঙ্গদেশের কাথলিক মণ্ডলীর ইতিহাসের প্রথম মৌলিক রচনা। এই পুস্তকটি মিলানের সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে।

১৮৬৩ খ্রিঃ মারিয়েত্তি যশোহরে একটি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।[২৯] তাঁর চেষ্টার ফলে বিদ্যালয়টি ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নত করতে পারবেন এই মর্মে কলকাতায় ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে অনুমোদন লাভ করেন। এই ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় ফাদার মারিয়েত্তিকে যশোহর শহরে জনপ্রিয় করে তোলে।

১৮৬৪ খ্রিঃ ফাদারএর অনুরোধে সিস্টারস অফ চ্যারিটির ৩জন সিস্টার ইটালী থেকে যশোহরে এসে পৌঁছান। তাঁরা এখানে মেয়েদের জন্য একটি আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[৩০] প্রথম অবস্থায় সেখানকার ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৩০ জন। বালিকা ছাড়া বয়স্কা নারীদের ধর্ম ও নীতি শিক্ষাদানের উপযুক্ত করার জন্য ফাদার মারিয়েত্তি তাদের বাংলা ভাষা শিক্ষা দিতে থাকেন।

৬.৯ পশ্চিমবঙ্গ ভিকারিয়েটে যেজুইটগণ

বেলজিয়াম যেজুইটগণ ১৮৬০ খ্রিঃ গোড়ার দিকে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ নতুনভাবে শুরু করেন এবং ফাদার হেনরী দেপেল চ্যাঁ এই কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

১৮৭৪ খ্রিঃ ফাদার গফিনেত জানতে পারলেন যে, তাঁর তত্ত্বাবধানে কাথলিক ভক্তবিশ্বাসীর সংখ্যা প্রায় ১০০ জন। তিনি সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য আবিসিনিয়ায় ব্যবহৃত তাঁবুর ধাঁচে মাঝখানে মজবুত একটা খুঁটি দেওয়া গোলাকৃতি একটি বাংলো বাড়ি তৈরি করলেন। এর একদিকে তাঁর বাসগৃহ ও অন্য দিকে বিদ্যালয় ভবন। মাত্র ১জন ছাত্র নিয়ে তিনি বিদ্যালয়টি আরম্ভ করলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ছাত্র-সংখ্যা বেড়ে হলো ১৪৪ জন; তার মধ্যে ১০ জন কাথলিক, ৩০ জন মুসলমান আর বাদবাকি হিন্দু।

১৮৭৭ খ্রিঃ সেপ্টেম্বর মাসে ফাদার হেনরি ১২ জন ছাত্র নিয়ে রাঘবপুরে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় শুরু করেন।[৩১] এটিই রাঘবপুরের প্রথম বিদ্যালয়। ফাদার হেনরি সেন্ট জেভিয়ার্স

কলেজের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম পুরোহিত। বাংলা ভাষায় তাঁর খুব ভাল দখল ছিল এবং নিজের মাতৃভাষার মতোই বাংলা বলতে পারতেন।

ফাদার কুটো ভক্তদের ব্যবহারের জন্য 'মারীয়াগীত' আর 'পুষ্পহার' নামক দুটি ধর্মসঙ্গীতের বই বাংলা ভাষায় রচনা করেন।[৩২] এছাড়াও তিনি বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যে অশেষ ক্লেশ স্বীকার করে রাঘবপুরে সেবা করে গেছেন।

পরবর্তীতে পুরোহিতের সংকটের কারণে চাইবাসা ও বালেশ্বরের স্কুল ও অনাথাশ্রমটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। কলকাতায় কয়েকজন বুদ্ধিজীবী ফাদারকে রেখে সমস্ত ফাদারদের রাঁচী মিশনে প্রেরণ করা হয়। রাঁচী মিশনের সমগ্র অঞ্চল জুড়ে ছোটবড় অনেকগুলি প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়। শেষ পর্যন্ত রাঁচীর গর্ব সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলও গড়ে তোলা হয়। কিছুদিন পরে এই স্কুলটিকে কলেজে উন্নীত করা হয়। তার পরেই গড়ে ওঠে সেন্ট আলবার্ট যাজক বিদ্যালয়।[৩৩] তখন কাথলিকের সংখ্যা ছিল ২,৯৫,০০০ জন। ১৯২৭ খ্রিঃ রাঁচী আলাদা ধর্মপ্রদেশে পরিণত হয় এবং ২,৫৮,০০০ জন চলে যায় রাঁচী ধর্মপ্রদেশের অধীনে।

১৮৮১ খ্রিঃ ফাদার কাণ্ডিনো উবের্তি (Fr. Candino Uberti) নামে একজন তরুণ ও উদ্যোগী পুরোহিত ভবরপাড়া মিশনের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। তারই তত্ত্বাবধানে ১৮৮৩ খ্রিঃ সিস্টারদের কনভেন্ট ও মেয়েদের জন্য পাকা আবাসিক বিদ্যালয় ভবন নির্মিত হয়। সিস্টারস অফ চ্যারিটির সিস্টারগণ ৩০ জন ছাত্রী নিয়ে কাজ শুরু করেন।

ফাদার ই. দ্য গ্রেজ (De Gryge) থেকে ছোট নাগপুরের দ্বিতীয় লিভিন্স বলা হয়।[৩৪] গাংপুরের রাজার আমন্ত্রণে তাঁর রাজ্যে গমন করেন এবং রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি ওঁরাও, মুণ্ডা ও খাড়িয়াদের কাথলিক ধর্মে দীক্ষা দেন। এর অল্প দিন পরেই তিনি মারা যান।

যশপুরের রাজা তাঁর রাজ্যে কাজ করার জন্য যেজুইট ফাদারদের আমন্ত্রণ জানান। তবে তিনি একটি শর্ত দেন: তাঁর রাজ্যে যথেষ্ট সংখ্যক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে জাতি ও বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত প্রজাদের মধ্যে শিক্ষার আলো জ্বেলে দিতে হবে। ফাদারগণ রাজার শর্ত পূরণ করার জন্য বিভিন্ন

স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন। কিছুদিনের মধ্যেই যশপুর রাজ্যের ওঁরাওদের মধ্যে এক প্রবল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়।

ফাদার লিভিন্স আদিবাসীদের উচ্চারণে 'লিবিন সাহিব' এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক মুক্তিদূত। তিনি সব সময় উপলব্ধি করেন শিক্ষিত না হলে আদিবাসীরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে না। তাই তিনি ১০০টি স্কুল স্থাপন করে আদিবাসী ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করতে প্রয়াসী হন।[৩৫] কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রায় ২০০ আদিবাসী শিক্ষক ও ক্যাটেখিস্ট তৈরি হয়ে গেল। পরে এদের হাতেই প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাদানের কাজ ন্যস্ত করা হলো।

আদিবাসীরা সবিনয়ে লক্ষ্য করলো : মানবিকতা, ন্যায়বিচার ও মানবপ্রেম খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থে শুধুমাত্র লিখিত নির্দেশ হয়েই থাকেনি, বরং তাদের নিজেদের জীবনে কার্যকরী হয়ে এক নতুন জগতের সন্ধান দিল।

১৮৯৮ খ্রিঃ ফাদার দ্য লা ক্রোয়া (Fr. De.La. Croia) রাঘবপুর মিশনের ভার গ্রহণ করেন। তিনি বিদ্যালয়ের কাজ সম্পূর্ণ করেন। আর্চবিশপের নামানুসারে বিদ্যালয়টির নামকরণ করা হয় 'সেন্ট জন্স মিডল ভারণাকুলার স্কুল'।[৩৬]

৬.১০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সেন্ট জেভিয়ার্স ১৮৩৪ খ্রিঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর কয়েক বছরের মধ্যে আর্চবিশপ কেরু সেন্ট জন্স স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই দুটি স্কুলের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছিল। কালক্রমে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৬০ খ্রিঃ ফাদার হেনরী দেপেলচ্যাঁ স্কুলটি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এই স্কুল প্রাঙ্গণে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরুতে এই স্কুল ও কলেজে পড়াশুনার সুযোগ পেতো সাহেব, প্রশাসন, ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত পিতার সন্তানেরা। শীঘ্রই স্থানীয় অধিবাসীদের সন্তানদেরও এখানে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হয়।

লরেটো হাউস : ১৮৪২ খ্রিঃ ১২ জন সিস্টার কলকাতায় আসেন এবং লরেটো হাউস নামে মেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। সেই সঙ্গে তাঁরা চন্দন নগরে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৪৭ খ্রিঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অনাথাশ্রমটি ইন্টালিতে স্থানান্তর করেন। পরবর্তীতে তারা শিয়ালদহ, বৌবাজার ও হাওরায় তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

১৮৪২ খ্রিঃ কলকাতায় তারা একটি ধর্মব্রতী শিক্ষানবিশি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করতে ইচ্ছুক মেয়েদের সাধারণ শিক্ষা ও ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। প্রথম দিকে প্রার্থী পেতে অসুবিধা ছিল, কিন্তু পরে ১৮৭০ খ্রিঃ অনেক প্রার্থী লরেটো সম্প্রদায়ের সিস্টার হওয়ার বাসনায় আবেদন করতে থাকেন। এদের মধ্যে ইউরোপীয়ান ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরাই ছিলেন সংখ্যায় বেশি। কিছু কিছু তিব্বতী ভারতীয় (Indo-Tibetan) এই প্রার্থী তালিকায় ছিলেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন বাঙ্গালী তার নাম সিস্টার বেনেডিকটা চক্রবর্তী। ইনিই প্রথম বাঙ্গালী সিস্টার।

৬.১১ কৃষ্ণনগরের ২য় বিশপ শান্তিনো তাভেজ্জা (পিমে)

বিশপ তাভেজ্জা যখন কৃষ্ণনগরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন এখানে ছেলেদের জন্য ৩টি ও মেয়েদের জন্য ২টি বোর্ডিং স্কুল ছিল। ছাত্রাবাস ও ছাত্রী নিবাসগুলিতে ২৪০ জন অনাথ ছেলেমেয়ে ছিল। আরো ছিল ছোট ছোট ডে'স্কুল ও নাইট স্কুল। এই স্কুলগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীরা বেশির ভাগই ছিল অ-খ্রিস্টান।

উত্তরবঙ্গে (দিনাজপুর, সোদপুর, দমনপুর, নাগরাকাটা, ঘড়িবাড়ী, রোহনপুর আধাঁরকোটা, ধানজুরি) কাথলিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে সেখানে ৩১টি স্কুল ও ১৯টি গির্জা নির্মিত হয়।

১৯২২ খ্রিঃ ২৮ জুলাই সাধ্বী আন্না সংঘের (Daughters of St. Ann) ৩জন সিস্টার রাঘবপুর মিশনে আসেন। তাঁরা এখানে কনভেন্ট ও তাদের বিদ্যালয়ের শুভ সূচনা করেন।

ফাদার পদেরজায় রাঘবপুর মিশনে নুরশিক দারচকে খালের পাশে জমি কিনে গির্জা ও স্কুল নির্মাণ করেন। দেবীপুরে জমি কিনে স্কুল স্থাপন করেন। নানা দুর্যোগ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে স্কুলগৃহটির শোচনীয় অবস্থা হয়। সরকারী বিদ্যালয় পরিদর্শকের পরামর্শে স্কুলটিকে মধ্য বাংলা (M.V.) থেকে মধ্য ইংরেজি (M.E.) স্কুলে পরিণত করলেন।

পরবর্তীতে আর্চবিশপ পেরিয়েরের উদার দাক্ষিণ্যে নতুন বিদ্যালয় ভবন তৈরি হয়।

এরপর রাঘবপুরে একটি কারিগরী শিক্ষাকেন্দ্র খোলার অনুমতি লাভ করেন। তবে তার প্রকল্প সাফল্যমণ্ডিত হয়নি।

১৯৫৪ সালে ফাদার কস্টার রাঘবপুরে আসেন। তিনি মনে করতেন যথোপযুক্ত শিক্ষা না পেলে কোন জাতিই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। আর এই শিক্ষা শৈশবকাল থেকেই আরম্ভ হওয়া উচিত। তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়টিকে জুনিয়র হাইস্কুল থেকে পৃথক করলেন এবং প্রাথমিক স্কুলটিকে মিশনের কর্তৃত্বাধীনেই রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন।

১৯৫৪ খ্রিঃ ৬ষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত জুনিয়র হাইস্কুলের সরকারী অনুমোদন পাওয়া গেল। প্রধান শিক্ষক ফাদার ডিরিডারের পরিচালনায় ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হলো ৫২০জন। (তাদের মধ্যে ছাত্র ৩২০ ও ছাত্রী ২০০) অপর দিকে শ্রী সন্তোষ মাখালের তত্ত্বাবধানে বোর্ডিংটি আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলো।

১৮৭৫ খ্রিঃ ফাদার দেলপ্লাস মোড়াপাই মিশনের ভিত্তি স্থাপন করেন। শিক্ষার প্রসারের জন্য এই এলাকার ১৮৯৩ খ্রিঃ সেন্ট প্যাট্রিক প্রাইমারী স্কুল স্থাপিত হয়।[৩৭] পরে তা নিম্নমাধ্যমিক স্কুলে পরিণত হয়।

১৯০৪ খ্রিঃ লরেটো মাদারদের ও সাধ্বী আন্না সমাজের সিস্টারদের পরিচালনায় বালিকাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য সাধ্বী আন্নার নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মহিলাদের স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে শিল্প বিদ্যালয় তৈরি হয়।

১৯৩২খ্রিঃ সাধ্বী আন্না সমাজের ৩জন সিস্টার খাড়ীতে আসেন ও তাঁদের প্রচেষ্টায় স্থানীয় মেয়েদের স্কুলটি অল্প সময়ের মধ্যে উন্নতি লাভ করে। পরবর্তীতে ফাদার ডি'সুজা একটি বৃহদাকার বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ করেন।

১৯৪৮ খ্রিঃ সাধ্বী আন্না সমাজের সিস্টারগণ মেদেনীপুরের কাথলিক ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদান কার্য পরিচালনা করছিলেন।

১৯৫৩ খ্রিঃ ৩ জন সিস্টার মেদেনীপুর আসেন স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য এবং সেখানে তাঁরা প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন।

১৯৫১ খ্রিঃ কার্মেল সিস্টারগণ খড়গপুরে হিজলীতে একটি কনভেন্ট স্কুল ও একটি ইংরেজি মাধ্যম প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাইমারী স্কুলে ১৮০ জন ছাত্রছাত্রী ও কেজি থ্রি-তে ৩০ জন ছাত্রছাত্রী ছিল।

আসানসোল :১৯৪৮ খ্রিঃ ফাদার এমিল রোল্যান্ড (Fr. Emile Roland, SJ) আসানসোল মণ্ডলীর পরিচালকের ভারপ্রাপ্ত হন। ফাদারের প্রখর ব্যক্তিত্ব ও যোগ্য পরিচালনায় আসানসোল মণ্ডলী একটি দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩৮] তিনি সেখানে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। চেলিয়া ডাঙ্গায় প্রতিষ্ঠিত সেন্ট প্যাট্রিক স্কুল ও লরেটো স্কুলে, সেন্ট ভিনসেন্ট স্কুলে সাধারণ ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ার সুযোগ পেতো না। তিনি জনাকীর্ণ একখণ্ড জমিতে দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করে সাধ্বী আন্না সমাজের সিস্টারদের কাছে স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। ১৯৫১ খ্রিঃ স্কুলে পঠনপাঠন শুরু হয়। এর কিছু দিন পূর্বে ফাদার পপুলের একটি হিন্দী মাধ্যম বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ফাদার ড্রাগম্যান স্কুলটি পরিচালনার জন্য দু'জন স্থানীয় শিক্ষিকা নিযুক্ত করেন। স্কুলগৃহ না থাকায় প্রথমে গাছতলায় এই স্কুল বসতো। স্কুলটি পরিচালনার ভার আন্না সমাজের সিস্টারদের হাতে দেওয়া হয়।

১৯৫১ খ্রিঃ ফাদার পসেঁলে বার্ণপুরে একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন[৩৯] এবং চামবেরীর সেন্ট যোসেফ সিস্টারদের হাতে সেটির পরিচালনার ভার অর্পণ করেন। অঞ্চলে কিছু এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, আদিবাসী ও বাঙ্গালী খ্রিস্টান বাস করতো। এদের জন্য ফাদার ড্রাগম্যান একটি

ইংরেজি মাধ্যম স্কুল স্থাপন করেন। একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মহিলা এই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা নিযুক্ত হয়। এরপর ফাদার একটি হিন্দি-মাধ্যম স্কুলও স্থাপন করেন এবং স্কুলটি সরকারের অনুমোদন লাভ করে।

আসানসোলের কাথলিকদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। আসানসোল থেকে ১০ কি.মি. দূরে আমলানা গ্রামে বাউরী সম্প্রদায়ের লোক বাস করতো। বাউরীরা আধা-বাঙ্গালী,আধা-আদিবাসী। বাউরীদের অনুরোধে ফাদার ড্রাগম্যান একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং বিদ্যালয়টি সরকারী অনুমোদন লাভ করে।[৪০] এছাড়াও পূর্বদিকে উষর গ্রামে মেথোডিস্ট মিশনারীগণ বাংলা মাধ্যম দুইটি হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৫৭ খ্রিঃ Success Villa ভেঙ্গে নতুন সেন্ট যোসেফ স্কুল ও বোর্ডিং এবং মেয়েদের জন্য সাধ্বী মারীয়া গোরেত্তি স্কুল গড়ে তোলা হয়।[৪১] প্রথমে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলে পড়ানো হতো। তারপর মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের রাঁচী পাঠানো হতো। পরবর্তীতে সেন্ট যোসেফ ও সেন্ট মারীয়া গোরেত্তি স্কুল দুটিকে হাইস্কুলে পরিণত করা হয়।

৬.১২ দার্জিলিংএর পার্বত্য অঞ্চল

১৯৪৭ খ্রিঃ দার্জিলিং জেলায় মিশন পরিচালনার ভার কানাডার ইংরেজিভাষী যেজুইট ফাদারদের উপর অর্পণ করা হয়। পরবর্তীতে ৭জন ফাদার কানাডা থেকে দার্জিলিংয়ে উপস্থিত হন। তারা ৩টি দলে বিভক্ত হয়ে কাজ শুরু করেন।

ফাদার অরিমেন্ট ছিলেন শিক্ষাবিদ। তিনি সেন্ট রবার্টস্ স্কুলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

১৯২৯ খ্রিঃ কার্শিয়াংএর পাহাড়ী খ্রিস্টানের সংখ্যা ছিল ৩০০ জন। ১৯৩১ খ্রিঃ নেপালী ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সেন্ট আলফনসাস স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪২] ফাদার মাইকেল ওয়েরি (Fr. Michel Wery, S.J.) কার্শিয়াং মিশনের ভারপ্রাপ্ত হন। তিনি শুধু সাধারণ বিদ্যাশিক্ষা নয়, ঐ বিদ্যালয়ের অঙ্গসংগঠন হিসাবে একটি কারিগরি বিভাগও প্রতিষ্ঠা করেন[৪৩] এবং ছেলেদের কাঠের কাজ ও চর্ম শিল্পে ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

ফাদার অগাস্ট বর্সাস (Fr. Agust Borses, SJ) হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে গয়াগঙ্গা মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি যশপুরের রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় যশপুর রাজ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে সেখানে শিক্ষার আলো জ্বেলে দেন।[৪৪]

ফাদার বসার্স গয়াগঙ্গায় কতকগুলো বাড়ি নির্মাণ করলেন, যার মধ্যে একটি স্কুল হিসাবে, অপর আর একটি বোর্ডিং হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকলো। তাই ১৯৩৫ খ্রিঃ 'ডটার্স অফ দ্য ক্রস' (Liege) সিস্টারদের গয়াগঙ্গায় নিয়ে এসে তাঁদের হাতে স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। এছাড়া সিস্টাররা একটি ডিসপেন্সারিও পরিচালনা করতে থাকেন।

এদিকে কাথলিকের সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৫৪ খ্রিঃ ফাদার আগুরসন গয়াগঙ্গায় আসেন। তাকে স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব দান করেন। ফাদারের পরিচালনায় প্রাথমিক স্কুলটি প্রথমে মাধ্যমিক এবং পরে হাইস্কুলে পরিণত হয়। স্কুলে তখন ছাত্র সংখ্যা ছিল ২৫০ জন। তার মধ্যে বোর্ডিংএর ছাত্র সংখ্যা ছিল ৫৪ জন।

৬.১৩ ডন বস্কোর সালেসীয়দের আগমন

সালেস্‌এর সাধু ফ্রান্সিসের নামানুসারে ধর্মসংঘের নামকরণ হয় সালেসীয় (Saelesian)। এই সংঘের পুরোহিতগণ সালেসীয় পুরোহিত নামে পরিচিত হতে থাকেন। সালেসীয় ফাদারগণ ডনবস্কোর আদর্শ ও শিক্ষানীতিকে ফলপ্রসূ করার জন্য পৃথিবীর সব দেশেই গড়ে তুলেছেন সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কারিগরি বিদ্যালয়, বোর্ডিং স্কুল, অনাথাশ্রম ও শিক্ষা দানের উপযোগী অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। ডন বস্কো শুধু দক্ষ কর্মী ও শিল্পী ছিলেন না, উপরন্তু তিনি ছিলেন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ। সাধারণ মানুষের নৈতিক চরিত্রের উন্নতির জন্য তিনি বহু পুস্তক রচনা করেছেন।

মনসিনিয়র ইম্মানুয়েল বার্স, এসডিবি (ধর্মীয় প্রশাসক ১৯২৮-৩৪ খ্রিঃ)এর সময়ে কৃষ্ণনগর ডাইওসিসে ২৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল।

মনসিনিয়র বার্ড কৃষ্ণনগর আসার পর মিলান ফাদারদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সাধু পিটার ও পল প্রাথমিক বিদ্যালয়টির সংস্কার করেন ও 'ডন বস্কো' নাম রাখেন। এই ভাবে ১৯৩৪ খ্রিঃ ডন বস্কোর স্কুলের সূচনা হয়।[৪৫]

১৯৩৩ খ্রিঃ আরো কয়েকজন পুরোহিত কৃষ্ণনগরে আগমন করেন। ফাদার টমাস লোপেজ ডন বস্কো স্কুলে একটি কারিগরী বিভাগ তৈরি করে নিজেই বিভাগটি পরিচালনা করেন।[৪৬] ছয়টি নতুন মেশিন বসিয়ে তিনি কাঠের ও লোহার কাজ শেখাতে আরম্ভ করেন। কৃষ্ণনগরে তখন বিদ্যুৎ না থাকায় ১২ অশ্বশক্তি সম্পন্ন মোটর ও ডাইনামার ব্যবস্থা করেন।

মনসিনিয়র স্কুদেরি ডন বস্কো স্কুলটি স্থানান্তরিত করেন। ১৯৩৬ খ্রিঃ ১৫ই ফেব্রুয়ারি থেকে এই নতুন জায়গায় ডনবস্কো স্কুলের পঠন-পাঠন শুরু হয়। একই সঙ্গে এই স্থানে বোর্ডিংও স্থানান্তরিত হয়।

১৯৩৭ খ্রিঃ কারিগরী বিদ্যালয়টিও স্থানান্তরিত করা হয়। এর মানে সমগ্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি যেমন, মধ্যইংরেজী স্কুল, ছাত্রাবাস ও কারিগরি বিদ্যালয় একই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে।

৬.১৪ লুইস এল আর মরো, এসডিবি(১৯৩৬-৬৯)

১৯৪০ খ্রিঃ ২৫শে অক্টোবর বিশপ মরো কৃষ্ণনগরে আগমন করেন ও কাজ শুরু করেন। তাঁর পরিকল্পনার মধ্যে ছিল মিশনকেন্দ্রগুলির উন্নতি বিধান, দরিদ্রদের স্বনির্ভরতা, পীড়িতদের চিকিৎসা, ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদান ও সর্বোপরি জনসাধারণের জীবন যাপনে মানব-উন্নয়ন।

আমেরিকার প্রগতিবাদ ছিল বিশপ মরোর অস্থিমজ্জায় মিশ্রিত। তিনি মনে করতেন, শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি বা সম্প্রদায় উন্নত হতে পারে না। তাই তিনি শিক্ষাকে তাঁর পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার দান করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ডন বস্কো স্কুল, টেকনিক্যাল স্কুল ও তার বোর্ডিং, কৃষ্ণনগরে সিস্টারস অফ চ্যারিটি পরিচালিত মেয়েদের হলি ফ্যামিলি স্কুল ও তার বোর্ডিং এবং খুলনায় সেন্ট যোসেফস স্কুলের উন্নতির জন্য কাজ শুরু করেন।

১৯৪৪ খ্রিঃ দিকে বিশপ মরো জুনিয়র ডনবস্কো স্কুল নির্মাণ করেন।[৪৭] গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে কচিকাঁচাদের কলতানে মুখর হয়ে ওঠে এখানকার পরিবেশ। তাদের দেওয়া হতো পুষ্টিকর খাদ্য, পরিষ্কার পোশাক, তেল, সাবান, ব্রাশ, টুথপেস্ট, ইত্যাদি। প্রতিদিন বিকালে শেখানো হতো খেলাধুলা ও ড্রিল। এখানকার পড়া শেষ করে তারা ভর্তি হতো সিনিয়র ডনবস্কো স্কুলে। সেখান থেকে পাঠানো হতো খুলনা সেন্ট যোসেফ হাইস্কুলে এবং ম্যাট্রিকুলেট পাসের পর কলেজে।

৬.১৫ শিক্ষা

টেপ রেকর্ডিং (১৯৪১-৪২)

বিশপ মরো আমেরিকা থেকে ৭টি টেপ রেকর্ডার নিয়ে আসেন। এদেশে তখন টেপ রেকর্ডারের প্রচলন ছিল না। তিনি বিভিন্ন কাহিনীকে নাটিকার রূপ দিয়ে তা রেকর্ড করার ব্যবস্থা করেন। এগুলিতে ডনবস্কো স্কুল ও হলিফ্যামিলি স্কুলের উচ্চ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকগণ অংশ গ্রহণ করে। রেকর্ডিং হয়ে যাওয়ার পর একটি ছোট জেনারেটর চালিয়ে গ্রামে গ্রামে কাহিনী শোনানো হতো।

চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষা (১৯৫২ খ্রিঃ)

চলচ্চিত্র শিক্ষা ও প্রচারের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এই জন্য বিশপ মরো আমেরিকা থেকে তিনটি জেনারেটর ও তিনটি ছবি দেখানোর যন্ত্র (Film Project) নিয়ে আসেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন কাহিনী, চলচ্চিত্র ও ছোটদের জন্য কার্টুন চিত্র নিয়ে আসেন। প্রথম প্রথম ফাঁকা মাঠে প্রতি রবিবার শিক্ষামূলক চিত্র দেখানো হতো।

সিস্টারস্ অফ চ্যারিটির পরিচালিত জুনিয়র হোলি ফ্যামিলি ও হলিফ্যামিলি প্রাইমারী স্কুল নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।

১৯৬০ খ্রিঃ দু'টি স্কুলই সরকারের সহায়তাদান প্রকল্পের আওতায় আসে। অচিরেই লেখাপড়ায়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায়, নিয়ম-শৃঙ্খলায় কৃষ্ণনগর শ্রেষ্ঠ বালিকা বিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

স্কুলের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি তাঁরা কনভেন্টের ভিতরে একটি শিল্পবিদ্যালয় পরিচালনা করতে থাকেন। এই শিল্প বিদ্যালয়ে মেয়েদের তাঁত বোনা, দর্জির যাবতীয় কাজ, লেস তৈরি ও এমব্রয়ডারী শেখানো হতো, যাতে এসব মেয়েরা ভবিষ্যতে স্বনির্ভর হতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানটিও সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রশংসিত। এছাড়াও এরা বিনাবেতনে সরকারী হাসপাতালে রোগীদের সেবাকার্যে রত আছেন। চার্চ প্রাঙ্গণে বিনামূল্যে রোগীদের দেখা ও ঔষধপত্র বিতরণ করা অন্যতম দয়ার কাজ।

৬.১৬ সিস্টারস্ অফ মেরী ইম্মাকুলেট

১৯৪৮ খ্রিঃ প্রতিষ্ঠিত সংঘটি কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রদীপ জ্বালাতে আরম্ভ করে। কৃষ্ণনগর শহরের উত্তর-পশ্চিমে অভিজাত পল্লী নগেন্দ্র নগরে ১৯৫৯ খ্রিঃ জানুয়ারি মাসে প্রতিষ্ঠা করেন মেরী ইম্মাকুলেট মন্তেসরি স্কুল। স্কুলটি শহরের এক প্রান্তে হওয়ায় ছেলেমেয়েদের যাতায়াত করতে অসুবিধা হতো। সে জন্যে ১৯৬৮ খ্রিঃ সেটি ক্যাথিড্রাল রোডে স্থানান্তরিত করা হয়। শহরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনুরোধে এটি ইংরেজি মাধ্যম প্রাথমিক স্কুলে পরিণত করা হয়। এ সময় স্কুলের নাম দেওয়া হয় 'বিশপ মরো সেন্টার'।[৪৮]

ইতিমধ্যে সিস্টারগণ জনসাধারণের চিকিৎসার জন্য স্থাপন করেন 'মেরী ইম্মাকুলেট ক্লিনিক'। রোগীর চাপ বেশি থাকায় এই ক্লিনিকটি একটি বৃহৎ ও পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালে উন্নীত করা হয়। মেরী ইম্মাকুলেট হাসপাতাল কৃষ্ণনগরে একটি প্রশংসিত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান।

৬.১৭ খুলনা প্যারিশ

ফাদার বিয়াঙ্কি ১৯৪০ খ্রিঃ ৪০ জন ছাত্র নিয়ে খুলনা শহরের কেন্দ্রস্থলে ক্রয়করা জমিতে 'সেন্ট জোসেফস' নামে একটি মধ্য ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।[৪৯]

১৯৪৪ খ্রিঃ সেন্ট যোসেফস হাইস্কুল হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সেই সময় বঙ্গদেশের সমস্ত হাইস্কুল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনাধীন ছিল। শেষ পরীক্ষাও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত হতো।

১৯৫৮ খ্রিঃ মেরী ইম্মাকুলেট সিস্টারগণ রাণাঘাটে আসেন ও ১৯৫৯ খ্রিঃ মেরী ইম্মাকুলেট প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[৫০]

১৯৭০ খ্রিঃ মেরী ইম্মাকুলেট সিস্টারগণ রাঘবপুর প্যারিশে আসেন ও স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৬১ খ্রিঃ মেরী ইম্মাকুলেট সিস্টারগণ বহরমপুরে কনভেন্ট স্থাপন করেন। ১৯৫২ খ্রিঃ তারা একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল স্থাপন করেন। পরে এই মাধ্যমিক স্কুলটি হাইস্কুলে পরিণত হয়। এই সঙ্গে তারা একটি বাংলা মাধ্যম প্রাথমিক স্কুল ও একটি ডিসপেনসারী স্থাপন করেন।

১৯৬৩ খ্রিঃ মেরী ইম্মাকুলেট সিস্টারগণ চাপড়া প্যারিশে কনভেন্ট স্থাপন করে সেখানে মেয়েদের স্কুল স্থাপন করেন। মেয়েদের জন্য একটি প্রাইমারী ও হাইস্কুল, মেয়েদের হোস্টেল, মা ও শিশুর যত্ন প্রকল্পে একটি হাসপাতাল স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

৬.১৮ উপসংহার

ভারতীয় উপমহাদেশ আয়তন ও বৈচিত্র্যের বিচারে ছিল বিশাল এক দেশ। সেখানে মিশনারীদের গুণগত মানের শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এদেশে শিক্ষা বিস্তারে এদের অবদান অনস্বীকার্য। শিক্ষার উপকরণ থেকে শুরু করে শিক্ষার বিষয়বস্তু, পাঠদান পদ্ধতি, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদির উপর মিশনারীদের উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে। তাঁরাই শিক্ষাদান পদ্ধতি ও পাঠ্যসূচীতে আধুনিক ভাবধারার বিকাশ ঘটান। তারাই এদেশে প্রথম ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা দেখতে পাই, শিক্ষা বিস্তারের জন্য মিশনারীগণ নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছেন। তাঁরা শিশুকিশোরদের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয়, পিতৃমাতৃহীন

শিশুদের জন্য অনাথাশ্রম, শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ স্কুল, বৃত্তিমূলক কারিগরি বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়, কলেজ, বোর্ডিং স্কুল ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নেও তাদের অবদান রয়েছে। তারা শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। মিশানারীরাই সর্বপ্রথম ছাপাখানা স্থাপন করেন, শিক্ষা বিস্তারে যার ভূমিকা অপরিসীম। নব প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানায় মাতৃভাষায় পুস্তক প্রকাশিত হতো। ধর্মপ্রচার কাজকে সহজসাধ্য করার লক্ষ্যে তাঁরা বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় পুস্তক অনুবাদ করে তা প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেন।

আমরা আরো দেখতে পাই, মিশানারীদের চেষ্টায় এদেশের মানুষ ইংরেজি শিক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়ে। জনসাধারণের আগ্রহ লক্ষ্য করে মিশনারীগণ এদেশে অনেক ইংরেজি মাধ্যম স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। বাংলা ভাষার উন্নয়নেও মিশনারীদের ভূমিকা ছিল অসাধারণ। শিক্ষক হিসেবে তাঁরা ছিলেন সৎ, আন্তরিক, ন্যায়নিষ্ঠ ও দরদী। এ জন্যই বিদেশী হয়েও তাঁরা ভারতীয়দের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রাচীনপন্থী ভারতীয় শিক্ষাকে আধুনিক যুগের উপযোগীকরণে তাঁরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এই উপমহাদেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা বহুল পরিমাণে মিশনারীদের নিকট দায়বদ্ধ বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না।

তথ্য সূত্র :

---

[১] সরকার, লুইস প্রভাত, "বঙ্গদেশে খ্রীষ্ট ধর্ম ও খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়", জয়গুরু ইম্প্রেশন, কলকাতা ৭০০০০৬, প্রথম সংস্করণ, ২০০২। ঐ পৃষ্ঠা নং ৩
[২] ঐ পৃষ্ঠা নং ৫
[৩] ঐ পৃষ্ঠা নং ১২
[৪] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৫
[৫] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৫
[৬] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৫
[৭] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩৮
[৮] ঐ পৃষ্ঠা নং ৬৩
[৯] ঐ পৃষ্ঠা নং ৬৪
[১০] ঐ পৃষ্ঠা নং ৬৪
[১১] ঐ পৃষ্ঠা নং ৬৪
[১২] ঐ পৃষ্ঠা নং ৬৪
[১৩] ঐ পৃষ্ঠা নং ১২২
[১৪] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৫৩
[১৫] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৫৩
[১৬] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৫৪
[১৭] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৫৪
[১৮] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৫৪
[১৯] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৫৪
[২০] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৫৪
[২১] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৬৭
[২২] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৬৭
[২৩] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৭০
[২৪] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৭৭
[২৫] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৮৪
[২৬] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৯২
[২৭] ঐ পৃষ্ঠা নং ২০৪
[২৮] ঐ পৃষ্ঠা নং ২১৫
[২৯] ঐ পৃষ্ঠা নং ২২১
[৩০] ঐ পৃষ্ঠা নং ২২২
[৩১] ঐ পৃষ্ঠা নং ২২২
[৩২] ঐ পৃষ্ঠা নং ২২৮
[৩৩] ঐ পৃষ্ঠা নং ২২৮
[৩৪] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৩০
[৩৫] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৪৪
[৩৬] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৪৬
[৩৭] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৪৯
[৩৮] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৭৬
[৩৯] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৯০
[৪০] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৯১
[৪১] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৯৩
[৪২] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৯৩
[৪৩] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৯৫
[৪৪] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৯৫
[৪৫] ঐ পৃষ্ঠা নং ২৯৬
[৪৬] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩০৭
[৪৭] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩১০
[৪৮] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩২১
[৪৯] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩৩৩
[৫০] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩৩৫

গ্রন্থপঞ্জি

❖ সরকার, লুইস প্রভাত, “বঙ্গদেশে খ্রীষ্টধর্ম ও খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়”, জয়গুরু ইম্প্রেশন, কলকাতা ৭০০০০৬, প্রথম সংস্করণ, ২০০২। (পৃঃ ১৮৬, ১৬৭)

❖ ডি’কস্তা, যেরোম, “বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী’, (প্রথম খণ্ড), প্রতিবেশী প্রকাশনী, আগষ্ট, ১৯৮৮খ্রিঃ।

সপ্তম অধ্যায়

বর্তমান বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তারে কাথলিক মিশনারী

নং	পৃষ্ঠা নং
৭.১ ভূমিকা	২৯৫
৭.২ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পর্তুগীজদের অনুপ্রবেশ।	২৯৬
৭.৩ মোগল যুগে খ্রিস্টধর্ম (১৫৭৬-১৭৬৫)	২৯৭
৭.৪ খ্রিস্টীয় সাহিত্যের সূত্রপাত	২৯৮
৭.৫ ঢাকা শহরে মিশনারী কাজের সূত্রপাত	২৯৯
৭.৬ ঐতিহাসিক তেজগাঁও উপাসনাগৃহ	৩০১
৭.৭ হলিক্রস ফাদার ও সিস্টারদের আগমন	৩০২
৭.৮ ভিকারিয়েট (ধর্মাঞ্চল) শিক্ষা ব্যবস্থা	৩০৩
৭.৯ বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী	৩০৪
৭.১০ বিশপীয় অঙ্গসমূহ/সংগঠনসমূহ	৩০৪
৭.১১ উৎসর্গীকৃত জীবন	৩০৯
৭.১২ নিবেদিত প্রাণ	৩১০
৭.১৩ ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের সেবাকাজ	৩১১
৭.১৪ বর্তমানে দেশ ও জাতির সেবায় বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলী	৩১২
৭.১৫ বাংলাদশে হলিক্রস অতীত ও বর্তমান	৩১৭

৭.১৬ ধর্মপ্রদেশসমূহ ৩২৮

৭.১৭ শিক্ষাসেবায় ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ ৩৩৭

৭.১৮ বৈশিষ্ট্যসমূহ/ গুণাবলী ৩৩৮

৭.১৯ উপসংহার ৩৩৯

বর্তমান বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তারে কাথলিক মিশনারী

৭.১ ভূমিকা

প্রতিষ্ঠালগ্নের ও পূর্ব থেকে তদানীন্তন বঙ্গদেশে ও বর্তমান বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্মের গোড়া পত্তন, প্রচার ও প্রসার হয়ে আসছে বিভিন্ন আঙ্গিকে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনসেবা। এ কাজগুলোর একটি অপরটির পরিপূরক। প্রথম থেকেই এ কাজগুলো বাংলাদেশের কাথলিক মিশনারীদের হৃদয় জুড়ে অবস্থান করছিল। তবে সময়ের ধারাবাহিকতায় ক্রমান্বয়ে তাদের প্রকাশ ও প্রচার আরো বিস্তারলাভ করেছে। আর এসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই এদেশের মানুষ খ্রিস্টমণ্ডলীর পরিচয় পেয়েছিল।

রোমান কাথলিক মণ্ডলী বাংলাদেশে খ্রিস্টীয় মণ্ডলী। পর্তুগীজ নাবিক, বণিক ও পুরোহিতরা ষোড়শ শতকে ইহার গোড়াপত্তন করেন। ১৫১০ খ্রিঃ ভারতের পশ্চিম উপকূলে গোয়ায় পর্তুগীজ উপনিবেশ স্থাপিত হওয়ার পর সুদূর চীন ও জাপান পর্যন্ত পর্তুগীজদের সামুদ্রিক বাণিজ্য প্রসার লাভ করে।[১]

১৫১৭ খ্রিঃ বাণিজ্য করার উদ্দেশ্য চট্টগ্রাম বন্দরে উপস্থিত হন।[২] বাংলাদেশ তখন গৌড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৫৩৭ খ্রিঃ বিহারের শেরশাহ্‌দ্বারা গৌড়ের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়ে পড়লে সুলতান মাহমুদ শাহ্‌ পর্তুগীজদের নিকট হতে সামরিক সাহায্য লাভের আশায় তাদের চট্টগ্রাম ও হুগলী জেলার সাতগাঁওতে বাণিজ্য ঘাটি স্থাপনের অনুমতি দেন।[৩] অল্প সময়ের মধ্যে চট্টগ্রাম ভারতীয় উপকূলের পূর্বাঞ্চল পর্তুগীজদের সকল কর্মতৎপরতার কেন্দ্রে পরিণত হল।[৪]

৭.২ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পর্তুগীজদের অনুপ্রবেশ

ষোড়শ শতকে পর্তুগাল বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৌ-শক্তিতে পরিণত হয়।[৫] তখন সমুদ্রে পর্তুগীজদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো কোন শক্তি ভারতীয় উপমহাদেশে ছিলনা।[৬]

ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বারো ভূঁইয়াদের অভ্যুদয়ের ফলে বাংলাদেশ কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। চট্টগ্রামে আরাকানীদের আধিপত্য বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। বাংলাদেশের এই পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পর্তুগীজরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বাণিজ্য বিস্তারের সুযোগ লাভ করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বাকলা (বরিশাল), চান্দিকন (যশোহর-খুলনা), শ্রীপুর (ঢাকা), ভুলুয়া (নোয়াখালী), কাতরাবো (ঢাকা-ময়মনসিংহ) এবং খুলনার টপগাঁওতে তাদের বাণিজ্য ঘাটি স্থাপিত হয়।[৭] বার ভূঁইয়াদের মধ্যে বরিশালের পরমানন্দ রায়, যশোহরের প্রতাপাদিত্য ও ঢাকার কেদার রায়, তাদের নিজ নিজ নৌবাহিনীতে পর্তুগীজদের চাকুরি প্রদান করেন। এছাড়া এদেশের রাজনীতির সাথে তারা জড়িয়ে পড়ে। চট্টগ্রামের আরাকানীদের সাথে পর্তুগীজদের বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ী ছিল।[৮] পরবর্তী সময়ে এই মিত্রতার কারণেই চট্টগ্রামের পর্তুগীজরা এদেশে জলদস্যু হিসাবে কুখ্যাতি অর্জন করেছিল।

ষোড়শ শতকের শেষভাগে চট্টগ্রাম কর্ণফুলী নদীর মোহনায় অবস্থিত দিয়াঙ্গা, বাকলা, চান্দিকন ও শ্রীপুরে খ্রিস্টীয় সমাজের অস্তিত্বের প্রমাণ ইতিহাসে রয়েছে। পর্তুগীজ নাবিক, বণিক, যোদ্ধা ও তাদের এই দেশীয় খ্রিস্টধর্মান্তরিত ক্রীতদাস-দাসী ও উপপত্নীদের গর্ভজাত সন্তানদের দ্বারা বাংলাদেশের আদি খ্রিস্টীয় সমাজ গঠিত হয়েছিল।

৭.৩ মোগল যুগে খ্রিস্টধর্ম (১৫৭৬-১৭৬৫)

(যেজুইট মিশনারীদের আগমন)

১৫৭৬ খ্রিঃ মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে চট্টগ্রাম ও কয়েকটি দুর্গম এলাকা ব্যতীত সমস্ত বাংলাদেশ মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

মোগল আমলেই বাংলাদেশে রোমান কাথলিক মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা হয়। এর দুটি কারণ ছিল :

প্রথমত, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে ইউরোপ ও ইউরোপের বাইরে যেজুইট মিশনারীরাই রোমান কাথলিক মণ্ডলীর গৌরব বৃদ্ধি করেন। পর্তুগীজদের দ্বারা এদেশে খ্রিস্টীয় সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হলেও যেজুইট মিশনারীগণই বাংলাদেশে প্রথম খ্রিস্টীয় উপাসনাগৃহ অনাথাশ্রম, স্কুল প্রভৃতি স্থাপনের মাধ্যমে খ্রিস্টের সু-সমাচার প্রচার করতে শুরু করেন। বাংলা ভাষায় খ্রিস্টবাণী প্রচার তারাই শুরু করেন। যেজুইটদের পরে অন্যান্য সম্প্রদায়ের রোমান কাথলিক মিশনারীগণ এদেশে খ্রিস্টের রাজ্য বিস্তারের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন।

দ্বিতীয়ত, মোগল সম্রাট আকবর ও তাঁর পুত্র এবং উত্তরাধিকারী সম্রাট জাহাঙ্গীর ধর্মীয় ব্যাপারে খুব উদার ছিলেন। তাদের উভয়ের সাথে যেজুইট মিশনারীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।[৯] আকবর ও জাহাঙ্গীর যেজুইট মিশনারীদের বিনা বাধায় খ্রিস্টধর্ম প্রচারের অনুমতি দিয়েছিলেন। তবে এই উদারতার পেছনে একটি উদ্দেশ্য ছিল। পর্তুগীজদের সামরিক সাহায্য লাভে মোগল সম্রাটগণ সব সময়ে সচেষ্ট ছিলেন।

১৯৬৬ খ্রিঃ পর্তুগীজদের সহায়তায় সচেষ্ট ঢাকার মোগল শাসনকর্তা শায়েস্তা খান আরাকানীদের হাত থেকে চট্টগ্রাম দখল করেন।

১৯৯৮ খ্রিঃ ফাদার ফ্রান্সিসকো ফার্ণান্দেজের নেতৃত্বে প্রথম যেজুইট মিশনারীগণ গোয়া থেকে চট্টগ্রাম পৌঁছান। মিশনারীগণ যখন বাংলাদেশ আসেন তখন অধিকাংশ খ্রিস্টান চট্টগ্রাম অঞ্চলে বাস করতেন। দিয়াঙ্গা বন্দর তখন পূর্ব ভারতে পর্তুগীজদের সর্ববৃহৎ উপনিবেশ।

১৫৯৮ খ্রিঃ চট্টগ্রাম ও আরাকানে পর্তুগীজ খ্রিস্টানদের সংখ্যা ছিল প্রায় আড়াই হাজার।[১০] চট্টগ্রামের কক্সবাজার মহকুমা তখন আরাকান রাজ্যের অংশ ছিল।

চট্টগ্রামে যেজুইটগণ দুটি উপাসনাগৃহ স্থাপনের অনুমতি পেয়েছিলেন।[১১] তারা এখানে একটি অনাথাশ্রমও স্থাপন করেন।

বাকলা ও চান্দিকানে যেজুইটগণ স্থানীয় হিন্দু সামন্ত রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। তারা দুটি স্থানে উপাসনাগৃহ নির্মাণ করেছিলেন। তারা দুটি স্থানে এই উপাসনাগৃহ নির্মাণের অনুমতি পেয়েছিলেন। ঢাকার শ্রীপুরেও তাঁরা তাদের কর্মতৎপরতা শুরু করেছিলেন।

১৬০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যেজুইটগণ বাংলাদেশে চারটি উপাসনাগৃহ স্থাপন করেন। এগুলোর মধ্যে চান্দিকানের উপসানাগৃহটিকে এদেশের প্রথম খ্রিস্টীয় উপাসনাগৃহ বলে মনে করা হয়।[১২]

১৫৯৮ খ্রিঃ কোচিনের যেজুইটদের কার্যপরিচালনা কেন্দ্র থেকে ফাদার পিমেস্তা ৪জন যেজুইট পুরোহিতকে বাংলাদেশে প্রেরণ করেন।[১৩] তারা এখানে একটি স্কুল ও একটি হাসপাতাল নির্মাণ করেন।

৭.৪ খ্রিস্টীয় সাহিত্যের সূচনা

খ্রিস্টধর্ম প্রচারে খ্রিস্টীয় সাহিত্যের প্রয়োজন রয়েছে। খ্রিস্টীয় সাহিত্য ছাড়া খ্রিস্টীয় মণ্ডলীর আধ্যাত্মিক জীবন উন্নত হতে পারে না। ফাদার ফার্ণান্দেজ খ্রিস্টধর্মের মূলনীতির উপর

একটি গ্রন্থ ও একটি প্রশ্নোত্তরমালা পর্তুগীজ ভাষায় রচনা করেন তাঁরই সহকর্মী ডমিনিক দ্য সুজা। অল্প সময়ের মধ্যে বাংলা ভাষা রপ্ত করে বই দুটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন।[১৪] তাই ডমিনিক দ্য সুজাকে বাংলার খ্রিস্টীয় সাহিত্যের জনক বলা হয়।

সপ্তদশ শতকের শুরুতে খ্রিস্টের রাজ্য যখনই বৃদ্ধি পেতে থাকলো, ঠিক তখনই বাংলাদেশে বিপর্যয় নেমে এলো। ফলে মিশনারীদের কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গেল। চট্টগ্রামে ফাদার ফ্রান্সিসকো ফার্নান্দেজ আরাকানীদের হাতে নিহত হলেন।[১৫] বাংলাদেশে ফাদার ফার্নান্দেজ প্রথম সাক্ষ্যমর মিশনারী। ফাদার নিহত হবার পর অন্যান্য যেজুইট মিশনারীগণ বেশি দিন আর বাংলাদেশে অবস্থান করেননি। ফলে অনেক বছরের জন্য এদেশে মিশনারী কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

১৫০৭ খ্রিঃ আবারও নতুনভাবে চট্টগ্রাম ও দিয়াঙ্গায় বিপর্যয় নেমে আসে। ফলে খ্রিস্টীয় সমাজ প্রায় বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হয়।

সন্দীপে খ্রিস্টের রাজ্য বিস্তারের সুযোগ ছিল ১৬০৯ হতে ১৬১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত। কিন্তু জাগতিক লোভের বশীভূত হয়ে সেই সুযোগ গ্রহণ করতে পারেনি পর্তুগীজ ও দেশীয় খ্রিস্টানগণ। সপ্তদশ শতকের প্রথম দশকে বাংলাদেশে রোমান কাথলিক পুরোহিতের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য।

১৬১৬ খ্রিঃ থেকে ১৬২৯ খ্রিঃ পর্যন্ত বাংলাদেশের খ্রিস্টীয় মণ্ডলীর ইতিহাসে কী ঘটেছিল তা জানা নেই। তাই এই সময়টাকে ‘অন্ধকারের যুগ’ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৭.৫ ঢাকা শহরে মিশনারী কাজের সূত্রপাত

১৬০৮ খ্রিঃ সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে, ঢাকা মোগল বাংলার রাজধানীতে পরিণত হয়। রাতারাতি শহরটি একটি বড় বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়।[১৬] বাংলাদেশের নানা জায়গা থেকে পর্তুগীজগণ বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে তেজগাঁও এলাকায় বসবাস করতে শুরু করে। এখানে

উল্লেখ্য যে, মোগল আমলে যেসব বিদেশী ডাচ, ফরাসী ও ইংরেজ বাণিজ্য উপলক্ষ্যে ঢাকায় আসতেন তারাও এই এলাকায় বসবাস করতেন। শুধু আর্মেনীয় খ্রিস্টান ব্যবসায়ীগণ শহরের ভিতরে বাস করতেন।

১৬১৬ খ্রিঃ ঢাকায় একটি রোমান কাথলিক মিশন স্থাপিত হয়েছিল।[১৭] ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অগষ্টিনিয়ান সম্প্রদায়ের মিশনারীগণ। কিন্তু মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও ঢাকার মিশনারীদের কাজের অগ্রগতি হয়নি।

১৬২৯ খ্রিস্টাব্দে দিয়াঙ্গার ভিকার হিসাবে ফাদার ম্যানরিক বাংলাদেশে আসেন। তিনি লিখেছেন :'যেসকল মিশনারী ভ্রাতা পূর্বে ঢাকায় এসেছিলেন তারা খ্রিস্টানদের বাসস্থান এলাকার নিকটে তেজগাঁও আরও একটি উপাসনাগৃহ স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে শিরিপুর (শ্রীপুরে) ও লরিকোল (লরিকোল) বান্দানে তারা দুটি উপাসনাগৃহ নির্মাণ করে ছিলেন'।

১৬৩২ খ্রিঃ হুগলী থেকে বহু দেশীয় খ্রিস্টান বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষভাবে ঢাকা জেলায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশে খ্রিস্টীয় মণ্ডলীর ইতিহাসে সপ্তদশ শতকটি ফসল সংগ্রহের যুগ। এই শতকে চট্টগ্রাম ও ঢাকা জেলার মণ্ডলীর জনসংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি লাভ করেছিল।[১৮]

ডোম আন্তনিও ছিলেন ঢাকার উত্তরে অবস্থিত ভূষণায় এক হিন্দু জমিদারের সন্তান।[১৯] বাল্যকালে তিনি জলদস্যুদের হাতে বন্দী ছিলেন। একজন অগাষ্টিনিয়ান ধর্মযাজক ম্যানুয়েল ডি'রোজারিও তাকে ক্রয় করেন। পরবর্তীতে তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে নিজের দেশে ফিরে আসেন। তিনি ভাওয়াল পরগনার নাগরীতে 'তলেনতিনোর সাধু নিকোলাস মিশন' নামে একটি মিশন স্থাপন করে তার চতুর্দিকে খ্রিস্টের বাণী প্রচার করেন। ১৫৬৩ খ্রিঃ নাগরীতে একটি গির্জা স্থাপিত হয়েছিল।[২০]

সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে পর্তুগীজদের সকল দুষ্কর্মের কেন্দ্র ছিল চট্টগ্রাম। ১৬৬৬ খ্রিঃ আরাকানীদের হাত থেকে চট্টগ্রাম দখলের সময়ে পর্তুগীজরা মোগলদের সাহায্য করেছিল। এই সাহায্যের পুরস্কার হিসেবে তাদের ঢাকা শহর থেকে প্রায় ১২ মাইল দূরে ইছামতী নদীর তীরে ফিরিঙ্গি বাজার নামক স্থানে পুনর্বাসিত করা হয়েছিল।[২১] এভাবেই ঢাকার রোমান কাথলিক মণ্ডলীর ইতিহাসে শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়।

৭.৬ ঐতিহাসিক তেজগাঁও উপাসনাগৃহ

১৬৪০ খ্রিঃ ফাদার ম্যানরিক যখন ঢাকায় এসেছিলেন তখন তিনি তেজগাঁও-এ একটি (মনষ্টারি বা সন্ন্যাসীদের মঠ) একটি উপাসনাগৃহ দেখেছিলেন।

তেজগাঁও-তে পর্তুগীজদের তৈরি যে খ্রিস্টীয়উপাসনা গৃহটি এখনও দাঁড়িয়ে আছে তা ১৬৭৭ খ্রিঃ নির্মিত হয়েছিল। এটি কয়েকবার সংস্কার করা হয়েছে। এর স্থাপত্যে ইউরোপীয় মোগল রীতির সংমিশ্রণ ঘটেছিল।[২২] তবে এই উপাসনাগৃহের আদি ইতিহাস রহস্যাবৃত। এনিয়ে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মতামত রয়েছে।

অষ্টাদশ শতকে রোমান কাথলিক মিশনারীগণ ঢাকা অঞ্চলকেই তাদের কর্মক্ষেত্রে পরিণত করেন।

১৭৪৭ খ্রিঃ হাসনাবাদে একটি নতুন গির্জা স্থাপিত হয়।[২৩] অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি বরিশালের পাদ্রীশিবপুরে একটি নতুন মিশনকেন্দ্র খোলা হয়। কালক্রমে এখানে একটি বড় রোমান কাথলিক মণ্ডলী গড়ে ওঠে।[২৪] ১৭২৩ খ্রিঃ একজন যেজুইট ফাদারের রচিত বিবরণী থেকে জানা যায় যে, মাদ্রাজের সেন্ট থোমার বিশপ যখন চট্টগ্রাম পরিদর্শনে আসেন তখন পর্তুগীজ খ্রিস্টানরা তিনটি কলোনীতে বিভক্ত হয়ে বসবাস করতো। প্রত্যেকটি কলোনীর নিজস্ব ক্যাপ্টেন, উপাসনাগৃহ ও মিশনারী (ধর্মযাজক) ছিল।[২৫]

বাংলাদেশে রোমান কাথলিক মণ্ডলীর পরিচালনার চারটি পর্যায় নিম্নরূপ:

প্রথমত :পরিচালিত হতো গোয়ার পাদ্রোয়াদো দ্বারা।

দ্বিতীয়ত:মদ্রাজের মাইলাপুরের সাধু টমাস ডায়োসিস কর্তৃক।

তৃতীয়ত :রোমের বিশ্বাস বিস্তার সংস্থার দ্বারা।

চতুর্থত : মাইলাপুরের অধীনে।

৭.৭ হলিক্রস ফাদার ও সিস্টারদের আগমন

১৮৫০ খ্রিঃ ১৫ই ফেব্রুয়ারি বিশপ অলিফ পূর্ণ ক্ষমতাসহ পূর্ববঙ্গ ভিকারিয়েটের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন।[২৬] তিনি স্বাধীনভাবে ভিকারিয়েট পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত ‘পবিত্র ক্রুশ সংঘ’এর (The Association of Holy Cross) সুপিরিওর জেনারেল ফাদার আন্তনী বাসিল মরো (Anthony BasileMoreau) পূর্ববঙ্গে তাঁর যাজকদের প্রেরণ করতে সম্মত হন। সিদ্ধান্ত হয় যে, ফাদারদের সাহায্য করার জন্য হলিক্রস সিস্টারগণ সঙ্গে যাবেন।

উল্লেখ্য যে, হলিক্রস যাজকদের প্রধান কাজ ছিল শহরে ও গ্রামের মিশনকেন্দ্রগুলি পরিচালনা করা ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে শিক্ষা ও জ্ঞানদান করা।[২৭] হলিক্রস সিস্টারদের প্রধান কাজ স্কুলে শিক্ষাদান করা, হাসপাতাল ও সেবা প্রতিষ্ঠানে আর্ত ও মুমূর্ষুদের সেবা করা।[২৮]

১৮৫৩ খ্রিঃ ১৭ই জানুয়ারী ৮ সদস্যের একটি দল ফ্রান্স থেকে জাহাজযোগে যাত্রা করেন ও মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতায় পৌঁছায়। তাঁরা নৌকাযোগে পূর্ববঙ্গে উপস্থিত হন এবং পৃথক হয়ে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, বরিশাল ও ঢাকায় কাজ শুরু করেন।

দ্বিতীয় দলটি ১৮৫৩ খ্রিঃ ১৭ই সেপ্টেম্বর ফ্রান্সের মার্সেই বন্দর থেকে জাহাজ যোগে রওনা হন। নভেম্বর মাসে প্রথম সপ্তাহে তাঁরা কলকাতা পৌঁছেন। ৮ই নভেম্বর নৌকায় করে বরিশাল হয়ে ঢাকায় উপস্থিত হন।

হলিক্রস ফাদার ও সিস্টারগণ পূর্ববঙ্গে ১৮৫৩ খ্রিঃ থেকে যে কাজ শুরু করেছিলেন আজকের বাংলাদেশে তাঁরা সেই কাজ অদ্যাবধি সাফল্যের সঙ্গে করে যাচ্ছেন।[২৯]

৭.৮ ভিকারিয়েটে (ধর্মাঞ্চলে)শিক্ষাব্যবস্থা

বিশপ দ্যুফাল, সিএসসি ধর্মাঞ্চলের অধিকাংশ জেলায়ই স্কুল স্থাপন করেছিলেন যেগুলো যোগ্য শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত হতো। এসব স্কুলে মৌলিক শিক্ষণীয় বিষয়াদি ও ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হতো।[৩০]

১৮৮২ খ্রিঃ দোম গ্রেগরী দ্য গ্রোত, ওএসবি ঢাকায় বোর্ডিংসহ একটি স্কুল স্থাপন করেন। এর নাম ছিল সেন্ট গ্রেগরীজ স্কুল। এখানে ৯জন অনাথ বালক ও প্রায় ৩৫ জন বালক বালিকা দিনের বেলায় পড়াশুনা করতো।[৩১] শিক্ষকের সংখ্যা ছিল দুজন-চার জন। বর্তমান সেন্ট গ্রেগরীজ হাই স্কুলের এভাবেই গোড়া পত্তন হয়েছিল।

১৮৮২ খ্রিঃ মে মাসে বিশপ বালসিপের ফ্রান্সের লিয়ন নগরীর 'ইনস্টিউট অব আওয়ার লেডী অব দি মিশন্স' (RNDM) সংঘের প্রতিষ্ঠাত্রী মাদার মেরীর কাছে ধর্মাঞ্চলে শিক্ষাদানকার্য পরিচালনার্থে একদল সিস্টারের জন্য আবেদন জানান। তাঁর এ আবেদনে সিস্টারগণ সাড়া দেন।

১৮৮৩ খ্রিঃ ২৯শে মার্চ মাদারসহ চারজন চট্টগ্রামে পৌঁছেন। সেখানে তাঁরা সেন্ট স্কলাস্টিকা কনভেন্ট পরিচালনা শুরু করেন।

১৮৮৭ খ্রিঃ সিমিয়োন নামক একজন কাথলিক আকিয়াবে সেন্ট জন্‌স ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল স্কুল চালু করেন।[৩২]

৭.৯ বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী (Catholic Bishops Conference of Bangladesh-CBCB)

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে 'বাংলাদেশ কাথলিক সম্মিলনী' প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের কাথলিক মণ্ডলীর স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সেবাদানের বিষয়গুলোর সাধারণ নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করাই এর কাজ।[৩৩]

এই সম্মিলনীর সদস্যগণ হলেন নিম্নরূপ :

ক) প্রেসিডেন্ট

খ) ভাইসপ্রেসিডেন্ট

গ) সেক্রেটারী জেনারেল

ঘ) ট্রেজারার

ঙ) সদস্য(বর্তমানে ৫জন। এই সংখ্যা বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন কারণে বাড়তে ও কমতে পারে)

চ) সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল

৭.১০ বিশপীয় অঙ্গসমূহ/সংগঠন সমূহ

বিশপীয় অঙ্গ সমূহের বিভিন্ন কমিশনের মাধ্যমে বাংলাদেশ মণ্ডলীর পালকীয়, সেবামূলক, পরিচালনা ও অন্যান্য বিষয়গুলোর কার্যসমূহ পরিচালিত হয় ও দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়।[৩৪] কমিশনগুলো হলো :

১। উপাসনা ও প্রার্থনা বিষয়ক বিশপীয় কমিশন

লক্ষ্য উদ্দেশ্য :

ক) উপাসনা-জীবনের দিক নির্দেশনা।

খ) উপসনাগ্রন্থ ও টেক্সট যোগান দেওয়া।

গ) উপাসনার সঙ্গীত ঠিক করা।

ঘ) স্থানীয় সংস্কৃতি ব্যবহার (উপাসনা ও প্রার্থনায় জনগণের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানো)।

ঙ) উপাসনালয়ে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ জোরদার করা।

২। ধর্মশিক্ষাদান ও বাইবেলীয় সেবাকাজ

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

ক) বাংলাদেশে ধর্মশিক্ষা ও বাইবেলীয় সেবাকাজের দিকনির্দেশনা বৃদ্ধি ও পরিচালনা।

খ) স্থানীয় ভাষায় ধর্মশিক্ষাদান ও বাইবেলীয় বিষয়ে প্রস্তুতি ও উৎসাহ প্রদান।

গ) কাটেখিজম ও খ্রিস্টধর্ম শিক্ষকগঠনে সহায়তা করা।

৩। পরিবার-কল্যাণ পরিষদ

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

ক) যথাযথ পরিচালনা ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল খ্রিস্টীয় পরিবারের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা জোরদার।

খ) ভ্রান্তি ও অপব্যবহারের বিরুদ্ধে খ্রিস্টীয় পরিবারগুলোকে রক্ষা করা এবং বিবাহ ও পরিবার জীবনকে খ্রিস্টীয় শিক্ষায় ধরে রাখা।

গ) অন্যান্য খ্রিস্টীয় পরিবার ও অন্যদেরকে মঙ্গলবাণী শোনাবার জন্য খ্রিস্টীয় পরিবার গঠন করা।

৪। বাংলাদেশ কাথলিক শিক্ষাবোর্ড

লক্ষ্য উদ্দেশ্য :

ক) যুব শ্রেণীর শিক্ষার জন্য জাতীয় সকল বিষয়াদিতে অর্থপূর্ণভাবেঅংশগ্রহণ।

খ) মণ্ডলীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষা পলিসি (নীতিমালা) পুনর্গঠন পুনঃপরীক্ষা নিরীক্ষা ও প্রস্তুতিতে সহায়তাদান করা।

গ) জীবনের আহ্বানরূপে দেখতে শিক্ষকদের ধারাবাহিক গঠনে সহায়তাদান।

৫। স্বাস্থ্য সেবা কমিশন

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

ক) মণ্ডলীর স্বাস্থ্যসেবা খাতে পলিসি (নীতিমালা)।

খ) অসুস্থ্যদের সেবাযত্নে যীশুর ভালবাসা, করুণা প্রকাশ।

গ) স্বাস্থ্য বিষয়ে মণ্ডলীর শিক্ষা প্রচার ও ব্যাখ্যাদান।

ঘ) ডাক্তার, নার্স ও অন্যদের খ্রিস্টীয় ভাবধারায় গঠন করা।

৬। ন্যায় ও শান্তি কমিশন

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

ক) দেশ ও সমাজের অন্যায্যতা দূরীকরণে সহায়তা।

খ) সামাজিক বিষয়গুলোতে সচেতনতা।

গ) অন্যায্যতাগুলো কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্যপ্রমাণাদিসহ উপস্থাপন।

ঘ) অন্যায়, অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবার পন্থা সুপারিশ।

৭। খ্রিস্টীয় একতা ও আন্তঃধর্মীয় বিষয়ক কমিশন

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

ক) বিভিন্ন ধর্মের লোকদের মধ্যে সু-সম্পর্ক সৃষ্টি।

খ) অন্যান্য ধর্মের আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ অধ্যয়ন ও উপলব্ধি।

গ) আমাদের মূল্যবোধ অন্যদের সাথে সহভাগিতা।

৮। সামাজিক যোগোযোগের বিষয়ে কমিশন

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

ক) যোগাযোগের মাধ্যমে খ্রিস্টীয় মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা উপস্থাপন ও জোরদার করা।

খ) এর মাধ্যমগুলির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের অবস্থা, আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

গ) মণ্ডলীর বিভিন্ন ব্যক্তি যেন সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করতে পারে তার জন্যতাদের অনুপ্রাণিত করা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া।

৯) যুব কমিশন

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

ক) যুবাদের মধ্যে খ্রিস্টবিশ্বাস বিস্তার করা এবং সমসাময়িক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোগত বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন করা।

খ) তাদেরকে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা, ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলা,মণ্ডলীর কাজে অংশ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা।

গ) ভোগবাদ, জাগতিকতা, পুঁজিবাদ থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করা ওঅহিংসা নীতির মাধ্যমে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ নতুন সমাজ গড়ে তোলায় উদ্বুদ্ধ করা।

১০) ভক্তজনসাধারণ বিষয়ক কমিশন

ক) ভক্তজনসাধারণের প্রৈরিতিক কাজ বৃদ্ধি ও তার সমন্বয় সাধন করা।

খ) মণ্ডলীর সেবাকাজে অংশগ্রহণে সমর্থন দেওয়া (ব্যক্তিগতভাবে ও সংঘবদ্ধভাবে)

গ) ধর্মশিক্ষাদান, উপাসনা এবং সংস্কারীয় জীবনে যৌথভাবে তাদেরকে কাজে অনুপ্রাণিত করে দয়া, ক্ষমা, ভালোবাসা ও সামাজিক উন্নয়ন কাজে অনুপ্রাণিত করা।

১১) সেমিনারী কমিশন

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

ক) দেশের চাহিদা অনুসারে আদর্শ পুরোহিত গঠনে দায়িত্বপ্রাপ্তদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করা।

১২) যাজক ও সন্ন্যাসব্রতীদের কমিশন

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

ক) বিভিন্ন প্রোগ্রাম, নীতিমালা গঠনে সাহায্য করা।

খ) আহ্বান বৃদ্ধি করা ও তাদের গঠনদাতাদের গঠনদানে সাহায্য করা।

১৩) মঙ্গলসমাচার প্রচার কমিশন

জনসাধারণের মাঝে খ্রিস্টের বাণী প্রচারে সাহায্য করা।

১৪) কারিতাস বাংলাদেশ

বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা।

এছাড়াও বিভিন্ন সংঘ, কেন্দ্র, সমিতি, অফিসসমূহ, স্টুডেন্ট মুভমেন্টগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন সাংগঠনিক, কাঠামোগত, ব্যক্তিগত পর্যায়ে আধ্যাত্মিক উন্নয়ন, পালকীয় যত্ন, আর্থসামাজিক উন্নয়ন, মানবীয় ও নৈতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। যেমন, সুখী পরিবার গঠন, শিশু মঙ্গল, বৃদ্ধদের, গরীবদের, প্রান্তিক জনগণের কল্যাণে যারা এসব পরিচালনা করছেন তাদেরকে যত্ন নেওয়া ও বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

৭.১১ উৎসর্গীকৃত জীবন (Consecrated Life)

উৎসর্গীকৃত জীবন মানবসেবার জন্যে ঈশ্বরের এক বিশেষ দান। এই দানের মধ্য দিয়ে তারা চিন্তাচেতনায়, ধ্যানে-জ্ঞানে ও কর্মসাধনে চেষ্টা করে অন্যের মঙ্গল ও কল্যাণ সাধন করতে।

যীশু মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য পিতার দ্বারা প্রেরিত হয়ে এ পৃথিবীতে এসেছেন। তিনি মানবজাতির জন্য পিতার ভালোবাসার চূড়ান্ত প্রমাণ দিয়েছেন। যে পরিত্রাণকর্ম তিনি সাধন করেছেন, খ্রিস্টমণ্ডলী পরিত্রাণের বাণীপ্রচার আর সেবাকাজ এক করে দেখে। কারণ মানুষের

কাছে কথার চেয়ে কাজের গুরুত্ব বেশি। তাই খ্রিস্টমণ্ডলী যা প্রচার করেন তা কাজের মাধ্যমে দেখিয়ে থাকে। তাই খ্রিস্টমণ্ডলীর কাজগুলো যীশুখ্রিস্টের মনোভাবেরই প্রতিফলন।[৩৫]

আমরা সেবাকাজকে যতটা সহজ মনে করি, আসলে তেমন সহজ নয়। সেবাকাজে গুরু নিজেই নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়েছেন।[৩৬] সেবাকাজের জন্য প্রেরণ করার আগে যীশু তাঁর শিষ্যদের বলেন, "তোমরা আমাকে মনোনীত করোনি,আমিই তোমাদের মনোনীত ও নিযুক্ত করেছি। আমি চেয়েছি তোমরা কাজে এগিয়ে যাও, তোমরা সফল হও, স্থায়ী হোক তোমাদের কাজের ফল, তাহলে পিতার কাছে আমার নামে তোমরা যা-কিছু চাইবে, তিনি তাই তোমাদের দিবেন। তোমাদের আমি এই আদেশ দিচ্ছি: তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে" (যোহন ১৫: ১৬-১৭)।

খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রধান প্রধান সেবাকাজগুলো হলো: শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কারিগরি ক্ষমতায়ন, দারিদ্র বিমোচন, পরিবার কল্যাণ, শিশু মঙ্গল, যুব গঠন।[৩৭]

বর্তমানে মিশনারীরা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে সেবাকাজ করে যাচ্ছেন। কথা ও কাজের মধ্যে সঙ্গতি রক্ষা করে তারা পৃথিবীর মানুষের কাছে খ্রিস্টের সাক্ষী হয়ে উঠছেন। মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তার মানুষ হয়ে তারা তাদের চিন্তাচেতনাকে আরো প্রসারিত করে তুলছেন।

৭.১২ নিবেদিতপ্রাণ

সুলতানী আমল থেকে শুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত বহু সন্ন্যাস-সংঘ ও ধর্মপ্রদেশীয় কাথলিক মিশনারীগণ দেশের জন্য নিরলস, কঠোর ও সফলভাবে, নিঃস্বার্থভাবে দেশের সেবা করে যাচ্ছেন।

মিনশনারীগণ খ্রিস্টের নামে নিজের জীবন উৎসর্গ করে জাগতিক মায়া, মোহ, ভোগবিলাসিতা ত্যাগ করে নিঃস্বার্থভাবে মানবসেবায় নিজেদেরকে বিলিয়ে দেন।

দরিদ্রতা,বাধ্যতা ও কৌমার্যের ব্রত নিয়ে তারা ঈশ্বরের বাণীকে নিজের জীবনে গ্রহণ করেন, তা জনগণের মধ্যে প্রচার করেন এবং সেবাকাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তারা খ্রিস্টপ্রভুর জীবনাদর্শ ও শিক্ষার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং পবিত্র আত্মার মাধ্যমে মণ্ডলীর নিকট পিতা পরমেশ্বরের এক প্রীতি-উপহার। পবিত্র আত্মার দেওয়া আধ্যাত্মিক ও প্রৈরিতিক জীবনের ঐশ্বরিক দানে সমৃদ্ধ হয়ে মণ্ডলীর রহস্যাবৃত সত্য ও তাদের মিশনারী কর্মদায়িত্বকে উজ্জ্বলতা দান করতে সহায়তা করেছেন, সমাজের নবায়নে অবদান রেখেছেন এবং প্রতিনিয়তই অবদান রাখছেন। মিশনারীগণ তাদের উদারতা, সেবাকাজ, শিক্ষাদান, ও ভালোবাসা দ্বারা ভক্তজনগণকে আপন করে নেন। তাঁরা সাধারণ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও ভালোবাসা ও সেবা কাজের মধ্য দিয়ে হয়ে ওঠেন পবিত্র ও সকলের আপনজন।

৭.১৩ ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের সেবাকাজ

বর্তমানে বাংলাদেশে ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের সংখ্যা সন্ন্যাসব্রতী যাজকদের চেয়ে অনেক বেশি। তাদের রয়েছে ‘বাংলাদেশ ধর্মপ্রদেশীয় যাজকসংঘ’ (BDPE), যার মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের জীবন ও কাজের দিকদর্শন লাভ করেন: বার্ষিক নির্জন-ধ্যান, বার্ষিক সেমিনার, বিভিন্ন কোর্স, মিটিং ও অন্যান্য পর্যায়ে তারা লাভবান হন। তাঁরা কাজ করছেন ধর্মপল্লীতে, ধর্মপ্রদেশীয় কুরিয়াতে, গঠনগৃহ ও সেমিনারিতে, বিভিন্ন কমিশনে, মফঃস্বলে, নেতৃত্বদান ও নির্মাণে, পরিবারে, পারিবারিক সমস্যা সমাধানে, আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃমাণ্ডলিক সম্পর্ক উন্নয়ন, বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষাদান ইত্যাদিতে। তাদের কাজের পরিধি বিস্তৃত ও চ্যালেঞ্জিং। ত্যাগ ও নিঃস্বার্থ পালকীয় সেবাকাজে তারা বিশ্বস্ত। কাজের বোঝা কারও কারও বেশি হওয়াতে সব সেবাকাজ যথাযথভাবে কারো কারো জন্য সম্ভব হয়ে উঠেনা। জনগণের প্রত্যাশা ও চাহিদা বৈচিত্র্যময়। ঐতিহ্যগতভাবে পরিচালিত সেবাকাজের পরিবর্তন অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে মানুষ বাহ্যিক উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে প্রত্যাশী, যা কোন কোন যাজক দিতে পারেন না। একজন যাজক চান জনগণের অন্তরের

নবায়ন,পরিবর্তন, নৈতিক-আধ্যাত্মিক মূল্যবোধে গঠন, মণ্ডলীর নতুন ধারার সাথে জনগণের সচেতনতা ও সম্পৃক্ততা। তিনি তার শিক্ষা ও গঠনের সাথে কোথাও কোথাও বাস্তবতার সংঘর্ষ অভিজ্ঞতা করেন। তবে একজন ধর্মপ্রদেশীয় যাজক হলেন :

সমাজে একতা নির্মাতা।

মঙ্গলবাণীর ঘোষক।

আধ্যাত্মিক নেতা।

পূজার্চনাশীল সমাজের উদ্দীপক।

মানব-সমাজ নির্মাণকারী।

শান্তি ও পুনর্মিলনের উদ্যোক্তা।

প্রবক্তা ও মেষপালক।

আধ্যাত্মিক কর্মী।

খ্রিস্টমণ্ডলীতে ধর্মসংঘগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঐশরাজ্য বিস্তারে ও জগতের প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গ করার জন্য।[৩৮] যুগে যুগে বহু ধর্মসংঘের প্রতিষ্ঠা হয়েছে নিজ নিজ দর্শন ও পালকীয় ধরন নিয়ে খ্রিস্টকে লাভ ও প্রচার করার জন্য।[৩৯] বাংলাদেশেও খ্রিস্টের বাণী নিয়ে আসেন বিভিন্ন ধর্মসংঘের সদস্যগণ। বর্তমানে তারা আধ্যাত্মিক সাধনা ও পালকীয় সেবা দিয়ে মণ্ডলীর পরিচর্যা করে যাচ্ছেন।

৭.১৪ বর্তমানে দেশ ও জাতির সেবায় বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলী

বাংলাদেশে চারশত বছরেরও আগে খ্রিস্টমণ্ডলী স্থাপিত হয়েছে।[৪০] এর মধ্যে মণ্ডলী নানাবিধ সেবাকাজে জড়িত রয়েছে। আজ অবধি তাঁরা নিঃস্বার্থ, নিরলস ভাবে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। তাদের সেবা কাজগুলোর কিছু কিছু নিচে তুলে ধরা হলো:

১) দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : **১৯৭১** খ্রিঃ মুক্তিযুদ্ধে অনেক মিশনারী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন।[৪১]তিন জন পুরোহিতসহ অনেকে শহীদ হয়েছেন। অনেক সাধারণ মানুষ প্রাণও দিয়েছেন। বাংলাদেশের বিশপগণ পুরোহিতদের নির্দেশনা দিয়েছিলেন যেন তারা যুদ্ধে আশ্রয়হীনদের আশ্রয়দান করেন। তাঁরা অনেক ধর্মপল্লীতে লোকদের আশ্রয় দিয়ে দেশের স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তা করেছেন। অনেক আহত মুক্তিযোদ্ধাকে তাঁরা সেবা-শুশ্রূষা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

২)শিক্ষাক্ষেত্রে : বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলী শিক্ষার দিকে জোর দিয়েছেন। কারণ মণ্ডলী উপলব্ধি করেছে যে, একটা জাতিকে উন্নত করতে হলে শিক্ষার আলো ছড়াতে হবে।[৪২] তাই তারা দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শহরে, তেমনি হয়েছে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। বর্তমানে সারা দেশে মণ্ডলী পরিচালিত প্রাইমারী স্কুল ৫১৩টি, জুনিয়র হাইস্কুল ১০টি, হাইস্কুল ৪৮টি, কলেজ ৫টি, কারিগরী বিদ্যালয় ১৩টি, হোস্টেল ১২৫টি, বিশ্ববিদ্যালয় ১টি। খ্রিস্টমণ্ডলী বাংলাদেশে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ করে যাচ্ছে। খ্রিস্টমণ্ডলী কর্তৃক পরিচালিত এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সব ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীরাই শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মানযথেষ্ট উন্নত। নিম্নলিখিত কারণে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা যথেষ্ট উচ্চমানের :

১) প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুন যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়।

২) শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রতি নজর দেওয়া হয়। নিজেদের কোন লাভের দিকে নয়।

৩) সব বিষয় ভালো করে পড়ানো হয়।

৪) সুন্দর জীবন গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ শিক্ষা দেওয়া হয়।

৫) পরিচালকমণ্ডলী এসব কাজে জীবন উৎসর্গ করেন। শিক্ষার্থীদের সেবা করে যে তাঁরা ঈশ্বরকেই সেবা করছেন, এই মনোভাব নিয়ে তাঁর তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন।

৬) নিঃস্বার্থ ও নিবেদিতপ্রাণ পরিচালকদের পরিচালনা।

এসব কারণে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর মান ভালো হয়।

৩)স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রে : স্বাস্থ্যের উপর ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় উন্নতির অনেক কিছু নির্ভর করে। স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে শিক্ষায় যেমন মন বসেনা তেমনি অন্য কোন কিছুই ভালো লাগে না। তাই খ্রিস্টমণ্ডলী চিকিৎসাকেন্দ্রের উপর অনেক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সেই কারণে মণ্ডলীর উদ্যোগে সারা দেশে অনেক চিকিৎসাকেন্দ্র নির্মিত হয়েছে।[৪৩]

ক) হাসপাতাল সমূহ :

দিনাজপুর	- সেন্ট ভিনসেন্ট হাসপাতাল
খুলনা	- (মংলা) সেন্ট পৌল হাসপাতাল
যশোর	- ফাতেমা হাসপাতাল
রাজশাহী	- খ্রিস্টান হাসপাতাল
নাটোর	- হরিশপুর হাসপাতালমিশন হাসপাতাল
কক্সবাজার	- মালুমঘাট খ্রিস্টান হাসপাতাল
চন্দ্রঘোনা	-খ্রিস্টান হাসপাতাল
পার্বতীপুর	- ল্যাম হাসপাতাল
টাঙ্গাইল (মধুপুর)	- জলছত্র হাসপাতাল ও জলছত্র কুষ্ঠাশ্রম

দিনাজপুর - ধানজুরি কুষ্ঠ হাসপাতাল

ফরিদপুর - ব্যাপিষ্ট চার্চ পরিচালিত কুষ্ঠাশ্রম

নটর ডেম নেভিন ক্লিনিক

ঢাকা খ্রিস্টান হাসপাতল

সেন্ট মেরীস কাথলিক মা ও শিশু সেবাকেন্দ্র।

এসব হাসপাতালে খ্রিস্টান, অ-খ্রিস্টান, ধনী-গরীব সব মানুষের জন্য মিশনারীগণ চিকিৎসা দিয়ে যাচ্ছেন। ঢাকার হলি ফ্যামিলি হাসপাতালও খ্রিস্টান মিশনারীদের দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু পরে তা রেড ক্রিসেন্টের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

খ) ডিসপেনসারী : সারা বাংলাদেশে মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত ৬৫টিরও বেশি ডিসপেনসারী রয়েছে। এগুলোর মধ্যে প্রতিদিন অগণিত রোগীদের বিনামূল্যে ও কোন কোন ক্ষেত্রে নামমাত্র মূল্যে ঔষধসহ চিকিৎসা দেওয়া হয়। এদের বেশিরভাগগুলোতেই স্বাস্থ্য সচেতনতা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়।[৪৪]

গ) ডাক্তার ও নার্স: ২০১২ খ্রিঃ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে, সারা দেশে ১২০ জনের অধিক খ্রিস্টান ডাক্তার ও পাঁচ হাজারের বেশি খ্রিস্টান নার্স বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিকে চিকিৎসা ও সেবা দিয়ে যাচ্ছেন।

৪)আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে :বাংলাদেশে খ্রিস্টমণ্ডলী মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য অবিরাম ও নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কারিতাস, সিসিডিবি, কৈননিয়া, খ্রিস্টান ক্রেডিট ইউনিয়ন, কাল্ব, খ্রিস্টান হাউজিং সোসাইটি, সালভেশন আর্মি, ওয়ার্ল্ড ভিশন এবং এধরনের আরও অনেক উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষাক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য নিরবে কাজ করে যাচ্ছে।[৪৫]

৫)যুব-উন্নয়ন ক্ষেত্রে :যুব সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারলে দেশ ও জাতির উন্নতি হবে। আর দেশও তখন সঠিক পথে চলবে বলে ধরে নিতে পারি। এ কারণে যুব সমাজকে সুগঠন দেওয়ার জন্য আমাদের দেশের সাতটি ধর্মপ্রদেশে সাতটি যুব কমিশন ও একটি জাতীয় যুব কমিশন রয়েছে। এর দ্বারা যুবকযুবতীদেরকে বিভিন্ন রকম প্রশিক্ষণ ও কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করানো হয়।[৪৬]

৬)পরিবার উন্নয়ন :মানুষ সামজিক জীব। পরিবারের মধ্যেই মানুষের জন্ম। পরিবার হলো শিক্ষার মূল কেন্দ্রবিন্দু। পরিবার থেকে মানুষ ভালোবাসা, ন্যায্যতা, শান্তি, সহানুভূতি, উদারতা ইত্যাদি মূল্যবোধ শিখতে পারে। তাই সাতটি ধর্মপ্রদেশ ও জাতীয় পর্যায়ে পরিবার উন্নয়নের জন্য প্রতি বছর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।[৪৭]

পারিবারিক কাউন্সেলিং দ্বারাও অনেক সমস্যাগ্রস্ত পরিবারকে সৎপথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা অব্যাহত রাখা হচ্ছে।

৭)মানবাধিকার, ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় :মানুষের মধ্যে ন্যায় ও শান্তির প্রয়োজনীয়তা থাকলেও মানুষের মনেই অন্যায় ও অশান্তি বারে বারে এসে দানা বাঁধতে থাকে। তাই ন্যায় ও শান্তি কমিশন সারা দেশে ঘনঘন প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন সেমিনার পরিচালনা করে মানুষকে মানবাধিকার, ন্যায় ও শান্তি সম্পর্কে সচেতনতা দিয়ে থাকে।[৪৮]

৮)মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন :বর্তমান যুগের বড় সমস্যা হলো মাদকাসক্তি। এখন শুধু শহরের মধ্যেই এই সমস্যা সীমাবদ্ধ নয়, গ্রাম-গ্রামান্তরেও এই সমস্যা ছড়িয়ে পড়েছে। এই সমস্যা নিরসনের জন্য বাংলাদেশ মণ্ডলী বেশ কয়েকবছর যাবৎ ২টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র পরিচালনা করে আসছে। কেন্দ্র দুটি হলো 'আপন' ও 'বারাকা'।[৪৯]

উপরোক্ত সেবাকাজগুলো ছাড়াও ব্যক্তিগত উদ্যোগে আরও অনেক ধরনের সেবাকাজ এখানে ওখানে হচ্ছে। মোট কথা, বাংলাদেশে খ্রিস্টমণ্ডলী দেশ ও জাতি গঠনে নিরলস শ্রম দিয়ে যাচ্ছে। মণ্ডলীর লক্ষ্য একটাই : মানবসেবার মাধ্যমে ঈশ্বরের সেবা করা।[৫০]

৭.১৫ বাংলাদেশে হলিক্রস : অতীত ও বর্তমান

পবিত্র ক্রুশ সংঘ বঙ্গে পদচিহ্ন এঁকেছিল ১৬১ বছর আগে। অজানা অচেনা দুর্গম পথ বেয়ে বিশ্বাসের প্রদীপ জ্বালাতে এসেছিলেন অভিযাত্রী ও দুঃসাহসিক প্রেরণকর্মীরা। নিজ জীবন বিপন্ন করে হলেও তারা একটি স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে চেয়েছিলেন। সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ফাদার বাসিল আন্তনী মেরী মরো নবপ্রতিষ্ঠিত সংঘের সমস্ত সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিয়ে এক প্রত্যাশাপূর্ণ ঝুঁকি নিয়েছিলেন। সে সময়কার সবচেয়ে কঠিন প্রেরণকর্মক্ষেত্র 'বঙ্গে' পাঠিয়েছিলেন তার সদস্য-সদস্যাদের।

বিগত ২০০৩ খ্রিস্টবর্ষে হলিক্রস সংঘ বাংলাদেশে আগমনের 'দেড়শত' বর্ষপূর্তি উৎসব উদ্‌যাপন করেছে। এ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত বিশেষ স্মরণিকায় বিশপ থিওটনিয়াস গমেজ, সিএসসি তাঁর বাণীতে লিখেছেন, "বাংলার বুকে পবিত্র ক্রুশ সংঘের আগমনের জন্য পৃথিবীর সকল প্রান্তে প্রেরিত হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে, এখানে সংঘের দেড় শ' বছরের ইতিহাস সংঘের বিশ্বস্ততার ও ধৈর্য্যের সামর্থ প্রকাশ করে। সর্বোপরি এ দেড় শ' বছরের যাত্রা অন্তরের অগ্রযাত্রার কথা বলে।"

আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সুদীর্ঘ গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হওয়া সত্ত্বেও দেশটি এখনও নানা সমস্যায় জর্জরিত। বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় এ দেশটি এখনও অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে অনেক অনগ্রসর। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তাই ক্ষমতাসীন সরকারের কর্মসূচির ঘোষণায় দারিদ্রবিমোচন অগ্রাধিকার

পেয়েছে। হলিক্রস সন্ন্যাস- সংঘের সদস্যগণ যখন বঙ্গদেশে (বর্তমান বাংলাদেশ, মায়ানমারের উত্তরাঞ্চল ও আসামের কিছু অংশ) আসেন তখনও দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব, কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, ইত্যাদি ছিল প্রকট। যাতায়াত ব্যবস্থা ছিল সেকেলে ও কষ্টসাধ্য। বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে মানুষের ভোগান্তি ছিল প্রচুর। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, নানা রকম রোগব্যাধি যেমন ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত ইত্যাদির প্রকোপ ছিল ব্যাপক। তথাপি তারা এরূপ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সাহস করে এদেশে এসেছিলেন কাজ করার উদ্দেশ্যে। তাঁদের অনেকেই বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে অল্প বয়সে মারা গেছেন বা দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। তথাপি তাঁরা আশাহত হননি। এদেশের মানুষকে তাঁরা মনেপ্রাণে ভালবেসেছেন এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করে এদেশের জনগণের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করে ফাদার মরোর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে চেষ্টা করেছেন।

কর্মক্ষেত্র ও প্রৈরিতিক কাজ

প্রথম দিকে হলিক্রস মিশনারীগণ পালকীয় পরিচর্যার কাজে মনোযোগী ছিলেন। পরবর্তীতে তাঁরা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবায় মনোনিবেশ করেছেন। তাদের কর্মপরিকল্পনায় ও নীতি নির্ধারণে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র, অনগ্রসর, আদিবাসী/উপজাতি ও সুবিধাবঞ্চিতরাই অগ্রাধিকার পেয়েছে। তাঁরা প্রতিটি ধর্মপল্লী ও উপ-ধর্মপল্লীতে উপাসনালয় নির্মাণের পাশাপাশি স্কুলঘর নির্মাণ করেছেন। অকৃত্রিম ভালবাসা নিয়েই তাঁরা জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছেন। শিক্ষক ও প্রচারকদের গঠন-প্রশিক্ষণ তাদের কর্মপরিকল্পনায় বিশেষ অগ্রাধিকার পেয়েছে। “বিশ্বাসের শিক্ষক” হিসেবে পবিত্র ক্রুশ পরিবারের সদস্যবৃন্দ আজো বিশ্বাসের মশাল হাতে নিয়ে তাঁদের দায়িত্ব পালন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

আধ্যাত্মিক ও মানবিক পরিচর্যা

প্রাতিষ্ঠানিক প্রৈরিতিক কাজ ছাড়াও হলিক্রুস পরিবারের সদস্যগণ বিভিন্ন ধরনের আধ্যাত্মিক ও মানবিক সেবাকাজ ও পরিচর্যায় আত্মনিয়োগ করছেন। বিগত বছরগুলোতে তাঁরা নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করে মণ্ডলীকে সমৃদ্ধ করেছেন। এখানে তাদের বিশেষ কয়েকটির কথা উল্লেখ করছি: মৌলিক খ্রিস্টীয় সমাজ গঠন, মানবাধিকার, ন্যায্যতা ও শান্তি, মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র, জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, অনাথাশ্রম, পুস্তক-পুস্তিকা (ধর্মীয় সাহিত্য) রচনা, অনুবাদ ও প্রকাশনা, বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা ও আধ্যাত্মিক পরিচর্যা, ক্যারিজম্যাটিক আন্দোলন, ম্যারেজ এনকাউন্টার এণ্ড ফ্যামিলি কাউন্সেলিং, দিয়াং মিরিয়াম আশ্রম, পালকীয় সেবাকেন্দ্র ও ধ্যানাশ্রম (সাগরদী, বরিশাল), খ্রিস্টীয় গঠন-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ভাদুন) ইত্যাদি।

এছাড়াও তারা স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা কেন্দ্র, হোস্টেল পরিচালনা, নারী শিক্ষা ও নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য সমাজ সচেতনামূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছেন ও করছেন।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান

বাংলাদেশে সমবায় ঋণদান সমিতি গঠন ও আন্দোলনের উদ্যোক্তা ও জন্মদাতা ফাদার চার্লস ইয়াং, সিএসসির নাম অত্যন্ত সুপরিচিত। তাঁরই নিরলস প্রচেষ্টায় বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে দেশের প্রায় প্রতিটি ধর্মপল্লীতে গড়ে উঠেছে সমবায় ঋণদান সমিতি। এর মাধ্যমে খ্রিস্টান সমাজ অর্থনৈতিক মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছে। প্রাকৃতিক পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্পের সাথেও ফাদার ইয়াং ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। ঋণদান সমিতির পাশাপাশি খ্রিস্টান হাউজিং সোসাইটিও গড়ে উঠেছে যার ফলে স্বল্প আয়ের মানুষের আবাসনের ব্যবস্থা হয়েছে। ১৯৭০ খ্রিস্টবর্ষের নভেম্বর মাসে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পরে বিশপ যোয়াকিম রোজারিও, ব্রাদার লরেন্স ডায়াস, ফাদার বেঞ্জামিন লাব্বের প্রচেষ্টায় "খ্রিস্টান ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংস্থা" (CORR) গড়ে ওঠে, যা পরবর্তীতে

"মণ্ডলীর সামাজিক অঙ্গসংগঠন" বলে পরিচিত কারিতাস বাংলাদেশে রূপান্তরিত হয়। এগুলোর সফল পরিচালনায় হলিক্রস পরিবারের অনেকেই জড়িত ছিলেন ও আছেন।

বিভিন্ন গঠনগৃহে (সেমিনারীতে) পরিচালনা ও শিক্ষাদান

হলিক্রস পরিবারের সদস্যগণ তাঁদের নিজস্ব প্রশিক্ষণ ও গঠনগৃহ ছাড়াও ডায়োসিয়ান সেমিনারীতে পরিচালনা ও শিক্ষাদান করেছেন। তারা ১৯১৭ খ্রিঃ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত, সুদীর্ঘ বছর ধরে বিভিন্ন স্থানে গঠন-প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান

হলিক্রস পরিবারের সদস্যগণ শুরু থেকেই শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়ে আসছিলেন। এ কারণে এমনকি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছোটখাটো গির্জাঘর নির্মাণের পাশাপাশি তাঁরা স্কুলঘর নির্মাণ করেছেন। সেখানে প্রাথমিক শিক্ষার উপরই জোর দেওয়া হতো বেশি। যার ফলে বর্তমানে দেশের সার্বিক সাক্ষরতার তুলনায় কাথলিক খ্রিস্টানদের মধ্যে সাক্ষরতার হার অনেক বেশি। অনেক সময় একই ঘর রবিবারের উপাসনা এবং সাপ্তাহিক দিনে স্কুল হিসেবে ব্যবহৃত হতো। কেননা ধর্মীয় বিশ্বাসকে আত্মস্থ ও গভীরতর করে তোলার জন্য শিক্ষার মাধ্যমে মন, মনন, মেধা, চিন্তা-চেতনা ও হৃদয়মনের বিকাশ সাধন অপরিহার্য।

বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তারের গুরুত্ব অনুধাবন করে ১৮৯৪ খ্রিঃ ঢাকার নবনিযুক্ত বিশপ পিটার হার্থ পুরনো ঢাকার লক্ষ্মীবাজারে সেন্ট গ্রেগরী স্কুল নির্মাণের কাজ শুরু করেন। ১৯১২ খ্রিঃ নির্মিত হয় বান্ধুরা হলিক্রস হাইস্কুল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশাসনিক কাজ ও শিক্ষকতায় অনেক হলিক্রস সদস্য নিয়োজিত ছিলেন ও আছেন। বর্তমানে দেশে কাথলিক চার্চের ৭টি ইন্টারমিডিয়েট কলেজের মধ্যে ৫টি হলিক্রস পরিবারের সদস্যগণ পরিচালনা করেন: (১) ফাদারদের পরিচালিত নটরডেম কলেজ ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ), (২) সিস্টারদের পরিচালিত হলিক্রস কলেজ (তেজগাঁও, ঢাকা), (৩) ব্রাদারদের পরিচালিত সেন্ট যোসেফ

স্কুল ও কলেজ (মোহাম্মদপুর, ঢাকা), (৪) ব্রাদারদের পরিচালিত হলিক্রস স্কুল ও কলেজ (বান্দুরা, ঢাকা) (৫) ব্রাদারদের পরিচালিত সেন্ট ফিলিপস্ স্কুল ও কলেজ (দিনাজপুর)। এ ছাড়া ১টি ডিগ্রী কলেজ (নটর ডেম কলেজ, ঢাকা) এবং ১টি বিশ্ববিদ্যালয়, নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ (মতিঝিল, ঢাকা) হলিক্রস পরিবারের সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত। তাছাড়াও রয়েছে সিষ্টারদের দ্বারা পরিচালিত হলিক্রস হাইস্কুল (তেজগাঁও, ঢাকা), কর্পূস খ্রিস্টী হাইস্কুল (জলছত্র, টাঙ্গাইল), ব্রাদার আন্দ্রে হাইস্কুল (নোয়াখালী), ব্রাদারদের দ্বারা পরিচালিত সেন্ট গ্রেগরী হাইস্কুল (লক্ষীবাজার, ঢাকা), তুমিলিয়া বয়েজ হাইস্কুল (গাজীপুর), সেন্ট নিকোলাস হাইস্কুল (নাগরী), সেন্ট প্লাসিড হাইস্কুল (চট্টগ্রাম), মিরিয়াম আশ্রম হাইস্কুল (দিয়াং), বিড়ইডাকুনি হাইস্কুল (ময়মনসিংহ), উদয়ন হাইস্কুল (বরিশাল), বান্দরবান ডন বস্কো হাইস্কুল (বান্দরবান) সেন্ট যোসেফ কারিগরী বিদ্যালয় (নারিন্দা), বটমলী হোম কারিগরী বিদ্যালয় (তেজগাঁও)।

এছাড়াও ব্রাদার এবং সিস্টারগণ অন্য কয়েকটি স্কুলে শিক্ষকতা করছেন। যেমন, কুলাউড়া জুনিয়র হাইস্কুল।

বর্তমানে হলিক্রস পরিবারের সদস্যদের সাথে সহকর্মী হিসাবে নিবেদিতপ্রাণ বেশকিছু সংখ্যক খ্রিস্টভক্ত ও অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মরত আছেন।

নিম্নে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবদান সম্পর্কে তুলে ধরা হলোঃ

নটর ডেম কলেজ : বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নটর ডেম কলেজের অবদান ও ভূমিকা অত্যন্ত গৌরবদীপ্ত ও তাৎপর্যপূর্ণ যা হিরণ্ময় দ্যুতিতে সমগ্র দেশে দীপ্যমান। রোমান কাথলিকদের দ্বারা পরিচালিত ঐতিহ্যবাহী এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি জন্মলগ্ন থেকে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য ও প্রত্যয়দীপ্ত দর্শনের আলোকে যুগপৎভাবে পবিত্র অধ্যাত্মরসে সঞ্জীবিত ধারায় উদ্ভাসিত হয়ে মানবতার

সেবায় নিবেদিত রয়েছে এবং মূল্যবোধে গঠন, শিক্ষা, ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি রাজধানীতে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও সারা দেশের ছাত্ররা এখানে অধ্যয়নের সুযোগ পায়। এ থেকে বলা যায় যে, নটর ডেম কলেজ সমগ্র বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তারের একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান।

কলেজ পরিচিতি

রাজধানী ঢাকা শহরের মতিঝিল এলাকায় স্থাপিত নটর ডেম কলেজ **১৯৪৯** খ্রিঃ পুরান ঢাকার লক্ষ্মীবাজার এলাকায় 'সেন্ট গ্রেগরী কলেজ' নামে স্থাপিত হয়েছিল। **১৯৫৪-৫৫** শিক্ষাবর্ষে কলেজের নাম পরিবর্তন করে নটর ডেম কলেজ রাখা হয় এবং বর্তমান লোকালয়ে তার নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত করা হয়। নটর ডেম কলেজ সুদীর্ঘকাল ধরে সারা দেশে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে। বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই কলেজ প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে। আধুনিক পদ্ধতিতে এখানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দান করা হয়। পবিত্র ক্রুশ সংঘের সদস্যগণ এই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

নামকরণঃ নটর ডেম কলেজের নামকরণের একটি অন্তর্নিহিত তাৎপর্য রয়েছে। নটর ডেম (Notre Dame) শব্দ দুটি ফরাসী ভাষার শব্দ। ইংরেজিতে এর অনুবাদ হয় Our Lady. সাদর সম্বোধন বা সম্ভাষণ হিসেবে রোমান কাথলিকগণ "আওয়ার লেডী" বলতে মারীয়া বা মেরীকে বুঝিয়ে থাকেন। শিক্ষাক্ষেত্রে যীশুর মা মারীয়া অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। এ জন্য নটর ডেম কলেজ মারীয়ার নামে উৎসর্গীকৃত। যীশু খ্রিস্টের "জ্ঞানে ও বয়সে, ঈশ্বর ও মানুষের ভালবাসায় বৃদ্ধি বা বিকাশ লাভে" মারীয়ার ভূমিকা ছিল অনন্য। তাই তাঁর সেই মাতৃসুলভ ভালবাসা দিয়ে ছাত্রদের প্রকৃত মানুষ রূপে গড়ে উঠতে সহায়তা করার লক্ষ্যেই এই নামকরণ।

মূলনীতি : নটর ডেম কলেজের মূলনীতিকে যে কথার দ্বারা প্রকাশ করা হয় তা হলো Diligite Lumen Sapientiae. এটি ল্যাটিন ভাষা। ইংরেজিতে এর অনুবাদ হলো - Love the Light of Knowledge বা Wisdom. অর্থাৎ জ্ঞানের আলো-কে ভালোবাস। ঈশ্বর হলেন জ্ঞানের উৎস। মারীয়া হলেন জ্ঞানের প্রতীক।

শিক্ষাদান পদ্ধতি : নটর ডেম কলেজ তার শিক্ষার্থীদের শুধু পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক শিক্ষা দেয় না। সাথে সাথে ছাত্রদের মূল্যবোধে গঠনদান ছাড়াও ব্যবহারিক জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য এখানে বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যক্রমের ব্যবস্থা রয়েছে : ডিবেটিং ক্লাব, বিজ্ঞান ক্লাব, অ্যাডভেঞ্চার ক্লাব, কম্পিউটার ক্লাব ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। তাই বলা যায়, বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তারে কলেজটি একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তারে নটর ডেম কলেজের ভূমিকা

দেশের সার্বিক উন্নতি ও বিশ্বদরবারে সমৃদ্ধ দেশ হিসাবে পরিচিতি লাভের জন্য শিক্ষার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। শিক্ষাবিস্তারের দ্বারাই বিশ্ব আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে। বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার যেটুকু উন্নতি সাধিত হয়েছে, সমাজের বিশিষ্টজনদের মতে তার পেছনে নটর ডেম কলেজের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। কলেজ প্রতিষ্ঠার মূলে রয়েছে কতকগুলো ব্রত। এসব ব্রত পালন ও অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের চলার পথ সুগম করতে পারে। বাংলাদেশের খুব কম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এরূপ আধুনিকতা ও সময়ের সদ্ব্যবহার খুঁজে পাওয়া যায়। মুখস্ত বিদ্যার চাইতে মুক্ত চিন্তার অভ্যাস শতগুণে শ্রেয়। এরূপ বিদ্যা অর্জন করতে হলে যুক্তিবুদ্ধি প্রয়োগ করে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করতে ও তার গভীরে যেতে চেষ্টা করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষক চেষ্টা করেন ছাত্রদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা ও নতুন নতুন দিগন্ত আবিষ্কার করার স্পৃহা জাগাতে। নটর ডেম চায় ছাত্রদেরকে জীবনের জন্য প্রস্তুত করতে। অন্য সব প্রতিষ্ঠানের ন্যায় নটর ডেমও চায় যেন ছাত্ররা পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করে। কিন্তু ভাল রেজাল্ট বলতে নটর ডেম বোঝে জীবনে

প্রকৃত সফলতা অর্জন করা। আর প্রকৃত সফলতা হলো সত্য ও সুন্দরের উপর প্রতিষ্ঠিত এমন জীবন যেখানে অকৃত্রিম শান্তি ও সুখ বিরাজ করে। নটর ডেম কলেজ সার্বজনীন মূল্যবোধের উপর গুরুত্ব দেয় এবং যেকোন ধরনের সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামিকে প্রত্যাখান করে।

তাই বলা যায় যে, কলেজটি সত্যিকার অর্থেই বাংলাদেশের একটি আদর্শ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই কলেজ শিক্ষাদানের পাশাপাশি ছাত্রদের জীবনের জন্য প্রস্তুত করে তোলে। ফলে তারা সামাজিক ও জাতীয় জীবনে দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। সুতরাং বলা যায় যে, বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তারে নটর ডেম কলেজের ভূমিকা অনন্য ও অসাধারণ।

সেন্ট যোসেফ হাই স্কুল এবং কলেজ

"Advancing in Wisdom and Virtue"- এই স্লোগান, আদর্শ, লক্ষ্য ও মূলমন্ত্র নিয়ে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির একদিন যাত্রা শুরু হয়েছিল, তার নাম হলো সেন্ট যোসেফ স্কুল। বর্তমানে এটি দেশের একটি অত্যন্ত উন্নত মানের শিক্ষা নিকেতন। পুরনো ঢাকার নারিন্দায় ১৯৫৪ সালে যার জন্ম, নতুন ঢাকার আসাদ এ্যাভিনিউতে তার সগৌরব অধিষ্ঠান। এটি বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটির নানা দিক থেকেই রয়েছে কিছু স্বাতন্ত্র্য। এখানে নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা ও চর্চা করা হয় অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। এখানে শিক্ষার্থীদের গঠনমূলক কাজে ব্যস্ত রাখার জন্য বহুবিধ সহশিক্ষা কার্যক্রমের ব্যবস্থা আছে।

সেন্ট যোসেফের উৎকর্ষ

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ্বে হলিক্রস মিশনারীগণ অধ্যাত্ম জীবনসাধনায় ব্যাপৃত থাকার পাশাপাশি তাদের জীবন উৎসর্গ করেন শিক্ষা বিস্তারে ও জনসেবায়। শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে মিশনারীগণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার দিকে বিশেষ মনোনিবেশ করেন। যার

ফলশ্রুতিতে এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিটি গির্জাকে কেন্দ্র করেই অতি উন্নতমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং প্রায় প্রত্যেক যাজকই এক একজন উন্নত মানের শিক্ষকে পরিণত হয়ে উঠেছেন।

শিক্ষাব্রতে নিবেদিত হলিক্রস পরিবারের সদস্যদের পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য হলো প্রতিটি শিক্ষার্থীকে একজন পরিপূর্ণ মানুষরূপে গড়ে তোলা। একজন শিক্ষার্থীকে সম্যকরূপে গড়ে তোলার অর্থ হচ্ছে তাকে মননশীল ও নিবেদিতপ্রাণ করা, অর্থাৎ শিক্ষার্থীর মন, হৃদয় ও মস্তিষ্কের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা, তাকে আচার-আচরণে ভদ্র ও বিনয়ী করে তোলা এবং কর্তব্যপালনে ও নেতৃত্বদানে দক্ষ করে তোলা।

সেন্ট যোসেফ হাইস্কুলে সাংবৎসরিক কর্মকাণ্ডে অর্থাৎ শ্রেণীকক্ষে পাঠদান ও নিয়ম-শৃঙ্খলা পালনে নিষ্ঠাবান হওয়ার সুব্যবস্থাপনা এবং বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে উপযুক্ত গুণাবলী অর্জনে শিক্ষার্থীকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে থাকে। শিক্ষার্থীর দেহ ও মন – উভয়ই যাতে পরিপুষ্টি লাভ করে সেদিকে সেন্ট যোসেফ সর্বদা যত্নশীল। সেন্ট যোসেফ লক্ষ্য রাখে শিক্ষা যেন আত্মস্থ করার বিষয় হয়, শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভার সর্বাধিক বিকাশ ঘটে। সকল প্রচেষ্টা, যত্ন ও কার্যক্রমের ফলে সেন্ট যোসেফের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রদেরকে অন্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের হতে সহজেই আলাদা করে চেনা যায়। তাছাড়া মেধায়, মননে, আচরণে, মূল্যবোধে তাদের মধ্যে সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সুপরিকল্পিত প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়।

পূর্ণাঙ্গ মানুষ গঠন সেন্ট যোসেফের মূল লক্ষ্য হলেও সেন্ট যোসেফ আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশুনার উপরও বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। যার ফলে এই প্রতিষ্ঠান মেধাবী শিক্ষার্থী তৈরিতেও সারা দেশের মধ্যে ঈর্ষণীয় অবস্থানে রয়েছে।

ঢাকা বোর্ডের অধীনে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ফলাফলের তুলনায় পাসের হার বিবেচনায় প্রায় প্রতি বছরই শীর্ষস্থান দখল করে আসছে। প্রথম বিভাগ, স্টার, লেটার

ইত্যাদির সংখ্যা অনেক বেশি হলেও উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা, অনূত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ও তৃতীয় বিভাগ প্রাপ্ত ছাত্রের সংখ্যা অনেক বেশি, যার ফলে শতকরা হিসাবে ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ, ৩য় বিভাগ না পাওয়া ও ফেল করা ইত্যাদি সামগ্রিক বিচারে সেন্ট যোসেফই সর্বোৎকৃষ্ট ও শীর্ষস্থানীয়।

হলিক্রস কলেজ : শিক্ষার হার ও গুণগত মানের বিচারে বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। বিভিন্ন ভাবে এদেশের শিক্ষা বিস্তার ঘটেছে। তবে পবিত্র ক্রুশ সংঘের সিস্টারদের দ্বারা পরিচালিত হলিক্রস স্কুল ও হলিক্রস কলেজ – এই দু'টি অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। রাজধানীতে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও সারা দেশের ছাত্রীরাই এখানে অধ্যয়নের সুযোগ পায়। বাংলাদেশে বিশেষ করে নারী শিক্ষা বিস্তারে হলিক্রস স্কুল ও হলিক্রস কলেজ উল্লেখযোগ্য শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান।

হলিক্রস কলেজের পরিচিতি : এই কলেজের অবস্থান ঢাকা মহানগরীর তেজগাঁও এলাকায়। **১৯৫১** খ্রিঃ স্থাপিত হয়েছিল হলিক্রস কলেজ। এটি ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের দ্বিতীয় মহিলা কলেজ। এই কলেজটি তখন নারী শিক্ষা বিস্তার ও নেতৃত্ব গঠনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

পবিত্র ক্রুশ সংঘের সিস্টারগণ কলেজের শিক্ষা প্রদানসহ বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকেন। এ কলেজের ছাত্রীদের সৃজনশীল ও মুক্তচিন্তার অধিকারী হওয়ার জন্য পাঠ্যপুস্তকের সীমিত জ্ঞানের পাশাপাশি বহির্জগতের চিন্তাধারার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। শিক্ষার্থীরা যাতে অনুশীলন, চর্চা, অধ্যবসায় ও সাধনাবলে দেহ, মন, হৃদয় ও আত্মার বিকাশ ঘটিয়ে সুস্থ সবল দেহ, সুগভীর জ্ঞানসমৃদ্ধ উন্নত মানসিকতা ও খাঁটি মনুষ্যত্বের অধিকারী হতে এবং মানসিক গুণাবলী সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসাবে গড়ে উঠতে পারে শিক্ষকগণ তারই প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকেন।

বর্তমানে বাংলাদেশের প্রশাসন, সাংস্কৃতিক অঙ্গন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা তাদের সৃজনশীল প্রতিভা ও মননের সমন্বয় সাধনপূর্বক দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেছেন।

এই কলেজের শিক্ষাদান পদ্ধতি অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে ভিন্ন। ছাত্রীরা মনেপ্রাণে যা হতে চায় তার বাস্তবায়নের সম্ভাবনা ও শক্তি রয়েছে এখানে। তবে তার উত্তর খুঁজে পাওয়াই শিক্ষা জীবনের বিরাট সার্থকতা। এই কলেজের শিক্ষার্থীদের শুধু পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক শিক্ষাই দেয় না, বরং তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের জন্য ও ব্যবহারিক জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যক্রমের ব্যবস্থা রয়েছে।

বর্তমানে বিভিন্ন কারণে এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে ভীষণ অবনতি ঘটেছে। শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির প্রয়াস অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নেই বললেই চলে। সেই তুলনায় এই প্রতিষ্ঠানটি ছাত্রীদের পূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার ও উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য সঠিক মনোভাব ও মজবুত ভিত্তি প্রস্তুত করতে সক্ষম। এই কলেজ ছাত্রীদের সৃজনশীল হতে ও প্রকৃত জ্ঞানার্জন করতে উৎসাহিত করে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গণে হলিক্রস কলেজ একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই কলেজ তার শিক্ষার্থীদেরকে জীবনের জন্য প্রস্তুত করে। ফলে তারা ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। তাই শিক্ষা বিস্তারে হলিক্রস কলেজের ভূমিকা অপরিসীম।

সুতরাং কাথলিক মণ্ডলী পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলো অক্ষুণ্ন রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে : শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মানুষ করে গড়ে তোলা, মেধা বিকাশের পাশাপাশি মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটানো, মন ও হৃদয়কে সত্য জ্ঞানে উদ্ভাসিত করা, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সহাবস্থানে থেকে তাদের সাথে

সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করা, দীনদুঃখী মানুষের সেবায় তাদের উদ্বুদ্ধ করা ইত্যাদি। শিক্ষাক্ষেত্রে পবিত্র ক্রুশ সংঘের অবদান সবচেয়ে বেশি। পবিত্রক্রুশ পরিবার শুরু থেকেই শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে।

৭.১৬ ধর্মপ্রদেশসমূহ

ষোড়শ শতাব্দীর শুরুতে গোয়া ধর্মপ্রদেশ, কোচিন ধর্মপ্রদেশ এবং তারও পরে মাদ্রাজের মাইলাপুর ধর্মপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত থেকে ১৮০০খ্রিঃ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় অঞ্চল প্রথমে বাংলা ভিকারিয়েট অ্যাপোস্টলিক বা বাংলা বিশেষধর্মাঞ্চল, তারপর ১৮৪৫ খ্রিঃ পূর্ববাংলা ভিকারিয়েট অ্যাপোস্টলিক রূপে দীর্ঘ পথ অতিক্রম শেষে ১৮৮৬ খ্রিঃ ১লা সেপ্টেম্বর বিশ্ব মণ্ডলীর একটি ধর্মপ্রদেশরূপে যাত্রা শুরু করে। এই প্রদেশটির নাম ঢাকা ধর্মপ্রদেশ।[৫১] ১৯৫০ খ্রিঃ ঢাকা ধর্মপ্রদেশ মহাধর্মপ্রদেশে রূপান্তরিত হয়। তৎকালীন বিশপ লরেন্স লিও গ্রেনার, সিএসসি মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ পদে উন্নীত হন। ব্রিটিশের নিকট থেকে স্বাধীনতা লাভের পর আর্চবিশপ গ্রেনারই নতুন মহাধর্মপ্রদেশের কাণ্ডারী হয়ে ওঠেন। তিনি ছিলেন ঢাকার ৬ষ্ঠ বিশপ।[৫২] শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত ঢাকায় ৫জন বিশপ ও ৫জন আর্চবিশপ এসেছেন। তার সাথে ২জন সহকারী বিশপও এসেছেন। তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের রোষানলে পড়ে আর্চবিশপ গ্রেনারকে ১৯৬৫ খ্রিঃ নভেম্বর মাসে এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়। তার স্থানে উত্তরাধিকারী স্বত্বাধিকারী বিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলি, সিএসসি মহা ধর্মপ্রদেশের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।[৫৩] তিনি প্রথম বাঙ্গালী বিশপ ও আর্চবিশপ। ১৯৭৭ খ্রিঃ ২রা সেপ্টেম্বর আকস্মিকভাবে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৭৮ খ্রিঃ ৯ই এপ্রিল বিশপ মাইকেল রোজারিও ঢাকার আর্চবিশপ পদে অধিষ্ঠিত হন।[৫৪] তিনি ছিলেন ঢাকার ৩য় আর্চবিশপ। ২০০৫ খ্রিঃ ৯ই জুলাই তিনি অবসরে গেলে বিশপ পৌলিনুস কস্তা ঢাকার আর্চবিশপ পদে নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন ৪র্থ আর্চবিশপ। ২০১১ খ্রিঃ তিনি অবসরে

গেলে তার উত্তরসূরী আর্চবিশপ প্যাট্রিক ডি রোজারিও, সিএসসি ঢাকার আর্চবিশপ পদে অধিষ্ঠিত হন।[৫৫]

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ

আওতাভুক্ত জেলাসমূহ	নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, চাঁদপুর
আয়তন	২৬,৭৮৮ বর্গ কি.মি
কাথলিকদের সংখ্যা	৬৮,৪৫৫ জন
প্যারিশ (ধর্মপল্লী)	১৯ টি
প্রাইমারী স্কুল	১৯ টি
হাইস্কুল	১৮ টি
কলেজ	৫ টি
বিশ্ববিদ্যালয়	১ টি
টেকনিক্যাল/ ভোকেশনাল	৩ টি
হোস্টেল /বোর্ডিং	১৪ টি
ধর্মসংঘ	২৩ টি
স্বাস্থ্যকেন্দ্র	১০ টি
সংস্থা বা সংঘ	৪ টি
কমিটি	১৮ টি
সেমিনারি/গঠন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র / নবিশিয়েট	২৫ টি
আশ্রম	৩ টি

চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশ

আওতাভুক্ত জেলাসমূহ	চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, বরগুনা,
আয়তন	৪৪,১৬৮ বর্গ কি.মি.
কাথলিকদের সংখ্যা	৪০,৫৯৬ জন
প্যারিশ/ধর্মপল্লী	১৫ টি
প্রাইমারী স্কুল	১১ টি
হাইস্কুল	৮ টি
ধর্মসংঘ	১১ টি
স্বাস্থ্যকেন্দ্র	১৮ টি
সংস্থা বা সংঘ	৯ টি
কমিটি	৭ টি
সেমিনারি/গঠন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র / নবিশিয়েট	৪ টি
আশ্রম /হোস্টেল / বোর্ডিং	২০ টি

দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ

আওতাভুক্ত জেলাসমূহ	দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, রংপুর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, লালমনির হাট, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট
কাথলিকদের সংখ্যা	৫৪,০৮২ জন
প্যারিশ/ধর্মপল্লী	১৪ টি
সাব-সেন্টার	১২ টি
প্রাইমারী স্কুল	২৬ টি
হাইস্কুল	৩ টি
জুনিয়র হাই স্কুল	৫ টি
কলেজ	১ টি
টেকনিক্যাল / ভোকেশনাল	২ টি
ধর্মসংঘ	১৪ টি
স্বাস্থ্যকেন্দ্র / ডিসপেন্সারী	৯ টি
কমিটি / কমিশন	১৫ টি
সেমিনারি / গঠন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র / নবিশিয়েট	৪ টি + ৬ টি
আশ্রম / হোস্টেল / বোর্ডিং	২১ টি

খুলনা ধর্মপ্রদেশ

আওতাভুক্ত জেলাসমূহ	খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, যশোর, ঝিনাইদহ, নড়াইল, মাগুরা, ফরিদপুর
আয়তন	২৮,২৩৬ বর্গ কি.মি.
কাথলিকদের সংখ্যা	৩৫,১৫২ জন
প্যারিশ/ধর্মপল্লী	১১ টি
সাব-সেন্টার	৪ টি
প্রাইমারী স্কুল	১৭ টি
হাইস্কুল	৫ টি
জুনিয়র হাইস্কুল	৩ টি
টেকনিক্যাল/ভোকেশনাল	৪ টি
ধর্মসংঘ	১৩ টি
স্বাস্থ্যকেন্দ্র / ডিসপেন্সারী	৯ টি
কমিটি / কমিশন	৯ টি
সেমিনারি/গঠন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র / নবিশিয়েট	৯ টি
আশ্রম / হোস্টেল / বোর্ডিং	১৭ টি

ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ

আওতাভুক্ত জেলাসমূহ	ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, শেরপুর, জামালপুর, টাঙ্গাইল
আয়তন	১৬,৪৪৮ বর্গ কি.মি.
কাথলিকদের সংখ্যা	৭৬,০৪৭ জন
প্যারিশ/ধর্মপল্লী	১৪ টি
সাব-সেন্টার	৭ টি
হাইস্কুল	৮ টি
জুনিয়র হাইস্কুল	৪ টি
কলেজ	১টি
টেকনিক্যাল / ভোকেশনাল	৪ টি
ধর্মসংঘ	১৫ টি
স্বাস্থ্যকেন্দ্র / ডিসপেন্সারী	৯ টি
কমিটি / কমিশন	১২ টি
সেমিনারি /গঠন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র / নবিশিয়েট	৫ টি
আশ্রম /হোস্টেল / বোর্ডিং	২৬ টি

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ

আওতাভুক্ত জেলাসমূহ	রাজশাহী, নাটোর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, জয়পুরহাট
আয়তন	১৮,০৬৩ বর্গ কি.মি.
কাথলিকদের সংখ্যা	৫৯,৬৩০ জন
প্যারিশ/ধর্মপল্লী	১৯ টি
সাব-সেন্টার	৪ টি
প্রাইমারী স্কুল	১৬ টি
হাইস্কুল	৩ টি
ধর্মসংঘ	৯ টি
স্বাস্থ্যকেন্দ্র / ডিসপেন্সারী	১৪ টি
সংস্থা বা সংঘ	৮ টি
কমিটি / কমিশন	২০টি
সেমিনারি/গঠন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র / নবিশিয়েট	২টি
আশ্রম / হোস্টেল / বোর্ডিং	২২টি

সিলেট ধর্মপ্রদেশ

আওতাভুক্ত জেলাসমূহ	সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার
আয়তন	১২,৫৯৪ বর্গ কি.মি.
কাথলিকদের সংখ্যা	১৬,৭০৭ জন
প্যারিশ/ধর্মপল্লী	৭ টি
সাব-সেন্টার	১ টি
হাইস্কুল	৫ টি
টেকনিক্যাল / ভোকেশনাল	২ টি
ধর্মসংঘ	১০ টি
স্বাস্থ্যকেন্দ্র / ডিসপেন্সারী	২ টি
কমিটি / কমিশন	১১ টি
আশ্রম / হোস্টেল / বোর্ডিং	২ টি

বরিশাল ধর্মপ্রদেশ

আওতাভুক্ত জেলাসমূহ	বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, গোপালগঞ্জ (আংশিক), মাদারীপুর, শরীয়তপুর, রাজাবাড়ী
আয়তন	২০,৭০৮ বর্গ কি.মি.
কাথলিকদের সংখ্যা	১৫,৫৩০ জন
প্যারিশ/ধর্মপল্লী	৬ টি
স্কুল	৮ টি
ধর্মসংঘ	৮ টি
স্বাস্থ্যকেন্দ্র / ডিসপেন্সারী	৫ টি
কমিটি / কমিশন / সেমিনারী	২ টি
আশ্রম / হোস্টেল / বোর্ডিং	৫ টি

বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশের কাজ বিভিন্ন রকম; একটি কাজের সাথে আরেকটি কাজের কোন সম্পর্ক নেই। তবে বিভিন্ন কাজের সুবিধার জন্য বাংলাদেশ মণ্ডলীকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য ৮টি ধর্মপ্রদেশে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি ধর্মপ্রদেশেই মিশনারীগণ, সন্ন্যাসব্রতীগণ ধর্মপ্রদেশীয় যাজকগণ তাদের শক্তি, বুদ্ধি, মেধা, শ্রম, সেবা, ধৈর্য, ভালোবাসা, সহিষ্ণুতা দিয়ে নিরলস ও নিঃস্বার্থভাবে তাদের সেবাদায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

৭.১৭ শিক্ষা সেবায় ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশটি নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তার সময় পার করে এসেছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন কালের পূর্ব থেকে ঢাকাসহ তদানীন্তন বঙ্গদেশ এবং বর্তমান বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্মের গোড়াপত্তন, প্রচার ও প্রসার হয়ে আসছে বিভিন্ন আঙ্গিকে। তার মধ্যে ৩টি কর্মযজ্ঞ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । যেমন : শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনসেবা।[৫৬]

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশে ২৩টি ধর্মসংঘ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তাদের কেউ কেউ বাংলাদেশ হওয়ার পূর্ব থেকেই কাজ করছে আর কেউ কেউ বাংলাদেশ হওয়ার পর থেকে সেবাকাজ করে যাচ্ছে। তারা ধর্মপল্লীতে পালকীয় সেবাদান, স্কুল স্থাপন, ধর্মশিক্ষাদান, সমাজ-উন্নয়ন, সেবা-যত্ন, স্বাস্থ্যসেবা, বাণীপ্রচার, স্কুল-কলেজ পরিচালনা, শিক্ষাদান, হোস্টেল পরিচালনা, যুবগঠন, সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ, নারী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, ন্যায্যতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা, সংঘ সমিতি পরিচালনা, বৃদ্ধদের সেবাদান এবং আরো অনেক সেবামূলক কাজ পরিচালনা করে যাচ্ছেন।[৫৭]

'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড'। জাতির মেরুদণ্ডটিকে মজবুত ও সোজা রাখার জন্যে বাংলাদেশের কাথলিক মণ্ডলী তথা ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশে বর্তমানে পরিচালিত হচ্ছে ৬৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। স্থানীয় পর্যায়ে এ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রত্যেকটিই যথেষ্ঠ সু-পরিচিত, স্বনামধন্য ও মানসম্পন্ন। বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়েও এগুলোর বেশ কিছু অত্যন্ত ঈর্ষণীয় শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসাবেও একাধিকবার স্বীকৃতি পেয়েছে।[৫৮] তাছাড়া আরো আছে কারিগরি প্রতিষ্ঠান। এগুলো সরাসরি মণ্ডলীর বিভিন্ন ধর্মসংঘ কর্তৃক পরিচালিত। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে কারিতাস বাংলাদেশের তত্ত্বাবধানে একটি অত্যন্ত স্বনামধন্য কারিগরি প্রতিষ্ঠানও ঢাকা শহরেই অবস্থিত।

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো দেশের সকল ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের সন্তানদেরই সর্বোত্তম শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলায় অকৃত্রিম প্রয়াস অব্যাহত রেখে যাচ্ছে। এগুলোর পরিচিতি সুনাম ও মান পরিচালক, শিক্ষক ও কর্মীদের নিষ্ঠা, ত্যাগ ও আত্মনিবেদনের কারণেই সম্ভব হচ্ছে মণ্ডলী ও ধর্মসংঘগুলোর সরাসরি তত্ত্বাবধানে। সাধারণ মানুষের যৌথ প্রচেষ্টায় এগুলো আজও সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে।[৫৯]

তবে যুগপৎ কিছু কিছু সমস্যাও আজকাল মাথাচাড়া দিচ্ছে। কেবল সদিচ্ছা, আন্তরিকতা, পরিশ্রম ও মূল্যবোধ দিয়ে বর্তমানে আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা সম্ভব নয়। এগুলোর পাশাপাশি শিক্ষাগত যোগ্যতাও থাকা একান্ত প্রয়োজন। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশসহ সারা দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ঐতিহ্য ধরে রাখতে হলে সকল প্রকারের যোগ্যতায় যোগ্য হতে হবে। তা নাহলে জাতীয় যোগ্যতার কাঠামোতে পিছিয়ে পড়তে হবে। যার ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠানগুলো হয়তো কোন এক সময়ে হাতছাড়াই হয়ে যেতে পারে। সুতরাং নীতি নির্ধারকদেরকে উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত করা, নানা ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া এবং খ্রিস্ট ভক্তদেরও প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে, যেন তাঁরা প্রতিষ্ঠানগুলোর হাল ধরতে পারেন এবং এগুলোর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলোও তাঁরা অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হন।

৭.১৮ বৈশিষ্ট্যসমূহ/ গুণাবলি

খ্রিস্টান তথা কাথলিক মণ্ডলী পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলো সমুন্নত রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মানুষ করে গড়ে তোলা, মেধা বিকাশের পাশাপাশি মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটানো, মন ও হৃদয়কে সত্যজ্ঞানে উদ্ভাসিত করা, অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে সহাবস্থান করে তাদের সাথে সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করা, দীন ও দুঃখী মানুষের সেবায় তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা ইত্যাদি।[৬০] সচরাচর পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি সহপাঠ্যক্রমের মাধ্যমে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর উন্মেষ

ঘটানো সম্ভব, যা বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অনেক ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি তা মোকাবেলা করা।

বাংলাদেশ মণ্ডলীর প্রথম ধর্মপ্রদেশ ছিল ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ। পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে অন্যান্য ধর্মপ্রদেশ স্থাপিত হয়েছে। তবে এ ধর্মপ্রদেশে যা হয়েছে তা আরো জোরালো ভাবেই চলতে থাকবে। এ প্রত্যাশা আমাদের সকলের।

৭.১৯ উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনা হতে আমরা দেখতে পাই যে, সেই সুলতানী আমল থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত কাথলিক মিশনারীগণ এই দেশ ও দেশের জনগণের মধ্যে নিরলস ও নিঃস্বার্থ সেবাকাজ করে, কাঠোর পরিশ্রম করে জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে এবং আজও রেখে চলছে। আমরা দেখতে পাই, খ্রিস্টমণ্ডলী বিভিন্ন কমিশন ও সংগঠনের মাধ্যমে সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে সেবামূলক এসব কাজের মাধ্যমে এগিয়ে যাচ্ছে। তাঁরা উপলব্ধি করেছেন যে, একটা দেশ ও জাতিকে উন্নত করতে হলে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। তাই তারা দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। এসব প্রতিষ্ঠান দেশের গ্রামে-গঞ্জে, শহরে ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে নির্মিত হয়েছে । বর্তমানে বাংলাদেশে খ্রিস্টমণ্ডলী কর্তৃক পরিচালিত অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, কারিগরী বিদ্যালয়, হোস্টেল, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এসব প্রতিষ্ঠানে পুঁথিগত পাঠ দানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদেরকে অন্যান্য মানবিক, নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় শিক্ষায়ও শিক্ষাদা ও গঠন দান করার চেষ্টা করা হয়। এসব প্রতিষ্ঠান শুধু একাডেমিক শিক্ষা বা সার্টিফিকেট প্রদানের জন্যই নয় বরং মানুষ গড়ার কারিগর হিসাবে সমাদৃত। এগুলো শিক্ষার্থীদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য সামগ্রিক জ্ঞান দিয়ে থাকে। ফলে এ শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের পরস্পরে মধ্যে, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে, স্কুলে ও স্কুলের বাইরে একটা মধুর

সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান যথেষ্ট উন্নত। এসব প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করে অনেকেই আজ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করছেন। কাথলিক মিশনারীদের পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দেশে-বিদেশে সুপরিচিত, স্বনামধন্য ও মানসম্মত। জাতীয় ও বিভাগীয় পর্যায়েও এগুলো ঈর্ষণীয় অবস্থানে রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে দেশের সকল ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের শিশুকিশোর ও যুবকযুবতীদের আধুনিক ও উন্নত মানের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার অকৃত্রিম প্রয়াস অব্যাহত আছে। ফলে এগুলোর ঐতিহ্য, ধারাবাহিকতা ও মান বজায় রাখা এগুলোর পরিচালকবৃন্দ, শিক্ষকমণ্ডলী ও কর্মীদের ত্যাগ ও নিষ্ঠার কারণেই সম্ভব হচ্ছে। তাই আমি বলতে পারি যে, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির উন্নয়নে, জনগণের মাঝে শিক্ষা বিস্তারে কাথলিক মিশনারীদের অবদান শুধু অনস্বীকার্যই নয় বরং সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তথ্য সূত্র

[১] সরকার, লুইস প্রভাত, "বঙ্গ দেশে খ্রীষ্ট ধর্ম ও খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়", জয় গুরু ইম্প্রেশন, কলকাতা-৭০০০০৬, প্রথম সংস্করণ, ২০০২। পৃষ্ঠা নং ১
[২] ঐ পৃষ্ঠা নং ২
[৩] ঐ পৃষ্ঠা নং ১
[৪] ঐ পৃষ্ঠা নং ১
[৫] ঐ পৃষ্ঠা নং ১
[৬] ঐ পৃষ্ঠা নং ১
[৭] ঐ পৃষ্ঠা নং ২
[৮] ঐ পৃষ্ঠা নং ২
[৯] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩
[১০] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩
[১১] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩
[১২] ঐ পৃষ্ঠা নং ৪
[১৩] পণ্ডিত, দিলীপ, "বাংলাদেশে খ্রিষ্টীয় মণ্ডলীর ইতিহাস" খ্রিষ্টীয়ান লিটারেচার সেন্টার, চাঁদপুর, কুমিল্লা। পৃষ্ঠা নং ১৯০
[১৪] ঐ পৃষ্ঠা নং ৫
[১৫] ঐ পৃষ্ঠা নং ৫
[১৬] ঐ পৃষ্ঠা নং ৭
[১৭] ঐ পৃষ্ঠা নং ৭
[১৮] ঐ পৃষ্ঠা নং ১০
[১৯] ঐ পৃষ্ঠা নং ১১
[২০] ঐ পৃষ্ঠা নং ১১
[২১] ঐ পৃষ্ঠা নং ১২
[২২] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৩
[২৩] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৪
[২৪] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৪
[২৫] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৪
[২৬] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৮৬
[২৭] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৮৬
[২৮] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৮৬
[২৯] ঐ পৃষ্ঠা নং ৯৯
[৩০] ঐ পৃষ্ঠা নং ৯৯
[৩১] ঐ পৃষ্ঠা নং ৯৯
[৩২] ঐ পৃষ্ঠা নং ১০০
[৩৩] The Catholic Directory of Bangladesh 2013, Published by Proatibeshi Prokashoni, 10th revised Edition. পৃষ্ঠা নং ২৮
[৩৪] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩০
[৩৫] এল. গমেজ, সিঃ শিখা, সিএসসি; কস্তা, ফাঃ অনল টেরেন্স, সিএসসি; টি. গনসালভেজ, ফাঃ অসীম, সিএসসি; কস্তা, রবার্ট টমাস, "খ্রিষ্ট ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা", ৫ম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড, ঢাকা। পৃষ্ঠা নং ৫৪
[৩৬] ঐ পৃষ্ঠা নং ৩০
[৩৭] ঐ পৃষ্ঠা নং ৫৫-৫৬
[৩৮] স্মরণিকা, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ প্রতিষ্ঠার ১২৫ বছর জুবিলী উৎসব, ৯ নভেম্বর ২০১২ খ্রীঃ, পৃষ্ঠা নং ৫০
[৩৯] ঐ পৃষ্ঠা নং ৫০
[৪০] এল. গমেজ, সিঃ শিখা, সিএসসি;, কস্তা, ফাঃ অনল টেরেন্স, সিএসসি; টি. গনসালভেজ, ফাঃ অসীম, সিএসসি; কস্তা, রবার্ট টমাস, "খ্রিষ্ট ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা", ৫ম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড, ঢাকা। পৃষ্ঠা নং ৮৯
[৪১] ঐ পৃষ্ঠা নং ৮৯
[৪২] ঐ পৃষ্ঠা নং ৮৯
[৪৩] ঐ পৃষ্ঠা নং ৯০
[৪৪] ঐ পৃষ্ঠা নং ৯০
[৪৫] ঐ পৃষ্ঠা নং ৯১
[৪৬] ঐ পৃষ্ঠা নং ৯১
[৪৭] ঐ পৃষ্ঠা নং ৯১

[৪৮] ঐ পৃষ্ঠা নং ৯১
[৪৯] ঐ পৃষ্ঠা নং ৯১
[৫০] ঐ পৃষ্ঠা নং ৯২
[৫১]The Catholic Directory of Bangladesh 2013, Published by Pratibeshi Prokashoni, 10th revised Edition. পৃষ্ঠা নং ১৩
[৫২] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৭
[৫৩] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৭
[৫৪] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৭
[৫৫] ঐ পৃষ্ঠা নং ১৭
[৫৬] স্মরণিকা, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ প্রতিষ্ঠার ১২৫ বছর জুবিলী উৎসব, ৯ নভেম্বর ২০১২ খ্রীঃ, পৃষ্ঠা নং ৫৬
[৫৭] ঐ পৃষ্ঠা নং ৫৬
[৫৮] ঐ পৃষ্ঠা নং ৫৬
[৫৯] ঐ পৃষ্ঠা নং ৫৬
[৬০] ঐ পৃষ্ঠা নং ৫৭

গ্রন্থপঞ্জি

- এস পেরেরা, ফাঃ আদম, সিএসসি; এল. গমেজ, সিঃ শিখা, সিএসসি; দীপ্তি, সিঃ মেরী, এসএমআরএ, "খ্রিষ্ট ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা", ৫ম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা, ২০১৩ খ্রিঃ। (পৃ.- ৫৪-৫৬, ৮৯-৯২)।

- এল. গমেজ, সিঃ শিখা, সিএসসি; কস্তা, ফাঃ অনল টেরেন্স, সিএসসি; টি. গনসালভেজ, ফাঃ অসীম, সিএসসি; কস্তা, রবার্ট টমাস, "খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা", ৮ম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা। (পৃ. ২৩, ২৪, ৩৪, ৩৮-৪৬)।

- পণ্ডিত, দিলীপ, "বাংলাদেশে খ্রিষ্টীয় মণ্ডলীর ইতিহাস", খ্রিষ্টিয়ান লিটারেচার সেন্টার, চাঁদপুর, কুমিল্লা। (পৃঃ ১-১৫, ৯৯, ১০০)।

- ডি'কস্তা, যেরোম, "বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী', (প্রথম খণ্ড), প্রতিবেশী প্রকাশনী, আগষ্ট, ১৯৮৮খ্রিঃ।

- গমেজ, ফাঃ জয়ন্ত এস (সম্পাদক) "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী"- ২০১১ খ্রিঃ।

- গমেজ, ফাঃ জয়ন্ত এস (সম্পাদক) "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী"- ২০১৫খ্রিঃ।

- গমেজ, ফাঃ জয়ন্ত এস (সম্পাদক) "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী"- ২০১৬ খ্রিঃ।

- কস্তা, ফাদার বেঞ্জামিন, সিএসসি, "খ্রিষ্টান যুব সমাজ ও উচ্চ শিক্ষা"।

- কস্তা, ফাদার বেঞ্জামিন, সিএসসি, "বাংলাদেশে হলিক্রস : অতীত ও বর্তমান"।

- কস্তা, ফাদার বেঞ্জামিন, সিএসসি, “বাংলাদেশ পবিত্র ক্রুশ সংঘের যাজক প্রার্থীদের গঠন প্রশিক্ষণের ইতিহাস” ।
- কস্তা, ফাদার বেঞ্জামিন, সিএসসি, “বাংলাদেশে বর্তমান হলিক্রস” ।
- নটর ডেম কলেজের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ”সুবর্ণ স্মারক,” ১১ নভেম্বর, ১৯৯৯ খ্রিঃ ।
- “স্মরণিকা”, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ প্রতিষ্ঠার ১২৫ বছর জুবিলী উৎসব, ৯ নভেম্বর, ২০১২ খ্রিঃ।
- “The JOSEPHITE” Golden Jubilee Souvenir 2004, St. Joseph High School and College, 2004.
- "The Catholic Directory of Bangladesh"- 2013 Pg- 28-43, 68-69, 125-127, 157-159, 185-187, 217-219, 245-247,273-275.
- Holy Cross Members in the History - Published for Jubilee celebration (February 01-11,2004)
- "The Catholic Directory of Bangladesh"- 2013 Pg- 28-43, 68-69, 125-127, 157-159, 185-187, 217-219, 245-247,273-275.

অষ্টম অধ্যায়

উপাত্ত বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৮.১	ভূমিকা	৩৪৫
৮.২	শিক্ষা বিস্তারে মিশনারীদের অবদান সংক্রান্তের বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন	৩৪৫
৮.৩	পরামর্শ দাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা।	৩৫১

উপাত্ত বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন

৮.১ ভূমিকা

গবেষণা বলতে কোন বৈজ্ঞানিক রীতিসিদ্ধ নিয়মতান্ত্রিক এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা নিরীক্ষাকেই বুঝায়। ক্রফোর্ড (Crawford) বলেন যে, "চিরাচরিত উপায়ে কোন সমস্যার যে সমাধান পাওয়া যায় তার চেয়েও অধিক পর্যাপ্ত সমাধান লাভের জন্য বিশেষ ধরনের উপকরণ, যন্ত্রপাতি ও কারিগরি প্রয়োগের মাধ্যমে চিন্তনের পদ্ধতিগত ও পরিমার্জিত কৌশলই গবেষণা।" তাই গবেষণাকর্মকে সার্থকভাবে সম্পন্ন করার জন্য সুষ্ঠু ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া মেনে চলতে হয়।

গবেষণা কাজে উপাত্ত বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। "বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তারে কাথলিক মিশনারীদের অবদান মূল্যায়ন" শীর্ষক গবেষণাটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য ঐতিহাসিক বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে বিভিন্ন মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হোস্টেল, বোর্ডিং, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও মিশনারী এবং বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করে সঠিক ভাবে যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে তা উপাত্তাকারে বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করা হয়েছে।

৮.২ শিক্ষা বিস্তারে মিশনারীদের অবদান সংক্রান্তের বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন

শিক্ষা সহায়ক বই পুস্তক, প্রবন্ধ, প্রতিবেদন, বিভিন্ন নথিপত্র, বাৎসরিক ম্যাগাজিন ও শিক্ষা সংক্রান্ত দলিলসমূহ পর্যালোচনা করে দেখতে পাই মিশনারীদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, শিক্ষার পদ্ধতি, অন্তরায় ও উদ্দেশ্য একই ধরনের।

ব্যক্তিগত বৈশিষ্টসমূহ :

- আগ্রহী ও আত্মত্যাগী।
- ধর্মানুরাগ ও ক্ষমাশীলতা।
- ন্যায়পরায়ণ ও পরিশ্রমী।

- সাহসী ও সচ্চরিত্রবান।
- গুণবান ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।
- জীবনযাত্রা সাধারণ ও আদর্শ খ্রিস্টীয় জীবন।
- বুদ্ধিদীপ্তি সম্পন্ন।
- সুদক্ষ ও দায়িত্বশীল।
- সাহিত্যিক ও উচ্চশিক্ষিত।
- শান্ত ও বিনীত।
- প্রাণবন্ত ও স্বাধীনচেতা।
- পারস্পরিক প্রেমে দৃঢ়বিশ্বাসী ।
- উদারতা।
- দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও ঐশতত্ত্ববিদ।
- দক্ষ শিল্পী ও কর্মী।
- চিন্তাবিদ, লেখক ও অনুবাদক।
- জ্ঞানদানে অত্যুৎসাহী ও কর্মোদ্যোগী।
- অটুট ধর্মবিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক জীবন।
- দিব্য ক্ষমতাসম্পন্ন।
- প্রচার ক্ষেত্রে উত্তম কৃষকের মতো।
- দেশাত্মবোধ ও স্বাধীনতা।
- সক্রিয়তা।
- দক্ষ শিল্পী ও কর্মঠ।
- অটুট ধর্মবিশ্বাস।
- আধ্যাত্মিক জীবন।
- সাহসী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

- সহমর্মিতা।
- আদর্শ শিক্ষক ও প্রচারক।
- ধর্মানুরাগী ও দয়াশীল।
- বিচক্ষণতা।
- জ্ঞানার্জনে উৎসাহী।
- কর্মোদ্যোগী ও আগ্রহী।

শিক্ষার পদ্ধতিসমূহ

- দেশ-দেশান্তরে পরিভ্রমণ করে।
- পায়ে হেঁটে (নগ্নপায়ে)।
- গ্রামেগঞ্জে, নগরে-বন্দরে হাটে-বাজারে অলিতেগলিতে ঘুরে ঘুরে।
- ঘন্টা বাজিয়ে গানের মাধ্যমে।
- সহজ ও সরল ভাষায়।
- আনন্দদায়ক কৌতুকের মাধ্যমে।
- খেলাধুলা ও গানবাজনার মাধ্যমে।
- ধর্মীয় বইপুস্তকাদি বিলি করে।
- কিশোরদের একত্রিত করে
- যেখানে প্রচার করতে যেতেন সেই স্থানের ভাষা অনুযায়ী বইপুস্তকাদি রচনা ও বাইবেল অনুবাদ করে।
- বহুমুখী শিক্ষাদর্শনের মাধ্যমে।
- সুনাগরিক করার বাস্তবমুখী পরিকল্পনার মাধ্যমে
- শিক্ষার কোন বয়স ছিল না। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে শিক্ষা প্রদান করতেন।
- শিক্ষার ভাষা ছিল বন্ধু মনোভাবাপন্ন।

- ❖ যেখানেই প্রচারের জন্য যেতেন সেখানেই উপাসনাগৃহ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতেন।
- ❖ অকালবৃদ্ধা ও অসহায়দের জন্য আশ্রম ও থাকার গৃহ নির্মাণ করেছেন।
- ❖ অনাথ ও পরিত্যক্ত শিশুকিশোরদের জন্য অরাটরী নির্মাণ করেছেন।
- ❖ আর্তপীড়িত রোগাক্রান্তদের সেবা ও চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছেন।
- ❖ লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করা।
- ❖ জনসমাবেশে গিয়ে প্রচার করা ।
- ❖ হাটবাজারে গিয়ে প্রচার করা ।
- ❖ গান গেয়ে।
- ❖ তারা যেখানে বাস করতেন সেই সব স্থানের নিকটবর্তী গ্রামে পরিদর্শনে গিয়ে।
- ❖ নদীর তীরে বা ঘাটে গিয়ে।
- ❖ বছরে একবার বা দু'বার দূরদূরান্তের গ্রামগুলোতে গিয়ে।
- ❖ পূজা-পার্বণ, ধর্মীয় উৎসব ও ধর্মীয় মেলায় সমাগত বৃহৎ জনসমাবেশে গিয়ে।
- ❖ সু-সমাচারের অংশবিশেষ বাংলায় অনূদিত পুস্তিকা আকারে বিতরণ ক'রে।
- ❖ শহরের এক প্রান্তে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে।
- ❖ পালাগান ও কীর্তনের মাধ্যমে।
- ❖ নাটিকা বা জীবন্তিকা উপস্থাপন ক'রে।
- ❖ কাঁধে কাপড়ের ব্যাগ ঝুলিয়ে পায়ে হেঁটে।
- ❖ নীতিশিক্ষাদানের মাধ্যমে।

❖ কারিগরি বহুমুখী শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে।

❖ অনাথ ও পরিত্যক্ত ছেলেদের জন্য বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে।

❖ রোগাক্রান্ত ও আর্তপীড়িতদের জন্য বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে।

❖ ১৯৫২ খ্রিঃ থেকে তাঁরা চলচ্চিত্র ও টেপরেকর্ডারের মাধ্যমে শিক্ষা দিতেন।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ

- খ্রিস্টের প্রেমবাণী প্রচার ও বিস্তার।
- খ্রিস্টমণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করা ।
- সদুপদেশ, সদাচারণ ও সুমন্ত্রে দীক্ষিত করা
- ধর্মশিক্ষার মাধ্যমে নৈতিক বিষয়ে প্রবুদ্ধ করা।
- পরস্পরের সাথে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা।
- শিক্ষা প্রদান ও বিস্তার করা।
- গরীব-দুঃখী, অনাথ, দুর্বল ও অসুস্থদেরকে ভালোবাসার মাধ্যমে সেবা করা।
- একে অপরের সাথে সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া।
- সুকুমার বৃত্তির প্রসার।

বাধাসমূহ/অন্তরায়

- খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধে যারা ছিল তারা যড়যন্ত্র করে অভিযুক্ত করতো।
- হৃদয়হীন সম্রাটদের হাতে অনেকে তাদের জীবন উৎসর্গ করেছে।
- বর্বরদের নিষ্ঠুর অভিযান।
- বিভিন্ন বিপর্যয় দেখা দিয়েছে (যেমন যুদ্ধ, ধ্বংস)
- প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কাজ করেছে।
- অনেক নির্যাতন, অত্যাচার, উৎপীড়নের মুখে পতিত হয়েছে।

- বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদের সম্মুখীন হয়েছেন।
- চিঠিপত্র ছাড়া যোগাযোগের কোন মাধ্যম ছিলনা।
- যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত ছিল না।
- বেশিরভাগ লোক ছিল অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন।
- আর্থিক দিক দিয়ে অনেকেই ছিল অ-সচ্ছল।
- সামাজিক দিক দিয়ে ছিল দুর্বল, অসহায় ও দীনদরিদ্র।
- উপযুক্ত বাসগৃহের অভাব ছিল।
- পরিবেশ ছিল অস্বাস্থ্যকর।
- প্রতিটি পদক্ষেপে পাত্র হতে হতো ঘৃণা, ঈর্ষা ও মিথ্যা অভিযোগের।
- নানা প্রকার দুর্গতি ও বিপত্তি দেখা দিত।
- নিঃস্ব-হতদরিদ্র।
- মিশনারীগণ বেশির ভাগ ছিল বিদেশী। তারা স্থানীয় ভাষায় ঠিকমতো কথাবার্তা বলতে না পারার কারণে তাদের স্নায়ুকে পীড়িত করতো।
- জায়গা-জমি ছিল সীমিত।
- বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব (কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ডায়ারিয়া ইত্যাদি)
- সহযোগিতার অভাব।
- দূষিত পরিবেশ।
- তাদেরকে খড়কুটা দিয়ে তৈরী কুঁড়ে ঘরে থাকতে হতো।
- কর্মএলাকাগুলো ছিল দুর্গম।
- বেশিরভাগ মানুষ ছিল নিরক্ষর, অত্যন্ত দরিদ্র ও সহায়সম্বলহীন।

➢ প্রাকৃতিক দুর্যোগ (যেমন খরা, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, দুর্ভিক্ষ) ইত্যাদি প্রায়ই লেগে থাকতো।

৮.৩ পরামর্শ দাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাসংশ্লিষ্ট মিশনারীগণ সবাই উচ্চশিক্ষিত। শতকরা ১০০% বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীপ্রাপ্ত।

নবম অধ্যায়

গবেষণার ফলাফল ও উপসংহার

নং	পৃষ্ঠা নং
৯.১ ভূমিকা	৩৫২
৯.২ গবেষণালব্ধ ফলাফল	৩৫২
৯.৩ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাঠামোগত অবস্থা	৩৫৩
৯.৪ বর্তমান পদক্ষেপসমূহ	৩৫৪
৯.৫ সুপারিশসমূহ বা মতামত	৩৫৯
৯.৬ পরবর্তী গবেষণার জন্য সুপারিশ	৩৬১
৯.৭ উপসংহার	৩৬১

গবেষণার ফলাফল ও উপসংহার

৯.১ ভূমিকা

“বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তারে কাথলিক মিশনারীদের অবদান মূল্যায়ন” শীর্ষক গবেষণাকর্মটি নির্ধারিত সময়ে শেষ করার জন্য গবেষক বিভিন্ন ক্ষেত্র হতে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে উপস্থাপন করেছেন।

৯.২ গবেষণালব্ধ ফলাফল

ব্যক্তিগত তথ্য

- মিশনারী ব্যক্তিবর্গের পেশাগত যোগ্যতা ও দক্ষতা সন্তোষজনক।
- মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সন্তোষজনক।
- বিভিন্ন শিক্ষা বিস্তারে পরিচালক মণ্ডলী সেবাকাজে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁদের বিশ্বাস এই যে, তারা শিক্ষার্থীদের সেবা করে স্বয়ং ঈশ্বরকেই সেবা করেন।
- শিক্ষা প্রসারে তাঁরা উদার ও প্রাণবন্ত।
- তাদের পরিচালনা নিবেদিতপ্রাণ ও নিঃস্বার্থ।
- দেশ ও জাতি গঠনে তাঁরা নিরলস শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন।
- দেশের সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন সেবাকাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন।
- শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা পিতৃ-মাতৃতুল্য ।
- জীবন গঠনে বন্ধু ও পথ প্রদর্শক।
- যে কোন কাজে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দাতা।

❖ সহযোগী ও সহমর্মী।

❖ তাদের মধ্যে যতটুকু জ্ঞানের মাধুর্য রয়েছে তা শিক্ষার্থীর মাঝে সঞ্চারিত করে দেন।

৯.৩ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাঠামোগত অবস্থা

❖ কাঠামোগত অবস্থা ভাল।

❖ শিশু-বান্ধব পরিবেশ রয়েছে।

❖ শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে।

❖ শিক্ষার্থীরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসে।

❖ মেধা ও প্রতিভা বিকাশের সুযোগ রয়েছে।

❖ সার্বিক নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সুযোগ রয়েছে।

❖ প্রতিষ্ঠানে নিয়মকানুন যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়।

❖ শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রতি নজর দেওয়া হয়, নিজেদের কোন লাভের দিকে নয়।

❖ প্রতিটি বিষয়ে ভালো যত্ন নেওয়া হয়।

❖ সুন্দর জীবন গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ শিক্ষা দেওয়া হয়।

❖ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে উত্তম ভৌত অবকাঠামো ও সুন্দর পরিবেশ রয়েছে। যেমনঃ শ্রেণি ব্যবস্থা, প্রশস্ত খেলার মাঠ, সেমিনার ও বিনোদনের জন্য হল রুম, লাইব্রেরী, স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা, নিরাপদ পানীয় জল ইত্যাদি।

❖ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নয়।

❖ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নিবেদিত। কোন ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নেই।

❖ শিক্ষা কার্যক্রম আন্তরিকভাবে সংগঠিত হয়।

❖ সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্বের মনোভাব জাগিয়ে তোলে। যেমন: শিক্ষা সফর, জাতীয় সামাজিক অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ, বিজ্ঞান মেলা, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতা, ইত্যাদি।

❖ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ রাজনৈতিক দলের প্রভাবমুক্ত, লেজুড়বৃত্তি ও ধূমপান মুক্ত।

❖ শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষাদান পদ্ধতি।

❖ শ্রেণিপাঠ ও শিখন কার্যক্রমের নিয়মিত তত্ত্বাবধান ।

❖ শ্রেণি পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষণ শিখন কাজের অগ্রগতি মূল্যায়ন।

❖ শিক্ষাদানে আধুনিক মনোবিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি অনুসরণ।

❖ নিয়ম-শৃঙ্খলা ও কর্তব্যপালনে নেই কোন অবহেলা।

❖ কোন দুর্নীতিকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়া হয় না।

❖ অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা শিক্ষা দান।

❖ শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত সুবিধা ও অসুবিধা যাচাই ও পরামর্শ দানের জন্য মেনটরিংএর ব্যবস্থা।

৯.৪ বর্তমান পদক্ষেপসমূহ

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসে ‘বাংলাদেশ কাথলিক সম্মিলনী’ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের কাথলিক মণ্ডলীর স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সেবাদানের বিষয় সংশ্লিষ্ট সাধারণ নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করাই এর কাজ। বিশপীয় অঙ্গসংগঠনসমূহের বিভিন্ন কমিশন রয়েছে। এ কমিশনগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশ মণ্ডলীর পালকীয়, সেবামূলক, পরিচালনা ও অন্যান্য বিষয়গুলোর কার্যসমূহ পরিচালিত হয় ও দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। তার মধ্যে অন্যতম একটি

কমিশন হলো বাংলাদেশ কাথলিক শিক্ষাবোর্ড। এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো : (১) যুব শ্রেণির শিক্ষার জন্য জাতীয় সকল বিষয়াদিতে অর্থপূর্ণভাবে অংশগহণ, (২) মণ্ডলীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষানীতিমালা পুনর্গঠন, পুনঃপরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রস্তুতিতে সহায়তা দান করা এবং (৩) জীবনাহ্বান হিসেবে শিক্ষকদের ধারাবাহিক গঠনে সহায়তা করা।

শিক্ষা প্রসারে মণ্ডলীর ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপক প্রসারিত। শিক্ষা ভাবনায় প্রাক্-প্রাথমিক, প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, কারিগরি বিদ্যালয় – এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এর আওতাভুক্ত। এছাড়া নারীশিক্ষার ক্ষেত্রেও খ্রিস্টমণ্ডলী দূরদর্শী ভূমিকা পালন করছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের শিক্ষার সুযোগ দানের জন্য মণ্ডলী সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রেখেছে।

বাংলাদেশে কাথলিক মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ

ধর্মপ্রদেশ	নিবন্ধকৃত ও অনিবন্ধকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় (মণ্ডলী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত)	নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়	উচ্চ বিদ্যালয়	কলেজ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ	বিশ্ববিদ্যালয়	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	বোর্ডিং/ হোস্টেল/ এতিমখানা
ঢাকা	১৬	১৭	০২	১৮	৩+১=৪	১	০৩	১৬
চট্টগ্রাম	১২	০১		১০				২১
দিনাজপুর	২২	০৪	০৩	০৩	১		০২	২০
খুলনা	১৮	০১	০৩	০৫			০৪	১৭
ময়মনসিংহ	১৪৪	০৬	০৪	০৮			০৪	২৬
রাজশাহী	১৫	০৩		০৩				১৯
সিলেট		০১	০৪	০১				০৬
বরিশাল	প্রক্রিয়াধীন							
মোট	**২২৭**	**৩৩**	**১৪**	**৪৮**	**৫**	**১**	**১৩**	**১২৫**

তথ্যসূত্র ঃ সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

এ সকল প্রতিষ্ঠানে মোট ৯৪,০২০ জন শিক্ষার্থী আছে এবং এখানকার শিক্ষক সংখ্যা হলো ১৯৫০ জন। এখানে উল্লেখ্য যে, সারা বাংলাদেশে কাথলিক চার্চের ৩৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ১৯৭৩ খ্রিঃ জাতীয়করণ করা হয়। এগুলো এখন সরকারী প্রাথমিক স্কুল। এসব স্কুল পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ ফাণ্ড না থাকায় এগুলো সরকারকে দিয়ে দেয়া হয়। তবে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে কারিতাস শিক্ষাপ্রকল্প বাংলাদেশে শিক্ষাবিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে খ্রিস্টমণ্ডলীর ৩৪টি ধর্মসংঘ কাজ করে যাচ্ছে। তাদের বেশির ভাগেরই প্রধান কাজ শিক্ষাবিস্তার। এ ধর্মসংঘগুলোর মধ্যে প্রধান প্রধানগুলো হলো পবিত্র ক্রুশ সংঘের ফাদার, সিস্টার ও ব্রাদারগণ, আরএনডিএম, এসএমআরএ, লুইজিনা, শান্তিরাণী, মারীয়া বাম্বিনা, পিমে, সালেশিয়ান, মেরীনল সিস্টারগণ, যেজুইটস ও অবলেট ফাদারগণ। তবে পবিত্র ক্রুশ সংঘের ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারগণ সুদীর্ঘ সময় ধরে সকল স্তরের শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য বিভিন্ন ধর্মসংঘের সন্ন্যাসব্রতী ব্রাদার, সিস্টার ও ফাদারদের পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

আনুষ্ঠানিক সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও কাথলিক মণ্ডলী অনগ্রসর বা ঝরে-পড়া শিক্ষার্থীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য বেশ কিছু কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন।

এছাড়াও পিতৃমাতৃহীন অনাথ ও এতিম শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য মণ্ডলীর পক্ষ থেকে অরফানেজের ব্যবস্থা রয়েছে। ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুবিধার জন্য বোর্ডিং বা হোস্টেলের ব্যবস্থা রয়েছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে মণ্ডলীর পক্ষে কারিতাস বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। শিক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন করে, শিক্ষকদের উপযুক্ত ও মানসম্মত প্রশিক্ষণদানের জন্য নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ, আর্থিক অনুদান প্রদান, সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর জন্য সুযোগ সৃষ্টি, যুবগঠণ

কার্যক্রমে সহায়তা, শিক্ষক মূল্যায়ন-পদ্ধতি শিক্ষা দান করে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গতা দিয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে কারিতাসএর অবদান অনস্বীকার্য।

বাংলাদেশ মণ্ডলীতে শিক্ষাবিস্তারের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য বাংলাদেশ মণ্ডলী প্রথম থেকে সংগঠিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই কাজের চূড়ান্ত রূপ হলো রেজিষ্টিকৃত বর্তমান বাংলাদেশ কাথলিক শিক্ষাবোর্ড। এই কাথলিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে রয়েছে সকল ধর্মপ্রদেশের শিক্ষা কমিশন এবং বিশপগণ হলেন এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। কাথলিক মণ্ডলীর শিক্ষার দর্শন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এদেশে শিক্ষাসেবাকে তৎপরতার জন্য বাংলাদেশ কাথলিক শিক্ষাবোর্ড সহায়তা করছে। বাংলাদেশ কাথলিক শিক্ষাবোর্ড বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলা হলো :

* মণ্ডলীর সমগ্র শিক্ষা সেবার মান উন্নয়ন

* বোর্ডের অধীনে কাথলিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ নীতিমালা প্রণয়ন।

* শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সরকারী, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ের কাজের সমন্বয় সাধন এবং তাদের মধ্যে সমঝোতাপূর্ণ সাহায্য প্রদান ও সমর্থন দান করা।

* সবার জন্য শিক্ষা – এই উদ্যোগের সাথে একাত্ম হয়ে দেশে সাধারণ ও বিশেষ স্কুল প্রতিষ্ঠা করে গুণগত ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা।

সরকার, সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে মুখপাত্র হিসাবে প্রতিনিধিত্বমূলক ভূমিকা পালন করা।

* শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সামগ্রিক ও মূল্যবোধ শিক্ষার জোরদার ভূমিকা পালন

* শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবদান সুস্পষ্টভাবে সমন্বিত করতে এবং অনুরূপ প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বীকৃতি ও সমর্থন দানে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

* অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন ও সহযোগিতা করে।

* জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সহায়তা করে তা প্রতিষ্ঠানে পৌঁছে দেয়া।

* গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলোকে সাহায্য করার জন্য সরকারি, ব্যক্তিগত বা অন্য কোন খ্রিস্টান দাতা সংস্থার অনুকূলে তহবিল যোগাড় করা।

বর্তমানে দেশে কাথলিক চার্চের ৭টি ইন্টারমিডিয়েট কলেজের মধ্যে ৫টি হলিক্রস পরিবারের সদস্যগণ পরিচালনা করেন: (১) ফাদারদের পরিচালিত নটর ডেম কলেজ ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ), (২) সিষ্টারদেও দ্বারা পরিচালিত হলিক্রস কলেজ (তেজগাঁও, ঢাকা), (৩) ব্রাদারদের দ্বারা পরিচালিত সেন্ট যোসেফ স্কুল ও কলেজ (মোহাম্মদপুর, ঢাকা), (৪) ব্রাদারদের দ্বারা পরিচালিত হলিক্রস স্কুল ও কলেজ (বান্দুরা, ঢাকা) (৫) ব্রাদারদের পরিচালিত সেন্ট ফিলিপস্ স্কুল ও কলেজ (দিনাজপুর)। এ ছাড়া **১**টি ডিগ্রী কলেজ (নটর ডেম কলেজ, ঢাকা) এবং **১**টি বিশ্ববিদ্যালয় (নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ, মতিঝিল, ঢাকা) হলিক্রস পরিবারের সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত।

মিশনারীদের প্রচেষ্টায় স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন এসেছে। সেই পরিবর্তনগুলো ছিল নতুন প্রণীত সরকারি শিক্ষানীতি অনুসারে প্রশাসনিক কাঠামোগত পরিবর্তন যেমন : পরিচালনা পরিষদ, প্রতিষ্ঠান প্রধান ও শিক্ষক নিয়োগ, বিদ্যালয় নিবন্ধিতকরণ, পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও সরবরাহ। সরকারের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করে এসব প্রতিষ্ঠানকে যুগের চাহিদামাফিক গড়ে তোলা হয়েছে। উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার গুণগত মান বজায় রাখতে বা সুনিশ্চিত করতে তারা সক্ষম হয়েছে। ফলে বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় সুদূর প্রসারী ইতিবাচক ফলাফল সৃষ্টি হয়েছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে।

৯.৫ সুপারিশসমূহ বা মতামত

শিক্ষা বিস্তারে গুণগত মান ও উন্নয়নের লক্ষ্যে কিছু কিছু বিষয় আরও জোরালো হলে তা যথাযথ হবে। সেক্ষেত্রে কয়েকটি সুপারিশ তুলে ধরা হলো:

- ❖ জনগণকে শিক্ষা সর্ম্পকে আরো সচেতন করে তুলতে হবে।

❖ শিক্ষকদের আরো প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে।

❖ সঠিক নীতিমালা প্রণয়ন করে তা যথাযথ ভাবে বাস্তবায়িত করতে হবে।

❖ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামোগত কোন সমস্যা থাকলে তা নিরূপণ করতে হবে।

❖ প্রকাশ্য ও খোলাখুলি আলোচনা, মতবিনিময় ও ব্যক্তিগত যোগসূত্র স্থাপন করা।

❖ মানসম্মত শিক্ষাবিস্তারের লক্ষ্যে সর্বজনস্বীকৃত একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন জরুরী।

❖ শিক্ষাক্ষেত্রে সকল ধরনের জেণ্ডার বৈষম্য দূর করতে সময়োপযোগী পদক্ষেপ নিতে হবে।

❖ সহপাঠীদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও নৈতিকতা বোধ তৈরি করতে হবে।

❖ আন্তরিক যত্নের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অনুশাসনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুস্থ জীবনবোধ ও মূল্যবোধ তৈরি করতে হবে।

❖ শিক্ষার্থীদের সর্ম্পকে অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়মিত জোরালোভাবে মতবিনিময় করতে হবে ।

❖ গ্রন্থাগারে পর্যাপ্ত প্রয়োজনীয় পুস্তক সংগ্রহ ও সংযোজন করা, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও একাধিক ওভারহেড প্রজেক্টরের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

❖ শিক্ষকমণ্ডলীকে নতুন পাঠ্যসূচি ও নতুন শিক্ষাদান পদ্ধতির সাথে পরিচিত হতে হবে।

❖ শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর সাথে শিক্ষা উপকরণের সঠিক ব্যবহার করতে হবে।

❖ শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে আন্তর্ব্যক্তিক সর্ম্পক আরো জোরদার করতে হবে।

❖ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মমুখী এবং জীবনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো সুদূরপ্রসারী করার জন্য সৃজনশীল মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে।

- ❖ শিক্ষা ও গঠনদান কাজ আরও বাস্তবধর্মী, সক্রিয় ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে দরিদ্র, অবহেলিত ও নিপীড়িত ভাইবোনদের কথা বিবেচনায় রেখে এর প্রক্রিয়াকে নতুন রূপদানের জন্য নিজেদের মধ্যে সমন্বয় করতে হবে।
- ❖ পাঠদানের সময় শ্রেণিকক্ষে বিদ্যুৎ চলে গেলে তার বিকল্প ব্যবস্থার প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ❖ শ্রেণিকক্ষ সুন্দর, পরিপাটি ও আকর্ষণীয় করতে হবে।

গবেষণালব্ধ ফলাফলে যেসব অন্তরায় বা সুপারিশগুলো রয়েছে তা আরো জোরালো ও যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে অধিকতর সফলতা অর্জন করা সম্ভব ফলে গবেষকের বিশ্বাস।

৯.৬ পরবর্তী গবেষণার জন্য সুপারিশ

- ❖ বর্তমান গবেষণাকর্মটি আরও ব্যাপকভাবে, সময় নিয়ে, বৃহত্তর পরিসরে পরিচলনা করা যেতে পারে।
- ❖ শিক্ষার অগ্রগতি ও মানসম্মত শিক্ষার প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা করা যেতে পারে।

৯.৭ উপসংহার

বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও গবেষক **'বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তারে কাথলিক মিশনারীদের অবদান মূল্যায়ন'** শীর্ষক গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। মানব সমাজে জীবনের জ্ঞানদানকারী শিক্ষা গুরুদেরকে সর্বোচ্চ গৌরবের স্থানে রাখা হয়েছে। বর্তমান সময়ে বিভিন্ন কারণে যোগ্য শিক্ষাদানকারীর অভাব অনেক ভাবে অনুভূত হচ্ছে। খ্রিস্টমণ্ডলী শিক্ষাদানের ও যোগ্য শিক্ষাদানকারীকে গঠনের ব্যাপারে সর্বদাই সচেষ্ট। স্বীয় স্বাতন্ত্র ও ঐতিহ্যের ভিত্তিতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে পারস্পরিক আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশের শিক্ষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, আর্থসামাজিক আবকাঠামের উন্নয়ন ও বিকাশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে অর্থপূর্ণ ও কল্যাণকর ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান যে অবস্থা তা তেমন সম্মানজনক

নয়। এদেশে শিক্ষাব্যবস্থার যেটুকু উন্নতি সাধিত হয়েছে তার পিছনে মিশনারীদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

মিশনারীগণ তাদের লক্ষ্যকে সামনে রেখে অনেকদূর এগিয়ে এসেছে। তাদের সেবা ও ভালোবাসার ফসল ভোগ করছে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ। খ্রিস্টের আদর্শে মানুষের সেবায় তারা নিজেদের উজাড় করে দিয়েছেন। দিয়েছেন নব চেতনা, শুনিয়েছেন খ্রিস্টের বাণী। প্রাথমিক অবস্থায় মানুষের মাঝে কাজ করা বেশ কঠিন ছিল। তবুও সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে মিশনারীগণ নিরলস ভাবে কাজ করেছেন। আজ অবধি তারা তাদের সামর্থ্য ও শ্রম দিয়ে কাজ করে চলেছেন। তাই বলা যায় যে, বাংলাদেশে মিশনারীদের শিক্ষা বিস্তার যথার্থতা লাভ করেছে।

তথ্যপঞ্জি/গ্রন্থপঞ্জি

- সরকার, লুইস প্রভাত, “বঙ্গদেশে খ্রীষ্টধর্ম ও খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়”, জয়গুরু ইম্প্রেশন, কলকাতা ৭০০০০৬, প্রথম সংস্করণ, ২০০২। (পৃঃ ৪, ৫, ১২, ১৫, ২০, ২৫, ৩৮-৪২, ৫৮,৬৩-৬৫, ১৫২-১৫৪, ১৬৭, ১৭০, ১৭১, ১৭৭, ১৮১-১৮৫, ১৯১-১৯৮, ২০৪-২০৭, ২১৪-২০৩০, ২৪২-২৪৯, ২৫৫, ২৬৪, ২৭০-২৭৬, ২৮০, ২৮৮-২৯৮, ৩০৩, ৩০৬,৩০৭,৩১১, ৩১৯-৩২১, ৩২৬, ৩৩৩-৩৩৬, ৩৪৪, ৩৪৫)।

- কলুস্সি, ফাঃ লুচানো, এসডিবি (ভিকার জেনারেল), “খ্রীষ্ট মণ্ডলীর ইতিহাস”, ৪র্থ সংস্করণ, সাধু যোসেক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট অফ প্রিন্টিং, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, (পঃ বঙ্গ, ১৫) আগষ্ট, ২০০৫খ্রিঃ। (পৃ. ১-১৬, ২১-২৭, ৩০-৩৬, ৩৯-৭৯, ৮৩, ৮৯, ৯৩-৯৫, ৯৯-১০৪, ১০৮-১২৯, ১৪০, ১৪৪-১৪৯, ১৫৭-১৬২, ১৬৯, ১৭০, ১৭৫-১৭৮, ১৯৬, ২০৩-২০৬, ২১২, ২১৮-২২৩, ২২৭, ২৩৪, ২৩৭, ৩৩৮, ২৪০-২৪৪)।

- প্রদীপ (Fr. Lucio), অনুবাদক, “নতুন মানুষের আবির্ভাব”, জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যশোর, ৫ম প্রকাশ, ২০১০ খ্রিঃ। (পৃ. ৩, ৪, ১৯৪, ১৯৬, ১৯৮, ২০৫)।

- বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, “কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা”, প্রথম প্রকাশ (নিখিল সাধু সাধ্বীর মহাপর্ব), ১লা নভেম্বর, জুবিলীবর্ষ-২০০০ খ্রিঃ (পৃ. ২১১ - ২৬৩)

- ছোটদের বাইবেল (পুরাতন ও নতুন নিয়মের কাহিনী), ৩য় সংস্করণ, ৩১ মার্চ, ২০০২ খ্রিঃ বর্ষ। (পৃ. ৩৭-৪৬, ৭৩, ৭৪, ৭৭-৮৪)।

- এস. পেরেরা, ফাঃ আদম, সিএসসি; এল. গমেজ, সিঃ শিখা, সিএসসি; দীপ্তি, সিঃ মেরী, এসএমআরএ, “খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা”, ৫ম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা, ২০১৩ খ্রিঃ। (পৃ. ৫৪-৫৬, ৮৯-৯২)।

- এল গমেজ, সিঃ শিখা, সিএসসি; কস্তা, ফাঃ অনল টেরেন্স, সিএসসি; টি. গনসালভেজ, ফাঃ অসীম, সিএসসি; কস্তা, রবার্ট টমাস, "খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা", ৭ম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা। (পৃ. ১-৫, ৫৮)।
- এল গমেজ, সিঃ শিখা, সিএসসি; কস্তা, ফাঃ অনল টেরেন্স, সিএসসি; টি গনসালভেজ, ফাঃ অসীম, সিএসসি; কস্তা, রবার্ট টমাস, "খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা", ৮ম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা। (পৃ. ২৩, ২৪, ৩৪, ৩৮-৪৬)।
- সরকার সাইমন চৌধুরী, দীপক লাল, ও কুইয়া, সিঃ ফিলিমিনো, সিএসসি, 'খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা', ৯ম ও ১০ম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা, ২০০৯ শিক্ষাবর্ষ পৃ. ১০৬
- পণ্ডিত, দিলীপ, "বাংলাদেশে খ্রিষ্টীয় মণ্ডলীর ইতিহাস", খ্রিষ্টিয়ান লিটারেচার সেন্টার, চাঁদপুর, কুমিল্লা। (পৃ. ১-১৫, ৯৯, ১০০)।
- ডি'কস্তা, যেরোম, "বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী', (প্রথম খণ্ড), প্রতিবেশী প্রকাশনী, আগষ্ট, ১৯৮৮খ্রিঃ।
- পিনোস, ফাঃ লুইজী, পিমে, "খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রেরণকাজে আনন্দ", প্রকাশনা পিমে মিশনারীগণ, সুইহারী, দিনাজপুর, ২০০৫খ্রিঃ।
- মোহাম্মদ আজহার আলী, "শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস," বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬ খ্রিঃ।
- মান্নান আ.খা.আব্দুল, হক এ.কে.এম মোজাম্মেল, গোলাম রসুল মিয়া। আনাম মুহম্মদ ইবলু, "শিক্ষার ইতিহাস," ঢাকা আহছানিয়া মিশন, ২য় মুদ্রণ জুন, ১৯৯৬ খ্রিঃ।
- আহমেদ, ইমতিয়াজ, "দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পর্তুগীজ বাণিজ্য" বাংলা একাডেমী, ঢাকা প্রকাশনা, জুন ২০০৮ খ্রিঃ ।

➢ মালেক আব্দুল, বেগম, মরিয়ম, ইসলাম ফকরুল, রিয়াদ শেখ শাহবাজ, “শিক্ষবিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষা”, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা-১২০৭, চতুর্থ সংস্করণ মার্চ ২০১৪, চৈত্র ১৪২০। (পৃঃ ৬২১, ৬২২, ৬২৯, ৬৩০, ৬৩২, ৬৩৩, ৬৩৭, ৬৩৮, ৬৪৯, ৬৫২, ৬৫৩)।

➢ হালদার, গৌরদাস, “শিক্ষা প্রসঙ্গে ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস,” প্রকাশক, শ্রী সূর্য কুমার ব্যানার্জী, ৪র্থ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২ খ্রীঃ।

➢ গমেজ, ফাঃ জয়ন্ত এস, (সম্পাদক) “সাপ্তাহিক প্রতিবেশী”, ২০১১ খ্রিঃ।

➢ গমেজ, ফাঃ জয়ন্ত এস, (সম্পাদক) “সাপ্তাহিক প্রতিবেশী”, ২০১৫ খ্রিঃ।

➢ গমেজ, ফাঃ জয়ন্ত এস, (সম্পাদক) “সাপ্তাহিক প্রতিবেশী”, ২০১৬ খ্রিঃ।

➢ কস্তা, ফাদার বেঞ্জামিন, সিএসসি, “ খ্রিষ্টান যুব সমাজ ও উচ্চ শিক্ষা”।

➢ কস্তা, ফাদার বেঞ্জামিন, সিএসসি, “ বাংলাদেশে হলিক্রস : অতীত ও বর্তমান”।

➢ কস্তা, ফাদার বেঞ্জামিন, সিএসসি, “বাংলাদেশ পবিত্র ক্রুশ সংঘের যাজক প্রার্থীদের গঠন প্রশিক্ষণের ইতিহাস”।

➢ (Fr. Lucio)" অনুবাদক “নতুন মানুষের আবির্ভাব” জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যশোর। ৫ম প্রকাশ ২০১০ খ্রিঃ।

➢ “খ্রিষ্টমণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার সারসংক্ষেপ” জামানো ক্রেপালদি (সেক্রেটারী), কার্ডিনাল আঞ্জেনা সোডানা (স্বরাষ্ট্র সচিব) কার্ডিনাল রেনাটো রাফায়েলে মার্তিনো, প্রেসিডেন্ট।

➢ কস্তা, ফাঃ বেঞ্জামিন, সিএসসি, “বাংলাদেশে বর্তমান হলিক্রস”।

➢ কস্তা, ফাঃ বেঞ্জামিন, সিএসসি, “সকল মানুষের মৌলিক ও অভিন্ন আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার”।

➢ “আমি পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি”- বঙ্গানুবাদ - (সংগৃহীত)

➢ পিনোস, ফাঃ লুইজী, পিমে, “খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রেরণকাজে আনন্দ,” প্রকাশনাঃ পিমে মিশনারীগণ, সুইহারী, দিনাজপুর। প্রকাশ : ২০০৫ খ্রিঃ।

➢ গৌরবের ৭৫ বছর “সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুল (১৯৩৩ খ্রিঃ) প্লাটিনাম জুবিলী, ২০০৮, ১৭ মাঘ ১৪১৫ বাংলা, ৩০ জানুয়ারী ২০০৯ খ্রিঃ।

➢ নটর ডেম কলেজের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে “সুবর্ণ স্মারক”, ১১ নভেম্বর, ১৯৯৯ খ্রিঃ।

➢ শতবর্ষ পূর্তি ‘স্মরণিকা’ বান্দুরা হলিক্রশ উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা (১৯১২ খ্রিঃ)।

➢ “প্রকর্ষণ”, আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, প্রথম সংখ্যা, ৪ জুন, ২০১০ খ্রিঃ।

➢ “স্মরণিকা”, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ প্রতিষ্ঠার ১২৫ বছর জুবিলী উৎসব, ৯ নভেম্বর, ২০১২ খ্রিঃ।

➢ “The JOSEPHITE” Golden Jubilee Souvenir 2004, St. Joseph High School and College, 2004.

➢ "The Catholic Directory of Bangladesh"- 2013, Published by Proatibeshi Prokashoni, 10th revised Edition.

➢ PP- 28-43, 68-69, 125-127, 157-159, 185-187, 217-219, 245-247,273-275.

- Holy Cross Members in the History - Published for Jubilee Celebration (February 01-11,2004)
- D' Costa, Jerome, "Christianity in Bangladesh."
- Fr. Armanasco, "Kripasastra", The Foreign Missions of Milan, April 15, 1953.
- History of St. Placid's School (1853-1953) by Bro. Alberic, CSC, Translated from French, Rev. Father Mascarenhas, CSC (1956), 2nd Edition, January 2010.
- Pinos, Fr. Luigi, PIME, Catholic Beginnings in North Bengal, 2nd Edition, August 1994
- http://www.cbcbsee.org/CBCB
- http://en.wikipedia.org/wiki/Christianity-in-Bangladesh
- http://sites.google.com/sitr/bdguiber/home/6-english/mission/the history-of-christian -contributions-in-Bengal.

পরিশিষ্ট - ক

গবেষণা তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচিত স্থানসমূহ :

১. প্রতিবেশী প্রকাশনী (তেজগাঁও)

২. নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়

৩. কারিতাস বাংলাদেশ

৪. সেন্ট যোসেফ স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা

৫. আর্চবিশপ টি.এ গাঙ্গুলী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা

৬. হলিক্রস কলেজ, ঢাকা

৭. সেন্ট প্লাসিড হাইস্কুল, চট্টগ্রাম

৮. সেন্ট আলফ্রেডস্ হাইস্কুল, পাদ্রিশিবপুর, বরিশাল

৯. প্রেসবিটারিয়ান চার্চ, সিলেট

১০. বান্দুরা হলিক্রস স্কুল

১১. শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১২. অবলেট হাউজ, ঢাকা

পরিশিষ্ট - খ

মানচিত্র সমূহ :

মানচিত্র-১

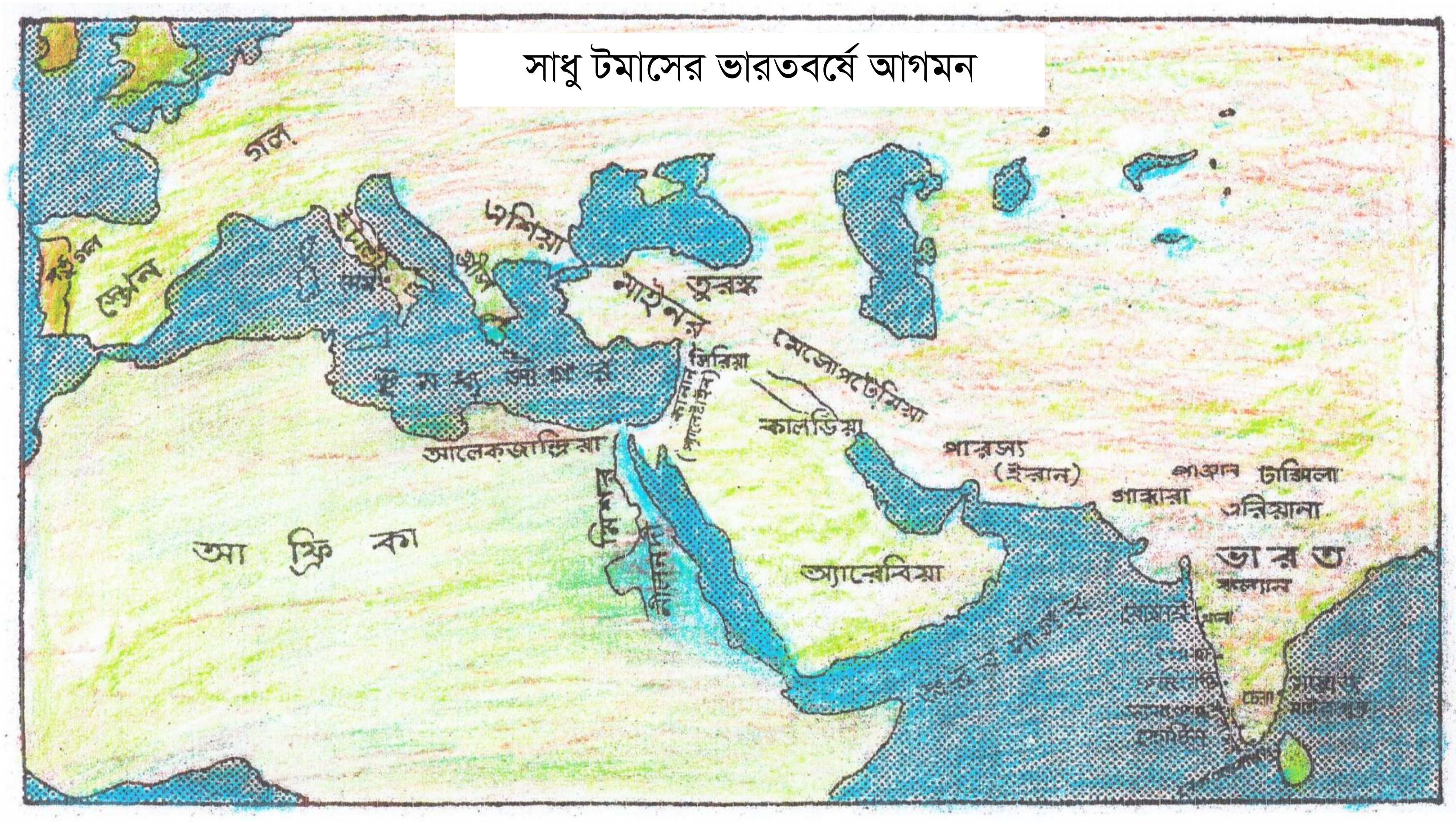
সাধু টমাসের ভারতবর্ষে আগমন
স্পেন
তুরস্ক
সিরিয়া
মেসোপটেমিয়া
কালডিয়া
পারস্য
(ইরান)
আলেকজান্দ্রিয়া
আ ফ্রি কা
অ্যারেবিয়া
গান্ধারা
ভারত

মানচিত্র-২

যীশুর সময়কার প্যালেষ্টাইন দেশ

মানচিত্র-৩

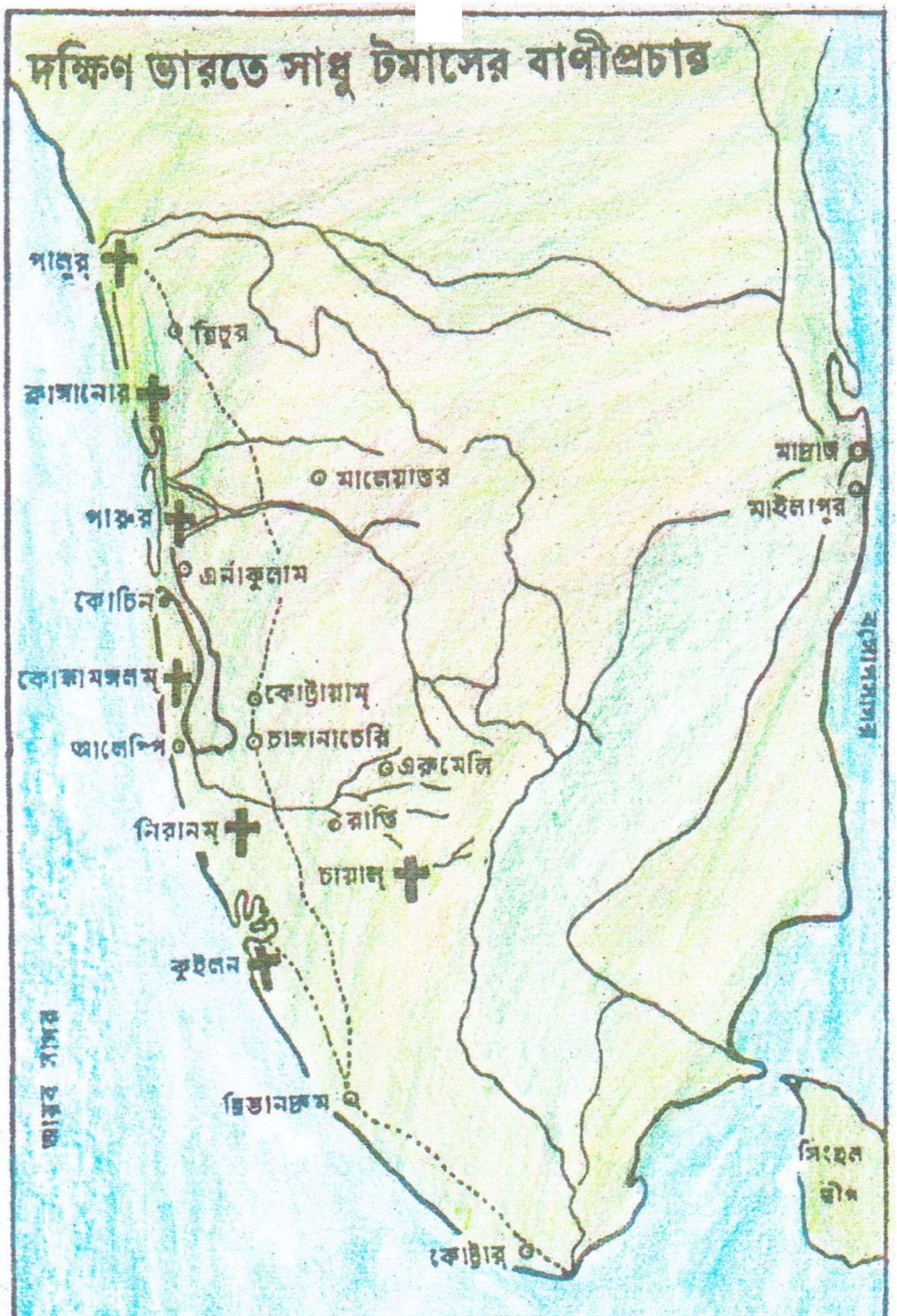
দক্ষিণ ভারতে সাধু টমাসের বাণীপ্রচার
পালুর
ত্রিচুর
ক্রাঙ্গানোর
মালেয়াত্তুর
পাকুর
এর্নাকুলাম
কোচিন
কোক্কামঙ্গলম্
কোট্টায়াম্
আলেপ্পি
চাঙ্গানাচেরি
এরুমেলি
নিরানম্
রান্তি
চায়াল্
কুইলন
ত্রিভানদ্রম
কোটার্
মাদ্রাজ
মাইলাপুর
বঙ্গোপসাগর
আরব সাগর
সিংহল দ্বীপ
ভারত মহাসাগর

মানচিত্র-৪

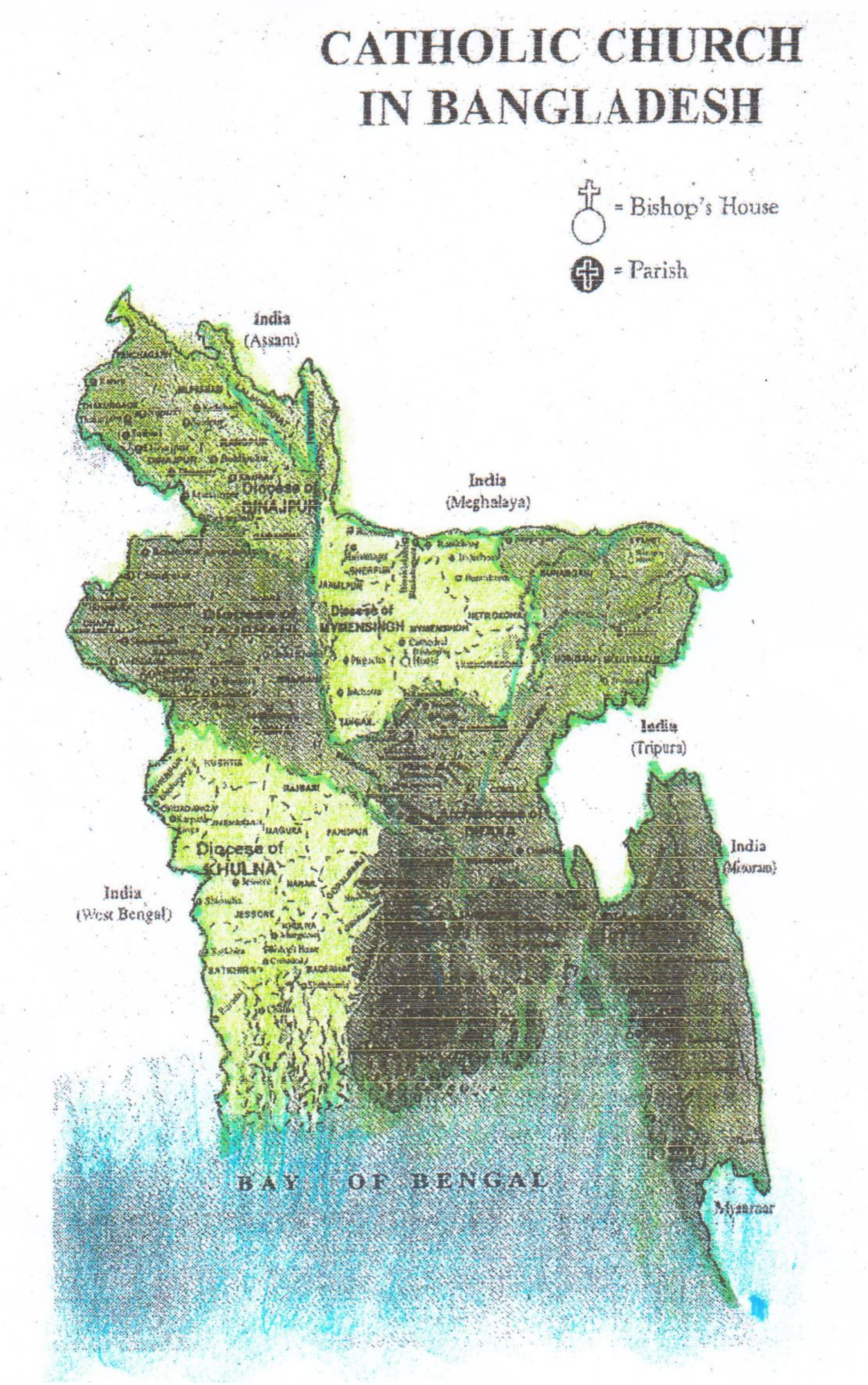
CATHOLIC CHURCH
IN BANGLADESH
= Bishop's House
= Parish
India
(Assam)
India
(Meghalaya)
India
(Tripura)
India
(Mizoram)
India
(West Bengal)
Diocese of
DINAJPUR
Diocese of
MYMENSINGH
Diocese of
KHULNA
BAY OF BENGAL
Myanmar

মানচিত্র-৫

পরিশিষ্ট - গ

স্থির চিত্রসমূহ :

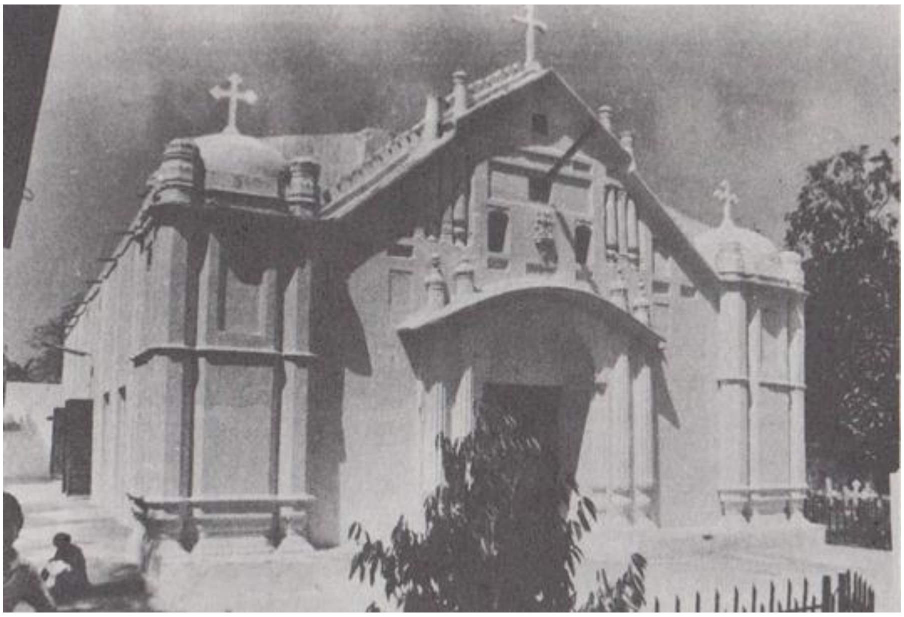

তেজগাঁও চার্চ (পুরাতন)

তেজগাঁও চার্চ (নতুন)

নটর ডেম কলেজ (পুরাতন)

নটর ডেম কলেজ (নতুন)

হলিক্রস গার্লস হাইস্কুল

হলিক্রস কলেজ

সেন্ট যোসেফ হাইস্কুল এণ্ড কলেজ

নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়

ব্যাণ্ডেল চার্চ